শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী

প্রথম খণ্ড।

১ম, ২য়, ৩য় ভাগ সম্পূর্ণ।

তৃতীয় সংস্করণ।

মডেল ভগিনী, কালাচাঁদ, চিনিবাস-চরিতামৃত,
নেড়া হরিদাস প্রভৃতি উপন্যাস-লেখক
কর্ত্তৃক এই গ্রন্থ বিরচিত।

কলিকাতা,

৩৮। ২ ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী-ইলেকট্রো-মেসিন্ প্রেসে,
শ্রীনটবিহারী রায় দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩১২ সাল।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা।

আজ প্রায় সাত বৎসর অতীত হইল, শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী উপন্যাসের কিয়দংশ—১ম এবং ২য় ভাগ প্রকাশিত হয়। অবশিষ্টাংশ,—(৩য়, ৪র্থ, ৫ম এবং ৬ষ্ঠ ভাগ)—১৩০৮ সালের চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহে লিখিতে আরম্ভ হইয়া, ১৩০৯ সালের ২রা জ্যৈষ্ঠ সমাপ্ত হয়।

গ্রন্থ বৃহৎ। দুই খণ্ডে বিভক্ত করা হইল। প্রথম খণ্ডে ১ম, ২য় এবং ৩য় ভাগ রহিল। দ্বিতীয় খণ্ডে ৪র্থ, ৫ম এবং ৬ষ্ঠ ভাগ রহিল।

এ ধরণের এরূপ বৃহৎ উপন্যাস বঙ্গভাষায় বোধ হয়,—এই নূতন। এরূপ গ্রন্থ পাঠ করিবার ধৈর্য্য সাধারণতঃ বাঙ্গালীর আছে কিনা জানি না।

কেবল গল্পটীর জন্য যিনি এই গ্রন্থ পড়িবেন,—তিনি ঠকিবেন। উপন্যাস পাঠের উদ্দেশ্য,—অন্যরূপ।

আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত ধীরভাবে মনোযোগপূর্ব্বক না পড়িলে, এ উপন্যাসের মর্ম্মার্থ অবগত হওয়া কঠিন। স্রোতে যেন কেহ ভাসিয়া না যান।

বাস্তব-ঘটনার ছায়া লইয়া এই উপন্যাস লিখিত।

২রা জ্যৈষ্ঠ। ১৩০৯ সাল } শ্রী.........গ্রন্থকার।
কলিকাতা, বঙ্গবাসী-কার্য্যালয়।

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা।

শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী উপন্যাস প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে বার হাজার ছাপা হইয়াছিল। দুই বৎসরের মধ্যে ঐ বার হাজার গ্রন্থ নিঃশেষ হয়। তৃতীয় সংস্করণ দশ হাজার ছাপা হইল।

বৈশাখ, ১৩১২ সাল।

শ্রী.........গ্রন্থকার।

কলিকাতা, বঙ্গবাসী-কার্য্যালয়।

শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী।

প্রথম ভাগ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

চিরদিন কখন সমান যায় না। কভু বনে বনে ভ্রমণ,—কভু সিংহাসনে উপবেশন। কখন রাখাল,—কখন রাজা। কখন ভিক্ষুক,—কখন দাতা।

পৌষের প্রত্যুষে এক বর্ষীয়সী বিধবা স্ত্রীমূর্ত্তি,—গঙ্গা-স্নানের পর, কাঁখে কলসী লইয়া, শীতে থর-থর কাঁপিতে কাঁপিতে যাইতেছে। ভিজা কাপড় পরিধান। কাঁধে ভিজা গামছা। কাঁখে গঙ্গাজলপূর্ণ বড় এক মাটীর কলসী। ঈষৎ ঘোমটা টানা। কলসীভরে বৃদ্ধা অঙ্গ হেলিয়া হেলিয়া যাইতেছে। দেখিলেই মনে হয়, যেন কোন ভদ্রঘরের স্ত্রীলোক।

থানের কাপড় পরিধান। সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা। পদদ্বয় এবং অঙ্গুলি-দল দেখিলে, বুঝা যায়, বৃদ্ধা গৌরাঙ্গী। বয়স পঞ্চাশ বৎসরের অধিক অনুমান হইলেও, বৃদ্ধার গায়ে এখনও বেশ শক্তি আছে বলিয়া বোধ হয়।

মা! পথে ত এখন কোন লোকজন নাই, তুমি অমন আর্দ্রবস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া কেন যাইতেছ মা! তোমার বয়স এত অধিক হইলেও তোমার ঘোমটা কেন মা! তুমি স্বয়ং জল তুলিতেছ কেন? এত বড় কলসী বহন করা তোমার কি কাজ? তোমার ঘরে ঝি নাই কি মা!

মা! বড় শীত! শুক্‌নো কাপড় একখানি সঙ্গে করিয়া আন নাই কেন? সেখানি পরিয়া গেলে এ সময় ত এত কষ্ট হইত না মা। তোমার কি দ্বিতীয় বস্ত্র নাই?

এত ভোরে স্নান কেন মা? গাছে-পালায়, ঝোপে-ঝোপে, এখনও রাত রহিয়াছে। পাখীগণ এখনও ডাকিয়া উঠে নাই। এরূপ অসময়ে মানুষে কখন কি গঙ্গাস্নান করিতে পারে? অল্প রোদ উঠিবার পর স্নান করিলে ত এত কষ্ট হইত না?

বৃদ্ধা কিন্তু বেশ যাইতেছেন। শীতে থরথর কাঁপুন, কলসীভরে হেলিয়াই পড়ুন, তিনি বেশ যাইতেছেন। তা বুঝি নয়; বৃদ্ধার যেন বড়ই কষ্ট হইতেছে। কম্পন এবং হেলন,—কষ্টের পরিচায়ক নহে কি?

পৌষের সেই ঊষাকালে এইরূপে বৃদ্ধা প্রায় এক-পোয়া পথ অতিক্রম করিলেন। ক্রমশ ফরসা হইয়া আসিল। পাখী ডাকিতে লাগিল। দুই এক জন লোক পথে দেখা দিল। বৃদ্ধা আরও একটুকু ঘোমটা টানিয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধা এক প্রকাণ্ড অট্টালিকার সমীপবর্ত্তিনী হইলেন। রাজবাড়ী-তুল্য প্রাসাদ। বাটীর সম্মুখে পুষ্পোদ্যান, সরোবর, দেবালয়, অতিথি-শালা, নহবৎ-খানা, বৃহৎ উঠান,—নাই কি? মল্লগণের ক্রীড়া করিবার স্বতন্ত্র স্থান,—নৃত্য-গীত-বাদ্যের স্বতন্ত্র স্থান,—এককালে

দুই হাজার লোক-ভোজনের স্বতন্ত্র স্থান,—ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের বসিয়া বিচার করিবার স্বতন্ত্র স্থান,—পুরাণ পাঠের স্বতন্ত্র স্থান,—নাই কি? তার পর অন্দরবাটী। তাহাও অতি বৃহৎ এবং নানা খণ্ডে বিভক্ত।

এই যে বৃদ্ধা,—এই রাজ-ভবনেই প্রবেশোদ্যতা দেখিতেছি! এতক্ষণে বুঝিয়াছি, বুড়ী এই বাড়ীর ঝী। সম্ভ্রান্ত বাড়ীর সম্ভ্রান্ত ঝী। বোধ হয়, রাজকন্যা প্রাতে গঙ্গাজলে স্নান করেন; তাই ঝী শুদ্ধাচরণে জল আনিতেছে।

বৃদ্ধা বাড়ী ঢুকিলেন। পুষ্পোদ্যানে জনমানব নাই,—বাগানের মালিগণ কোথায়? শীতকালের প্রভাত কি না?—বিষম শীত বলিয়া মালিগণ এখনও কাজে লাগিতে পারে নাই।

সদরবাটীর দ্বিতীয়-দ্বারে,—সিংহদ্বারে,—বৃদ্ধা প্রবেশ করিলেন। তথায় এক নবদূর্ব্বাদল-শ্যাম, দীর্ঘকায়, বিশালবক্ষ, ভীমাকৃতি, লোহিত-লোচন পুরুষ দণ্ডায়মান। বয়স চল্লিশের অধিক হইয়াছে। দেহ সুঠাম, সুদৃঢ়,—কেশরী জিনিয়া কটীতট,—তেজঃস্ফুর্ত্তির অক্ষয়-আধার! প্রথম যৌবনে এই ব্যক্তি কিরূপ শক্তিসম্পন্ন ছিল, এখন কেবল তাহাই ভাবিতে ইচ্ছা হয়। এই লোকটী বুঝি এ রাজবাড়ীর পুরাতন দ্বারবান্।

বৃদ্ধাকে অদূরে দেখিয়াই, সেই পুরুষ সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইল। পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল। কোন কথা কহিল না। কেবল সে একদৃষ্টে বৃহৎ মৃৎকলসী পানে চাহিয়া রহিল।

একি! ভৃত্য, ঝীকে প্রণাম করে কেন?

অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই, সদরখণ্ডে জীবমাত্রেরই সমাগম নাই। বৃদ্ধা ঘোমটা খুলিয়া দিয়া, সদরখণ্ডের মধ্য দিয়া

অবনতবদনে চলিতে লাগিলেন। অন্দর-দ্বারে প্রবেশের পথে বৃদ্ধা দেখিলেন, এক পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকা দৌড়িয়া আসিতেছে। বালিকা হাসিয়া এবং রাগিয়া বৃদ্ধাকে কিল মারিবার উপক্রম করিল।

বৃদ্ধা। আমাকে ছুঁইও না। আমার এখনও পূজা শেষ হয় নাই।

বালিকা। মা, তবে তুই বল্, এত দেরী ক'রে কেন এলি?

বৃদ্ধা। গঙ্গা কি কাছে মা?

বালিকা। মা, তোর দেরী হওয়া দেখে বৌ কত কাঁদ্‌ছিল! তুই বল্, আর দেরী কর্‌বি না? তা নহিলে, এখনি তোকে কিল মার্‌বো।

বৃদ্ধা। না মা, আর দেরী কর্‌বো না।

এইরূপ কথা-বার্ত্তা হইতেছে এবং বৃদ্ধাও অন্দরের দিকে অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময়ে এক অদ্ধ অবগুণ্ঠনবতী, শুদ্ধ-বসনপরিধানা বধূ আসিয়া, বৃদ্ধার কক্ষ হইতে কলসী লইয়া, স্বীয় কক্ষে স্থাপনপূর্ব্বক, বৃদ্ধার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। যে ঘরে পূজার আয়োজন হইয়াছে, সেই ঘরে কলসী সংরক্ষিত হইল। বধূ—ধূপ-ধূনা গুগ্‌গুলে অগ্নি সংযোগ করিলেন। পঞ্চদশবর্ষীয় এক বালক আসিয়া, বৃদ্ধার নিকট দেবীপ্রীতিকর বিল্বদল ও পুষ্প-সম্ভার রাখিয়া দিল। বৃদ্ধা—দেবীসম্মুখে পূজার আসনে বসিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বৃদ্ধা গৃহকর্ত্রী; বধূ,—বৃদ্ধার প্রথম পুত্রের সহধর্ম্মিণী; বালিকা,—বধূর কন্যা; বালক,—বৃদ্ধার কনিষ্ঠ পুত্র। বধূ,—সধবা; কিন্তু পতি নাই,—আজ এক বৎসরের অধিক কাল কোথায় তিনি নিরুদ্দেশ হইয়াছেন, কেহ তাহা জানে না। বালিকা অভ্যাসদোষে তাহার পিতামহীকে মা বলিয়া ডাকে,—তাহার মাকে বৌ বলে।

বৃদ্ধার নাম কাত্যায়নী। পৌত্রীর নাম লক্ষ্মী; পুত্রবধূর নাম যশোদা দেবী। নিরুদ্দিষ্ট জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ভবানীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। কনিষ্ঠ পুত্রের নাম রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। আর যে ভীমাকৃতি পুরুষ, সিংহদ্বারের সন্নিকটে বৃদ্ধাকে প্রণাম করিয়াছিল, সে এ বাটীর দ্বারবানই বটে। জাতিতে সে গোপ,—নাম রঘুদয়াল। উহার মাতৃপ্রদত্ত আর একটী নাম ছিল,—"গোকা।"

বৃদ্ধার বসতবাটী,—উদ্যান-পুষ্করিণী লইয়া প্রায় আধখানা গ্রাম ব্যাপিয়া আছে। বাড়ীর চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর। ঐ বৃহৎ ভবনে তিনটী স্ত্রীলোক, রমাপ্রসাদ এবং রঘুদয়াল এই দুইটী পুরুষ,—এই পাঁচজন ব্যতীত আর কেহ বাস করে না। কেবল রঘুদয়ালের যত্নে ও গুণে গৃহ এখনও সেইরূপ শ্রীহীন হয় নাই;—শ্মশানে পরিণত হয় নাই। প্রত্যহ কিছু কিছু বালি-চূণ খসে বটে; কিন্তু রঘুদয়াল সে গুলি ঝুড়ি করিয়া কুড়াইয়া লইয়া, বাহিরে ফেলিয়া দেয়; দালানের কোটরে রঘুদয়াল চড়ুই-চামচিকার বাসা হইতে দেয় না; "বাঁটুল" মারিয়া তাড়ায়। কিন্তু পায়রাকে সে বড় পারিয়া উঠে না এবং গৃহ-কর্ত্রীরও পায়রা

তাড়াইতে নিষেধ আছে। রঘুদয়াল পায়রার জন্য বাটীর প্রান্ত-ভাগে এক স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। সেইখানেই পারাবতকুলকে যৎকিঞ্চিৎ যথাসাধ্য আহার দেয়। সদর খণ্ডে এবং অন্দর-খণ্ডে পায়রা আসিলে, রঘুদয়াল হো—করিয়া উড়াইয়া দেয়। সুবৃহৎ-পুষ্পোদ্যানে নানাজাতীয় পুষ্পবৃক্ষ ছিল। সে সব এখন কিছুই নাই। বত্রিশ জন মালী ছিল। এখন রঘুদয়াল একা,—কিরূপে সে উদ্যান সংরক্ষিত হইবে? ফুলগাছ যেমন শুকায়, রঘু কখন বা সে গাছ কাটিয়া জঙ্গল পরিস্কার করে; কখন বা তাহা মা ঠাকুরাণীর রাঁধিবার কাঠ হয়।

এইরূপে এক বৎসরে রঘু সমস্ত ফুল গাছই কাটিয়াছিল; কেবল দেবীপূজার জন্য কয়েকটী ফুলগাছ কাটে নাই। স্বয়ং তাহাদের তলে জলসেচন করিত। ফুলগাছ ব্যতীত বাটীর উদ্যানে অন্য কোন বৃক্ষ ছিল না। ছিল কেবল একটী আম গাছ। কর্ত্তা-মহাশয় স্বহস্তে তাহা রোপণ করেন,—প্রবাদ, সেরূপ সুমিষ্ট আম সে দেশে ছিল না। কর্ত্তা স্বয়ং জালতী করিয়া সে আম পাড়িতেন, পাকাইতেন, দেবতাকে ও ব্রাহ্মণকে দান করিতেন। অবশেষে স্বীয় সহধর্ম্মিণী কাত্যায়নীকে বলিতেন,—"আম সকলকে দেওয়া হইয়াছে, এখন তুমি একটী খাইলেই আমি খাইতে পারি।" কাত্যায়নী হাসিয়া কহিতেন,—"ও আম টক্, প্রসাদ না হইলে মিষ্ট হয় না; আমি টক্ আম কেন খাইব?" আম যখন পাকিত, বৃক্ষে ঝুলিত, তখন গাছের উপর এক রেসমের জাল পড়িত; দুই জন দ্বারবান্ পাহারা দিত; কর্ত্তা রাত্রে শয়নাগারে যাইবার পূর্ব্বে একবার আম গাছের নিকট যাইতেন এবং প্রধান দ্বাররক্ষক রঘুদয়ালকে বলিয়া আসিতেন,—"দেখিও, যেন

বৃক্ষের প্রহরিগণ রাত্রে না নিদ্রিত হয়।" এখন গাছ ঢাকা দিবার জন্য সে রেসমের জাল আর নাই, রঘুদয়াল কখন কখন বাঁটুল ধনুর্ব্বাণ লইয়া, দিবসে হনুমান্ এবং পক্ষী তাড়াইয়া থাকে,—রাত্রে দুই তিন বার উঠিয়া বাদুড়কুলকে দূর করে।

এখনও আম সেইরূপ পাকে। এখনও গৃহিনী গ্রামের যত দেবালয়ে এবং সুব্রাহ্মণের গৃহে সেইরূপ আম পাঠাইয়া থাকেন। সমস্তই সমভাবে চলিতেছে, কেবল বৃদ্ধা সে আমের আস্বাদ এখন গ্রহণ করেন না। পুত্রবধূ যশোদা, বৃদ্ধাকে আম খাইতে বলিলে বৃদ্ধা হাসিয়া বলিতেন,—"ও টক্ আম আমি খাই না।" পুত্রবধূ এ কথার অর্থ বুঝিতে পারিতেন না। শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণীর কথার প্রতিবাদ করা গর্হিত বিবেচনা করিয়া তিনি নীরব হইতেন। আর আম খাইত না,—সেই রঘুদয়ালে চাকরটা। গৃহকর্ত্রী তাহাকে আম খাইবার জন্য অনুরোধ করিলে, সে যোড়-হাত করিত। বেশী জিদ্ করিলে আম লইয়া আপন মস্তকে রাখিত, এবং বলিত,—"মা! যে আম কর্ত্তা ভাল-বাসিতেন, সে আম আমি কেমন করিয়া খাইব?" বলিতে বলিতে রঘুদয়ালের চক্ষু দিয়া দর দর জল পড়িত। গৃহকর্ত্রী,—রঘুদয়ালের নিকট আর মুহূর্ত্ত মাত্র না দাঁড়াইয়া, সহসা পশ্চাৎ ফিরিয়া চলিয়া আসিতেন।

রঘুদয়াল সরোবর পরিস্কার রাখিয়াছে। পূর্ব্বে মৎস্য-পূর্ণ ছিল,—এখন নাই। এখন মাছ ফেলিবার মানুষ নাই, মাছ জন্মিবে কেন? আগে প্রভাত হইতে রাত্রি দ্বি-প্রহর পর্য্যন্ত গৃহে দলে দলে লোক আসিত,—এখন লোক-সমাগম-শূন্য। নীরবতার মহারাজ্য; বুঝি সে পথে আর লোক চলে না; লোক চলিলেও বুঝি উঁকি দিয়া সে ভবনপানে আর কেহ চায় না, চাহিলেও

বুঝি লক্ষ্য করে না। সে ভবনের উপর দিয়া পাখীও বুঝি উড়ে না। সকলই ছিল,—সকলই গিয়াছে। অথবা আছে সকলই; কিন্তু কেহই নাই। তখন বন্ধু ছিল, আত্মীয়স্বজন ছিল, গুরু ছিল, পুরোহিত ছিল, গুরুপুত্র-ভিক্ষাপুত্র ছিল,—সম্বন্ধী ভগিনীপতি ভাগিনেয় ছিল, —আরও কত কি ছিল,—এখন আছেনও সকলই,—কিন্তু নাই কেহই। কেবল রঘুদয়াল ছাড়িলেই ষোল-কলা সম্পূর্ণ হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

হায়! কেন এমন হইল, কিসে এমন হইল? কার দোষে কার পাপে, কার অভিশাপে, কোন কর্ম্মফলে এ সোণার সংসার—এ সোণার স্বর্ণ-প্রতিমা ডুবিল! হায় কে বলিয়া দিবে, কেন ডুবিল!

জমীদারী ছিল, তেজারতি ছিল, কোম্পানীর কাগজ ছিল, ব্যবসায় ছিল, চাকুরী ছিল, চাষ ছিল, এক শত ধানের মরাই বাঁধা ছিল, এখন আর তার কিছুই নাই। কর্ত্তার আজ দুই বৎসর মাত্র মৃত্যু হইয়াছে,—হঠাৎ যাদুমন্ত্রে যেন সমস্ত উড়িয়া গিয়াছে। দাস-দাসী অসংখ্য ছিল, দ্বারবান্ ষোল জন ছিল, কলমধারী কর্ম্মচারী ত্রিশজনের কম নহে,—অশ্ব ছিল, হস্তী ছিল, নৌকা ছিল। অতিথি-শালায় প্রত্যহ পঁচিশ জন অতিথির সেবা হইত; দেব-সেবায় দ্বাদশ জন ব্রাহ্মণ প্রতিপালিত হইতেন; এক শত ভিখারী প্রত্যহ দেড় পোয়া করিয়া চাউল পাইত; গৃহের অধিষ্ঠাত্রীদেবী শঙ্করীর সেবায় প্রত্যহ দ্বাদশ বলি হইত। এখন সে সব কিছুই নাই। কখন ছিল কি না, তাহার চিহ্নমাত্র বুঝি নাই।

কর্ত্তার নাম ছিল,—শঙ্করীপ্রসাদ। তিনি দেবী ভক্ত শাক্ত এবং মুক্তহস্ত পুরুষ ছিলেন। তাঁহার ললাট উন্নত, নয়ন-যুগল উজ্জ্বল, বর্ণ তপ্তকাঞ্চন-নিভ। তিনি ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে জাগ্রত হইতেন এবং পূজা ও হোম শেষ করিয়া প্রাতে বেলা আটটার সময় সদর-বাটীতে যখন উপস্থিত হইতেন, তখন তাঁহার তেজঃপুঞ্জ-কলেবর দেখিয়া মনে হইত, যেন কোন রাজা-ঋষি ভূতলে উদিত হইয়াছেন। তাঁহার গ্রামস্থ লোক এবং নিকটবর্ত্তী গ্রামস্থ লোক—আদালতে মোকদ্দমা করিতে যাইত না,—শঙ্করীপ্রসাদ তাহাদের বিচারপতি ধর্ম্মাবতার ছিলেন।

এই পরম ভাগ্যবান পুরুষ শঙ্করীপ্রসাদের কালে মৃত্যু হইল এবং দুই বৎসর যাইতে না যাইতেই সমস্ত শূন্যাকার হইল। মানব! দম্ভ অহঙ্কার করিও না! ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া কখন ঐশ্বর্য্যের কথা মনে করিও না। ভাবিও, ইহা ছায়াবাজী। ভাবিও, ইহা আকাশ-কুসুম,—ইহা কবি-কল্পনা। ভাবিও, ইহা বিকার-গ্রস্ত রোগীর দুঃস্বপ্ন। অথবা ভাবিও ইহা মায়া,—"ব্রহ্মাদি তৃণ-পর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ।"

শঙ্করীপ্রসাদ উপকার করিতে কাহারও বাকি রাখেন নাই। তিনি যে জেলায় বাস করিতেন, সে জেলার মধ্যে যেখানে লোকের অন্নকষ্ট উপস্থিত হইত, সেখানে অন্নছত্র বসাইতেন। যেখানে পানীয় জলের অভাব হইত, সেখানে দিঘী কাটাইয়া দিতেন। কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ আসিলে তিনি অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতেন। ঋণদায়ে কোন ভদ্র ব্যক্তির কারাবাস হইতেছে দেখিলে, তিনি সে টাকা স্বয়ং পরিশোধ করিতেন। বহুলোককে পিতৃ-মাতৃ-দায়ে তিনি উদ্ধার করিয়াছেন। তিনি গুরুকে ভূমিদানে সঙ্গতিপন্ন করিয়া,

ছেন; পুরোহিতের অট্টালিকা করিয়া দিয়াছেন এবং ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণকে দানে সতত পরিতুষ্ট করিয়াছেন।

মুক্তহস্ত পুরুষ হইলেও তিনি নিতান্ত বে-হিসাবী লোক ছিলেন না। তাঁহার বুদ্ধির ধার—তীক্ষ্ণক্ষুর-ধার তুল্য। বহুদর্শিতাও বহুবিষয়ে ছিল। তিনি একা স্বয়ং উপার্জ্জন করিয়া এত ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াছিলেন। তিনি ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে আবকারী বিভাগের কোন দারগার তামাক্‌সাজা মুহুরী ছিলেন। এইখানেই তাঁহার লেখা-পড়া শিক্ষা হয়। তিনি বাঙ্গালা এবং পারসী জানিতেন। শেষ বয়সে ইংরেজীও কিছু শিখিয়াছিলেন। সপ্তদশ বৎসর বয়সে তিনি পুলিশবিভাগে হেডকনেষ্টেবলের পদ প্রাপ্ত হন। বিংশতি বৎসর বয়সে পুলিশ-দারোগার পদলাভ করেন। এক বৎসর অতিবাহিত হইলে, মেদিনীপুরের নিকটস্থ কোন সাহেব-কোম্পানীর তরফে তিনি নীলকুঠীর দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হন। পাঁচ বৎসর পরে সে কার্য্য ছাড়িয়া দিয়া তিনি ব্যবসায়ী হইলেন। ব্যবসায়েই তাঁহার বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি। লবণের ব্যবসায়ে তিনি এক বৎসর চারি লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করেন। এই সময়ে ওকালতী পরীক্ষা দিয়া তিনি উকীল হইলেন। দুই বৎসর মধ্যে তিনি জেলার সর্ব্বপ্রধান এবং প্রথম উকীল হইলেন। উপার্জ্জনও অধিক হইতে লাগিল। উপার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যয়ও প্রচুর ছিল। এখন অনেক উকীল উপার্জ্জন করেন, স্ত্রীর গহনার জন্য এবং কোম্পানীর কাগজের জন্য। শঙ্করীপ্রসাদ যখন নীল-কুঠীর দেওয়ান হন, তখন প্রথম বৎসরেই গৃহের অধিষ্ঠাত্রীদেবী শঙ্করীর এক সুবৃহৎ মন্দির প্রস্তুত করেন। এখন উপার্জ্জন করিয়া, দেবমন্দির ত দূরের কথা, কেহ পুষ্করিণীও প্রতিষ্ঠা করে

না। এখন রোজগার করিলে, গৃহিণীর গহনাগঠনের পরই বাড়ী, ঘড়ি, গাড়ি, ঘুড়ি,—বাকি থাকে কেবল একগাছি দড়ি।

এখন অতিথিশালায় অতিথিসেবার পরিবর্ত্তে চাঁদার খাতায় সহি করা প্রথা হইয়াছে। মুষ্টি-ভিক্ষা দানের পরিবর্ত্তে ভিখারীকে অর্দ্ধচন্দ্র দান প্রথা হইয়াছে। এখন অনেক হাকিম উকীল ব্যবসায়ী, জমীদার রোজগার করেন—রোজগারের জন্য; তখন রোজগার করিত—ক্রিয়াকলাপের জন্য, দোল-দুর্গোৎসবের জন্য। এখন দোল-দুর্গোৎসব হয় বটে; কিন্তু পৈতৃক দুর্গাকে না আনিলে বাড়ীর মেয়েরা রাগ করে,—তাই। এখন কর্ত্তা ধর্ম্মকর্ম্ম মেয়েদের উপর ভার দিয়া, প্রভাত হইতে তোপ-পড়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, কেবল রোজগারের চিন্তাতেই মগ্ন থাকেন। পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্য্যন্ত চিন্তা—কেবল পয়সা, কেবল তাম্রখণ্ড, কেবল রজতখণ্ড কেবল ছাপমারা কাগজখণ্ড। কিন্তু কেন পয়সা, কেন টাকা, কেন কাগজ, সে জন্য চিন্তা একবারও করেন না। দু-চোখ বুজিলেই যে অন্ধকার, তাহা তাঁহার মনে হয় না। কেবল কোম্পানীর ঘরে টাকা রাখিয়া কি হইবে বাপু? শঙ্করীপ্রসাদের ত সবই ছিল, তাঁহার এখন কি হইয়াছে বাপু? তাঁহার নগদ টাকা ছিল, সোণা-রূপার বাসন ছিল, মোহর ছিল, জমিদারী ছিল, ধান্যের মরাই ছিল, তেজারতী ব্যবসায় ছিল, সবই ছিল;—বল দেখি, মৃত্যুর পর কেন তাঁহার সমস্তই ফুৎকারে ভস্মীভূত হইয়া গেল? বল দেখি, কেন, তাঁহার স্ত্রী রাজরাজেশ্বরী হইয়া আজ ভিখারিণী? রাজরাজেশ্বরী—আজ কাঁখে কলসী লইয়া গঙ্গা হইতে জল তুলে কেন? রাজরাজেশ্বরী,—আজ ফেনে-ভাতে খায় কেন? রাজরাজেশ্বরী,—গঙ্গা হইতে আজ ভিজা কাপড়ে আসে

কেন? রাজরাজেশ্বরীর আজ দ্বিতীয় বস্ত্র নাই কেন? রাজ-রাজেশ্বরী,—উনানে হাঁড়ি চাপাইয়া বেলা তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত জল গরম করেন কেন? রঘুদয়াল তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত চাউল জুটাইতে পারে না কেন? সমস্তই কর্ম্মফল,—

কর্ম্মফলে কপালে কেবল সুখ দুঃখ
কেহ লক্ষপতি কেহ দ্বারের ভিক্ষুক।

তাই বলি, অর্থ-রক্ষায় কোন সুখ নাই,—সুখ সদ্ব্যয়ে। কর্ম্ম করিয়া যাও, শাস্ত্রানুমোদিত কর্ম্ম করিয়া যাও, দেব-সেবা, অতিথি-সেবায় তৎপর হও. সুব্রাহ্মণের সংরক্ষায় মনোযোগ দাও, তোমার অর্থের সার্থকতা হউক।

শঙ্করীপ্রসাদের বিষয়-সম্পত্তি কিসে উড়িল, তাহা জানিবার এক্ষণে প্রয়োজন নাই। সময়ে সকলই শুনিতে পাইবেন। এক্ষণে এইমাত্র বুঝিয়া রাখুন, কাত্যায়নী আজ নিরন্না,—ভাদ্রমাসের ভরা গঙ্গা হঠাৎ আজ বারিহীনা,—অন্নপূর্ণা হঠাৎ আজ অন্নহীনা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রকৃতই আর্দ্রবসনে শঙ্করী-সমীপে কাত্যায়নী বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ধ্যানে নিমগ্না। তাঁহার পূজা, জপ, হোম, আরাধনা, ধ্যানে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা কাল অতিবাহিত হইত। ভিজা কাপড় গায়ে শুকাইত। দ্বিতীয় বস্ত্র যে তাঁহার নিতান্ত ছিল না, তাহা নহে। একখানি ছিল; কিন্তু তাহা ছোট এবং তালি দেওয়া। বধূ যশোদা দেবী,—সূচ-শিল্পে বড় নিপুণা। তিনি সেই ছিন্ন ক্ষুদ্র বস্ত্রখানি স্থানে স্থানে সেলাই করিয়াছেন এবং আবশ্যকমত তালি দিয়াছেন।

রিপুকর্ম্ম করিয়া সারিলেও, বস্ত্রের কিন্তু ছয় আনা অংশ নাই। যে অংশ বেশী জীর্ণ হইয়াছিল, সেই অংশ কাটিয়া লইয়া গামছা করা হইয়াছে। অবশিষ্ট অংশ যাহা আছে, তাহা পাঁচ হাতের অধিক হইবে না, সুতরাং সে কাপড় দ্বারা লজ্জা নিবারণ হইবে কিরূপে? কাজেই কাত্যায়নী গঙ্গার ঘাট হইতে আর্দ্রবসনেই আসিতেন এবং আর্দ্র বসনেই ধ্যান করিতেন।

শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণী পূজায় বসিলেন। এখন ত বেলা দশটা পর্য্যন্ত তিনি নিশ্চিন্ত। এদিকে আজ "অন্নচিন্তা চমৎকারা"—ঘরে চা'ল নাই, নুন নাই, তেল নাই, তরকারী নাই, আছে কেবল যৎকিঞ্চিৎ খেঁসারীর দাল। বধূ যশোদাদেবী, রন্ধন করেন এবং আহারীয় দ্রব্য কি আছে না আছে, তাহা দেখেন,—কাত্যায়নীর সহিত এ বিভাগের কোন সম্পর্ক ছিল না। শেষ রাত্রে উঠিয়া ঠাকুরাণী গঙ্গাস্নানে গিয়াছেন, আর যশোদা, সংসারে কিছু নাই বলিয়া কাঁদিতে বসিয়াছেন,—"মা,—গঙ্গা নাহিয়া আসিলে কেমন করিয়া বলিব, আজ যে খাবার কিছুই নাই! কেমন করিয়া বলিব, কন্যা লক্ষ্মীর দুগ্ধ, কল্য হইতে গোয়ালিনী বন্ধ করিয়াছে! কেমন করিয়া জিজ্ঞাসিব, বেলা এক প্রহর হইলে লক্ষ্মী কি খাইবে! পূজা শেষ করিয়া মা যখন উঠিবেন, উঠিয়া যখন শুনিবেন, ঘরে আজ নিত্য দেবসেবার চা'ল নাই, আহারের চা'ল নাই, মুদী উঠনা দেয় না, প্রতিবেশী চা'ল ধার দেয় না, তখন তাঁহার মনে কতই কষ্ট হইবে? সে কষ্ট আমি কেমন করিয়া দেখিব!"—এইরূপে নানা কথা ভাবিয়া বধূ যশোদা শেষ রাত্রি হইতে কেবল নয়ন-জলে ভাসিতেছেন।

প্রভাতে কন্যা লক্ষ্মী উঠিয়া যশোদাকে জিজ্ঞাসিল, "বৌ! তুই কাঁদ্‌ছিস্ কেন?" যশোদা প্রকৃত-তত্ত্ব গোপন রাখিয়া মুখে বলেন,—

"মা গঙ্গাস্নানে গিয়াছেন আসিতে বিলম্ব হইতেছে, তাই ভাবিয়া কাঁদিতেছি ;" এই জন্যই লক্ষ্মী তাহার পিতামহীকে অন্দর-প্রবেশের পথে অদ্য কিল মারিতে গিয়াছিল।

ক্রমে রৌদ্র উঠিল, বেলা হইল, আটটা বাজিল,—লক্ষ্মী মা'র আঁচল ধরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, মা! খিদে পেয়েছে, কিছু খাবার দে মা! যশোদা কন্যার কর হইতে আঁচল ছাড়াইয়া লইলেন ; একটু দূরে গিয়া বলিলেন,—"দিচ্ছি মা!" আর কথা কহিতে পারিলেন না, চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে রন্ধন-শালার দিকে বেগে পলাইয়া গেলেন।

কন্যা লক্ষ্মী "বৌ যাস্ কোথা" বলিয়া মার পিছু পিছু ছুটিল। মাতা,—কন্যার আগমন দেখিয়া বড়ই বিব্রত হইলেন এবং অঞ্চলের অগ্রভাগ দ্বারা চোখের জল মুছিতে লাগিলেন ; কিন্তু সে জল কি মুছা যায়। যত মুছেন, দ্বিগুণ তেজে জল তত বাহির হয়। জলের ফোয়ারা ফুটিয়া উঠিয়াছে,—সংসারে কার সাধ্য যে, তার গতিরোধ করে? দেখিতে দেখিতে কন্যা আসিয়া আবার মার আঁচল ধরিল। কহিল, —"একি বৌ, তুই কাঁদ্‌ছিস্ কেন?"

মা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) কাঁদি নাই মা, কাঁদি নাই।

কন্যা। ঐ যে কাঁদ্‌ছিস্ ; তুই যদি আবার কাঁদিস্, তা হ'লে এখনি মাকে (ঠাকুর-মাকে) গিয়ে ব'লে দিয়ে আস্‌ব।

এই কথা বলিতে বলিতে বালিকার চোখ ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। মা'র কান্না দেখিলে কোন্ কন্যা বা না কাঁদিয়া থাকিতে পারে? কন্যার ছল্ ছল্ চোখে ক্রমশ জল আসিল, জল আসার পর ক্রমশ ক্রন্দনের সুর উঠিল। মা কন্যাকে ক্রোড়ে লইলেন, মুখ-চুম্বন করিলেন, আপন নয়নজলের সহিত কন্যার নয়নজল মিশা-

ইলেন! আবার মুখচুম্বন করিলেন, বলিলেন, "মা, কাঁদিও না,—কান্না কিসের?"

কন্যা। তুই কাঁদ্‌ছিস্‌ কেন?

জননী সে কথার কোন উত্তর না দিয়া, কন্যাকে কোলে করিয়া রন্ধনশালায় উপনীত হইলেন। রন্ধনভবন এক প্রকাণ্ড ব্যাপার। পাঁচ হাজার লোকের এক দিনের অন্ন-ব্যঞ্জন, পিঠা, পরমান্ন রন্ধন হইতে পারে,—এরূপ ভাবে পাকশালা নির্ম্মিত। বহু সংখ্যক বড় বড় উনান সজ্জিত। কোথাও ফেন ঢালিবার পয়োনালী; কোথাও ভাত চাল রাখিবার মার্ব্বেল-পাথরে গাঁথান বড় বড় চৌবাচ্চা; কোথাও তরকারী ও কাষ্ঠাদি রাখিবার বড় বড় ঘর। রন্ধন-শালা সেইরূপই বিস্তৃত এবং সুসজ্জিত আছে,—নাই কেবল রন্ধনের উপকরণ।

এই অপূর্ব্ব রন্ধন-শালার এক বৃহৎ উনানানের নিকট জননী কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া বসিলেন। কন্যা ক্রোড় হইতে উঠিয়া রন্ধন-শালার এ-দিক্‌ ও-দিক্‌ খেলিতে লাগিল। লক্ষ্মী কখন দ্রুতপদে দৌড়িয়া রন্ধন-বেদীর উপর উঠিয়া পড়ে;—কখন বা অন্ন রাখিবার হ্রদে ধীরে ধীরে ঝাঁপ দেয়;—এখন বা একটী প্রকাণ্ড উনানের গর্ত্তে লুকাইয়া মধুরকণ্ঠে মাকে "ভু" দেয় 'ভূ—উ।"

জননী যশোদাও কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থা হইলেন। তিনি তখন অনিমিষ-লোচনে সেই অপূর্ব্ব অন্নক্ষেত্রের শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। যেখানে একদিন পাঁচ শত মণ চাউলের অন্ন হইয়াছে, সেখানে আজ একটী পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকার অন্ন [হয়, এমন] মুষ্টি-মেয় চা'লও নাই! সর্ব্বগ্রাসক কাল সমস্তই হরণ করিয়াছে।

ক্ষুধায় খেলা ভাল লাগে না। অল্পক্ষণ খেলিয়াই বালিকা কহিল,—"বৌ, গয়লানী এখনও দুধ দিয়া গেল না কেন? বৌ, তুই ততক্ষণ এই বড় উনানটা জ্বেলে রাখ, দুধ আসিলেই তখনি গরম করিয়া দিবি।"

জননী তাহাই হইবে বলিয়া কন্যাকে একা রাখিয়া সে স্থান হইতে উঠিয়া গেলেন। শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীর পূজা শেষ হইয়াছে কি না প্রথমতঃ দেখিলেন। পূজা তখনও শেষ হয় নাই। রঘুদয়াল জ্বালানী কাঠ করিয়া দিয়াছিল, তাহা কিছু আছে। জননী যশোদা উনান ধরাইবেন বলিয়া, জ্বালানী কাঠ বাছিতে লাগিলেন। বাছেন আর ভাবেন,—কেবল কাঠ বাছিয়া কি হইবে! উনান জ্বালিয়াই বা লাভ কি? হাঁড়িতে জল দিয়া শুধু গরম করিলেই বা ফল কি? ফল নাই—লাভ নাই জানিয়াও, কাঠ বাছিতে লাগিলেন। বাছিয়া বাছিয়া উত্তম উত্তম কাঠ লইয়া রন্ধন-শালাভিমুখে চলিলেন। স্বয়ং যশোদা, লক্ষ্মীর জন্য রাঁধিতে যাইতেছেন; কিন্তু কাঠ ভিন্ন আর কিছুই নাই। হা শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড! জননী ক্ষুধাকাতরা কন্যাকে খাওয়াইবার জন্য যাইতেছেন, তুমি সেই মায়ের হাতে এখন পড়িয়াছ,—কাষ্ঠখণ্ড! তুমি সরস হও, মঞ্জরিত হও, ফুলে ফলে শোভিত হও, মার জীবনধন লক্ষ্মীকে ফলদানে তৃপ্ত কর, যশোদার প্রাণ শীতল হউক,—নহিলে তাঁহার বুকের কলিজা বুঝি এবার ফাটিল!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বেলা প্রায় সাড়ে নয়টা, কাত্যায়নীর শঙ্করী-পূজা সাঙ্গ হইল। তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়া মা-শঙ্করীদেবীকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মায়ের একবার মুখপানে চাহিলেন,—চাহিয়াই অমনি চক্ষু অবনত করিয়া মায়ের চরণপানে নয়নদ্বয় নিবিষ্ট করিলেন। তখন তিনি যোড়হাতে ভক্তিগদ্গদকণ্ঠে কহিলেন,— "মা,! এই ভিক্ষা চাই, ধর্ম্মপথে আমার এবং পরিবারবর্গের যেন মতি-গতি থাকে। মা! ধর্ম্মপথে অর্দ্ধেক রাত্রে অন্ন হয়। মায়ায় আমাকে পথ ভুলাইয়া দিও না। মা! তোমার ঐ পাদপদ্ম আমার অন্তরে যেন চিরদিন অঙ্কিত থাকে।"

কাত্যায়নী,—একটী ছোট মাটীর কলসী লইয়া, বহির্ব্বাটীস্থ উদ্যানে আসিলেন। তিনি তুলসী গাছ, বেলগাছ, নিমগাছ আশোদগাছ প্রভৃতি গাছের তলায়, সেই কলসী হইতে একটু একটু জল ঢালিয়া দিলেন। ইহা তাঁহার দৈনিক কাজ।

শূন্য কলসী কাঁখে করিয়া কাত্যায়নী,—ধীরে ধীরে এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া, কি ভাবিতে ভাবিতে বহির্ব্বাটীর প্রাচীরের ফটকের দিকে যাইতেছেন। দেখিলেন, ফটকের দ্বার খোলা। মনে মনে বলিলেন,—"রঘুদয়াল বাহিরে যায়; কিন্তু দোয়ার বন্ধ করিয়া যায় না। কার মনে কি আছে, কেমন করিয়া বলিব? সুতরাং দোয়ার বন্ধ করিয়া রাখাই উচিত।"

বৃদ্ধা ফটকের সমীপবর্ত্তিনী হইলে, তিনটী সন্ন্যাসী ফটক অতিক্রম করিয়া, বহির্ব্বাটীতে প্রবেশ করিল। তাহাদের মাথায় জটা, হাতে কমণ্ডলু, পৃষ্ঠদেশে বাঘছাল, কৌপীন বসন। তাহারা

বৃদ্ধার নিকটে আসিয়া কতরকণ্ঠে কহিল,—"মায়ি! বড়িভুখছঁ। আজ দো' রোজ্‌সে কুচ খানাপিনা হুয়া নেহি।"

সন্ন্যাসী দেখিয়া, বৃদ্ধা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। উঠিয়া কহিলেন, "বাপ-সকল, পুকুরের কাছে ঐ গাছের তলায় বসিয়া বিশ্রাম কর।"

সন্ন্যাসিগণ হিন্দীভাষায় কথা কহিয়াছিল। আমরা এখানে তাহার মর্ম্ম বাঙ্গালায় প্রকাশ করিলাম।

১ম সন্ন্যাসী। মায়ি! আজ লইয়া তিন দিন দেবতার সেবা হয় নাই। দুধ আর রম্ভা যদি গৃহে থাকে, তবে শীঘ্র লইয়া আসুন, দেবতার সেবা হইবে।

এই বলিয়া, ১ম সন্ন্যাসী এক শিবমূর্ত্তি সম্মুখে রাখিল।

বৃদ্ধা একবার পশ্চাতের দিকে চাহিলেন,—আপন প্রকাণ্ড অট্টালিকা নিরীক্ষণ করিলেন, ভাবিলেন,—"দুধ আছে কি? রম্ভা ঘরে মিলিবে কি? গোয়ালিনী, যে দুধটুকু প্রাতে দিয়া গিয়াছে, তাহা বোধ হয় লক্ষ্মী এতক্ষণ খাইয়া ফেলিয়াছে।"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে দূরে দেখিলেন, লক্ষ্মী তাঁহার দিকেই দৌড়িয়া আসিতেছে; কিন্তু দূরে থাকিয়াই লক্ষ্মী কহিতে লাগিল,—"মা, তুই কোথা যাস্ বলতো? গয়লা বাড়ী হ'তে এখনও দুধ আসে নাই,—আমি খাই কি? আমার যে বা খিদে পেয়েছে।"

ঠাকুরমার নিকট আসিয়াই লক্ষ্মী দেখিল,—তিন জন সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন! বৃদ্ধার ইঙ্গিতমত লক্ষ্মী একে একে সকলকে প্রণাম করিল। সুন্দরী,—সুলক্ষণসম্পন্না বালিকা দেখিয়া সন্ন্যাসিগণ লক্ষ্মীর শিরোদেশে হাত দিলেন,—বুঝি আশীর্ব্বাদ করিলেন,—

হাসিলেন,—বৃদ্ধাকে কহিলেন,—"মায়ি! যখন তুমি এই কন্যাকে পৌত্রীরূপে পাইয়াছ, তখন তুমি ধন্য। এই কন্যা যে রাজলক্ষ্মী।"

লক্ষ্মী,—ঠাকুরমাকে এবার নিশ্চয়ই খুব মারিব মনে করিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু সন্ন্যাসী দেখিয়া তাহা ভুলিয়া গিয়া, ঠাকুরমার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া সন্ন্যাসীদের পানে চাহিয়া, নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।"

গোয়ালিনী এখনও দুধ দিয়া যায় নাই শুনিয়া ঠাকুরমার চক্ষু স্থির হইল! তাঁহার ভাবনা হইল,—"তবে কি পয়সা পায় নাই বলিয়া গোয়ালিনী রোজ বন্ধ করিয়াছে? দুধের বাছা লক্ষ্মী তবে দুধ বিনা কেমন করিয়া বাঁচিবে? সে কথা এখন যাউক,—উপস্থিত যে অতিথি বিমুখ হয় তাহার কি?'

ঠাকুরমা লক্ষ্মীকে আবার জিজ্ঞাসিলেন,—"সত্য-সত্যই কি আজ দুধ দিয়া যায় নাই?'

লক্ষ্মী। আমি কি মিছে কথা বল্‌চি? আমি দুধের জন্য বৌয়ের কাছে কত কেঁদেছি,—বৌ তবু দুধ দেয় নাই! আচ্ছা, মা, তুই আমার পেটে হাত দিয়া দেখ-না—আমার কত খিদে পেয়েছে।

সত্য-সত্যই লক্ষ্মী,—বৃদ্ধার হাত লইয়া আপন উদরে স্থাপন করিল।

বৃদ্ধার মুখ শুকাইল। চোক ছল-ছল করিতে লাগিল। বৃদ্ধা যোড়হাতে সন্ন্যাসিগণকে কহিলেন,—"বাপ-সকল! দুধ বুঝি ঘরে নাই। অপরাধ নেবেন না,—আমি ঘরে গিয়া দেখিগে, যদি দুধ পাই, তবে আগে দেবতার সেবার জন্য তোমাদের নিকট তাহা পাঠাইয়া দিব।"

১ম সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন,—"মায়ি! দুধের জন্য চিন্তা করিতে হইবে না। দুধ যদি না থাকে, তবে একমুঠা পরিমাণ আতপ চাউল যথেষ্ট হইবে।"

বৃদ্ধা। বাপ-সকল! আমার ঘরে যা থাকে, তৎসমস্তই দেবতার ও তোমাদের সেবার জন্য আনিয়া দিতেছি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বৃদ্ধা অন্দরাভিমুখে চলিলেন। লক্ষ্মী তাঁহার ডান হাতের দুইটী আঙ্গুল ধরিয়া যাইতে লাগিল। লক্ষ্মী কহিল,—"মা, তুই ঘরে যেয়ে আমাকে যদি খাবার না দিস্, তা'হলে তোকে খুব মার্‌বো!"

বৃদ্ধা। মা, তোমার কাকা কোথায়?

পাঠকের স্মরণ আছে, বৃদ্ধার কনিষ্ঠ পুত্রের নাম রমাপ্রসাদ। বয়স ষোল বৎসর। বৃদ্ধার জ্যেষ্ঠপুত্র ভবানীপ্রসাদের কন্যার নাম লক্ষ্মী। সুতরাং রমাপ্রসাদ হইলেন, কন্যার কাকা।

লক্ষ্মী। কাকাকে সকাল অবধি দেখি নাই।

বৃদ্ধা। মা! তোমার সদ্দার-জেঠা কোথায়?

গোয়ালা রঘুদয়াল,—লক্ষ্মীর সদ্দার-জেঠা হইত।

লক্ষ্মী। সদ্দার-জেঠা কোথা পালিয়ে গেছে মা,—বৌ তাকে এখনি খুঁজেছিলো,—আমাকেও খুঁজতে বলেছিলো,—আমি খুঁজিয়া পাই নাই।

এরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে বৃদ্ধা, লক্ষ্মীর সহিত অন্দরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন,—পুত্রবধূর চোখ দিয়া জল পড়ি-

তেছে। বৃদ্ধা জিজ্ঞাসিলেন,—"কেন মা কাঁদিতেছ?" বধূর চোখ দিয়া আরও জল পড়িতে লাগিল। বৃদ্ধা জিজ্ঞাসিলেন,—"বৌ মা! তবে কি দুধ পাও নাই? লক্ষ্মী কি এত বেলা পর্য্যন্ত কিছুই খায় নাই?"

বধূ যশোদা দেবী, কথা কহিতে পারিলেন না,—কেবল ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন,—লক্ষ্মী এত বেলা কিছুই খাইতে পায় নাই।

বৃদ্ধা কান্না কিসের মা?,—ভয় কি?—ঘরে তোমার অন্নপূর্ণা শুভচণ্ডী রয়েছেন,—তিনি থাকিতে আমাদের ভাবনা কি?—

বধূ যশোদা চোখের জল মুছিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা কহিতে লাগিলেন,—"আমাদের ঘরে আজ তিনটী সন্ন্যাসী এসে পদধূলি দিয়ে ঘর পবিত্র করেছেন। আজ দুই দিন তাঁহাদের আহার নাই। তাঁহাদের ইষ্টদেবতা উপবাসী আছেন। ঘরে যদি কিছু চা'ল থাকে দাও, আমি তাঁদের জন্য লয়ে যাই। আর লক্ষ্মীর জন্য শীঘ্র ভাত রাঁধিয়া দাও: শীঘ্র উনুন জ্বাল। যখন যেমন অবস্থা, তখন তেমন চলিতে হয়। মা শুভচণ্ডীর যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে,—তজ্জন্য দুঃখ কিসের? বৌমা, তুমি কাঁদিও না। এই লক্ষ্মী একদিন রাজরাজেশ্বরী হবে। লক্ষ্মীকে তুমি কোলে লও,———

বধূ যশোদা, লক্ষ্মীকে কোলে লইলেন, মুখ চুম্বন করিলেন,—ধীরে ধীরে কানে কাণে লক্ষ্মীকে কহিলেন,—"লক্ষ্মী, আজ তুই একবার আমার মাই খাবি? অনেক দুধ এসেচে।"

লক্ষ্মী,—চতুর্থ বৎসর উত্তীর্ণ করিয়া পঞ্চম বৎসরে পড়িয়াছে। আজ ৮ মাসের অধিককাল স্তন্যদুগ্ধ ছাড়িয়াছে; সুতরাং স্তন্য-পানের নামে বড়ই বিরক্ত হইল—বলিল,—"দূর! দূর! মাই বুঝি

আবার খেতে আছে? যা,—আমি তোর কোলে বস্‌বো না,"—এই বলিয়া লক্ষ্মী, জননীর কোল হইতে নামিয়া পড়িল।

বৃদ্ধা, যশোদাকে কহিলেন,—"মা! ঘরে চাউল যা কিছু থাকে দাও—দ্বারে অভুক্ত অতিথি বসিয়া আছে। মা, কথা কহিতেছ না কেন?

যশোদা দেবী কথা আর কহিতে পারিলেন না। যেন তাঁহার বাক্‌রোধ হইয়া গেল। তাঁহার অন্তর গুর-গুর করিতে লাগিল। ক্রমশ তিনি থর থর কাঁপিতে লাগিলেন। মাথা ঘুরিয়া উঠিল। তিনি চোখে আর কিছু দেখিতে পাইলেন না। তখন ক্ষুধা-ব্যথা প্রপীড়িতা লক্ষ্মীর জননী—জ্ঞানশূন্যা হইয়া শ্বশ্রূঠাকুরাণীর চরণ-প্রান্তে নিপতিতা হইলেন।

অতিথি সেবার জন্য ঘরে এক মুঠাও চাউল নাই, শ্বশ্রূঠাকুরাণীর নিকট যশোদা দেবী একথা একান্তই বলিতে অক্ষম; অথচ তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে অবশ্যই হইবে;—এই দুয়ের বিষম আঘাতে জর্জ্জরিতদেহ হইয়া ক্ষীণা দীনা যশোদা ঘুরিয়া ভূতলে পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পুত্রবধূর মূর্চ্ছায়, কাত্যায়নী আরও বিব্রত হইলেন। ভীত ও চকিত হইয়া, কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়াবৎ সেই স্থানে স্থাণুর ন্যায়, কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। শেষে দৌড়িয়া জল আনিতে গেলেন।

হা লক্ষ্মীর জননি! হা যশোদা দেবি! মূর্চ্ছিত হইয়াই কিছুক্ষণ থাক। ইহাতেই তোমার শান্তি! তোমার পতি নিরুদ্দিষ্ট,—থাকিতেও বুঝি নাই,—অথবা একে বারেই নাই। কথার মীমাংসা কে করিয়া দিবে? তুমি আশায় বুক বাঁধিয়া বসিয়া আছ,—যতই দিন যাইতেছে, তোমার বুকের হাড় একটু একটু করিয়া ততই ক্ষয় হইতেছে। প্রভাতে পাখী ডাকে, তুমি উর্দ্ধমুখে চাহিয়া দেখ,—পাখী বুঝি তোমার পতির সংবাদ আনিয়া তোমাকে ডাকাডাকি করিতেছে। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠে: ভাব-বিহ্বলা পাগলিনী যশোদা ভাবেন,—আমার পতি বুঝি দূরে থাকিয়া উঁকি দিয়া দেখিতেছেন। ভাবনায় এবং অর্দ্ধাহারে অনাহারে, যশোদার দেহ ভুয়া হইয়া আসিয়াছিল। অদ্যকার আঘাত আর সহ্য হইল না,—তাই যশোদা হঠাৎ মূর্চ্ছিতা হইলেন।

ওদিকে কাত্যায়নী জল আনিতে গেলেন, এদিকে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ আসিয়া বাটীতে পৌঁছিলেন! তাহার হাতে একটী ছোট ভাঁড় আছে। ভাঁড়ে কি আছে জানি না।

রমাপ্রসাদ উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন, "মা, মা,—কি হ'লো?—এ কি হলো?—বৌ এমন করিয়া পড়িয়া কেন?'

কাত্যায়নী জল লইয়া আসিয়া কহিলেন;—"বৌয়ের মূর্চ্ছা হইয়াছে। হঠাৎ পড়িয়া অচেতন হইল।"

রমাপ্রসাদ মাতার নিকট হইতে জল লইয়া বধূর মুখে চোখে দিতে লাগিলেন। বধূর মূর্চ্ছা তথাচ ভাঙ্গিল না।

আরও একটু-কাল মূর্চ্ছা থাকুক,—বধূ মূর্চ্ছিত হইয়াই ভাল আছেন। এ মূর্চ্ছা—এ সুখনিদ্রা, কেহ ভাঙ্গাইও না।

যশোদা দেবী,—ক্ষীণা, দীনা মলিনা,—পাঠককে সাহস করিয়া বলিতে পারি নাই,—আজ তিন দিন হইতেই, যশোদা দেবী এক-রূপ অনাহারেই আছেন। চা'ল যেমন ফুরাইতে লাগিল, চা'ল কিনিবার পয়সার সঙ্গতি যতই কম হইতে লাগিল, বধূ যশোদা ততই আপন আহার কমাইতে লাগিলেন। "এ দু'মুঠা চা'ল থাকিলে কাল আমার মেয়ে খাবে, অতএব আমি দুইমুঠা কম খাই না কেন? এইরূপ করিয়া প্রথম দিন দুই মুঠা, দ্বিতীয় দিন তিন মুঠা, তৃতীয় দিন চারি মুঠা চা'ল যশোদা কমাইতে লাগিলেন,—কন্যার জন্য অর্দ্ধভুক্ত হইয়া কাল কাটাইতে লাগিলেন। অর তাঁহার দেহ দুর্ব্বল হইতে লাগিল।

দুর্ব্বল দেহে আজ বিষম আঘাত লাগিল। কাজেই যশোদা হঠাৎ মূর্চ্ছিতা হইলেন। তাঁহার দেহ অতীব দুর্ব্বল বলিয়াই মূর্চ্ছা দূর হইতে এত দেরী হইতে লাগিল।

কাত্যায়নীর সেবায় ক্রমশ যশোদার একটু একটু জ্ঞানোদয় হইতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার দেহ বড় দুর্ব্বল, নাড়ী ক্ষীণ,—কথা কহিতে যেন কত কষ্ট হয়! সুপথ্যের আবশ্যক।

কাত্যায়নী রমাপ্রসাদকে কহিলেন,—"বাবা! দুধ কি একটুও পাওয়া যাইবে না? এখন একটু দুধ গরম করিয়া খাওয়াইলে, বধূর একটু বল হয়।—'

রামপ্রসাদ। মা, দুধ কোথা পাব? অদ্য প্রাতে আমি লক্ষ্মীর দুধের জন্য বাহির হইয়াছিলাম। কারণ একটু বেলা হইলেই, লক্ষ্মী ক্ষুধায় কাতর হইবে,—এবং দুধ-দুধ করিবে। শেষে বহু-বাড়ী ফিরিয়া একজন সদ্‌গোপগৃহে এই দুধটুকু মাগিয়া পাইয়াছি। এ দুধটুকু একপোয়ার অধিক হইবে না।

সেই ক্ষুদ্র ভাঁড়ে দুধ ছিল। রমাপ্রসাদ সেই ভাঁড় মায়ের হাতে দিলেন। জননী বহুযত্নে সেই ভাঁড় টিপিয়া ধরিলেন,—কেন না সে ভাঁড়ের দাম এখন লাক টাকা।

বধূ যশোদা, ধীরে, ধীরে কহিলেন,—"আমার দুধ চাহি না,—আমি বেশ আছি,—বলও আমার হইয়াছে,—এই দুধের অর্দ্ধেক-টুকু অতিথিদিগকে দাও এবং অর্দ্ধেকটুকু লক্ষ্মীকে দাও,—

কাত্যায়নী। না, মা,—তুমিও একটু দুধ খাও,—মা, তুমি বাঁচিবে কিসে? তোমার বল না হইলে, তুমি কথা কহিতে পারিবে কেন?—উঠিতে পারিবে কেন?

যশোদা তখন যোড়হাতে কাত্যায়নীর চরণ পানে চাহিয়া কহিলেন, "মা দাসীর অপরাধ লইবেন না, আমার জীবনধন লক্ষ্মী দুধ খাইলেই মা, আবার দেহে বল হইবে! আমার সাক্ষাতে লক্ষ্মীকে দুধ খাওয়াও মা; আমি এখনি উঠিয়া বসিতে পারিব।

কত্যায়নী। মা! তুমি যে, বড়ই কাহিল হইয়াছ! মুখ দিয়া যে, তোমার কথা সরে না।

যশোদা। (গলার স্বর মোটা করিয়া) এই যে মা, আমি বেশ কথা কহিতে পারিতেছি, এই দেখ না মা, আমি এখনি উঠিয়া বসিতেছি।

এই বলিয়া বধূ যশোদা যেমন তাড়াতাড়ি উঠিতে যাইবেন, অমনি মাথা ঘুরিয়া আবার পড়িয়া গেলেন। আবার তিনি মূর্চ্ছিতা হইলেন। আবার তিনি কিছুক্ষণের জন্য সুখশান্তি লাভ করিলেন।

এমন সময়ে অন্দরের দ্বারদেশে অতিথিগণ আসিয়া উচ্চকণ্ঠে কহিলেন,—"মায়ি! যদি ভিক্ষা দানে তুমি কুণ্ঠিত হও, তবে অন্যত্র

আমরা যাই। ক্রমে বেলা অধিক হইতে লাগিল। যদি দুধ না থাকে, দেবসেবার জন্য এক মুঠা চাল হইলেই হইবে। আমরা অধিক সামগ্রীর প্রার্থী নহি। যৎকিঞ্চিৎ দিয়া অতিথিসেবা কর। অতিথি বিমুখ করিও না। মায়ি! আমরা ফিরিয়া গেলে, তোমার পাপ হইবে; তোমাতে পাছে পাপ স্পর্শে, সেই জন্য আমরা ফিরিতে পারিতেছি না। মায়ি! যদি এক মুঠা চাল দিতেও কুণ্ঠিত হও, তবে অর্দ্ধমুঠা দাও,—ইহাতেই আমরা পরিতুষ্ট হইয়া চলিয়া যাইব।"

কাত্যায়নীর কাণে এ স্বর প্রবেশ করিল। তিনি রমাপ্রসাদকে জিজ্ঞাসিলেন,—"ঘরে চাল নাই কি?"

রমাপ্রসাদ। ঘরে চাল একটী গণিতে পাইবে না।

কাত্যায়নী। এ দুধটুকু বা অর্দ্ধেকটুকু অতিথিগণকে দিলে হয় না।

রমাপ্রসাদ। মা, আমার বুদ্ধি নাই। এ দুধ এখন কাহার প্রাপ্য, তুমিই বিচার করিয়া বলিয়া দাও! ঐ দেখ, লক্ষ্মী ক্ষুধায় আকুল হইয়া কেবল কণ্ঠাগতপ্রাণ হইয়াছে। বুকটী উহার ধুক্ ধুক্ করিতেছে। ঐ দেখ, বধূ দুর্ব্বলতায় মূর্চ্ছিতা হইয়া আছে। আর ঐ শুন, অতিথিগণ দ্বারে আর্ত্তনাদ করিতেছেন। মা! এ বিপদে তুমিই রক্ষক। আমি দিশাহারা হইয়াছি। মা, তুমিই বলিয়া দাও,—দুধ কে পাইবে?

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কেহ কেহ হয়ত মনে মনে প্রশ্ন করিতেছেন,—এমন বড় বাড়ী!—ইহার এক এক খানা ইট ভাঙ্গিয়া, বেচিয়া, খাইলে ত, কাত্যায়নীর পঞ্চাশ বৎসর কাটিতে পারে। দরজা-জানালা বেচিয়া খাইলে আরও একপুরুষ যায়। মার্ব্বেল পাথর বেচিয়া খাইলে, বুঝি তিন পুরুষ যায়, তবে তাঁহার এত অন্নকষ্ট কেন?

অথবা, সমগ্র বাড়ীটাই কাত্যায়নী যদি বিক্রয় করিয়া ফেলেন, এবং নিজে অন্যস্থানে মাটীর ঘর করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ত খুব সুখে স্বচ্ছন্দে তাঁহার সংসার চলিয়া যায়। এইরূপ সুবিধা, এত সহজ উপায় সত্ত্বেও, কাত্যায়নীর এত অন্নকষ্ট কেন?

কাত্যায়নী যে, বাড়ীর দরজা বেচিয়া ও মারবেল বেচিয়া, খাইতে আরম্ভ করেন নাই, তাহা নহে। কয়েকদিন মাত্র এইরূপে কালাতিবাহিত করার পর, হঠাৎ তিনি একদিন শুনিলেন,—স্বামীর ঋণে এ বাড়ী নিলাম হইয়া গিয়াছে,—তাঁহার এ বাটী দান-বিক্রয়ের আর অধিকার নাই। কাত্যায়নী এ কথা ধৈর্য্য ধরিয়া শুনিলেন,—কিছুক্ষণ অবনতবদনে রহিলেন,—তাঁহার চোখের কোণে জল আসিল কিনা ভাল বুঝা গেল না। শেষে তিনি কহি-লেন,—ঠিকই হইয়াছে।

বাড়ী যিনি নিলামে কিনিয়াছেন, তিনি বুঝি ভারি দয়ালু! তাই তিনি কাত্যায়নীর নিকট তাঁহার প্রধান নায়েব দ্বারা বলিয়া পাঠাই-লেন,—“অদ্য হইতে তিনমাস পর্য্যন্ত তোমাদিগকে বাটীতে থাকিতে দিব। এত তিন মাসের মধ্যে তোমরা অন্য স্থানে চলিয়া যাও—অন্য বাড়ী ভাড়া কর। এই তিন মাসের পরও যদি

এবাটীতে থাক, তাহা হইলে আদালত হইতে পেয়াদা আনিয়া, বে-ইজ্জত করিয়া, বলপূর্ব্বক এ বাটী হইতে তোমাদিগকে বাহির করিয়া দিব। আর এক কথা শুন,—এবাটীর কোন অংশ, ঐ তিন মাস মধ্যে নষ্ট করিতে বা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বিক্রয় করিতে পারিবে না। যদি কর, সেই দিনই উঠাইয়া দিব; এবং চোর বলিয়া ফৌজদারী সোপরদ্দ করিব। আরও কথা শুন,—বাটী অপরিস্কার রাখিতে পাইবে না। গৃহে জঞ্জাল এবং বাগানে যদি জঙ্গল থাকে, তাহা হইলে কালাকাল বিচার নাই, যে দিন ইচ্ছা, সেই দিনই উঠাইয়া দিব। এবং ক্ষতিপূরণ জন্য ঘটীবাটী কাড়িয়া রাখিব।”

কাত্যায়নী উত্তর দিলেন,—“মা ভগবতী যাহা করিবেন, তাহাই হইবে। উনিই আমার সব। ভাবিয়া কি করিব?”

আজ সেই তিনমাস উত্তীর্ণ হইতে আর সাতটী দিন মাত্র বাকি আছে।

যখন যশোদা দেবী মূর্চ্ছিত,—লক্ষ্মী ক্ষুধায় কণ্ঠাগতপ্রাণ, বুভুক্ষু অতিথিগণ দ্বারে দণ্ডায়মান, যখন এক পোয়া দুধ লইয়া পুত্র রমাপ্রসাদ কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়, কাত্যায়নী যখন শঙ্করী-ধ্যান-মগ্না,—তখন দ্বারদেশে সেই প্রধান নায়েব, দুইজন দীর্ঘাকার পাঠান দ্বারবানের সহিত পুনরায় উপস্থিত হইলেন। তিনি বজ্রনির্ঘোষে কহিলেন,—“আর বিলম্ব নাই। সাত দিন আছে,—সাতটী দিন মাত্র আছে,—অদ্য হইতে সপ্তম দিনে অতি প্রত্যুষেই তোমাদিগকে উঠিতে হইবে। ষষ্ঠদিনে রাত্রে মোট-পুঁটলি বাঁধিয়া তোমরা প্রস্তুত হইয়া থাকিও। সপ্তম দিনে বেলা চারি দণ্ডের পর আমার মনিবের পাঠান দল আসিয়া এ বাটী অধিকার করিয়া

লইয়া, বসবাস করিবে। সাবধান!—শুনিতে পাইলে কি? শুনিতে পাও, আর নাই পাও,—সাত দিন মধ্যে উঠিতেই হইবে। ধর্ম্মরক্ষার জন্য আবার ডাকিয়া বলিতেছি,—বিলম্ব নাই,—"

প্রধান নায়েব এই কথা বলিয়া প্রত্যাগত হইলেন। পাঠান দ্বারবান্ দুইজন, বাগানের বেলগাছ ভাঙ্গিয়া ফেলিল, তুলসী গাছ উপাড়িল, পুষ্করিণীর জলে থুথু বর্ষণ করিল। শেষে বহির্ব্বাটীর নিকট গো-হাড় ফেলিয়া দিয়া তাহারা প্রস্থান করিল।

অতিথি তিন জন সমুদয় ব্যাপার দেখিলেন,—তীব্র-নয়নে কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিলেন, কিন্তু কোন কথা কহিলেন না।

প্রধান নায়েবের কণ্ঠরব অন্দরে পশিবা-মাত্র, রমাপ্রসাদ ভীত-চকিত হইয়া আস্তে আস্তে কহিলেন,—"মাগো! ঐ আবার আসিয়াছে! আমাদিগকে এখনি উঠিয়া যাইতে বলিতেছে।"

কাত্যায়নী কহিলেন, "বাপধন! চুপ কর—কথা কহিও না,—উহারা কি বলে শুন।"

প্রধান নায়েব কথা শেষ করিয়া চলিয়া গেলে, কাত্যায়নী রমা-প্রসাদকে কহিলেন,—"চিন্তা কি বাপ! এখনও সাতদিন সময় আছে। পাছে আমরা উঠিয়া যাইবার দিনটী ভুলিয়া যাই, সেই জন্য উহারা পূর্ব্ব হইতে জানাইতে আসিয়াছে। উহারা ভাল কাজই করিয়াছে। চিন্তা কি বাপ! ঘরে মা চণ্ডী রহিয়াছেন,—ভয় কি বাপ!"

রমাপ্রসাদ। মাগো! বড়বৌ বুঝি আর বাঁচেন না,—মুখে জল দিতেছি,—জল ঠোঁট দিয়া বাহির হইয়া পড়িতেছে।

কাত্যায়নী। বিপদ্‌ভঞ্জনী দয়াময়ী মাকে ডাকো—মা মা—

রমাপ্রসাদ আর প্রকৃতিস্থ থাকিতে না পারিয়া গভীর আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। লক্ষ্মীও ক্ষীণকণ্ঠে সে ক্রন্দনে যোগ দিল।

কাত্যায়নী কহিতে লাগিলেন, "হে জগজ্জননি! হে মা ভগবতি! চরণের ছায়ায় সকলকে শীতল কর!

অতিথিত্রয়ের মধ্যে যিনি প্রধান এবং বয়োজ্যেষ্ঠ, তিনি গভীর মর্ম্মভেদী ক্রন্দন ধ্বনি শুনিয়া, অন্দর বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। কাত্যায়নী তাঁহাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, "বাবা, এস, এস! আমি দুঃখিনী হইয়াছি। বাবা সেবার ত্রুটি হইয়াছে, অপরাধ ক্ষমা কর।"আমার কিছুই নাই—এই দুধটুকু আছে, ইহা তোমারই প্রাপ্য, তুমিই লও।"

অতিথি। মায়ি! ব্যাপার কি? উনি মূর্চ্ছিতা বা মৃতপ্রায় কেন? এই বালিকা এরূপ ক্ষীণকণ্ঠে রোরুদ্যমানা কেন? ঐ ব্যক্তিই বা কে? যিনি দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া বলিয়া গেলেন, ৭ দিন মধ্যে এ বাটী হইতে আপনাদিগকে উঠিয়া যাইতে হইবে? আমি কতক যেন বুঝিয়াছি; কিন্তু আপনি স্বয়ং বলুন, ঘটনা কি?

কাত্যায়নী সংক্ষেপে করুণস্বরে সকল কথা কহিলেন।

অতিথি। মায়ি! চিন্তা নাই। এক কর্ম্ম কর। একসের গঙ্গাজল, পাথরের পাত্রে ভরিয়া লইয়া আইস। তাহাতে ঐ এক পোয়া দুধ ঢাল। ঢালিয়া, আমার সম্মুখে রাখ।

আদেশ অনুসারে তৎক্ষণাৎ সে কাজ করা হইল। বয়োজ্যেষ্ঠ অতিথি, অন্য দুইজন অতিথিকে ডাকিলেন। তাঁহারা নিকটে আসিলেন। প্রধান অতিথি শুখান শাঁকআলুর ন্যায় একটী মূল বাহির করিলেন। মূলটী দেখিলে মনে হয়, ইহাতে রস নাই, যেন পোড়াইবার জন্য ইহাকে কে শুষ্ক করিয়া রাখিয়াছে। প্রধান

অতিথি, গঙ্গাজলে সেই মূল ধুইয়া লইয়া, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ এবং তর্জ্জনীর সাহায্যে তাহা টিপিতে লাগিলেন। তখন সেই মূল হইতে গড় গড়ু রস পড়িতে লাগিল। বিরাম নাই,—সেই পাথরের পাত্রের উপর, সেই এক সের জলমিশ্রিত এক পোয়া দুগ্ধের উপর, সেই রস, গড় গড় পড়িতে লাগিল। মূলে যেন মন্দাকিনী-ধারা মিলিত হইয়াছে। রসের ফোয়ারা ফুটিয়া উঠিয়াছে। অনভিজ্ঞ ব্যক্তি, বিশ্বাস করিবেন কিনা জানি না; এক পোয়ারও অধিক রস সেই শুষ্ক মূল হইতে নির্গত হইল। সন্ন্যাসী শেষে ক্ষান্ত হইলেন,—শুষ্ক মূল এত রস দান করিয়াও, যেমন তেমনি রহিল, উহা যেন অনন্ত রসের প্রস্রবণ।

সন্ন্যাসী কহিলেন,—"মায়ি! আর এক সের গঙ্গাজল লইয়া আইস।"

কাত্যায়নী। বাবা! পাথর বাটী ত আর নাই। মাটীর ভাঁড়ে করিয়া জল আনিলে হইবে কি?

সন্ন্যাসী। হইবে।

জল আনা হইলে, সেই দুগ্ধমিশ্রিত জলে সন্ন্যাসী আর এক সের জল ঢালিলেন। তখন সন্ন্যাসী হাসিয়া কহিলেন, "মায়ি! ইহা আর দুগ্ধ নাই, অমৃত হইয়াছে। কলিকালে ইহাই অমৃত! আপনি এক্ষণে এই অমৃতের অধিকারিণী। আপনি দেব ও অতিথি-সেবার জন্য কিঞ্চিৎ অমৃত আমাদিগকে দিন।"

কাত্যায়নী, আদেশমত, সন্ন্যাসীদের কাষ্ঠনির্ম্মিত এক পাত্রে এক পোয়া আন্দাজ অমৃত ঢালিতে-না-ঢালিতেই, সন্ন্যাসী কহিলেন "বস, আর না, যথেষ্ট হইয়াছে, উহাতেই আমাদের হইবে।"

সন্ন্যাসী, তৎপরে বধূ যশোদার চিকিৎসায় অগ্রসর হইলেন।

মুখ দেখিলেন, নাড়ী দেখিলেন। হাসিয়া বলিলেন, "মায়ি! ভয় কি? ঝিনুকে করিয়া, এক ঝিনুক অমৃত সন্ন্যাসী স্বহস্তে যশোদার মুখে দিলেন, তারপর আর এক ঝিনুক অমৃত তাঁহার মুখে দিলেন। যশোদা চক্ষু চাহিলেন।

সন্ন্যাসী, কাত্যায়নীকে কহিলেন,—"মায়ি! এইবার আপনি যশোদার মুখে অমৃত দিন, চারি ঝিনুক অমৃত পান করিলেই যশোদা উঠিয়া বসিবেন। ছয় ঝিনুক পানে তিনি দাঁড়াইতে সক্ষম হইবেন। সাত ঝিনুকের অধিক অমৃত পান করিতে দিবেন না।"

এই কথা বলিয়া, বালিকা লক্ষ্মীকে সন্ন্যাসী অমৃত পান করাইতে গেলেন। লক্ষ্মী তখন ধূলায় ধূসরিতা। ক্ষুধায় আকুল হইয়া লক্ষ্মী দৌর্ব্বল্য, হেতু উঠানে পতিতা অথবা শায়িতা। জ্ঞানশূন্য নহে অথচ ঠিক জ্ঞানও নাই। সংসার কেমন ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ রব করিতেছে। লক্ষ্মীর নিকট সংসার আর সাদা নাই, সূর্য্যের আলোক আর সাদা নাই, সমস্তই কেমন হলুদ-বর্ণ হইয়াছে!

সন্ন্যাসী, বালিকাকে কোলে লইলেন! মাথায় হাত দিয়া লক্ষ্মীর মাথার ধূলা ঝাড়িয়া দিলেন, আশীর্ব্বাদ করিলেন, মৃদু মৃদু হাসিলেন,—লক্ষ্মীর মুখের নিকট আপন মুখ লইয়া গেলেন, বুঝি বলিকা লক্ষ্মীর চাঁদমুখে চুম্বন করিতে বৃদ্ধ সন্ন্যাসী অভিলাষ করিতেছিলেন; কিন্তু কৈ, মুখচুম্বন ত করিলেন না! সন্ন্যাসী ঝিনুকপূর্ণ অমৃত লইয়া বালিকার মুখে দিলেন। এক ঝিনুক অমৃত পানেই, লক্ষ্মীর পরিম্লান, পরিশুষ্ক, মুখকমল যেন প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। দ্বিতীয় ঝিনুক অমৃতপানে লক্ষ্মীর অধরপ্রান্তে হাসি-কৌমুদী

দেখা দিল। তৃতীয় ঝিনুকে, লক্ষ্মী সন্ন্যাসীর কোল হইতে নামিয়া মায়ের কাছে যাইতে চাহিল। চতুর্থ ঝিনুকে, লক্ষ্মী সন্ন্যাসীর কোল হইতে উঠিয়া দৌড়িয়া গিয়া মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিল। তখন মায়ের মুখ, কন্যার মুখের সহিত মিলিত হইল, কন্যার নয়নদ্বয় মায়ের নয়নদ্বয়ের সহিত মিলিত হইল,—আর মায়ের চোখের জল, কন্যার মুখকমলকে ভাসাইয়া দিল !

সন্ন্যাসী রমাপ্রসাদকে কহিলেন, "এইবার তুমি এই অমৃত পান কর। ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর হইবে, শরীরে বল হইবে, অবসন্নতা ঘুচিবে,—মনে মহাস্ফূর্ত্তি জন্মিবে। ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া এই দেড়ছটাক-পরিমিত অমৃত খাও।"

রমাপ্রসাদ তাহাই করিল। বলিল, "এমন সুমিষ্ট, সুস্বাদু, সদ্গন্ধময় সরবৎ আমি ত কখন পান করি নাই। একি স্বর্গীয় সুধা ?"

তখন উচ্চ হাসি হাসিয়া কাত্যায়নীকে সন্ন্যাসী কহিলেন, "মায়ি ! এইবার আপনার পালা। আপনিও অমৃতপানে তৃপ্ত হউন।"

কাত্যায়নী। আপনার আদেশ অলঙ্ঘনীয়। কিন্তু আমার তৃপ্তি, এ সজীবদেহে ইহজীবনে আর হইবে কি ? বিধাতার বিধিতে বাদ সাধা উচিত কি ?

হাস্যময় সন্ন্যাসী কহিলেন, "মায়ি ! দেখিতেছি, স্বধর্ম্মরক্ষায় তোমার আন্তরিক যত্ন আছে ; সুতরাং দেহরক্ষা করা, সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। অতিবড় দগ্ধদেহও, এই অমৃতপানে, এই মহাপ্রসাদ সেবনে, অন্ততঃ মুহূর্ত্তকালের নিমিত্ত, শীতল হইয়া থাকে।"

তখন কাত্যায়নীও দেড়ছটাক-পরিমিত অমৃত পান করিলেন।

সুধাসেবনে ক্ষণকালের নিমিত্ত সকলে বুঝি সুখ-সাগরে ভাসিলেন। দুঃখের অন্ধকারে সুখের জ্যোৎস্না বুঝি আবার হাসিল। পাষাণে বুঝি পদ্মফুল ফুটিল!

নবম পরিচ্ছেদ।

যশোদা দেবী, লক্ষ্মীকে কোলে লইয়া, ঘরের ভিতর গেলেন।

সন্ন্যাসী, কাত্যায়নীকে কহিলেন,—"এই পাথর বাটীতে অবশিষ্ট অমৃত যাহা রহিল, তাহা যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবেন, এক বৎসরের অধিক কালেও উহা নষ্ট হইবার নহে। কিন্তু আমার একটী কথা, গুরু-বাক্যের ন্যায়, পালন করিবেন। ঐ অমৃত যখন তখন খাইবেন না এবং যাহাকে-তাহাকে দিবেন না! নিতান্ত অসময় না হইলে, উহা ব্যবহারে আনিবেন না। যখন এমন সঙ্কটে পড়িবেন, সত্য সত্যই প্রাণরক্ষার আর কোন উপায় নাই, তখন উহা পানে তৃপ্ত হইবেন।"

কাত্যায়নী যোড়হাতে কহিলেন,—"তথাস্তু। আদেশ শিরোধার্য্য।"

সন্ন্যাসী। বিদায় হই,—চলিলাম!

কাত্যায়নী। বাবা! তাহা হইবে না। আমি দুঃখিনী। কিছুই খাওয়াইতে পারি নাই। যেমন করিয়া পারি, অদ্য আমি অতিথি-সেবা সম্পন্ন করিব। আপনারা যদি সেবা না লইয়া চলিয়া যান,—তাহা হইলে, এ দুঃখ আমার জীবনান্ত পর্য্যন্ত থাকিবে। ঠাকুর! আমি ত অনন্ত-দুঃখে পতিত আছি; কিন্তু বাবা! তোমরা, সেবা না লইয়া চলিয়া গেলে, আমার আর একটী দুঃখ বাড়িবে।

সন্ন্যাসী। সেবা ত আমাদের হইয়াছে। আপনার প্রদত্ত অমৃত আমরা দেবতার উদ্দেশে নিবেদন করিয়া দিয়াছি।

কাত্যায়নী। কথা সত্য বটে ; কিন্তু আমার মন ত মানে না। আপনাদিগকে আটা-ঘৃত-দুগ্ধ-দানে পরিতুষ্ট করিব, ইহাই আমার বাসনা।

সন্ন্যাসী। মায়ি! তোমার মন ভাল : কিন্তু অতিথিকে এত জেদ করিয়া রাখিতে নাই। আমরা কামচর,—আমাদের ইচ্ছার গতিরোধ করিতে নাই।

কাত্যায়নী যুক্ত-করে, সজল-নয়নে কহিলেন,—"আপনার সেবা না লইলে মনে বড়ই ব্যথা লাগিবে!"

সন্ন্যাসী। সেবা লইব ; কিন্তু এ স্থানে আর থাকিব না। এ পাপ-স্থানে সজীব বৃক্ষ জ্বলিয়া যাইতেছে, আমরা তিষ্ঠিব কিরূপে? বিশেষ অদ্য দুইজন মুসলমান আসিয়া, পুষ্করিণীর জলে থুথু দিয়া গিয়াছে,—তুলসী ও বেল গাছ উপড়াইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। আমরা সেবা লইব বটে ; কিন্তু গঙ্গাতীরে গিয়া। গঙ্গাগর্ভে অদ্য সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, তোমার সেবার অপেক্ষায় বাস করিব।

সন্ন্যাসিগণ বিদায় হইলেন। কাত্যায়নী ও রমাপ্রসাদ তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন। গৃহের ভিতর থাকিয়া, যশোদা দেবী স্বয়ং প্রণাম করিয়া লক্ষ্মীকে প্রণাম করিতে বলিলেন। লক্ষ্মী, মাতার প্রণামের অনুকরণ করিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

রমাপ্রসাদ। মা! করিলে কি? সর্ব্বনাশ দেখিতেছি যে!

কাত্যায়নী। কেন বাবা, কি হইয়াছে?

রমাপ্রসাদ। আমাদের ঘরে একটী পয়সাও নাই,—একটী পয়সা কোথাও হইতে পাইবারও উপায় নাই,—তবে মা, ঘৃত-আটা-দুগ্ধের দ্বারা অতিথি-সেবা হইবে কিরূপে?

কাত্যায়নী। বাছা! ভয় নাই। এতদিন তোমাদিগকে বলি নাই,—আমার একটী লক্ষ্মীপূজার মোহর আছে। অতিসংগোপনে রাখিয়াছি। উহা এখন লক্ষ্মীপূজার হাঁড়িতে আছে। ডাকাতগণ মনে করিয়াছিল, লক্ষ্মীপূজার হাঁড়িতে সামান্য ধান বৈ আর কিছুই নাই, তাই তাহারা সে মোহরটী লইতে পারে নাই। বাপ, তোমার ত মনে আছে. যে দিন ডাকাতি হইয়া গেল, সে দিন হইতে পাতিয়া শুইবার বিছানা ছিল না, পরিবার স্বতন্ত্র একখান কাপড় ছিল না, জল খাইবার একটী পিতলের ঘটীও ছিল না,—টাকাকড়ি ত দূরের কথা!

রমাপ্রসাদ। মা! যখন মোহর আছে, তখন অতিথিসেবার আর ভাবনা কি? মোহরের কথা তবে এতদিন বল নাই কেন মা?

কাত্যায়নী। লক্ষ্মীপূজার মোহর কি ভাঙ্গাইতে আছে? কোন দিন বেলা তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত চাল যুটে নাই, তথাচ মোহর ভাঙ্গাই নাই। আজ একমাস হইতে বধূ যশোদার লজ্জানিবারণের বস্ত্রের অভাব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তথাচ মোহর ভাঙ্গাই নাই। গোয়ালিনী আজ সাত দিন হইতে বলিয়া যাইতেছে, টাকা না দিলে লক্ষ্মীর আর দুধ দিব না; তথাচ মোহর ভাঙ্গাই নাই।

কিন্তু বাপধন! আজ অতিথি বিমুখ হয় বলিয়া সেই মোহরটী ভাঙ্গাইতে বাধ্য হইতেছি। অতিথি সেবার ন্যায় ধর্ম্ম সংসারে আর নাই এবং অতিথি সেবারূপ উপলক্ষ ব্যতীত কিছুতেই আমি আজ মোহর ভাঙ্গাইতে পারিতাম না!

রমাপ্রসাদ। মা! তা বেশই হইয়াছে! এই মোহর ভাঙ্গাইলে; আমাদের কতকগুলি টাকা হইবে মা?

কাত্যায়নী। কুড়ি একুশ টাকাও হইতে পারে।

রমাপ্রসাদের মুখে এইবার হাসি দেখা দিল! রমাপ্রসাদ কহিল,—"মা, অতি উত্তম হইয়াছে। তিন জন অতিথি সেবার জন্য অদ্য ৩৲ তিন টাকার অধিক লাগিবে কি?"

কাত্যায়নী। এত লাগিবে কেন? সাধু, অতিথিগণ অতি-ভোজনকারী নহেন। অল্পেই তাঁহারা পরিতুষ্ট। আমার বিবেচনায় এক টাকাতেই যথেষ্ট হইতে পারে।

রমাপ্রসাদ। তবে অতিথি-সেবার ব্যয় বাদে ২০৲ টাকা আন্দাজ আমাদের হাতে থাকিতেছে। বেশ হইয়াছে মা! আমি বলি, ২০৲ টাকারই চাল কিনিয়া রাখা হউক না! না, না,—কুড়ি টাকারই চাউল কিনিয়া কাজ নাই মা। ১৬৲ ষোল টাকার চাউল কিনিয়া রাখা হউক, আর লক্ষ্মীর দুধের জন্য ৪৲ চারি টাকা হাতে থাকুক;—আমি প্রত্যহ দুইটী পয়সা লইয়া প্রাতে বাহির হইব,—আর যেমন করিয়া হউক, দুই পয়সা দিয়া লক্ষ্মীর জন্য প্রত্যহ একসের দুধ লইয়া আসিব। আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া ও-পাড়ার সদ্‌গোপগণ বিশেষ দয়া করে মা! কোন দিন হয় ত পয়সাও লাগিবে না,—অমনি দুধ পাইব, মা! হরিদাস ঘোষ সদ্‌গোপ), আমাকে আসন পাতিয়া বসাইয়া, একদিন আমাকে

একসের গুড় দিতে চাহিয়াছিল। ও রূপ দান গ্রহণ করা, তোমার নিষেধ ছিল বলিয়া আমি লই নাই।

জননী কোন কথা না কহিয়া, কেবল ঈষৎ হাস্য করিলেন। রমাপ্রসাদ পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—"আমি ৪৲ টাকার দুধে লক্ষ্মীর পাঁচ মাস চালাইতে পারিব। আর ঐ বাকি ষোল টাকার কেবল চাল কিনিয়া রাখা হউক। পৌষ মাসে বেস নূতন চাল উঠিয়াছে। আমি আজ প্রাতে দর করিয়া জানিয়াছি,—মোটা চাল ষোল টাকায় আঠার মণ পাওয়া যাইতে পারে। তবে আমাদের আতপ চাল, না হইলে ত হইবে না—সেইজন্য কিছু কম মিলিবে। ষোল টাকায় অন্তত ষোল মণ আতপ মিলিতে পারে। তরকারি বা ডাল, নাই বা হইল, মা! নূতন চাল,—নূন দিয়া ফেনে-ফেনে ভাত বড় মিষ্ট লাগিবে মা! নূন আমি প্রত্যহ যেখান থেকে হউক যোগাড় করিয়া আনিব।"

কি জানি কেন, জননীর চোখ হইতে এক ফোঁটা জল টপ করিয়া হঠাৎ ভূতলে পতিত হইল। রমাপ্রসাদ তাহা দেখিতে পাইলেন না। তিনি এখন ষোল টাকায় ষোল মণ চাল কিনিবার আনন্দে আছেন,—নূন- দিয়া ফেনে-ভাতে খাইবার আনন্দে আছেন,—জননীর একটী ফোঁটা মাত্র চোখের জল দেখিতে পাইবেন কেন?

সঙ্গে সঙ্গে কাত্যায়নী মনকে দৃঢ় করিলেন। তিনি মুখে মৃদু হাসি দেখাইয়া রমাপ্রসাদকে কহিলেন,—"ক্ষেপা ছেলে! তোমার ঘর কৈ? পাঁচ মাসের চাল কিনিয়া তুমি রাখিবে কোথায়? এ বাটী হইতে সাত দিনের মধ্যে উঠিয়া অন্যত্র যাইতে হইবে, তাহা কি শুন নাই?—তুমি মোহরের আনন্দে বুঝি আত্মবিস্মৃত হইয়াছ?"

রমাপ্রসাদের মুখ শুকাইল। তিনি চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"উঃ, তবে আমরা কোথা যাব মা?"

কাত্যায়নী। ভয় কি বাছা! যেখানে মা ভগবতী লইয়া যাইবেন, সেই খানেই যাইব।

রমাপ্রসাদ। মা, দুইজন মুসলমান আসিয়া জলে থুথু ফেলিয়া গেল কেন? তোমার বেলগাছ ভাঙ্গিল কেন? তোমার তুলসী-গাছ উপাড়িল কেন?—

কাত্যায়নী। বাপধন! তুমি কি বুঝিতে পার নাই,—উহারা জানাইয়া গেল যে, "যদি সাত দিন মধ্যে তোমরা না উঠ, তাহা হইলে, তোমাদের উপর ঘোরতর অত্যাচার হইবে। অদ্য সামান্য অত্যাচার করিয়াই আমরা চলিলাম; যদি সাত দিন পরে আসিয়া আমরা দেখি, তোমরা এখনও এ বাটীতে বসবাস করিতেছ, তাহা হইলে তোমাদের এ দেবীপ্রতিমা টানিয়া লইয়া জলে ফেলিয়া দিব,—সমস্ত ভাঙ্গিব, চূর্ণিব,—অধিক কি, তোমাদের উপর যদি কায়িক অপমানও করিতে হয়, তবে তাহাও করিব।"—

রমাপ্রসাদ। সেকি মা! বল কি মা! তবে কি সাত দিন পরে আসিয়া উহারা আমাদিগকে মারিবে? মা শঙ্করীর মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিবে?

বালক রমাপ্রসাদ কাঁদিতে লাগিল। কাত্যায়নী তাহাকে আশ্বাসবাক্যে কহিলেন,—"ভয় কি বাছা! দেবী ভগবতী আমাদিগকে রক্ষা করিবেন।"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ধীরা, স্থিরা, নিশ্চল-নয়না কাত্যায়নী কিয়ৎকাল নীরব রহিলেন! পুত্রের মুখের দিকে শেষে আবার চাহিলেন। চাহিয়া হাসি হাসি ভাব দেখাইয়া আবার কহিলেন,—"বাপ রমাই! ভয় কি? আমি থাকিতে তোমাদের ভয় কি?"

তৎপরে কাত্যায়নী, বধূ যশোদাকে ডাকিলেন—"বৌমা এ দিকে এস।" যশোদা দেবী গৃহমধ্য হইতে, লক্ষ্মীকে কোলে লইয়া নিকটে আসিলেন। লক্ষ্মী,—মায়ের কোল হইতে নামিয়া ঠাকুরমার কোলে গিয়া বসিল।

কাত্যায়নী কহিলেন,—"বিপদে আত্মহারা হইতে নাই। মা ভগবতীর নাম স্মরণ করিয়া, ধৈর্য্যাবলম্বন কর। কাঁদিও না। কান্না কিসের? আমরা ত কোন ছার ব্যক্তি?—রাজা যুধিষ্ঠির বনে গিয়াছিলেন,—নলরাজা বনে গিয়াছিলেন! অধিক কি, বৈকুণ্ঠ-পতি শ্রীরামচন্দ্রও বনে বাস করিয়াছিলেন। সাত দিন মধ্যে আমাদের এ বাটী ত্যাগ করিয়া উঠিবার কথা: কিন্তু কল্য প্রাতেই আমি এ বাটী পরিত্যাগ করিয়া যাইব স্থির করিয়াছি।"

রমাপ্রসাদ। কোথা যাইব, মা?

কাত্যায়নী। বিধাতার এই বৃহৎ রাজ্যে আমাদের কি স্থান হইবে না? অবশ্যই নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। মা ভগবতী যেখানে লইয়া যাইবেন, সেইখানেই যাইব।

রমাপ্রসাদ। মা, মামার বাড়ী গেলে হয় না?

কাত্যায়নী। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) না বাছা! সে পথে

কণ্টক! তবে মা ভগবতী, যদি সেইখানেই গমন, আমাদের ললাটে লিখিয়া থাকেন, তবে সেইখানেই যাইব। আচ্ছা রঘুদয়াল এখনও আসিল না কেন? বেলা এক প্রহর অতীত হইয়াছে, তবু তাহার দেখা নাই কেন? তাহার ত কোন বিপদ্ ঘটে নাই? এখন আমার বিপদ্ পদে পদে।

রমাপ্রসাদ। সর্দ্দার দাদাকে খুঁজিতে যাইব কি? আমার বোধ হয়, সে কাহারও বাটীতে কোনরূপ কাজকর্ম্ম পাইয়াছে, তাই এখনও কাজ করিতেছে। আর একটু বেলা হ'লেই আসিবে এখন!

কাত্যায়নী। মোহরটী এখনি ভাঙ্গাইবার দরকার হইয়াছে, অতিথিসেবার বেলা হইতে লাগিল,—কে মোহর ভাঙ্গাইবে? তাই রঘুদয়ালের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি।

রমাপ্রসাদ। মা, তুমি আমাকে মোহর দাও না!—আমি ভাঙ্গাইয়া আনিতেছি।

কাত্যায়নী। মুদির দোকানে ত সহসা মোহর ভাঙ্গান চলিবে না,—হয়, কোন সঙ্গতিপন্ন ভদ্রলোকের বাড়ী, অথবা, কোন স্বর্ণকারের বাড়ী মোহর ভাঙ্গান চলিতে পারে। তুমি ছেলে-মানুষ, পাছে কেহ তোমাকে ঠকায়, বা তুমি ভাঙ্গাইতে অক্ষম হও,—তাই রঘুদয়ালকে তোমার সঙ্গে দিব মনে করিতেছি।

রমাপ্রসাদ। মা, আমি মোহর ভাঙ্গাইতে বেশ পারিব। আমাকে অনেকেই চিনে,—

কাত্যায়নী। আচ্ছা, আরও একটু সময় দেখ, যদি রঘুদয়াল না আইসে, তবে তুমি একাই ভাঙ্গাইতে যাইবে। দেখ রমাই এই মোহর ভাঙ্গাইলে, নিশ্চয়ই আঠার টাকা হইবে। ২০৲ বা ২১

টাকা যদি এই মোহরে হয়, তো ভালই ; কিন্তু ১৮৲ টাকা দরের যদি কেহ কম বলে, তবে তাহার নিকট মোহর ভাঙ্গাইবে না ; অন্যত্র ভাঙ্গাইবার চেষ্টা দেখিবে। মনে কর,—মোহর ভাঙ্গাইয়া ১৮৲ টাকা হইল। ঐ আঠার টাকা হইতে প্রথমে অতিথি-সেবার জন্য দেড় সের আটা, দেড় পোয়া ঘৃত এবং দেড় সের দুগ্ধ ও আধপোয়া সৈন্ধব-লবণ কিনিবে। ইহাতে একটাকা আন্দাজ খরচ হইবে। বাকি সতর টাকার যেন চা'ল কিনিয়া বসিও না!

রমাপ্রসাদ। না, মা, না,—তা কেন করিব? তুমি যাহা বলিবে, তাহাই করিব।

কাত্যায়নী। অবশিষ্ট ১৭৲ টাকা হইতে খরচ করিতে হইবে। গোয়ালিনী, দুধের দাম ॥৶৹ পাইবে। চা'ল, ডা'ল, নুন, তেল দেওয়ার দরুণ একজন মুদীর ১॥৵৹ বাকি আছে ; যদিও সে তাগাদা করে না বটে, কিন্তু তাহার টাকা শোধ করিয়া যাইতে হইবে। নাপ্তিনী, বৌমাকে আজ তিন মাস কামাইতে আইসে নাই ; কিন্তু তাহার পূর্ব্ব ছয় মাসের মাহিনা ৶৹ হিসাবে ৸৹ বার আনা দিতে হইবে। শ্রীমতী জেলেনী মাছের দাম ৴১৫ সাত পয়সা পাইবে। ধোবানী আজ ছয় মাস কাপড়-কাচা বন্ধ করিয়াছে বটে ; কিন্তু তাহার সাবেক পাওনা আছে।৹ চারি আনা। পদী বাগ্দিনী ঘুঁটে দিত, সে বড় দুঃখী ; তাহার ৴১০ ছয়টা পয়সা বাকি আছে, চাষাবৌ আজ চারি মাস মরিয়াছে ; সে প্রত্যহ দুই কলসী করিয়া আমাকে গঙ্গাজল তুলিয়া দিত ; মাসে ॥৹ আট আনা করিয়া দিবার কথা ছিল। তিন মাসের বেতন চাষাবৌ পায় নাই। তার একটী ভাইপো আছে। তাকে ১॥৹ টাকা দিতে হইবে

রমাপ্রসাদ। তা হইলে ত দেখিতেছি, দেনা শোধ দিতেই তোমার সব টাকা ফুরাইয়া গেল!

কাত্যায়নী। যদিই ফুরায়, তা, আমি কি করিব? হিসাব করিয়া দেখ দেখি,—কত টাকা হইল?

কাত্যায়নী আবার বলিতে লাগিলেন,—পুত্র রমাপ্রসাদ হিসাবে মনোযোগ দিলেন। শেষে কহিলেন,---"মা, ৬৮৵৫ হইয়াছে; এখনও অনেক টাকা মজুত আছে মা! আমি মনে করিয়াছিলাম, দেনা শোধ দিতেই বুঝি সব টাকা ফুরাইয়া গেল।

কাত্যায়নী। বাবা! টাকা আর বড় বেশী নাই। এখনও খরচ আছে। শুন,—রসিক দাস বৈরাগী, প্রত্যহ শেষরাত্রে নাম গায়। যদিও সে আমার বাটীতে নাম-গাওয়া বন্ধ করিয়াছে; কিন্তু শেষরাত্রে আমি যখন ছাদে উঠি, তখন আমি তাহার মুখের হরিনামধ্বনি শুনিতে পাই; সুতরাং রসিকদাস প্রত্যহ আমাকে মধুর হরিনাম শুনাইয়া যায়। তাহাকে আটটী গণ্ডা পয়সা দিতে হইবে।

রমাপ্রসাদ। মা, এমন করিয়া দান করিলে, তোমার একটী পয়সাও থাকিবে না।

কাত্যায়নী। (হাসিয়া) বাবা! রাগ করিতেছ,—আচ্ছা, আর আমি খরচের কথা বলিব না। একটী কথা বলিয়া দি,—মোহর ভাঙ্গাইয়া, নগদ টাকা সব, বা ১০৲ টাকার নোট লইয়া আসিও না। পয়সা, সিকি, দুয়ানি, আধুলি এবং টাকা,—এইরূপ করিয়া আনিও। আর বাটী আসিবার সময় আমাদের নিজ খরচের জন্য এক টাকার আতপ চা'ল এবং এক সের দুধ আনিবে। সস্তাদরে যদি বিলাতী কুমুড়া পাও, ঝিঙ্গে, থোঁপা, কাঁচকলা পাও—তবে

আনিবে। সৈন্ধবলবণ এক সের এবং তৈল একপোয়া আনিবে। মাছ দু'পয়সার আনিতেই হইবে।

রমাপ্রসাদ। মা, ডাল আনিব না? কড়ায়ের ডাল লক্ষ্মী খায় না। মুগের ডাল আনিব কি?

কাত্যায়নী। মুগের ডাল একপোয়া আনিও। ন্যাকড়ায় বাঁধিয়া ডাল ভাতে দিব। সিদ্ধ হইলে ন্যাকড়া খুলিয়া, ডাল জলে গুলিয়া, একটু গরম করিয়া লক্ষ্মীকে দিব। লক্ষ্মী তাহাই আহ্লাদে খাইবে। এইরূপে একপোয়া ডালে লক্ষ্মীর আট দিন হইবে।

লক্ষ্মী। (ঠাকুরমাকে চিমটী কটিয়া) না, মা, তেমন ডাল আমি খাব না। বৌ যেমন করে ডাল রাঁধে, তেমনি ক'রে রাঁধতে হবে।

কাত্যায়নী। তাই হবে। দেখ, রমাই! বলিতে ভুলিয়া যাইতেছি। লক্ষ্মীর জন্য আধসের গুড় নিয়ে এসো।

লক্ষ্মী। মা বড় দুষ্ট হ'য়েছে। ছিঃ; গুড় আবার খায় বুঝি! সেদিন আমি গুড় খাচ্ছিলাম ব'লে বোসেরা কত নিন্দে করলে! ছোট-লোকের মেয়ে ব'লে গাল দিলে। হেঁইমা তোর, পায়ে পড়ি, আমার জন্য হরিশময়রার দোকানের সন্দেশ আনতে বল না?—মা, তুই কাল কোথা যাবি বলচিস্। আমাকে কিন্তু সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে। আমার জন্য ভাল কাপড় কিনে আনতে বল্‌না মা? এই ছেঁড়া কাপড় পরে কোথাও যেতে আছে বুঝি! মা, তুই চেয়ে দেখ দেখি কত জায়গায় ছেঁড়া! মা; বাবা, কবে আসবে?—বাবা এলেই ভাল কাপড় পরবো। নয় মা?

যা শারদা দেবী এতক্ষণ অবনতবদনে নীরবে সকল কথা শুনিতে-ছিলেন, আর স্থির থাকিতে পারিলেন না;—হঠাৎ তিনি কাঁদিয়া

উঠিলেন। ধীরে নহে, সন্তর্পণে নহে, সতর্কতার সহিত নহে,—উচ্চরবে বধূ যশোদা গভীর আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। কণ্ঠের দ্বার খুলিয়া গিয়াছে,—স্নেহময় হেমগিরি ভেদ করিয়া শোক-গঙ্গা অশ্রুরূপে ভীমবেগে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে,—আর কি রক্ষা আছে? এ ভয়ঙ্করী গতি রুদ্ধ করিবার সাধ্য কার?

কাত্যায়নী কহিলেন,—"বৌমা, কর কি? ছেলে সাম্‌নে র'য়েছে—কর কি? লক্ষ্মী যে, এখনি কাঁদিয়া আকুল হবে! বৌমা, চুপ কর!"

আর, চুপ কর! চুপ করিয়া থাকিবার শক্তি যশোদার আর নাই।

যশোদা, বাতাহত কদলীর ন্যায়,—ভূপতিত, ভূলুণ্ঠিত হইলেন।

কাত্যায়নী! বাধা দিও না, তোমার বধূ কিছুক্ষণ কাঁদুক,—ভূমে গড়াগড়ি দিয়া, ধূলা-মাখা হইয়া মনের সাধে, কিছুক্ষণ কাঁদুক, কাঁদিতে না দিলে, উহার যে বুক ফাটিয়া যাইবে!

কাঁদ, যশোদা! কাঁদ, শ্বশ্রুঠাকুরাণীর আদেশে, তুমি কি কাঁদিতেও পাইবে না? কাঁদ, যশোদা! নির্ভয়ে কাঁদ, কাঁদ যশোদা! আশা পূর্ণ করিয়া, কাঁদ। কাঁদ, যশোদা! যতক্ষণ না তৃপ্তি হয়, ততক্ষণ কাঁদ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ।

দয়াবতী কাত্যায়নী, যশোদাকে কাঁদিতে দিলেন। লক্ষ্মী, ঠাকুরমার কোল হইতে, জননীর নিকট যাইবার জন্য,—এবং মায়ের ক্রন্দনে যোগ দিবার জন্য ব্যস্ত হইল। ঠাকুরমা কহিলেন,—"ওখানে যাইতে নাই। তোমার জননীকে বিছা কামড়াইয়াছে। তাই কাঁদিতেছে। তুমি ওখানে গেলে পাছে, তোমাকেও কামড়ায়, এই আমার ভয়।" এই বলিয়া ঠাকুরমা লক্ষ্মীকে চাপিয়া রাখিলেন। লক্ষ্মীর মুখ শুকাইল; ক্রমশঃ কাঁদকাঁদ হইল, শেষে লক্ষ্মীও কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

পাঁচ মিনিট অতিবাহিত হইল। লক্ষ্মীর ক্রন্দনের রোল, যতই উত্থিত হইতে লাগিল, যশোদার ক্রন্দনের কণ্ঠরব ততই আপনা-আপনি থামিতে আরম্ভ হইল। বধূর ক্রন্দন কমিতেছে দেখিয়া কাত্যায়নী যশোদাকে কহিলেন,—"বৌমা! লক্ষ্মীকে কোলে লও,—আর কাঁদ কেন?"

যশোদা এইবার প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অঞ্চলে আপন নয়ন-জল মুছিয়া কন্যাকে কোলে লইলেন। কন্যার মুখের নিকট আপন মুখ রাখিয়া যশোদা ভাঙ্গা-ভাঙ্গা-স্বরে কহিলেন,—"মা, কাঁদ্‌চো কেন? কান্না কিসের? চুপ কর।"

কন্যা কাঁদিতে কাঁদিতে উত্তর দিল,—"তুই কাঁদ্‌ছিলি কেন? বৌমা! আমাকে না ব'লে তুই কাঁদ্‌ছিলি কেন?"

যশোদা। মা, তোর খিদে পেয়েচে কি?—একটু দুধ খাবে?

কন্যা। দুধ খাবো না। ভাত খাবার বেলা হলো,—ভাত কই? আজ এখনও রান্না চড়ালি না কেন?

কাত্যায়নী যশোদাকে ইঙ্গিতে কহিলেন,—"লক্ষ্মীকে লইয়া এক্ষণে অন্যত্র যাও।" ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া, লক্ষ্মীকে ভুলাইবার জন্য যশোদা, বাটীর একপ্রান্তে, ছাদে গিয়া উঠিলেন এবং তথায় দুই জনে খেলিতে আরম্ভ করিলেন। যশোদা কখন ঘোড়া হন, লক্ষ্মী ঘোড়ার উপর চাপিয়া বলে,—"হেট্ হেট্,—তফাৎ তফাৎ।" যশোদা কখন শিব হন,—লক্ষ্মী শিবের উপর চাপিয়া, জিব কাটিয়া কালী হইয়া দাঁড়ায়। যশোদা কখন অসুর হন,—লক্ষ্মী, সিংহ হইয়া জননীর বাহুমূলে কামড়াইয়া থাকে!

খুব কম বয়সে, লক্ষ্মীর গলায় একবার ফোড়া হইয়াছিল। ডাক্তার আসিয়া অস্ত্র করে। লক্ষ্মীর সে কথা আজও মনে আছে। মা বলিলেন,—"লক্ষ্মী! আমার গলায় ফোড়া হইয়াছে।" লক্ষ্মী অমনি ডাক্তার সাজিল। একটু কাঠ কুড়াইয়া আনিয়া, বলিল,—"এই অস্ত্র।" ডাক্তারের অনুকরণে মাকে লক্ষ্মী বলিল,—"চোক বুজিয়া থাক,—কোন ভয় নাই,—কথা কহিও না,—আজ অস্ত্র আমি করিব না,—সে ভয় কিছুই নাই;—দেখি দেখি,—ফোড়া কেমন! বেশ ফোড়া।—এই—এই ঘ্যাচ—

লক্ষ্মীর এইরূপে অস্ত্র করা হইল। জননী কিন্তু কাঁদিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। লক্ষ্মী বলিয়া উঠিল,—"ওবৌ!—অস্ত্র যে করা হইয়াছে, তুই কাঁদিয়া ওঠ না, ছট্‌ফট্ কর না!" মাতা তখন ফোড়াকাটার যন্ত্রণায়, লক্ষ্মী যেমন কাঁদিয়াছিল, যেমন ছটফট করিয়াছিল, সেইরূপ কাঁদিতে ও ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। মা, কান্নার সুরটী থামান্, লক্ষ্মী বলে, এখনও হয় নাই, আরও একটু কাঁদিতে হইবে। তখন লক্ষ্মীও হাসে, মাও হাসে। হাসির তরঙ্গে

সে স্থল পূর্ণ হইল। অবশেষে হাস্যময়ী মাতা হাস্যময়ী কন্যাকে বুকে লইয়া আপন হাস্যময় মুখ কন্যার হাস্যময় মুখের উপর স্থাপন করিয়া রাখিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

গ্রহগণ বিগুণ হইলে পোড়া শোল মাছ জলে পলায়, নয় ?

যশোদা দেবী, লক্ষ্মীর সহিত খেলিতে থাকুন; এদিকে কাত্যায়নী মাটীর হাঁড়ি হইতে মোহর আনিবার জন্য উঠিলেন। তিনি ধীরে ধীরে এক-আধ-পা অগ্রসর হন, পশ্চাৎ ফিরিয়া চান, আর অল্প অল্প হাসেন। রমাপ্রসাদ জিজ্ঞাসিল "মা, হাসচো কেন ?

কাত্যায়নী। বাবা, হাসি আপনা-আপনি আসিতেছে! এত আশা করিয়া, এত ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত করিয়া মোহর আনিতে যাইতেছি; কিন্তু হাঁড়ির ভিতর, ধানের মধ্যে, যদি মোহরটি না পাই; তখন কি হইবে ? যেদিন বাটীতে ডাকাতি হয়, তার পরদিন একবার মোহরটী খুঁজিয়া দেখিয়াছিলাম; তার পর অনেক দিন দেখি নাই,—যদি ইন্দুরে লইয়া গিয়া গর্ত্তে রাখিয়া থাকে বা অন্য কোনরূপে মোহরটী হারাইয়া গিয়া থাকে, তখন কি উপায় হইবে ? এত দুঃখের, এত আশার মোহরটী যদি না পাই,—তাই হাসি আসিতেছে!

রমাপ্রসাদ। বল কি মা ?—মোহর কি হাঁড়িতে নাই ? আমার ত তোমার কথা শুনিয়া অন্তর গুর্ গুর্ করিতেছে,—মা! তোমার হাসি আসিতেছে কেন ?

কাত্যায়নী। বাবা! হাসি যে, কেন আসিতেছে, তা জানি না। কিন্তু হাসি যে, আসিতেছে তা ঠিক! দুঃখের শেষ-সীমার পর বুঝি হাসির রাজ্য উপস্থিত হয়!

রামপ্রসাদ। মা, আমি তোমার সঙ্গে, মোহরের জন্য, লক্ষ্মী পূজার ঘরে যাইব কি?

কাত্যায়নী। না তুমি ঐখানেই থাক। আমি এখনি মোহর আনিতেছি। চিন্তা কি? দেবীর নাম স্মরণ কর। সর্ব্বমঙ্গলা আমাদের মঙ্গল করিবেন।

পুত্রের দিকে আর না চাহিয়া কাত্যায়নী দ্রুতপদে চলিলেন। দেবী পাশে উপনীত হইয়া, শঙ্করীপদে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। শঙ্করী লক্ষ্মীকে, বারংবার প্রণাম করিয়া কহিলেন, "মা! আজ তোমার মোহর লইব। দাসীর অপরাধ লইও না, মা!—বড় বিপাকে পড়িয়াছি, আর চলে না,—দিন আর যায় না মা!"

কাত্যায়নী হাঁড়ি হইতে ধান বাহির করিতে লাগিলেন। প্রায় সাত আট সের ধান ছিল। ধান যত বাহির করেন, দেহ ততই তাঁহার জ্বলিতে থাকে। হাঁড়ির ধান যতই শেষ হইয়া আসে, তাঁহার মুখমণ্ডল ততই ম্লান হয়। ধান আর আধসের আন্দাজ হাঁড়িতে আছে, অথচ মোহর মিলিল না। তখন কাত্যায়নী আবেগে, উৎকণ্ঠায় হাঁড়ি নাড়িতে লাগিলেন,—যদি মোহরটী ঠক্ করিয়া উঠে! কিন্তু হাঁড়িতে মোহর ঠক্ করিল না। তখন কাত্যায়নীর চক্ষু স্থির হইল,—তিনি আর নাই! কিন্তু তিনি দিশাহারা হইলেন না। ভাবিলেন, মুঠা-মুঠা করিয়া আমি ধান হাঁড়ি হইতে উঠাইয়াছি,—যদি ধানের মুঠার সহিত মোহর আসিয়া থাকে,—তাহা হইলে ত মোহর

হাঁড়িতে নাই,—নিম্নে ধানের সহিত অবশ্যই আছে। এই ভাবিয়া, কাত্যায়নী, হাঁড়ির বাকি সমস্ত ধান মেজেতে ঢালিয়া, ধান মেজের উপর "মেলিয়া" দিতে লাগিলেন। মনে মনে কহিলেন,—"মোহর! আর আমায় বঞ্চনা করিও না। ব্রাহ্মণ-কন্যা বড়ই বিপন্না,—দয়া কর,—দেখা দাও! আর সহ্য করিতে পারি না। দেহ কেমন যে বিকল হইয়া যাইতেছে।"

ভগবতী শঙ্করীর কৃপায় এইবার মোহর দেখা দিল। কাত্যায়নী তাহা গ্রহণ করিয়া স্বীয় মস্তকে ধারণ করিলেন। বলিলেন,—"মা লক্ষ্মী! তুমি অনেক দিন আমার গৃহে ছিলে। আজ অন্য ঘরে চলিলে! আমি দীনা,—নিরন্না,—বস্ত্রহীনা,—বাস্তুভিটাহীনা,—মা, তুমি আর আমার ঘরে থাকিবে কেন?"

কাত্যায়নী তখন মোহর লইয়া পুত্রের নিকট আসিলেন, সুগম্ভীর স্বরে কহিলেন,—"বাছা, এই মোহর লও। তোমার নিকট এক অনুরোধ, হিন্দু ভিন্ন অন্য জাতির নিকট এ মোহর বিক্রয় করিও না।"

পুত্র রমাপ্রসাদ, দক্ষিণ হস্ত পাতিয়া, আহ্লাদে গদগদ হইয়া মোহর গ্রহণ করিলেন। এদিকে জননীর চক্ষু দিয়া ঝর্ ঝর্ জল পড়িতেছে দেখিয়া, রমাপ্রসাদ জিজ্ঞাসিলেন,—"মা, কাঁদচো কেন? মোহর যখন পাওয়া গেল, তখন আর কান্না কিসের? আজ ত আনন্দের দিন।

কাত্যায়নী চোখের জল মুছিয়া কহিলেন,—"বাছা মা লক্ষ্মীকে কি জন্মের মত বিদায় দিলাম?"

রমাপ্রসাদ। মোহর পাইবে না ভাবিয়া, তুমি একবার পূর্ব্বে

হাসিয়াছিলে,—এখন মোহরটী পাইয়া একবার তুমি বেশ কাঁদিয়া লইলে মা, তোমার এ কেমন ধারা।

জননী এবার হাসিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

মোহর হাতে পড়িলে, মন অনেকেরই গরম হয়। রামপ্রসাদেরও বুঝি মন কিছু গরম হইল। তাই বুঝি তাঁহার সভ্য ভব্য হইবার সাধ জন্মিল। তিনি মোহর ভাঙ্গাইতে যাইবেন; সুতরাং একটু ভব্যযুক্ত হইয়া যাওয়া উচিত নয় কি?

রমাপ্রসাদ সাজিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রথমেই গোল বাধিল—জুতা নাই। এদিক্ ওদিক্ খুঁজিয়া তিনি একজোড়া চটী বাহির করিলেন; কিন্তু তাহা "ভাবনা-ধরা,"—এবং অগ্রভাগের শেলাই খোলা,—পায়ে দিয়া দেখিলেন যে, পায়ের পাঁচটী অঙ্গুলিই বাহির হইয়া পড়িল। বিষন্নমনে রমাপ্রসাদ সে জুতা ছাড়িয়া অন্য জুতার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভবানীপ্রসাদ,—যিনি এখন নিরুদ্দিষ্ট,—তিনি প্রসিদ্ধ শিকারী ছিলেন। অশ্বে আরোহণ করিয়া, বা হাতীর উপর চাপিয়া, পিতার জীবদ্দশায়, সহচরগণ-সঙ্গে, বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সাহসী এবং বলিষ্ঠ ভবানীপ্রসাদ, শিকার-সন্ধানে বহির্গত হইতেন। ভবানীপ্রসাদের বিলাতী হণ্টিং বুট একজোড়া ছিল। হাঁটু অবধি সে জুতা উঠিত। মহাহর্ষে সেই জুতা ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া রমাপ্রসাদ পায়ে দিলেন। সেই মহামহিমান্বিত মহাজুতা,

রমাপ্রসাদের উরুদেশ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া উঠিল। অলঙ্কারের ভারে অবনত হইলেও, সুন্দরীর আহ্লাদ! জুতাভারে প্রপীড়িত হইলেও, রমাপ্রসাদের আজ মহা আহ্লাদ!

বস্ত্র একখানি বৈ নাই। একখানি বৈ ছিল না, রমাপ্রসাদ তাহা জানিতেন; সুতরাং যে বস্ত্রখানি পরিয়াছিলেন, সেইখানিই ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া পরিলেন। তবে এবার কাচা কোঁচা হইল; কোঁচা কাছা হইল। কেন না, হাটুর কাছে কাপড় খানি ছেঁড়া ছিল কাছাকে কোঁচা করিয়াও রমাপ্রসাদ সে ছিন্ন অংশ সম্যক্‌রূপে ঢাকিতে পারিলেন না। তিনি এক একবার জুতার পানে চাহেন, আর সেই ছেঁড়াটুকু নজর করেন। ছেঁড়া যতবার দেখেন, মনে অস্বস্তি ততবারই ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। কাজেই তিনি পুনরায় কাপড়-খানি বাগাইয়া পরিতে গেলেন; কিন্তু সে ছিন্ন অংশের বাগ কিছুতেই মানিল না,—যেন সেই ছিন্ন অংশটুকু সজীব হইয়া উঠিয়া রমা-প্রসাদকে উপহাস করিয়া উঠিল। রমাপ্রসাদের চোখের নিকট কেবল ঘুরিতে লাগিল। রমাপ্রসাদের মনে হইল, ছেঁড়া বুঝি ক্রমশই বাড়িতেছে। বুঝি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তিল তিল পরিমাণে, ছিন্ন অংশ বৃদ্ধি পাইতেছে। ক্রমশ সেই ছিন্ন অংশ রমাপ্রসাদের চক্ষে এক বিকট বিরাট আকার ধারণ করিল। এখন রমাপ্রসাদ যে দিকে চান,সেইদিকেই ছিন্নবস্ত্র দেখিতে পান। আকাশে ছিন্নবস্ত্র, পৃথিবীতে ছিন্নবস্ত্র,প্রাঙ্গণে ছিন্নবস্ত্র,—রমা, প্রসাদের পৃথিবী ছিন্নবস্ত্রময় হইল।

রমাপ্রসাদ কাঁপিতে লাগিল,—তাহার মাথা ঘুরিল। রমাপ্রসাদ বসিয়া পড়িল। করকমলে মোহর ন্যস্ত থাকিলেও, বালক-রমাপ্রসাদ এবার বড় জব্দ হইল। যাঁহার আর নাই, দ্বিতীয় বস্ত্র নাই, তিনি ভাবিয়া কি করিবেন?

কালে পুত্রশোকও দূর হয়, গভীর সমুদ্রও দ্বীপে পরিণত হয়;—কিছুক্ষণ পরে রমাপ্রসাদের হৃদয়ও স্থির হইল। রমাপ্রসাদ যুক্তি করিলেন, পিতার আমলের, বিছানা-ঢাকা যে বড় চাদরখানি আছে, সেইখানি এমন ভাবে গায়ে দিয়া বাহির হইবেন যে, কিছুতেই লোকে বস্ত্রের ছিন্ন অংশটুকু দেখিতে পাইবে না। ময়লা বিছানার চাদর খানি তখন তিনি লইয়া ওসার নামাইয়া দিয়া, গায়ে দিতে গেলেন। কিন্তু কাপড় ত এক স্থানে ছেঁড়া ছিল, চাদর আবার তিন জায়গায় ছেঁড়া! লক্ষ্মী আঙ্গুল দিয়া খেলাচ্ছলে সে ছেঁড়া বাড়াইয়াছে। দুভাগ্যবশতঃ সেই তিনটী ছিন্ন অংশ তাঁহার পিঠে গিয়া পড়িল। চাদরে বস্ত্রের ছিন্ন ভাগ ঢাকিয়া দিল বটে, কিন্তু পৃষ্ঠদেশে নূতন ছিন্নাংশত্রয়ের সৃষ্টি হইল। রমাপ্রসাদের গৌরবর্ণ পিঠ, ছিন্নাংশ দিয়া যেন উঁকি মারিতে লাগিল। রমাপ্রসাদ দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিয়া সেই উঁকি-মারা পৃষ্ঠত্রয়ে একে একে হাত দিলেন। মনে মনে বলিলেন, "তাই ত, এ আবার কি হইল? এক ঢাকিতে গিয়া তিন হইল। পিরাণ নাই কি? বোধ হয় নাই। মা সেদিন আমার জন্য একটী পিরাণ অনেকক্ষণ ধরিয়া খুঁজিয়াছিলেন, কিন্তু পিরাণ ত তিনি পান নাই। আচ্ছা, আমি একবার খুঁজিয়া দেখি না কেন?"

গৃহের সর্ব্বপ্রকোষ্ঠের সর্ব্বদিক্ রমাপ্রসাদ খুঁজিয়া দেখিলেন; কিন্তু কোথাও আংরাখা, পিরাণ বা কোট কিছুই পাইলেন না। ঘরের এক কোণে একখানি রুমাল কুড়াইয়া পাইলেন। ভাবিলেন, ছিন্ন স্থানের পৃষ্ঠদেশে এই রুমালখানি ঢাকা দিলে হয় না? ঢাকা দিয়া তাহার উপর চাদর গায়ে দিব, পিঠ কেহ দেখিতে পাইবে

না। কিন্তু ঢাকা দিব কিরূপে? রুমাল যে আপনা-আপনি গড়াইয়া পড়িয়া যাইবে। তবে জিয়ল-আটা দিয়া পৃষ্ঠদেশে এই রুমাল খানি আঁটিয়া লইলে হয় না?

রমাপ্রসাদ,এইবার তুমি লোক হাসাইলে। বালক-বুদ্ধিবশতঃ তুমি যাহা মনে মনে কল্পনা করিতেছ, তাহা প্রকাশ্যরূপে উচ্চারণ করিয়া বলিলে, লোকে তোমাকে পাগল বলিবে; অতএব চুপ কর, আর কথাটী কহিও না। মনে মনে যাহা বলিয়াছ, তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে। লজ্জা পঞ্চমে চড়িলে তাহাকে দমন করিতে হয়। লজ্জা অতিরিক্ত মাত্রায় উঠিলে তাহা রিপু বলিয়া গণ্য হয়। অতএব আত্মদমন কর। স্থির হও। লজ্জা কিসের? যখন যেমন অবস্থা,তখন সেইরূপ চলিবে। রুমাল দিয়া যদি সত্য-সত্যই সহজে ছিন্ন অংশ ঢাকা যাইত, তাহা হইলেও তোমার অধিক সম্মান হইত না। আর ও দিকে দেখ, ঐ দেখ তোমার মা আসিতেছেন, শীঘ্র চাদর গায় দাও, ছিন্ন অংশের কথা আর ভাবিও না।

জননী কাত্যায়নী নিকটবর্ত্তিনী হইয়া পুত্রকে কহিলেন,— "বাছা! তুমি এখনও মোহর ভাঙ্গাইতে যাও নাই? অথবা নাযাইয়া ভালই করিয়াছ। মোহরটী সিঁদূর মাখানো; গায়ে উহার সিঁদূরের দাগ আছে। ঘরে তেঁতুল নাই। দেখ দেখি, পুকুর-ধারে যদি আমরুল-শাক থাকে, তবে তাহার পাতা শীঘ্র লইয়া আইস।"

পুত্র আমরুল-পাতা আনিল। মাতা মোহরটী আমরুলের রসে ঘসিতে লাগিলেন। খাঁটী সোণার খাটী মোহর; এইবার প্রকৃত কনককান্তি বাহির হইল। সূর্য্য কিরণে মোহর ঝক্‌ঝক্ করিতে লাগিল। জননী পুত্রের কোঁচার খুঁটে স্বহস্তে মোহরটি বাঁধিয়া

দিলেন। খুঁটটী পুত্র পেটের ভিতর রাখিলেন। রাখিয়া কাপড় আঁটিয়া পরিলেন।

রমাপ্রসাদ হর্ণ্টেংবুট পায়ে দিয়া, মলিন বসন পরিধান করিয়া মলিন বিছানার চাদর গায়ে দিয়া, সর্ব্বরূপে চারিটি ছিন্ন অংশে সজ্জিত হইয়া মোহর ভাঙ্গাইতে যাত্রা করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

বালক, এতক্ষণ মোহর ভাঙ্গাইবার আনন্দে ছিল। এখন কোথায়, কাহাকে মোহর ভাঙ্গাই,—কোথায়, কাহাকে কি প্রস্তাব করি, ইহাই তাহার প্রধান ভাবনা হইল। বিশেষ, তাহার বেশ দেখিয়া, উরুদেশ পর্য্যন্ত সজ্জিত হর্ণ্টেংবুট দেখিয়া, লোকসমূহ তাহাকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। কেহ বলে, "এ ত জুতা নয়,—আস্ত দুইটী বলদ!" কেহ বলে "কাঙ্গালের এরূপ মূল্যবান্ জুতা কেন? ঐ জুতার দামে ত এক খানি গায়ের কাপড় কিনিলে হইত। পরিবার বস্ত্রখানি ত হাঁটু পর্য্যন্ত,—কাপড় নাই, জুতার বাহার দেখ! লক্ষ্মী ছাড়া হইলে বুঝি এইরূপই হইয়া থাকে। এখনই জুতা বেচুক!—বেচিয়া কাপড় কিনুক।"

রমাপ্রসাদ পথে যাইতেছেন, আর লোকমুখে ঐরূপ মধুর সম্ভাষণ শুনিতেছেন। লোকপাল তাঁহার পাছু পাছু আসিতেছে কিনা, রমাপ্রসাদ মাঝে মাঝে তাহা তাকাইয়া দেখিতেছেন। তিনি যে দোকানে বসিতে যান, সেই দোকানেই অমনি লোকে তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়ায়। তাঁহার আর বসা হয় না,—তিনি উঠিয়া অন্যত্র যান।

গ্রামের প্রান্তে এক মুদীর গোলদারী বড় দোকান ছিল। লোকসকল যাহাতে তাঁহার সঙ্গ লইতে না পারে, এই জন্য তিনি দৌড়িয়া সেই দোকানাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। হণ্টিং বুটের বিপরীত শব্দ হইতে লাগিল। কতকগুলি বালক রমাপ্রসাদের দৌড় দেখিয়া সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে দৌড়িতে লাগিল। রমাপ্রসাদ দেখিলেন, হিতে বিপরীত হইল।—দৌড়িয়াও নিস্তার নাই,—ঐ যে আসিতেছে! তখন তিনি পুনরায় আস্তে আস্তে চলিতে লাগিলেন। বালকগণও তখন ধীরে ধীরে পা ফেলিতে লাগিল।

রমাপ্রসাদ ভাবিয়াছিলেন, দোকানখানি বড়। মুদী বৃদ্ধ এবং সঙ্গতিপন্ন। সুতরাং সে ব্যক্তি, মোহর রাখিয়া টাকা দিতে পারে; এই ভাবিয়া রমাপ্রসাদ মুদীর দোকানে প্রবেশ করিলেন। বৃদ্ধ মুদী, তাহার স্বাভাবিক বাজখাঁই কর্কশস্বরে রমাপ্রসাদকে জিজ্ঞাসিল,—"কি চাও?" আমাকে শীঘ্র গঙ্গাস্নানে যাইতে হইবে—বল কি চাও?"

বালক রমাপ্রসাদ কহিল,—"আমি চাই না কিছু,—তবে—" রমাপ্রসাদকে আর বেশী কথা কহিতে হইল না।

মুদী রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিল,—"কিছু যদি চাই না, তবে এখানে সং দেখিতে এসেছে নাকি?"

রমাপ্রসাদ। আপনার সঙ্গে একটু অন্য দরকার আছে।

মুদী। আমার সঙ্গে তোমার আবার অন্য দরকার কি হে? চাল নাও, ডাল নাও ঘি নাও,—পয়সা ফেল, এখনি দিচ্ছি। দরকার-টরকার এখানে কিছু হবে না।

তার পর যখন বৃদ্ধ মুদী রমাপ্রসাদের জুতার প্রতি নজর করিল, তখন সভয়ে কহিল—"বাপু; এ, কি এ! তুমি এখনিই

আমার দোকান থেকে বেরোও। অমন হাঙ্গরমুখো কলাগেছে জুতো পায় দিয়ে এলে, এখনই আমার পর্য্যন্ত লক্ষ্মী ছেড়ে যাবে! তুমি বেরোও বাপু! তুমি যে হও, আমার দোকানে আর থেকো না। তোমায় দেখে আমার গা কাঁপছে। যে ছোক্‌রা অমন জুতো পায় দিতে পারে, সে সব কর্‌তে পারে।"

রমাপ্রসাদ। মহাশয়, রাগ কচ্ছেন কেন? আমি গোপনে কাণে কাণে আপনাকে একটী কথা বলিব।

মুদী। ওরে বাপ্‌রে!—তা হবে না। তুমি আমার কাণটী কাম্‌ড়ে একবারে নির্পোঁচ ক'রে তুলে নাও আর কি! তোমাকে তিলার্দ্ধ বিশ্বাস নাই। তুমি শীঘ্রই বাহির হও, বাপু!—আমি এখনই দোকানের ঝাঁপ বন্ধ ক'রে ফেলবো।

দেখিতে দেখিতে সেই পশ্চাদাগত বালকবৃন্দ দোকানে জড় হইল। বৃদ্ধ দোকানদার 'ত্রাহি মধুসূদন' রবে বলিয়া উঠিল,—"এরা আবার এর সঙ্গে সঙ্গে কে আসিল?"

রমাপ্রসাদ বেগতিক বুঝিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ভাবিলেন,—"কেন এমন হইতেছে? করি কি? সকলে তামাসা-কৌতুক করে, কেহ বা ক্রোধ করে, কেহ বা গৃহ হইতে বাহির করিয়া দেয়, কাহারও কাছে মোহরের কথা পর্য্যন্ত উত্থাপন করিতে পারি না,— হয় কি?" শেষে স্থির করিলেন,—"এই জুতাই যত আপদের মূল; অতএব আর জুতা পায়ে দিব না। জুতা খুলিব। শুধু-পায়ে যাইব।"

দোকান হইতে বাহির হইয়া রমাপ্রসাদ এক বৃক্ষতলে বসিয়া জুতা খুলিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু সে বিলাতী ভীষণ জুতা সহজে কি খোলা যায়? পরিবার সময় উল্লাসে, আহ্লাদে পরিয়া-

ছিলেন,—এখন ভগ্নমনে, ক্ষুব্ধ-হৃদয়ে জুতা খুলিতেছেন; কিন্তু জুতার চারিদিকে বোতাম-আঁটা, বগলশ-দেওয়া, ফিতা-নাগপাশে বাঁধা,—হঠাৎ খোলে সাধ্য কার?—বিশেষ তিনি অনভ্যস্ত। এদিকে আবার জুতা-খোলা-ব্যাপার দেখিতে চারিদিকে দর্শক-মণ্ডলী সমবেত হইল। দর্শক অসংখ্য, অভিনেতা একটী। কোন বৃদ্ধ ব্যক্তি কহিলেন,—"কেন বাছা! তুমি এমন জুতা পরিয়াছিলে, পায়ে যে রক্তারক্তি হইয়া যাইতেছে। ছুরি থাকেত, জুতা কাটিয়া পা-টীকে বাহির কর।" কেহ বলিল,—"ছোঁড়াটা ক্ষেপা,—নহিলে জুতা খুলিবে কেন? কোন্ ভদ্রলোকে পায়ের জুতা খুলিয়া পথ চলিয়া থাকে?" একজন ঐ কথার অনুমোদন করিয়া কহিল "যা বল্‌ছেন ঠিক বটে—বেলাও প্রায় এগারটা হইয়াছে, রৌদ্রের তাপও বৃদ্ধি পাইয়াছে,—কাজেই খেপার মাথা গরম হইয়া উঠিয়াছে;—এক কলসী জল উহার মাথায় ঢালিয়া দিলে হয় না?"

পরোপকার-ব্রতে, মানব, অন্য সময় যত অল্প পরিমাণে ব্রতী হউক না কেন, এ সময় কিন্তু উপস্থিত দর্শকমণ্ডলী তাহা পূর্ণ মাত্রায় পালন করিল। এক কলসী জলের নাম হইবামাত্র, অমনি কে আসিয়া হঠাৎ রমাপ্রসাদের শিরোদেশে কলসীপূর্ণ শীতল জল হুড় হুড় ঢালিয়া দিল! রমাপ্রসাদ ভীত, চকিত, কম্পিত ও বিভীষিকাগ্রস্ত হইয়া এক চীৎকার করিয়া উঠিলেন। লোকে ভাবিল, পাগল এবার উৎকট উন্মাদ-পাগল হইয়াছে। দর্শকগণ তখন দংশন-ভয়ে ভীত হইয়া চারিদিকে দৌড়িয়া পলাইল। রমা-প্রসাদ লোক-রাহু-মুক্ত হইয়া, ধীরে ধীরে এক গৃহস্থের ভবনে প্রবেশ করিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

রমাপ্রসাদ যে গৃহস্থের গৃহে প্রাণভয়ে প্রবেশ করিলেন, তাহা এক সম্ভ্রান্ত সদ্গোপের বাটী। ব্রাহ্মণ-বালককে বিপন্ন দেখিয়া, সদ্গোপকর্ত্তা বালক-দর্শক-মণ্ডলীকে তাড়াইয়া দিল। পাছে কেহ উপদ্রব করে বসিয়া, কর্ত্তা ঘরে খিল দিয়া রাখিল। সদ্গোপ যখন শুনিল, এই বালক ৺শঙ্করীপ্রসাদের পুত্র, তখন সে বালকের আর যত্নের অবধি রাখিল না।

সদ্গোপ-কর্ত্তা, বালকের গায়ের কাপড় শুকাইয়া দিল,—পরিধেয় বস্ত্র শুকাইয়া দিল,—শেষে একটী ডাব খাইতে অনুরোধ করিল। রামপ্রসাদ কহিলেন,—"আমি মাতৃ-আদেশ পালন করিয়া যতক্ষণ না ঘরে ফিরিয়া যাই, ততক্ষণ কিছু খাইব না।"

কর্ত্তা। কি আদেশ,—আমাকে বলিতে কি কোন দোষ আছে?

"দোষ কিছুই নাই"—এই বলিয়া রমাপ্রসাদ মোহর ভাঙ্গাইবার কথা এবং আপন লাঞ্ছনার কথা, আনুপূর্ব্বিক, সদ্গোপ-কর্ত্তার নিকট সমস্ত বর্ণন করিলেন।

কর্ত্তা। এ গ্রাম বড় বটে,—গণ্ডগোল ও মোকদ্দমা করিতে এ গ্রামের অনেকেই মজবুত বটে,—কিন্তু টাকা কাহারও নাই। বিশেষ, মোহর রাখিয়া টাকা কেহই দিবে না।

রমাপ্রসাদ। তবে উপায় কি? এই মোহর ভাঙ্গাইয়া টাকা না লইয়া গেলে যে, আমাদের সংসার অচল হইবে।

কর্ত্তা। উপায় এক আছে। আপনি এক কর্ম্ম করুন। এই গ্রামের প্রায় তিন পোয়া দূরে, গঙ্গার ধারে এক নীল-কুঠী আছে।

সেখানে এ সময় অনেক টাকা মজুত থাকিবার কথা। নীলকুঠীর দেওয়ানজী দয়াল বাবু আপনার ৺ঠাকুরকে বেশ চিনিতেন। পরস্পর বিলক্ষণ সদ্ভাব ছিল। গোমস্তা গোপাল বাবুও আপনার ৺পিতার কাছে অনেক বিষয়ে ঋণী ছিলেন। অতএব আমার বিশ্বাস, নীলকুঠী যাইবামাত্র, আপনার মোহর ভাঙ্গান হইবে।

রমাপ্রসাদ এ কথা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলেন এবং জুতা সদ্গোপবাড়ী খুলিয়া রাখিয়া, খালি-পায়ে নীলকুঠী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সদ্গোপ-কর্ত্তা মাঠ পর্য্যন্ত গিয়া বালককে আগ বাড়াইয়া রাখিয়া আসিল।

নীলকুঠীর কারবার এখন খুব ধুমধামের সহিত চলিতেছে। বৎসরে প্রায় দুই শত মণ নীল উৎপন্ন হয়,—যে বৎসর দেবতা সুপ্রসন্ন হন এবং চাষ ভাল হয়, সে বৎসর আড়াই শত মণও নীল জন্মে। নীলকুঠীর অট্টালিকা কাজেই এখন চারি ক্রোশ দূর হইতে দেখিতে পাওয়া যায়।

বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর। রমাপ্রসাদ প্রথমতঃ বড় আশায় বুক বাঁধিয়া, নীলকুঠীর উচ্চ-অট্টালিকা-শিখর দেখিতে দেখিতে, হন হন করিয়া তদভিমুখে যাইতেছেন। কিন্তু ক্রমশঃ তিনি মনে মনে কত তর্কবিতর্ক করিতে লাগিলেন,—"এবার মোহর ভাঙ্গাইয়া নিশ্চয় টাকা পাইব।" "পাইব"—এই কথা মনে হইলেই হর্ষে তাঁহার গণ্ডস্থল অমনি উৎফুল্ল হইয়া উঠে। "যদি না পাই"—এ কথা যখন তাঁহার মনে হয়, তখন তাঁহার মুখখানি অমনি শুকাইয়া, গুটাইয়া এতটুকু হইয়া যায়। কখন আহ্লাদ, কখন বিষাদ;—কখন জোৎস্না, কখন কাল মেঘ—ইহাই উলটা-পালটী রমাপ্রসাদের হৃদয়ে উদয় হইতে লাগিল।

নীলকুঠীর দ্বারে দ্বারবান্। কুঠীর ভিতর একজন দরিদ্র বালককে প্রবেশোদ্যত দেখিয়া, দ্বারবান্ কহিল, "ভিতরে যাইবার এখন হুকুম নাই,—বাহিরে দাঁড়াও।"

রমাপ্রসাদ কহিলেন,—"দয়াল বাবু আমার বিশেষ পরিচিত—তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ করিতে হইবে।"

দ্বারবান্। বড় বাবু এখানে নাই—তিনি আজ সাত দিন হইল, পীড়িত হইয়া, বাটী গিয়াছেন। নায়েব-দেওয়ান বাবু আছেন।

রামপ্রসাদ। দয়াল বাবু না থাকুন—গোপাল বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে। তুমি দ্বার ছাড়িয়া দাও,—তোমার উপর কোন দোষ আসিবে না।

দ্বারবান্ দেখিল, এই দরিদ্র বালক, বড় বাবুর এবং গোমস্তা বাবুর নাম করিতেছে। অবশ্যই ইহাদের সহিত বালকের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকিবে! আর দ্বিরুক্তি না করিয়া, দ্বারবান্ দ্বার ছাড়িয়া দিল।

নায়েব-দেওয়ান জাতিতে উগ্রক্ষত্রিয়। কৃষ্ণবর্ণ; চক্ষুদ্বয় গোল গোল। শরীরে বিলক্ষণ সামর্থ্য; প্রজা-শাসন করিতে অদ্বিতীয় পুরুষ। নাম, বীরভদ্র সামন্ত।

বীরভদ্র নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ বলিয়া দেশ প্রসিদ্ধ; তাহার ক্রোধানলে দিক্ দগ্ধ হয়। তাঁহার লাঠিবাজীতে ইংরেজ-কুঠিয়ালগণও ভয়ে শশব্যস্ত।

দুই একজন দিগ্বিজয়ী দস্যু হস্তগত না থাকিলে, কোন কোন নীলকুঠীর কাজ ভাল চলে না। নীলকুঠীর-অধিকারী স্বয়ং ধর্ম্ম-পরায়ণ হইলেও, ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধির জন্য, বীরভদ্রকে চাকর রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বীরভদ্রের সহিত তাঁহার দেখা

হইলেই বলিতেন, "আমার ষোল আনা স্বার্থ বজায় রাখিয়া কাজ করিবে; কিন্তু দেখিও, যেন প্রজার উপর বেশী অত্যাচার না হয়।" বীরভদ্র বলিতেন,—"আমি ত কৈ কখনই কাহারও উপর জুলুম করি না!" বীরভদ্রের বোধ হয় ধারণা ছিল, প্রজাকে শূলে চাপাইয়া বধ না করিলে, কিছু অত্যাচার হয় না।

রমাপ্রসাদ ধীরে ধীরে নীলকুঠীর প্রকাণ্ড বৈঠকখানা-গৃহে উপনীত হইলেন। দেখিলেন, এক সুবৃহৎ তাকিয়া ঠেশ দিয়া নায়েব দেওয়ান বীরভদ্র বসিয়া আছেন! বিছানা বিস্তৃত,—সতরঞ্চের উপর সাদা ধপধ'পে চাদর পাতা,—চাদরের উপর তিন খানি বৃহৎ থালা রক্ষিত,—সেই থালার উপর নৈবেদ্যের মত সাজান স্তূপাকারে মোহর সুশোভিত। দেখিতে দেখিতে আর তিনখানি থালা আসিয়া পৌঁছিল। নায়েব নিম্নস্থ কর্ম্মচারিগণকে হুকুম দিলেন,—"মোহরসমূহ গণনা করিয়া, 'থাক' দিয়া এই শূন্য থালায় রাখ।" তিন জন কর্ম্মচারী তিন খানি থালার প্রান্তে বসিয়া, মোহর-গণনা আরম্ভ করিলেন। গোমস্তা গোপাল বাবুও এক-জন গণক। মোহর হাতে করিয়া গণনা আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময় রমাপ্রসাদের দিকে গোপাল বাবুর দৃষ্টি পড়িল! তিনি কহিলেন, "রমাপ্রসাদ যে! এখানে এ সময় কি মনে করিয়া আসিয়াছ?"

রামপ্রসাদ! একটু আবশ্যক আছে।

গোপাল বাবু। আচ্ছা, তুমি এখানে কিছুক্ষণ ব'স; মোহর গণনা শেষ হইলে, তোমার কথা শুনিব।

রমাপ্রসাদ, গোপাল বাবুর কতকটা নিকটে গিয়া, উপবিষ্ট হইলেন।

এত মোহর কোথা হইতে আসিল? ইহা নীল-বেচা টাকার মোহর কলিকাতা হইতে আসিয়াছে। নীলকুঠীর স্বামী, নোট পছন্দ করিতেন না এবং রাশীকৃত রৌপ্য-মুদ্রাও ভাল বাসিতেন না;—তাই তাঁহার কলিকাতাস্থ কর্ম্মচারিগণ নীল বেচিয়া যে টাকা হইত, তাহাতে মোহর কিনিয়া কুঠীতে পাঠাইয়া দিতেন। মোহর অল্পস্থানে থাকে; সেই মোহর ভাঙ্গাইয়া যে টাকা হয়, সেই টাকা রাখিতে হইলে, তাহার বিশগুণ অধিক স্থান লাগে। ইহার উপর কুঠী-স্বামীর ধারণা ছিল, মোহর লক্ষ্মী, টাকা গোলাকার রৌপ্যখণ্ড মাত্র! এই কারণেই ইদানীং কলিকাতা হইতে টাকার পরিবর্ত্তে মোহর আসিত।

মোহর-গণনা আরম্ভ হইল। ষোলটী করিয়া মোহর এক এক থাকে সজ্জিত হইতে লাগিল। রমাপ্রসাদ অনিমিষ-নয়নে চিত্রার্পিতের ন্যায় মোহর-গণনা দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে মোহর গণনা শেষ হইল।

তখন তিনজন কর্ম্মচারী, কাগজ কলম লইয়া মোহরের থাক্ ঠিক দিতে লাগিলেন; স্বয়ং বীরভদ্রও স্বতন্ত্ররূপে থাক্ ঠিক দিতে লাগিলেন! দুইপক্ষ থাক্ ঠিক দিয়া দেখিলেন, কলিকাতার চালানের সহিত মিল হইতেছে না, একটী মোহর কমিতেছে। পুনরায় উভয়পক্ষ থাক্ দিলেন, আবার সেই একটী মোহর কমিয়াই থাকিল। তখন বীরভদ্র রূক্ষস্বরে কহিলেন,—"তোমাদের গণনায় ভুল হইয়াছে। কলিকাতার চালান ঠিক আছে; তাহাদের গণনায় কস্মিন্ কালে ভুল হয় না। অতএব তোমরা পুনরায় গণনা আরম্ভ কর।

কর্ম্মচারিগণ আবার মোহর-গণনা আরম্ভ করিলেন। আবার

সেইরূপ থাক্ দিলেন। আবার দোয়াত-কলম-কাগজ লইয়া থাক্ ঠিক দিলেন। আবার একটী মোহর কম হইল।

বীরভদ্র এবার ক্রোধভরে কহিলেন; "আমি নিজে গণিব, কলিকাতার চালান কখন ভুল হইবার নহে। এখানে চোরও কেহ আসে নাই, যাদুমন্ত্রে মোহরও কেহ উড়াইয়া দেয় নাই; নিশ্চয়ই তোমাদের গণিবার ভুল হইয়াছে।"

এইকথা বলিয়া স্বয়ং বীরভদ্র মোহর গণিতে আরম্ভ করিলেন; তিনি দশ-দশটী মোহর লইয়া এক একটী থাক্ দিতে লাগিলেন। মোহরগণনা শেষ হইল। কাগজে ঠিক পড়িল। কিন্তু সেই একটী মোহর কমই রহিয়া গেল। বীরভদ্র অপ্রস্তুত এবং অপ্রতিভ হইলেন। নিজে ঠকিলেন বলিয়া তাঁহার ক্রোধানল আরও জ্বলিয়া উঠিল। তিনি ক্রোধভরে কহিতে লাগিলেন,—"কলিকাতার চালানই ঠিক। একটী মোহর বোধ হয়, তোমাদের গণনা-কালে গড়াইয়া বিছানার নীচে বা অন্য কোথায় পড়িয়াছে, অতএব বিছানা তুলিয়া দেখ।" এই বলিয়া স্বয়ং স্বহস্তে বিছানা তুলিতে লাগিলেন; বিছানা তুলিয়া চাদর আছ্‌ড়া করিয়া ঝাড়িলেন, সতরঞ্জ ঝাড়িলেন, মাদুর ঠুকিলেন। কিন্তু মোহর পাওয়া গেল না। যে তিনটী তোড়ায় মোহর আসিয়াছিল, সেই তিনটী তোড়ার অভ্যন্তরে প্রদেশ আবার পরীক্ষা করা হইল। কিন্তু মোহর মিলিল না। তোড়ার মুখে যে গালা-মোহর ছিল, তাহা পরীক্ষা করা হইল। বীরভদ্র বলিলেন,—"গালা-মোহর আমাদেরই বটে; মোহর-বাহক কোন প্রবঞ্চনা করে নাই।" তার পর বৈঠকখানা গৃহের চতুষ্কোণ পর্য্যবেক্ষণ করা হইল। আলমারী পরিষ্কার করা হইল। দপ্তর খুলিয়া

দেখা হইল। দোয়াতের ভিতর হইতে কালি বাহির করিয়া দেখা হইল। জলপূর্ণ কলসীর জল ফেলিয়া দেখা হইল। বালি-শের ওয়াড় খুলিয়া দেখা হইল। শীতকাল। কর্ম্মচারিগণের গায়ে জামা ছিল। তাহাদের জামা খুলিয়া পকেট দে া হইল। তাহাদের গায়ের চাদর ঝাড়িয়া দেখা হইল। কিন্তু অহো! মোহর কোথাও মিলিল না।

তখন বীরভদ্র উচ্চরবে চীৎকার করিয়া কহিলেন,—"মোহর নিশ্চয়ই এইখানে আছে, কলিকাতার চালানে ভুল নাই। নিশ্চয়ই কেহ এইখানে মোহর চুরি করিয়াছে।' তিনি আরও উচ্চ-রবে বৈঠকখানা হইতে হাকিয়া ফটকস্থ দ্বারবানকে কহিলেন,—"রঘুনন্দন চোবে! চাবি দ্বারা ফটকের দ্বার বন্ধ করিয়া দাও। ভিতরের কোন লোককে বাহিরে যাইতে কিম্বা বাহিরের কোন লোককে ভিতরে আসিতে দিও না! সর্ব্বনাশ হইয়াছে, মনি-বের মোহর চুরি হইয়াছে।"

ভীমাকৃতি কৃষ্ণকায় বীরভদ্রের দুই চক্ষু রক্তজবার ন্যায় লাল হইয়া উঠিল! তাঁহার মূর্ত্তি কালান্তক যমের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। তিনি মহাহুঙ্কার করিয়া, এক গাছা লাঠী ঘুরাইতে ঘুরা-ইতে কর্ম্মচারিবৃন্দ এবং রমাপ্রসাদকে সম্বোধন করিয়া কহি-লেন "নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে যে কেহ হউক, মোহর চুরি করিয়াছে। একে একে সকলের কাপড়-ঝাড়া লইব।"

একজন খানসামা নূতন ভর্ত্তি হইয়াছিল! প্রথমে তাহারই কাপড় ঝাড়া আরম্ভ হইল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

শিশির-পাতে কমল শুকায়। রাহুগ্রাসে চাঁদ লোপ পায়। কালমেঘে ভাস্কর ডুবিয়া যায়। মহাপ্রলয়ে পৃথিবী ধ্বংস হয়।

শিশির নাই, রাহু নাই, কাল-মেঘ নাই, মহাপ্রলয়ও নাই—তথাচ বালক রমাপ্রসাদ অমন করে কেন?

মানুষ,—অন্নকষ্টে ক্ষুধায় মরে,—জলকষ্টে পিপাসায় মরে। সর্পদংশনে বিষে মরে! বৃশ্চিক-দংশনে জ্বালায় মরে।

রমাপ্রসাদের এখন ক্ষুধা নাই,—অমৃতপানে উদর তৃপ্ত;—পিপাসা নাই,—সর্প বা বৃশ্চিকদংশনও হয় নাই,—তথাচ রমাপ্রসাদ অমন করে কেন?—

নীল আকাশ ত সেইরূপই রহিয়াছে—কৈ রমাপ্রসাদের মাথায় আকাশ ত ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই, বজ্রাঘাতও হয় নাই,—তথাচ রমাপ্রসাদ অমন করে কেন?

রমাপ্রসাদের মুখ চুপসিয়া গিয়াছে—চোখের কোল বসিয়া গিয়াছে, নাক বসিয়া গিয়াছে, দেহ থুরু থুরু কাঁপিতেছে!

এ কি?—রমাপ্রসাদের শরীর হইতে এত ঘাম বাহির হইতেছে কেন? বিরাম নাই;—অনর্গল ঘাম ঝরিতেছে। বুঝি হিমাঙ্গ হইয়া উঠিল। বুঝি নাড়ী আর নাই!

দেখ, দেখ,—রমাপ্রসাদের বুক অমন ঘন ঘন উঠিতেছে পড়িতেছে কেন? এত হাঁপানি কিসের? একি,—শ্বাস আরম্ভ হইয়াছে! ইহাই কি মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ!

মৃত্যুই বটে! অপমৃত্যুর মহাকারণটী,—রমাপ্রসাদের কোঁচার খুঁটে বাঁধা, পেটের ভিতর দেদীপ্যমান!

সেই লক্ষ্মীপূজার মোহরই—মৃত্যু! কাত্যায়নীর আশা—সেই মোহরই মৃত্যু! কন্যা লক্ষ্মীর অন্ন এবং দুগ্ধের সংস্থান—সেই মোহরই—মৃত্যু!

বিধাতার নির্ব্বন্ধ কেহ খণ্ডাইতে পারে না। রমাপ্রসাদ ডুবিল। এই মহাধূমময়, কালমেঘময়, বিষধর-বৃশ্চিকময় ঘোর-সংসার-সাগরের গভীর তলদেশে রমাপ্রসাদ নীত হইল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

যখন নূতন খানসামার পরীক্ষা আরম্ভ হইল, রমাপ্রসাদ ভাবিল, তাহারও বুঝি পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। রমাপ্রসাদ কলের পুতুলের ন্যায় এ-দিক ওদিক চাহিতে লাগিল। শেষে বুঝিল, এবার আমার নয়,—খানসামার পরীক্ষা হইতেছে। চোখের নজর কম হইলে, অন্তরের দৃষ্টি কম হইলে,—এইরূপই ঘটিয়া থাকে।

একটী ছাগের বলিদান হইতেছে; অপর একটি ছাগ বলিদানার্থ নিকটে বাঁধা আছে। সেই নিবদ্ধ-ছাগের তখন প্রাণ কেমন করে বল দেখি? বালক রমাপ্রসাদের প্রাণ কেমন করিতেছে বল দেখি? বলিদানের পূর্ব্বে ছাগশিশু একবার মা, মা, করিয়া ডাকে; আর, তাহার চোখ দিয়া জল ঝরে। বালক রমাপ্রসাদ প্রকাশ্যত "মা" নাম উচ্চারণ করিতে পারিলেন না,—অন্তরে কেবল মা, মা, বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। আর, জলপূর্ণ নয়নকে এইভাবে বলিতে লাগিলেন,—"হে নয়ন! ক্ষমা কর। হে অশ্রু! দীন ব্যক্তিকে দয়া কর। একবার ক্ষান্ত হও। বিগলিত হইয়া

আমার গণ্ডস্থল ভাসাইও না। আমার চোখে জল দেখিলেই, এখনি আমাকে চোর বলিয়া ধরিবে।” কিন্তু নিঠুর নয়ন, সে কাতর বচন শুনিল না,—দুর্জ্জয় অশ্রু সে করুণ-কথা গ্রাহ্য করিল না,—দুইটী নয়ন দিয়াই অশ্রুবারি-ধারা নিপতিত হইতে লাগিল।

বালক ভাবিল, তবে এইবার ত নিশ্চয় মরিলাম। মরিবার পূর্ব্বেও মানুষ বাচিবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে। বালক, একবার ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া, চোখে কি পড়িয়াছে এইরূপ ভাণ করিয়া, চোখ একবার মুছিয়া লইল।

বালকের হৃদয় ভাব-তরঙ্গে পূর্ণ হইল। বালক মনে মনে বলিতে লাগিল,—“কেন মা! তুমি আমাকে মোহর ভাঙ্গাইতে পাঠাইয়াছিলে? আমি যে, এইবার মরিলাম মা! উপায় কি হবে মা!

“মা! তোমার ত কিছুই দোষ নাই। আমারই কপাল মন্দ,—তাই এমন হইতেছে। তুমি আমাকে একা, মোহর ভাঙ্গাইবার জন্য, যাইতে নিষেধ করিয়াছিলে! তুমি রঘুদয়ালকে সঙ্গে দিবে বলিয়াছিলে; কিন্তু তখন আমি সে কথা শুনি নাই। মায়ের কথা না শুনার ফল, সঙ্গে সঙ্গে ফলিল।

“আর, রঘুদয়াল! তুমিই বা সে সময় কোথা লুকাইয়া রহিলে? প্রাতঃকাল হইতে বেলা ১১টা পর্য্যন্ত তোমার দেখা নাই,—ইহারই বা কারণ কি? তুমি জান, ঘরে চাল নাই, লক্ষ্মীর দুধ নাই,—তথাচ তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া, অন্যস্থানে, কেমন করিয়া বসিয়া রহিলে? আমাদের দুঃখের দশা দেখিয়া, তুমিও বুঝিয়া শেষে পলাইয়া গেলে? ছি! রঘুদয়াল এই কি তোমার কাজ? রঘুদয়াল! মা যে, তোমাকে বড়-ছেলে বলিতেন! আমরা যে,

তোমাকে দাদা বলিতাম! সদ্দার দাদা! তোমার ছোট ভাই রমাপ্রসাদ ঘোর বিপদে পড়িয়াছে, তুমি আসিয়া রক্ষা করিবে না কি?”

বালক রমাপ্রসাদের, এইবার তাঁহার জ্যেষ্ঠসহোদর ভবানী-প্রসাদকে মনে পড়িল। বালক যেন ভাব-সাগরে ডুব দিল। মনে মনে কহিল,—“বড় দাদা! তুমি কি আর দেখা দিবে না? ছোট ভাইকে না দেখা দাও, কিন্তু মা যে, তোমার জন্য নীরবে নির্জ্জনে কাঁদিয়া কাঁদিয়া অন্ধ হইতে চলিলেন! দাদা! তোমার কথা কহিলেই মা আমাকে সাহস দিয়া বলেন, “চিন্তা কি?—তোমার বড় দাদা আসিবেন”—কিন্তু পরক্ষণেই দেখি, মায়ের চোখে জল। বড় দাদা! মা আর এমন করিয়া চোখের জল কতদিন ফেলিবেন। আমি বাড়ীতে না থাকিলেই মা কাঁদেন!

“দাদা! মায়ের ক্রন্দনে যদি তোমার হৃদয় কাতর না হয়,—কিন্তু বড়-বধূর দশা ত আর চক্ষে দেখা যায় না! বড়বধূর সে গৌরবর্ণ, সোণার ন্যায় সে উজ্জ্বল কান্তি,—দাদা! বলিলে বিশ্বাস করিবে কি, একেবারে কালো হইয়াছে। নব মেঘের ন্যায় বর্ণযুক্ত তাঁহার আর সে কেশকলাপ নাই। সমস্তই কাঁচি দিয়া তিনি কাটিয়া ফেলিয়াছেন। আর তাঁহার সেই চামর-বিনিন্দিত চুল লইয়া দড়ি বিনাইয়া বিক্রয় করেন,—যে পয়সা পান, তাহাতে লক্ষ্মীর দুধ কিনেন। কখন বা লক্ষ্মীর জন্য, সেই পয়সায় একটী সন্দেশ ক্রয় করেন। দাদা! বড়-বধূ দু-চারি-মুটা অন্নের অধিক আর এখন খান না;—বলেন, ইহাতেই আমার পেট ভরিয়াছে। দাদা! তাঁহার মুখ শুকাইয়াছে; শরীর শুকাইয়াছে; পূর্ব্বের সিকি শরী-রও আর নাই। তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়ে কিম্বা রক্তবিন্দু

পড়ে—তাহা বুঝিতে পারি না। দাদা! তাঁহার একখানি বৈ কাপড় নাই, তাহাও দশ যায়গায় ছেঁড়া। দাদা! তাঁহার কিছুই নাই,—কেবল সিঁতার সিন্দুরটি এখনও কেবল দপ্ দপ্ জ্বলিতেছে। দাদা! আমাকে না দেখা দাও,—একবার তাঁহাকে দেখা দিয়া যাও। আমি ত মরিতে বসিয়াছি,—কিন্তু 'এ সময় যদি বড়-বধূকে তুমি একবার দেখা দাও, তাহা হইলে আমি বড় সুখের মরা মরিব।

"বড়-বধূকে দেখা দিয়া কাজ নাই,—কিন্তু লক্ষ্মীকে একবার দেখা দাও,—একবার কোলে লও। যে লক্ষ্মী চোখের আড়াল হইলে, তুমি আঁধার দেখিতে, যে লক্ষ্মীর সহিত একত্র ভোজন না করিলে, তোমার উদর পূর্ণ হইত না,—যে লক্ষ্মীকে বসনে-ভূষণে,—লক্ষাধিক টাকার হীরক-মুক্তায় সাজাইয়াও তোমার তৃপ্তি হইত না,—দাদা! সেই লক্ষ্মীর আজ দুধ জুটে না,—সেই লক্ষ্মী একখানি কাপড়ের জন্য কাঁদে। পাড়ার কোন কন্যা, এক-খানি ভাল কাপড় পরিয়াছে দেখিলে, লক্ষ্মী অমনি দৌড়িয়া আসিয়া মায়ের গলা জড়াইয়া ধরে, আর বলে 'মা! বাবা কবে আস্‌বে মা!—বাবা এলেই আমি ভাল কাপড় পর্‌বো,—নয় মা?' দাদা! তোমার স্নেহময়ী লক্ষ্মীকে একবার দেখা দিয়া, কোলে লইয়া, একখানি ভাল কাপড় দাও,—লক্ষ্মী পরিয়া বাহির হউক। তার পর তোমার চলিয়া যাইতে হয়;—না হয়, চলিয়া যাইও। দাদা! লক্ষ্মী এখন বড় হইয়াছে। তুমি সাড়ে তিন বৎসরের লক্ষ্মীকে দেখিয়া গিয়াছিলে,—এখন লক্ষ্মীর বয়স প্রায় পাঁচ বৎসর হইয়াছে,—মাঝের দুইটী দাঁত পড়িয়া আবার উঠিতেছে। দাদা! লক্ষ্মীর কচি কচি দাঁতের কোমল দংশন তুমি বড় ভাল বাসিতে।

দাদা! লক্ষ্মীর এখন অনেক দাঁত উঠিয়াছে। তুমি শীঘ্র আসিয়া একবার দেখিয়া যাও। লক্ষ্মীর চুল পিঠ ছাড়াইয়া আরও নীচে আসিয়াছে,—তুমি আসিয়া একবার দেখিয়া যাও। লক্ষ্মী ভিখারীদের নিকট শুনিয়া গান গাহিতে শিখিয়াছে,——

"হরি নাম বিনে আর
কি ধন আছে সংসারে,
বল মাধাই মধুর স্বরে।"

দাদা! তুমি আসিয়া লক্ষ্মীর সেই মধুর কণ্ঠের গান শুনিয়া যাও! দাদা! আর বেশী বিলম্ব করিলে, লক্ষ্মীকে আর এমনটী কস্মিন্ কালে দেখিতে পাইবে না। শীঘ্র এস দাদা!"

সে সময় রমাপ্রসাদের মনে এই ভাবের নানা কথা, নানারূপে উদিত হইতে লাগিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে মানুষের মনে অনেক সময় পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠে। রমাপ্রসাদ আরও ভাবিতে লাগিল,— "কেন এমন হয়? কেন আমাদের এত দুঃখ হয়? বাবা এত অগাধ বিষয় রাখিয়া গেলেও, কেন আমরা পথের ভিখারী হইলাম? জননী দিনরাত্রি মা শঙ্করীকে ডাকিতেছেন,—শঙ্করীর কি দয়া হইল না?

"হে মা শঙ্করি! হে বিপদ্‌ভঞ্জনি! আমার উদ্ধারের কি কোন উপায় নাই? আমি আজই মরি, তাহাতে দুঃখ নাই— কিন্তু লক্ষ্মী যে খাইতে পাইবে না!—এই মোহরটী না ভাঙ্গাইতে পারিলে, লক্ষ্মীর দুধ জুটিবে না,—অন্ন জুটিবে না—লক্ষ্মী যে প্রাণে মরিবে! আর ওদিকে অতিথিগণ গঙ্গাগর্ভে বাস করিতেছেন;— এই মোহরটী না ভাঙ্গাইলে, তাঁহাদের সেবা হইবে কিরূপে? তাঁহাদের সেবা না হইলে মাতা উপবাসী থাকিবেন। মাতা

উপবাসী থাকিলে বধূ উপবাসী থাকিবেন। মা শঙ্করি! সত্য করিয়া বলিয়া দাও, তবে আজ আমরা কি সবংশে নিধন হইব!

"এসো দাদা! এসো—আমাদের আজ সবংশে নিধন দেখিয়া যাও। দাদা! তুমি একবার শিকারে গিয়া এক শিশু-হাতী ধরিয়া আনিয়াছিলে। সেই বাচ্ছা-হাতীতে লক্ষ্মীকে চড়াইয়া তুমি বলিয়াছিলে,—মা লক্ষ্মী আমার জগদ্ধাত্রী। সেই জগদ্ধাত্রীরূপিণী স্বয়ং লক্ষ্মী আজ অন্ন বিনা প্রাণে মরিতেছে,—দাদা! তুমি আসিয়া একবার দেখিয়া যাও!

"দাদা! অন্তরে তোমাকে এত ডাকিতেছি, তবু ত কৈ তুমি আসিলে না? দাদা! তোমার সে ভালবাসা কোথায় গেল? দাদা! আমাদের কোন্ দোষে য দেখা দিতেছ না? দোষ ত :ক কিছুই করি নাই

"দাদা তবে কি তুমি ইহ-জগতে নাই? কোথায় গেলে দাদা? সত্য সত্যই কি তুমি পরলোকে? আর কি তোমাকে এ সংসারে দেখিতে পাইব না?"

দাদা ভবানীপ্রসাদ এতবার আহূত হইয়াও আসিলেন না—বালক রমাপ্রসাদকে তিনি রক্ষা করিলেন না।

———

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

ভাবিতে ভাবিতে রমাপ্রসাদের বুদ্ধি জন্মিল। আমি মরিই বা কেন? আমি সত্য কথা বলি না কেন? আমি ভদ্রলোকের সন্তান;—আমার কথায় নায়েব-দেওয়ান-মহাশয় বিশ্বাস করিবেন না কি? এ স্থলে সত্য কথা বলিয়া একবার প্রাণরক্ষার চেষ্টা করা উচিত। আমি যোড়হাতে বলিব,—"আমার পিতার নাম ৺শঙ্করী-প্রসাদ। আমার দাদা বহুদিন নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। জননী সর্ব্বস্বান্তা,—সর্ব্ব অর্থহীনা;—আমরা আজ-কি-খাই, এমন সঙ্গতি নাই। মায়ের একটী লক্ষ্মীপূজার মোহর ছিল। সেই মোহরটী আমাদের অন্ন-সংস্থানের জন্য এবং অতিথি-সেবার জন্য মা আমাকে ভাঙ্গাইতে দিয়াছেন। সেই মোহরটী আমার কোঁচার খুটে বাঁধিয়া পেট-কাপড়ের ভিতর রাখিয়াছি। আমি আপনাদের মোহর চুরি করি নাই। মা শঙ্করীর দিব্য বলিতেছি, আমি মোহর চুরি করি নাই! এই দেখুন,—আমার সেই মোহর!

এই কথা বলিয়া, কোঁচার খুট হইতে মোহরটী খুলিয়া দেখাইলে হয় না? আমার কথায় নায়েব-দেওয়ান বিশ্বাস করিবেন ত? কিন্তু যদি বিশ্বাস না করেন, তখন উপায়! তখন যে, বন্ধন-হনন সমস্তই সহ্য করিতে হইবে।

তবে কি সত্য কথা বলিব না? কিন্তু না বলিয়াই বা উপায় কি? কাপড়-ঝাড়া-কালে মোহর ত নিশ্চয়ই বাহির হইয়া পড়িবে। তখন ত বন্ধন-হনন অবশ্যম্ভাবী তাই ভাবিতেছি,—সত্য কথা বলাই ভাল নয় কি? মা বলেন,—সত্যপথে, ধর্ম্মপথে থাকিলে,

অৰ্দ্ধেক রাত্রে অন্ন হয়। অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই হউক,—আমি সত্য কথা বলিব।

"না,—সত্য কথা বলা হইবে না। তাহাতে এক দোষ ঘটে যখন আমি নায়েব-দেওয়ানকে বলিব, 'মা, এই লক্ষ্মীপূজার মোহরটী ভাঙ্গাইতে দিয়াছেন,'—তখন নায়েব-দেওয়ান যদি মোহরটী আমার হাত হইতে লইয়া বলেন, "ইহা ত লক্ষ্মীপূজার মোহর নহে;—লক্ষ্মীপূজার মোহরে ত সিন্দুর মাখান থাকিত!—এ মোহরে সিন্দুর কৈ? এ মোহর ঝক্ ঝক্ করিতেছে, এ যে নূতন মোহর! কলিকাতা হইতে যে সকল মোহর আসিয়াছে,—এ মোহরটী যে, ঠিক তাহারই ন্যায়!—অতএব এই বালকই নিশ্চয় চোর! সে সময় আমি যদি আমরুল শাক দিয়া আমার মোহর পরিষ্কার করিবার কথা বলি, তাহা হইলে তখন সে কথা কেহই শুনিবে না,—হাসিয়াই উড়াইয়া দিবে। আমি চোর এবং মিথ্যাবাদী, এ দুইই হইব। অতএব সত্য কথা কিছুতেই বলা হইবে না; সত্য বলিলেই মারা পড়িব। মোহরটীতে যদি সিন্দুর-মাখান থাকিত, মা যদি আমরুল শাক দিয়া, মোহর পরিষ্কার করিতে না বলিতেন,—তাহা হইলে একদিন সত্য কথা বলিলেও বলিতে পারিতাম। কিন্তু অদৃষ্টের দোষে, মা মোহরটীকে মাজিয়া-ঘসিয়া উজ্জ্বল করিয়া দিলেন! কেন মা! তুমি মোহরটীকে এমন নূতন করিয়া দিলে? আমরুল শাকের কথা বলা কিছুতেই উচিত নহে,—কিছুতেই আমরুল শাকে সামঞ্জস্য হইবে না।

"অতএব আমি নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা বলিব। কিন্তু মিথ্যা কথা বলিলেই যে পরিত্রাণ আছে, এমন ত বুঝি না। কি মিথ্যা কথা বলিব? মিথ্যা কথার কিরূপ গল্প রচনা করিব? কিন্তু যেরূপ কাল-

সময় পড়িয়াছে, তাহাতে মিথ্যা কথাই সংসার-ব্যাধির পরম ঔষধ। ধর্ম্মপথ,—কণ্টকময়। ধর্ম্মপথে গমন করিলেই বিপদ্। এই ত মা, দিনরাত ভক্তিভরে শঙ্করী-নাম জপিতেছেন—কিন্তু মায়ের কষ্টের অবধি নাই। খাইতে পান না,—জ্যেষ্ঠপুত্র নিরুদ্দেশ, —বাকী কি? পিতৃদেবের সম্পত্তি ছিল,—রাজার ন্যায়। কিন্তু তাঁহার সে রাজত্ব কোথায় উড়িয়া গেল। এ দিকে পিতা, লক্ষ টাকা ক্ষতি হইলেও, কখন মিথ্যাকথা বলিতেন না;—লক্ষ টাকা লাভ হইলেও, কখন ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য করিতেন না। ইহা ব্যতীত, ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান যে, তিনি কত করিয়া গিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু তাঁহার সেই ধর্ম্মরাজ্য ধ্বংস হইল কেন? তাঁহার স্ত্রী, তাঁহার পুত্র, তাঁহার পুত্রবধূ ও তাঁহার পৌত্রী,—আজ অন্নের জন্য লালায়িত কেন?

"মিথ্যাই এ সংসারের সার পদার্থ। মিথ্যা ব্যতীত মানুষ তিষ্ঠিতে পারে না। সত্য কথা বলিতে হইলেও মিথ্যা মিশাইয়া বলিতে হইবে; কারণ, খাঁটি সত্য, এ সংসার-বাজারে চলে না।

"অতএব আমি একটী মিথ্যা-গল্প রচনা করিয়া বলিব! সে মিথ্যা-গল্পটী কি? গল্প ত খুঁজিয়া পাই না!

"আচ্ছা,—এমন করিলে হয় না? মোহরটী আস্তে আস্তে কোঁচার খুঁট হইতে খুলিয়া লইয়া, ধীরে ধীরে মোহরের এই গাদায় এইবেলা ফেলিয়া দিলে হয় না?

"গাদায় ফেলিয়া দেওয়া হইবে না,—যদি ঝনাৎ করিয়া শব্দ হয়?

"পেটের কাপড়ের ভিতর হইতে আগে কোঁচার খুঁটটী বাহির করি। তার পর কোঁচার খুঁট হইতে মোহরটী খুলিয়া লই।

অবশেষে মোহরটী নায়েব-দেওয়ানের জুতার নীচে রাখিয়া দিই! এমন ভাবে রাখিব যে, কেহ টের পাইবে না। কৌশলের সহিত এই কার্য্যটী করিতে পারিলেই, আমি এ যাত্রা বাঁচিয়া যাইব। লোকসকল এখন অন্যমনস্ক আছে; আমার প্রতি কাহারও দৃষ্টি নাই; সকলেই খানসামার কাপড়ঝাড়া দেখিতেছে। অতএব এই শুভ সময়। এইবার পেটের কাপড়ের ভিতর হইতে কোঁচার খুঁটটি বাহির করি না কেন?

"কিন্তু হাত অমন কাঁপে কেন? জিহ্বা এরূপ শুকায় কেন? চক্ষু এত টানে কেন? বুক এত ধড়াস্ ধড়াস্ করে কেন?

"যদি কেহ দেখিয়া ফেলে! হে মা শঙ্করি! সকলকে একবার অন্ধ কর,—আমি কোঁচার খুঁট খুলিয়া মোহর বাহির করিব। আর সেই মোহর লইয়া, অন্যের অগোচরে, নায়েব-দেওয়ানের জুতার তলার ভিতর রাখিব।

"আমায় কি কেহ দেখিতেছে? কৈ না,—কেহই দেখিতেছে না। তবে, এই উপযুক্ত অবসর। রে দক্ষিণ হস্ত! ভয় নাই,—শীঘ্র পেট-কাপড়ের ভিতর হইতে মোহর বাহির কর্।

"কিন্তু ঐ দেখ,—সকলেই আমাকে দেখিতেছে। ঐ দেখ,—সর্ব্বচক্ষু এক হইয়া আমার কোঁচার খুঁটের পানে চাহিয়া আছে।

"না, কেহই দেখে নাই;—আমারই ভ্রম হইতেছে। আমি দুলিতেছি, ঘুরিতেছি, টলিতেছি,—একি! আমি কি, স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছি! না, না, তা নয়,—আমি আকাশ-পথে উড়িয়া যাইতেছি। আমি চোখে অন্ধকার দেখিতেছি কেন?—আমি কোথায়? আমি কৈ? আমি কে?

"কি আনন্দ! আমি আনন্দ-রাজ্যে। এখানে জনপ্রাণী

নাই। আমার কোঁচার খুঁট দেখিবার কেহই নাই,—আমার মোহর দেখিবার কেহই নাই। এইবার পেটকাপড় হইতে কোঁচার খুঁট বাহির করি। মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত।”

এই বলিয়া বিহ্বল বালক,—সংজ্ঞা-শূন্য বালক সেই পেট-কাপড়ের কাছে, কোঁচার খুঁটে হাত দিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

ভাবিতে যাহা এক পল লাগে,—তাহা লিখিতে হয়ত পাঁচ মিনিটের অধিককাল অতিবাহিত হয়। বালক রমাপ্রসাদ এক্ষণে যাহা ভাবিল,—ভাবিয়া ভাবিয়া যাহা স্থির করিল,—তাহাতে তাহার বোধ হয়, পাঁচ সাত মিনিট লাগিয়া থাকিবে; কিন্তু গ্রন্থ-কারের সে বিষয় লিখিতে কিছুকম দুই ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়াছে।

নূতন খানসামার কাপড়-ঝাড়া লইতেও বোধ হয়, সর্ব্বরকমে পাঁচ সাত মিনিট লাগিয়াছিল! ইহা হইতে অল্পসময় মধ্যে, নায়েব-দেওয়ান খানসামার কাপড়-ঝাড়া কার্য্য শেষ করিতেন,—কিন্তু খানসামার উপর তাঁহার তাদৃশ সন্দেহ ছিল না;—তাঁহার সন্দেহ জন্মিয়াছিল, বালক রমাপ্রসাদের উপর। তিনি খানসামার কাপড়-ঝাড়া লইতেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি ছিল, রমা-প্রসাদের উপর। কাপড়-ঝাড়া-গ্রহণ-পর্য্যবেক্ষণচ্ছলে, তিনি কিছু অধিক সময় অতিবাহিত করিয়া, রমাপ্রসাদের কার্য্যকলাপ গোপন ভাবে দেখিতেছিলেন। রমাপ্রসাদের যখন মুখ শুকাইল,

দেহ ঈষৎ কাঁপিতে লাগিল, অঙ্গ দিয়া যৎকিঞ্চিৎ ঘর্ম্ম বাহির হইতে লাগিল, তখন তাঁহার সন্দেহ আরও দৃঢ়তর হইল। রমাপ্রসাদের ভাবান্তর দেখিয়া নায়েব-দেওয়ান স্থির করিলেন, এই বালকই নিশ্চয় চোর।

রমাপ্রসাদ যখন কোঁচার খুঁট বাহির করিবার জন্য পেটের কাপড়ে হাত দেন, তখন তিনি যেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য ;—মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইবার সর্ব্বলক্ষণ যেন তাঁহাতে বিদ্যমান। তিনি এখন উন্মাদবৎ,—পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রমাপ্রসাদ ভাবিতেছেন এখানে কেহ নাই,—এ রাজ্যে মানুষ নাই, কোন জীবই নাই। রমাপ্রসাদ এই অজ্ঞান অবস্থাতেই, কোঁচার খুঁট টানিয়া বাহির করিলেন ;—কোঁচার খুঁটে যে, কি এক গোলাকার পদার্থ বাঁধা আছে, নায়েব-দেওয়ান এবার তাহা দিব্য চক্ষে দেখিলেন ; তখন নায়েব দেওয়ান অনিমিষ নয়নে, রমাপ্রসাদের কার্য্য দেখিতে লাগিলেন।

রমাপ্রসাদ অর্দ্ধ-অজ্ঞান অবস্থাতেই, কোঁচার খুঁট হইতে মোহর খুলিয়া বাহির করিলেন। তখন শুধু নায়েব-দেওয়ানের নহে, আরও অনেকের চক্ষু সেই মোহরের উপর পতিত হইল। যাই মোহর বাহির হইল, অমনি নায়েব-দেওয়ান, বাঘের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া, বালক রমাপ্রসাদের প্রতি ধাবমান হইলেন। লোক সকলও দেখিল, রমাপ্রসাদের হাতে মোহর। তখন গৃহমধ্যে 'চোর ধরা পড়িয়াছে' বলিয়া এক মহাশব্দ উত্থিত হইল।

নায়েব-দেওয়ানই বাঘের মত গর্জ্জন করুন, আর অন্যান্য লোক 'চোর চোর' বলিয়াই শব্দ করুক,—রমাপ্রসাদ কিন্তু আপন মনে স্বকার্য্য করিতেছেন। তিনি, নায়েব-দেওয়ান তাঁহার নিকট

পৌঁছিবার পূর্ব্বেই, মোহরটীকে দিব্য করিয়া হাতে লইয়া, পূর্ব্ব-সঙ্কল্প অনুসারে নায়েব-দেওয়ানের জুতার দিকে গড়াইয়া দিলেন। সর্ব্বলোক, এ দৃশ্য সম্যক্‌রূপে সন্দর্শন করিল। আবার শব্দ উত্থিত হইল,—'চোর, চোর, চোর।'

মোহর গড়াইয়া দিয়া বালক আর বসিয়া থাকিতে পারিল না। শুইয়া পড়িল।

রমাপ্রসাদ মূর্চ্ছিত।

রমাপ্রসাদ যে কতকটা বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া, মোহর খুলিয়াছিল, তাহা কেহ বুঝিতে পারে নাই;—এবং রমাপ্রসাদ বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া, নায়েব-দেওয়ানের জুতার নিকট যে মোহর গড়াইয়া দিল,—তাহা কেহ বুঝিতে পারে নাই। রমাপ্রসাদ যে, ভূতলে পতিত হইয়া একেবারে চেতনা-বিহীন হইয়া পড়িল, তাহাও কেহ বুঝিতে পারে নাই। লোকে কেবল বুঝিল,—রমাপ্রসাদ চোর।—চুরির দ্রব্য কোঁচার খুঁটে বাঁধিয়া, পেট-কাপড়ে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। এক্ষণে খানসামার কাপড় ঝাড়া হইতেছে দেখিয়া রমাপ্রসাদ, উপায়ান্তর না দেখিয়া কোঁচার খুঁট হইতে মোহর খুলিয়া, গোপনে নায়েব-দেওয়ানের জুতার তলে রাখিবার চেষ্টা করিতেছিল; অতএব রমাপ্রসাদ—চোর,—পাকা চোর।

অতএব, মার, ধর, কাট রমাপ্রসাদকে,—

একথা মুখ ফুটিয়া আর কাহাকেও বলিতে হইল না। নায়েব-দেওয়ান, তাঁহার জুতার তলদেশ হইতে মোহর কুড়াইয়া লইলেন; আর, সেই সঙ্গে, তাঁহার সেই বৃহৎ জুতা হাতে লইলেন।

তখন সেই মূর্চ্ছিত ব্রাহ্মণ-বালকের পৃষ্ঠদেশে, উগ্রক্ষত্রিয়-বংশোদ্ভব নায়েব-দেওয়ান শ্রীযুক্ত বীরভদ্র সামন্ত মহাশয়, পটাপট্

জুতার আঘাত করিতে লাগিলেন। বালকের কোমল পিঠ ফাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। পার্শ্বদবর্গ, নায়েব-দেওয়ানকে উৎসাহ দিতে লাগিল,—"এখনও হয় নাই,—হয় নাই,—চোরের উপযুক্ত প্রহার এখনও হয় নাই। চলুক,—জুতা চলুক,—কীল চলুক,—লাথী চলুক!"

এ—কি? বালক কথা কয় না যে! প্রহার-যন্ত্রণায়,—"আঃ-উঃ" করে না যে! এ গুরুতর আঘাতে "ম'লাম," "গে'লাম" করে না যে!!

নায়েব-দেওয়ান কহিলেন,—"এ বালক বড় বিটল। মূর্চ্ছার বা মৃত্যুর ভাণ করিতেছে। বালক মনে করিয়াছে, মৃতবৎ হইয়া পড়িয়া থাকিলে, কেহ তাহাকে আর অধিক প্রহার করিবে না। কিন্তু আমি বীরভদ্র সামন্ত,—আমার নিকট কেহ ফাঁকি দিতে পারে না,—"

এই কথা বলিয়া, বীরভদ্র উচ্চরবে কহিলেন,—"কে আছিস রে! শীঘ্র আমার ধারাল বল্লম নিয়ে আয়!—আমি এই বদমাইস ছোঁড়ার উরুদেশে বল্লম দিয়া বিঁধিব,—বিঁধিয়া তাহাতে নুন পূরিয়া দিব!—দেখি কথা কয়, কি না কয়?"

গোপাল বাবু, বীরভদ্রকে কহিলেন,—"আমার কেমন কেমন লাগিতেছে! বালক হয় মৃত, না হয় মূর্চ্ছিত। দেখুন দেখি, বালকের নাকে নিশ্বাস পড়িতেছে কি না?

বীরভদ্র। (রুক্ষস্বরে) আপনি কি ক্ষেপেছেন? দুষ্ট ছোঁড়া কল্লা কর্‌চে! আমি ঢের অমন মরা দেখেচি! উরুতে বল্লম বিঁধিয়া নুন টিপিয়া দিলেই, এখনই মরামানুষ বাঁচিয়া উঠিবে আমি কারু কথা শুনিতে চাহি না; আমাকে কাহারও উপদেশ

দিবার আবশ্যক নাই ;—আমি ও বিটল ছোঁড়ার উরুতে বল্লম বিঁধিব, নুন্ দিব,—আর পাছাতে লোহার কল্'কে পোড়াইয়া ছেঁকা দিব,—কে আছিস্ রে ! লোহার কল্'কে লাল করিয়া পোড়াইয়া নিয়ে আয় !

দেখিতে দেখিতে, পূর্ব্ব আদেশ মত, তীক্ষ্ণধার এক দীর্ঘ বল্লম আসিয়া পৌঁছিল ; বীরভদ্র বল্লম হাতে করিলেন। তখন তাঁহাকে কালান্তক যমের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

গোপাল বাবু যোড়হাতে পুনরায় কহিলেন,—"মহাশয় ! আপনি কর্ত্তা। আপনি দণ্ডমুণ্ডের মালিক। মহাশয়, রাগ করিবেন না,—আমার দোষ ক্ষমা করুন।—ঐ দেখুন,—সত্য সত্যই এই বালক সংজ্ঞাহীন। মৃত্যু ঘটিয়াছে কি না,—ঠিক বলিতে পারিতেছি না। কিন্তু ঐ দেখুন, বালকের চক্ষের পলক নাই,—চক্ষু স্থির। জিহ্বা এবং দাঁত কতকটা বাহির হইয়া পড়িয়াছে।"

বীরভদ্র। তুমি বড় ছেলে মানুষ ! সংসারের অভিজ্ঞতা তোমাতে এখনও জন্মায় নাই। অথবা এই বালক-চোরের সহিত তোমার কোনরূপ যোগসাজস আছে। নহিলে উহার পক্ষ টানিয়া তুমি এত কথা বলিবে কেন ?

গোপাল। আমাকে যেরূপ কটু কথাই বলুন,—আমার কিন্তু নিশ্চয় ধারণা এই,—এই বালক মৃত বা ইহার মৃত্যু নিকট। আপনি বালককে একবার তুলিয়া বসাইয়া দেখুন দেখি ?—

বীরভদ্র, রমাপ্রসাদকে তুলিয়া বসাইতে গেলেন। যতক্ষণ বীরভদ্র হাত দিয়া রমাপ্রসাদকে ধরিয়া রহিলেন, ততক্ষণ রমাপ্রসাদ

কতকটা অর্দ্ধ-উপবিষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল,—তবে তাহার মুখ লটকাইয়া হেলিয়া প'ড়ল। বীরভদ্র যাই হাত ছাড়িয়া দিলেন, অমনি ধড়াস করিয়া রমাপ্রসাদ ভূতলে পড়িয়া গেল।

বীরভদ্র, হি—হি—হি হাসিয়া উঠিলেন। সে বিকট হাস্যে ভয়ানক ভাবে সে স্থান সহসা পূর্ণ হইল।

শীতকালে সহসা এরূপ দারুণ গ্রীষ্ম বোধ হয় কেন? কোথাও কি উল্কাপাত হইতেছে? কোথাও কি দাবানল জ্বলিতেছে? প্রাণ ছট্‌ফট্ আইঢাই করে কেন? এমন উৎকট পিপাসা পায় কেন? নরকের কালো কালো কীট মনে পড়ে কেন? হৃদয়ে ভয়ানক ভাবের সহিত বীভৎসের মিশ্রণ হয় কেন? ঐ—ঐ বিষাক্ত, উত্তাল আঁধার তরঙ্গ! বুঝি ডুবিলাম,—বুঝি মজিলাম!!

বীরভদ্র আবার হি—হি হাসিয়া উঠিলেন। লোকসমূহ নীরব, নিস্পন্দ,—যেন নির্জীব চিত্র।

এমন সময় একজন ভৃত্য লৌহ-কলিকাকে লালবর্ণ করিয়া পোড়াইয়া একখানি লৌহ-থালে রাখিয়া, বীরভদ্রের সম্মুখে ধরিল। বীরভদ্র প্রথমে ভৃত্যকে অকথ্য ইতর ভাষায় যৎকিঞ্চিৎ সম্ভাষণ করিলেন। তার পর, সাধুভাষায় ভৃত্যকে "শ্যালা" বলিয়া গালি দিয়া, তাহার গালে, এক চড় মারিয়া কহিলেন, "শ্যালা! এ লাল কল্‌কে আমি ধর্‌বো কেমন ক'রে। একটা চিম্‌টে নিয়ে আস্‌তে পারিস্ নেই? শীগ্‌গির নিয়ে আয় চিম্‌টে। যদি আস্‌তে দেরি হয়,—তবে এই লাল কল্‌কে নিয়ে তোর্ পিঠে ছেঁকা দিব। শুধু শ্যালা! এখানে তোর লাল কল্‌কে। রাখিয়া দৌড়ো!

ভৃত্য কলিকা রাখিয়া নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া গিয়া, চিম্‌টা আনিয়া

দিল। বীরভদ্র চিম্‌টে হাতে লইয়া, চিম্‌টে দ্বারা সজোরে ভৃত্যের পিঠে আঘাত করিয়া কহিলেন,—শ্যালা! এই চিম্‌টে ত আগে আনিলেই হইত!!"

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

বীরভদ্র তখন বামহস্তে বল্লম এবং দক্ষিণহস্তে চিম্‌টা ধারণ করিলেন। সে ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া অনেকের প্রাণ উড়িল। বীরভদ্র ভৈরব রবে কহিলেন, "আমার চোখে ধূলা দেয়, এমন বেটা ছেলে ত আমি এ দেশে দেখিতে পাই না। এই ছোঁড়াটা মনে ক'রেছিল, আমাকে ঠকাবে। কিন্তু আমাকে ঠকায় সাধ্য কার? ছোঁড়াট বেশ জলজীয়ন্ত রয়েচে—আবার কি না কল্লা ক'রে প'ড়ে যাওয়া হলো! হি—হি—হি!—ঐ যে হুমুখের দাঁতগুলি ছোঁড়াটা বাহির করিয়া রাখিয়াছে উহা সমস্তই উহার ছলামাত্র। হি—হি—হি!! মজা দেখ! মজা দেখ। ঐ দেখ্‌চো না, ছোঁড়াটা আস্তে আস্তে নিশ্বাস ফেল্‌চে। এইবার আমার কাছে ধরা পড়িয়াছে। আমি ধরিয়াছি—ধরিয়াছি। আমি বুজরুগি ভাঙ্গিয়াছি। হি—হি—হি!! এখনও বল্‌ছি,—ওঠ্—ওঠ্—উঠে বোস!—কৈ, কৈ এখনও উঠ্‌লি না? এখনও তুই দাঁতগুলো বাহির করিয়া রহিলি! এখনি দাঁতগুলো মুখে ঢুকিয়ে ফেল্!—এখনও মুখে দাঁত ঢুকুলি না!—সব রাখিয়া, মারি তোকে এক ঘুসি ঐ দাঁতের উপর!—ঐ দাঁতগুলো ভেঙ্গে ফেলে রক্তারক্তি ক'রে দি!—হি—হি—হি!!"

এই বলিয়া বীরভদ্র, বল্লম এবং চিমৃটা দূরে নিক্ষেপপূর্ব্বক জানু পাতিয়া বসিয়া, এক বজ্রমুষ্টি উত্তোলন করিলেন! সেই মুষ্টির আকার প্রকার, তেজ-ভঙ্গি দেখিয়া, বোধ হইতে লাগিল, বালকের ঐ কোমল দন্ত-পংক্তি ত কোন্ সামান্য সামগ্রী, ঐ এক মুষ্টিতেই লৌহমুদ্গারও চূর্ণ হইতে পারে! কার এমন আজ মহাশক্তি আছে, যিনি ঐ মহামুষ্টির গতিরোধ করিতে সক্ষম?

সভাস্থ সকলে নীরব। মুখ কাহারও ফুটিল না,—অন্তর কেবল হাহারব করিতে লাগিল। অন্তরের হাহারবও, পাছে বীরভদ্রের কাণে যায়,—এই ভয়েই বুঝি অনেকে ঝটিতি চক্ষু মুদিয়া ফেলিলেন!

এক অশীতিবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধ ব্যক্তি—পলিত-কেশ,—গলিত-দন্ত,—লোল-চর্ম্ম,—ত্বরমাণ হইয়া উঠিয়া, নক্ষত্রবেগে দৌড়িয়া গিয়া আপন বাহুদ্বয় দ্বারা, বীরভদ্রকে বেষ্টন করিয়া, মুষ্টির সম্মুখে আপন বক্ষ পাতিয়া দিয়া, কহিলেন—"সামন্ত মহাশয়! ব্রহ্মহত্যা করিবেন না। এই ব্রাহ্মণ-বালক যদিই জীবিত থাকে, তাহা হইলে, আপনার এই এক মুষ্ট্যাঘাতে উহার নিশ্চয় মৃত্যু ঘটিবে। আর, যদি ইহার মৃত্যুই হইয়া থাকে, তাহা হইলে মৃত ব্যক্তির উপর মুষ্ট্যাঘাত করিয়া লাভ কি?—নীল কুঠীতে ব্রহ্মহত্যা করিবেন না।"

"ব্রহ্মহত্যা" কথাটী হঠাৎ কেমন যেন সামন্ত মহাশয়ের কাণে বাজিল! বীরভদ্র মুষ্টি খুলিলেন, হাত সরাইয়া লইলেন; বৃদ্ধ ব্যক্তি তাঁহার নিকটে বসিলেন। বীরভদ্র কহিলেন, "কার্য্যকালে কিন্তু আমি ব্রাহ্মণ ট্রাহ্মণ বুঝি না। আমি মনিবরের মাহিনা খাই,—মনিবের ষোল আনা স্বার্থ বজায় রাখিব। কর্ত্তব্য কর্ম্মের

উপরোধে, আমি মনিবের জন্য প্রাণ দিতে পারি। ব্রাহ্মণ আমার মাথায় থাকুন,—কিন্তু চোরকে আমি চোরের মতন শাস্তি দিব। চোর—ব্রাহ্মণই হউক আর দেবতাই হউক,—চোর কখনই দয়ার পাত্র নহে।"

বৃদ্ধ। চোরকে আমি দয়া দেখাইতে বলিতেছি না, চোর ব্রাহ্মণ-বালককেও প্রহার করিতে নিষেধ করিতেছি না। আমার ভয়, পাছে নীলকুঠীতে ব্রহ্মহত্যা হয়। আরও দেখুন,—ব্রাহ্মণ-বালক প্রকৃতই যদি মৃত বা মূর্চ্ছিত হয়,—তাহা হইলেই বা উহাকে প্রহার করিয়া এখন লাভ কি? আপনার উদ্দেশ্য—প্রহার করা—দণ্ড দেওয়া;—ব্রাহ্মণকে একেবারে মারিয়া ফেলা ত আপনার অভিপ্রায় নহে।

বীরভদ্র। (একটু নরম সুরে) ব্রাহ্মণকে বধ করিব কেন? মনিবের সে হুকুম নাই;—আমার সে অধিকারও নাই এবং আমাদের শাস্ত্রেও ব্রাহ্মণ-বধ নিষিদ্ধ আছে। তবে আমি যাহা করি, তাহা মনিবের হিতের জন্যই করি।

বৃদ্ধ। ভাল কথা। উত্তম বিবেচনা। এই রকমই ত চাই। আচ্ছা,—আপনি যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে, একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক্ না কেন,—ও বদ্‌মাইস্ ছোঁড়াটা সত্য সত্যই মূর্চ্ছিত, না মূর্চ্ছার ভাণ করিয়া আছে? যদি মূর্চ্ছার ভাণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ মোহর-চোরকে আধমরা করিব—নাক ভাঙ্গিয়া দিব, কাণ কাটিয়া দিব, আর সম্মুখের দুইটী দাঁত লোহার মুগুর দিয়া গুঁড়া করিয়া ফেলিব।

বৃদ্ধ বাক্‌চাতুর্য্যে সুনিপুণ। প্রথমত তিনি "ভাল কথা,"—উত্তম বিবেচনা, "এই রকমই ত চাই"—এই তিনটী কথা বলিয়া

বীরভদ্রের প্রশংসাবাদ করিলেন। তার পর বীরভদ্রের আরও তুষ্টি-সাধনের জন্য ব্রাহ্মণ-বালককে "বদ্‌মাইস ছোঁড়া" বলিলেন। অবশেষে "আধমরা করিব," "দাঁত চূর্ণ করিব" ইত্যাদি কথায় বৃদ্ধ বীরভদ্রের অন্তঃকরণটী আনন্দের সুখরসে দ্রব করিয়া দিলেন।

সুতরাং এবার বীরভদ্র, বৃদ্ধের কথায় অনুমোদন করিয়া কহিলেন,—"আচ্ছা! পরীক্ষা করিতে দোষ কি? আমার সাক্ষাতেই পরীক্ষা হউক। জল আনুন, উহার মুখে দিন! গরম দুধ,—উহার গলায় নীচে নামে কিনা দেখুন,—নাড়ী দেখুন।"

বৃদ্ধ, অনুমতি পাইয়া, জল লইয়া আসিলেন। কিন্তু জল মুখে দিবামাত্র, মুখ হইতে জল বাহির হইয়া পড়িল। বৃদ্ধ নাড়ী দেখিলেন, নাড়ী অতি ক্ষীণ; তবে মৃত্যু এখনও ঘটে নাই, বুঝিলেন। বৃদ্ধ, বালকের চক্ষে ও মাথায় জল দিলেন; গোপাল বাবুকে একখানি পাখা আনিয়া বাতাস করিতে বলিলেন। গোপাল বাবু, পাখা আনিয়া বালকের শিয়রে বসিয়া পাখা করিতে লাগিলেন। তথাচ বালকের মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল না।

বৃদ্ধ,—ধীর-গম্ভীর স্বরে, বীরভদ্রকে কহিলেন,—বালক মূর্চ্ছিত বটেই; কিন্তু ইহা ব্যতীত, আমি মৃত্যুলক্ষণ দেখিতেছি। বোধ হয়, বালক বাঁচিবে না। একজন চিকিৎসক ডাকিলে হয় না?"

বীরভদ্র। চিকিৎসক ডাকিয়া গোল করা হইবে না। কাহাকেও এ কথা জানান হইবে না! এ সব কাজ চুপি-চুপি করিতে হইবে। পুলিসকে খবর দিলেই নগদ ৫০৲ টাকা চাহিয়া বসিবে। ২০০৲ টাকার কমে পুলিসের সহিত বন্দোবস্ত হইবে না। মিছামিছি মনিবের এত বেশী টাকা খরচ করিব

কেন? আমি ব'ল, এই বেলা, লোক-জানাজানি হইবার পূর্ব্বেই এখান হইতে লাস উঠাইয়া লইয়া গিয়া, কৃষ্ণখালির জঙ্গলের নিকট গঙ্গার গর্ভে লাসকে পুতিয়া ফেলা হউক।

এমন সময় একজন ভৃত্য গরম দুধ লইয়া আসিল।

বীরভদ্র কহিলেন,—"গরম দুধে আর দরকার কি? দুধ ফেলিয়া দাও। নীলকুঠীর আটজন বেহারা ডাক। ছোটো পাল্কীখানা আনিতে বল। লাস উঠাইয়া এখনি লইয়া যাও। পাল্কী ঘেরাটোপ দিয়া ঢাকিয়া আনিবে। পাল্কীর সঙ্গে হ'রে ও গেঁদো ডোম,—দুইজন বিশ্বাসী দরোয়ান যাউক। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, কাহার পাল্কী? বলিবে,—সামন্ত মোশায়ের বাটীর মেয়েরা যাচ্চে। এখনি লাস উঠাও।"

বৃদ্ধ। (যোড় হাতে) বলেন কি মহাশয়! বালক যে এখন বাঁচিয়া রহিয়াছে। জীবিত ব্যক্তিকে কেমন করিয়া গর্ত্তে পোতা হইবে?

বীরভদ্র। (রুক্ষস্বরে) তাতে দোষ কি? বিশেষ, উহার জীবন ত আর বেশীক্ষণ থাক্‌বে না! পথে যাইতে যাইতেই হয় ত মরিয়া যাইবে। আমি ত আর ব্রহ্মহত্যা করিতেছি না,—ছোঁড়াটা আপনা-আপনি মরিয়া যাইবে। লাস্ এখানে ফেলিয়া রাখিয়া, আমি আমার মনিবের কতকগুলা টাকা খরচ করাই আর কি? তোমার বেশ বিদ্যে। আমি বৃথা হাঙ্গামা ভাল বাসি না। লাসটী বে-মালুম পুতিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া, নীলের দাদন আরম্ভ করি—মনিবের যাহাতে দু-পয়সা হয়, তাহার চেষ্টা দখি! তুমি বুড়ো হ'লে তোমার " চুল পাক্‌লো,—অথচ তোমার বিষয়-বুদ্ধি হ'লো না—

বৃদ্ধের দু-নয়নে দশ ধারা বহিতে লাগিল। বাষ্পগদ-গদ কণ্ঠে বৃদ্ধ কহিলেন,—"আপনার কথার উপর কথা কহিবার আমার শক্তি নাই—আপনি রাজা; কিন্তু আমার প্রাণ কেমন আকুলি-বিকুলি করিতেছে। আমাকে অর্দ্ধ দণ্ডের জন্য এই ভিক্ষা দিন,—আমি নিজে সুচিকিৎসা করিয়া উহাকে একবার বাঁচাইতে চেষ্টা করি! এই দেখুন না, এখনও নাড়ী রহিয়াছে। বালকের অবস্থা দেখিয়া আমার যেন বুক ফাটিতেছে। প্রাণ কেমন যেন করিয়া উঠিতেছে।"

বীরভদ্র এবার হি—হি—হি—হা—হা—হা হাসিয়া উঠিলেন; হাস্যবদনে কহিলেন, "প্রাণ আবার কি? প্রাণের আবার কেমন-করা কি? হি—হি—হি! কেবল কার্য্যসম্পাদনের সুবিধা দেখিয়া চলিতে হইবে। ঐ বালক বাঁচিয়া থাকুক আর মরুক, তাহাতে আমাদের কি? ঐ বালককে জীবিত-অবস্থায় পুতিয়া ফেলিলেই বা আমাদের ক্ষতি কি? দোষ কি? ও বালক ত এখনি মরিবে; আমি ত মারিয়া ফেলিতেছি না। বালকের পক্ষে এইখানে মরিলে যে ফল, গর্ত্তের ভিতর গিয়া মরিলেও সেই ফল! ফল যখন সমান, তখন নীলকুঠীতে উহাকে রাখিয়া ঝঞ্ঝাট বাড়ান কেন? আচ্ছা, আমি একটা কথার-কথা—ঘরাও-ভাবে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, ঐ বালককে বাঁচাইয়া ফল কি? ইহাতে আমাদের কোন লাভ আছে কি? হি—হি—হি! আপনি নেহাইত ছেলে মানুষ!"

বৃদ্ধ। (উৎসাহের সহিত) ঐ দেখুন, সামন্ত মহাশয়! ঐ দেখুন, বালকের ঠোঁট নড়িতেছে।

বৃদ্ধ বালকের মুখে জল দিয়া আবার কহিলেন,—"ঐ দেখুন, এবার জল পেটে গিয়াছে—বাহির দিয়া জল গড়াইয়া পড়ে নাই।

বীরভদ্র। আমার বোধ হয়, বালককে দানা পাইয়াছে। কুড়ুল দিয়া এখনি উহার মাথা ফাটাইয়া দেওয়া উচিত। কে আছিস্ রে! শীঘ্র কুড়ুল নিয়ে আয় ত! আমি ত আর ব্রহ্ম-হত্যা করিতেছি না! মৃত ব্যক্তির মাথা ফাটাইতেছি।

এমন সময় যম-কিঙ্করের ন্যায় আটজন বেহারা এবং বস্ত্রাবৃত একখানি পাল্কী আসিয়া পৌঁছিল। বেহারাগণ,—লাঠিয়াল এবং ডাকাত—তবে নীলকুঠীর পোষ-মানা দস্যু। উহারা যে মধ্যে মধ্যে পাল্কী বহে, তাহা কেবল পুলিসের চক্ষে ধূলি দিবার জন্য।

বালক ধীরে ধীরে পাশ ফিরিয়া শুইল।

বীরভদ্র কহিলেন, "উঃ, ওঃ—সত্যসত্যই দানা পাইয়াছে! কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড!

বৃদ্ধ। (আপন-মনে) একটু গরম দুধ দিন্। চিন্তা নাই,—বালকের এখনি চেতনা হইবে।

বৃহৎ কুড়ুল আসিয়া উপস্থিত হইল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

ভোগের অবসান না হইলে, মানুষ মরে কি? মরিলেই ত উপস্থিত শাস্তি! কিন্তু ভোগযাতনা ক্ষয় করিবে কে? বালক রমাপ্রসাদের মরা হইল না। তিনি ভোগক্ষয়ের নিমিত্ত জীবিত রহিলেন। কুড়ুলই আসুক, আর তীক্ষ্ণধার বল্লমই আসুক,— রমাপ্রসাদকে মারে কে? তাঁহার যে ভোগ-ক্ষয় হয় নাই।

অল্প অল্প গরম দুধ পান করিয়া, রমাপ্রসাদ যেন সজীব হইয়া উঠিলেন। স্বচ্ছন্দে কথা কহিতে সমর্থ হইলেও, এখনও তাঁহার উত্থানশক্তি রহিত!

বীরভদ্র কহিলেন,—"বালক-চোর যদি জীবিত হইয়া থাকে, ত ভালই;—উহাকে শীঘ্র শীঘ্র বাঁচিয়া উঠিতে বল। এখন মোহর-গুলি এই ভাবেই থাকুক। চারিজন দ্বারবান পাহারা দিউক। আমি বাহিরের উঠানে গিয়া বসিয়া একটু কাজকর্ম্ম করিগে। চোর যখন উঠিয়া বসিতে সক্ষম হইবে, তখন আমাকে খবর দিও। উহাকে শীঘ্র উঠিয়া বসিতে বল না? যখন ও বাঁচিয়াছে, তখন আর বসিতে বিলম্ব করে কেন?"

এই কথা বলিয়া, বীরভদ্র দূরে উঠানে গিয়া এক চৌকির উপর বসিলেন। এতক্ষণ দ্বারের ফটকে চাবি বন্ধ ছিল,—তিনি বসিয়াই দ্বার খুলিতে আজ্ঞা দিলেন। সেই ফটক দিয়া কতকগুলি কৃষিজীবী লোক উঠানে প্রবেশ করিল। তাহারা গলায় কাপড় দিয়া, বীরভদ্রের সম্মুখে সারিদিয়া দাঁড়াইল। বীরভদ্র এক এক জনকে ডাকেন,—কোন কথা-বার্ত্তা নাই,—কেবল দুই তিন ঘা জুতা মারেন,—আর কাহাকেও বলেন—'তোমার ২৲ টাকা জরিমানা।' কাহাকেও বলেন,—'তোমার ৩৲ টাকা জরিমানা।' এইরূপে সেই দল বিদায় হইল।

দ্বিতীয় দল আসিল। এবারে কিছু বাহার বেশী। একজন, পায়ে নাগরা জুতা, গায়ে বেনিয়ান আঁটা, কোমরে চাদর বাঁধা—অগ্রে অগ্রে আসিতেছে। তাহার পশ্চাতে রামভরণ দরোয়ান—মাথায় লাল পাগড়ি, কাঁধে লাঠি—আসিতেছে। তার পর একজন বাঁকী দুই ঝুড়ি সন্দেশ বাঁকে লইয়া হেলিয়া দুলিয়া আসিতেছে। তার পর এক ব্যক্তি একটী বৃহৎ খাসী বান্ধিয়া লইয়া চলিয়াছে।

এই দল আসিবা মাত্র বীরভদ্র সেই বেনিয়ান-গায়ে লোকটীকে বলিলেন, "নায়েব মহাশয়! খবর কি? এত সন্দেশ কেন? খাসীই বা কেন?"

নায়েব ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,—"কর্ত্তাবাবু আপনার জন্য ভেট পাঠাইয়াছেন, আপনি ইহা গ্রহণ করিলে, তিনি বড়ই সুখী হইবেন।"

বীরভদ্র,—চাকরকে বলিলেন,—"অরে, একটা মোড়া নিয়ে আয়।"

নায়েব মোড়ায় উপবেশন করিলেন। বীরভদ্র কহিলেন,—"আপনার মনিব ভেট পাঠাইয়াছেন বটে; আমিও গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু এক কথা এই যে, ১০০/ এক শত বিঘা বিবাদী জমীতে আমি নীল বুনিতে আরম্ভ করিয়াছি, তাহা হইতে কিছুতেই ক্ষান্ত হইব না। আপনার মনিব নগদ পাঁচ শত টাকাই দিন, আর পাঁচ হাজার টাকাই দিন, নীলবুনা কিছুতেই বন্দ হইবে না।"

নায়েব। সে কি মহাশয়! ঐ জমী আমার মনিব বহুকাল হইতে ভোগ-দখল করিয়া আসিতেছেন, পাকা দলিল-দস্তাবেজও আছে, আপনার সহিত বিবাদ করা তাঁহার ইচ্ছা নয়, সেই জন্যই

তিনি অদ্য আমাকে পাঠাইয়াছেন। অতএব আপনি জমীতে নীল বুনিতে ক্ষান্ত হউন।

বীরভদ্র। আবার পিতার ঔরসে যদি আমার জন্ম না হইয়া থাকে, তাহা হইলেই নীল বুনিতে ক্ষান্ত হইতে পারি।

নায়েব। মহাশয় রাগ করেন কেন? মন দিয়া একবার শুনুন।

বীরভদ্র। আমার মন-টন নাই মহাশয়! মনিবের ক্ষতি আমি কখনও করিতে পারিব না। যদি আমার চৌদ্দপুরুষ শ্মশান হইতে উঠিয়া আসিয়া আমাকে এ বিষয়ে অনুরোধ করেন, তাহা হইলেও আমি নীল বুনিতে ক্ষান্ত হইতে পারি না। ইচ্ছা করিলে তুমি তোমার সন্দেশ এবং খাসী ফিরিয়া লইয়া যাইতে পার।

নায়েব। মহাশয়। সন্দেশ এবং খাসী ফিরিয়া লইয়া যাইতে আমার মনিবের আজ্ঞা নাই।

বীরভদ্র। তবে থাকুক। কে আছিস্ রে, সন্দেশ কুঠীর ভিতর লইয়া যা।

একজন ভৃত্য ব্রাহ্মণের হুকায় নল দিয়া আগন্তুক নায়েব মহাশয়ের হস্তে অর্পণ করিল। বীরভদ্রের জন্য এক বৃহৎ সট্‌কা আসিল। উভয়ে কিছুক্ষণ ধূম পান করিলেন। নায়েব,—বীর-ভদ্রের মূর্ত্তি কিছু যেন নরম দেখিয়া পুনরায় কহিলেন,—"মহাশয়, এক কর্ম্ম করুন না কেন? সালিসীতে এ বিষয় অর্পণ করিলে ভাল হয় না কি? আপনার যাহা দলিল-দস্তাবেজ আছে, বাহির করুন; আমার মনিবেরও দলিল-দস্তাবেজগুলি আমি লইয়া আসি। তারপর সালিসীর বিচারে যাহার জমী হইবে, তিনিই পাইবেন! বিবাদ-বিসংবাদের আবশ্যকতা কি আছে?

বীরভদ্র। আমিও ত বলি, বিবাদে দরকার কি? আমি যখন লইয়াছি, তখন কিছুতেই ছাড়িব না, ইহা ত আপনারা বেশ জানেন। সুতরাং বিবাদ করায় আপনাদের কোন ফল নাই। বিবাদ অর্থে—খুন, জখম এবং রক্তপাত!

নায়েব। আপনি তবে জমী ছাড়িতে কিছুতেই রাজী নন?

বীরভদ্র। না।

নায়েব। রাজী হইলে বড়ই ভাল হইত।

বীরভদ্র। যে চাকর মনিবের ক্ষতি করে, তাহার ভাল কিছুতেই হয় না। ঐ জমী সম্বন্ধে বিবাদ বাধিলে আমি স্বয়ং লাঠী ধরিব। আমার হাতে পঞ্চাশটী খুন হইবে। শেষে তোমরা যদি প্রবল হও, আমাকে খুন করিতে পার,—কিন্তু জীবিত থাকিতে আমি জমী ছাড়িয়া দিব না।

আগন্তুক নায়েব কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। শেষে বীরভদ্রকে কহিলেন,—"সামন্ত মহাশয়! তবে আমি চলিলাম। একটা কথা বলি, অন্ততঃ তিন দিন কাল সে জমী-চষা বন্দ রাখুন! ইহা আমার শেষ অনুরোধ।"

বীরভদ্র। এক দণ্ডও বন্দ রাখিতে পারিব না।

নায়েব বিফল-মনোরথ হইয়া শুষ্ক মনে আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বীরভদ্র নায়েবকে প্রণাম করিলেন এবং নায়েবের সহিত আগত প্রত্যেক ভৃত্যকে এক এক টাকা বকসিস্ দিতে কহিলেন। নায়েব, বোধ হয়, এই ভাবিতে ভাবিতে প্রস্থান করিলেন যে, আমি অনেক কাট-খোঁট্টা, রুক্ষ, কর্কশ, একঠোকা বদমায়েস গোঁয়ার দেখিয়াছি, কিন্তু এমনটী কখন দেখি নাই।"

নায়েব দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে, বীরভদ্র পুনরায় ধূমপানে নিমগ্ন

হইলেন। এদিকে বালক রমাপ্রসাদ ক্রমশই সুস্থ ও সবল হইতে লাগিল। যখন তাহার বিশেষ জ্ঞানোদয় হইল, তখন বালক কহিল,—"আমি কোথায়? মা আমাকে যে মোহর ভাঙ্গাইতে দিয়াছিলে, কর্ম্মফলে সে মোহরও ত নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমি এখন মুক্ত, না, বন্দী?" সেই অশীতিবর্ষ-বয়স্ক বৃদ্ধ কহিলেন,—বেশী কথা কহিও না। আমি যাহা জিজ্ঞাসা করি, ধীরে ধীরে অল্প কথায় উত্তর দাও।"

বালক। আচ্ছা, বলুন।

বৃদ্ধ। তোমার ক্ষুধা পাইয়াছে কি? খাইবার ইচ্ছা হইতেছে কি?

বালক। হাঁ সমস্ত দিন আমার আহার হয় নাই, ক্ষুধা বিলক্ষণই হইয়াছে।

বৃদ্ধ। মাগুর মাছের ঝোল দিয়া, ভাত খাইতে ইচ্ছা হয় কি?

বালক। ইচ্ছা খুবই হইতেছে বটে, কিন্তু লক্ষ্মী যে এখনও খায় নাই, আমি কেমন করিয়া খাইব! অতিথি-সেবা এখনও হয় নাই, কেমন করিয়া খাইব!

বালকের মুখে হঠাৎ এই সকল কথা শুনিয়া বৃদ্ধ ভাবিলেন, বালক বুঝি ছিটগ্রস্ত, তাই আবল-তাবল বকিতেছে। বৃদ্ধ এ সব কথার উত্তর না দিয়া কহিলেন,—সে যাহা হৌক, তোমার যখন ইচ্ছা হইয়াছে, তখন অন্ন এবং মাগুর মাছের ঝোল খাওয়া কর্ত্তব্য, বিশেষ তুমি মূর্চ্ছা গিয়াছিলে, দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছ। অন্ন এবং ঝোল এখন তোমার পক্ষে ঔষধের স্বরূপ। অতিথি-সেবা হউক আর না-ই হউক, আত্মদেহ-রক্ষার্থ এখানে ভোজন করিতে পার।"

দূরে উঠানে উপবিষ্ট বীরভদ্রের নিকট সংবাদ আসিল যে,

বালক মাগুর মাছের ঝোল এবং ভাত খাইতে চাহিতেছে। সমস্ত দিন তাহার আহার হয় নাই, অন্ন এবং ঝোল তাহার পেটে পড়িলে এখনি সবল হইয়া উঠিবে। বীরভদ্র হৃষ্টচিত্তে কহিলেন,—"অতি উত্তম সংবাদ। যেখানে পাও,—এখনি মাগুর মাছ লইয়া আইস এবং একটা পাঁঠা কাট। পাঁঠার ঝোলের সহিত একটু মদ মিশাইয়া, বালক-চোরকে দুই তিন বার অল্প অল্প খাইতে দাও, শীঘ্র সে সজীব হইয়া উঠুক, বসুক, দাঁড়াক্, চলুক। তখন দারোগা ডাকিয়া চোর বলিয়া হাতে হাতকড়ি দিয়া, গ্রেপ্তার করাইয়া দিব। চোরের শাস্তি না দিলে পাপ আছে।"

চোরকে সজীব এবং বলশালী করিবার জন্য এইরূপ নানা উপায় উদ্ভাবিত হইতে লাগিল। মদ্য, মাংস, মৎস্য আনীত হইল। বীরভদ্রের হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

বালক রমাপ্রসাদ নানা কারণে মূর্চ্ছিত হইয়াছিল। সমস্ত দিন অনাহার হয় নাই,—শরীর ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল। তাহার উপর দারুণ চিন্তা। তদুপরি চোরাপবাদ। অন্তিমে তাহার পরিণাম চিন্তা। একত্র অষ্টবজ্র-আঘাত আরম্ভ করিলে, মানুষ কতক্ষণ স্থির হইয়া থাকিতে পারে? বালক কিন্তু এখন মাগুর মাছের ঝোল, পাঁঠার ঝোল, অন্ন এবং দুগ্ধ পাইয়া সজীব হইয়া উঠিয়াছে; দেহে বলও পাইয়াছে। আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িবার পূর্ব্বেই যা কিছু মানুষের ভয়;—পড়িল ত ফুরাইল। প্রহারেও ত

কলঙ্কিত হইবার পূর্ব্বেই যা কিছু ভয় ;—মার খাইবার পর, কলঙ্ক রটিবার পর, আর ভয় কি আছে ? তখন ত ভরসা উপস্থিত। চোর-অপবাদ রটিবার পুর্ব্বে রমাপ্রসাদের হৃদয় ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। চোর-কলঙ্ক যখন রটিল, রমাপ্রসাদ যখন ধরা পড়িল, নজর বন্দীতে রহিল, রমাপ্রসাদের সে দারুণ মর্ম্মযাতনা সত্য সত্যই অনেকটা দূর হইল। এখন রমাপ্রসাদ যেন সহজ মানুষ। দেহে বল, মনোবেদনার লাঘব ;—সুতরাং রমাপ্রসাদের স্ফূর্ত্তি না হইবে কেন ?

রমাপ্রসাদের দেহে ও মনে বল দেখিয়া বীরভদ্রের হৃদয়ে আনন্দ আর ধরে না। বলি-দান দিবার পূর্ব্বে ছাগশিশুকে হৃষ্টপুষ্ট দেখিতে অনেকে ভালবাসে। রমাপ্রসাদ এতক্ষণ মলিন বস্ত্রে আচ্ছাদিত ছিলেন ; কিন্তু বীরভদ্রের সে মলিন বসন ভাল লাগিল না। আপন বস্ত্র দিয়া, শাল দিয়া বীরভদ্র,—রমাপ্রসাদকে সাজাইলেন ! একখানি উত্তম চেয়ারের উপর আসন পাতিয়া রমাপ্রসাদকে বসাইয়া রাখিলেন, এই কাজ সম্পাদন করিতেই সন্ধ্যা সমাগত হইল।

সন্ধ্যার পর অন্য এক নিভৃত কক্ষে গিয়া বীরভদ্র বসিলেন। বসিয়া পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এদিকে সেই বৃদ্ধ ভাবিতে লাগিলেন,—"বালককে বাঁচাইবার উপায় কি ? দুধের বালক না বুঝিয়া অজ্ঞানতাহেতু হঠাৎ চুরি করিয়া ফেলিয়াছে,—চুরির দণ্ড প্রায় ষোল আনা পাইয়াছে ; কিন্তু এখন যদি উহাকে দারোগার হাতেই দেওয়া হয়, তাহা হইলে বালক যে হাজতেই মরিয়া যাইবে,—পরিণামে ঘানি-টানা ত দূরের কথা। বীরভদ্র যেরূপ প্রকৃতির লোক, তাহাতে সে যে, আমাদের কথা শুনিবে,

উপরোধ রক্ষা করিবে, এমন ত বোধ হয় না! বালককে পুলিসের হাতে দিবার যদি সে স্থির করিয়া থাকে, তাহা হইলে আমার কথা দূরে থাক্,—তাহার সাক্ষাৎ গুরুদেব আসিয়া বলিলেও, সে তাঁহারও বাক্য শুনিবে না!—এ স্থলে উপায় কি? বালকের অদৃষ্ট বড় মন্দ দেখিতেছি। যদি আজ দেওয়ানজি মহাশয় থাকিতেন, তাহা হইলে এ ঘটনা কখনই ঘটিত না। বালকের অদৃষ্টে দুঃখ আছে বলিয়াই,—বালক, পুলিসের হাতে পড়িবে বলিয়াই, দেওয়ানজি মহাশয় পীড়িত হইয়া হঠাৎ বাড়ী গেলেন। নীলকুঠীর ললাটে বালক-বধ লেখা আছে বলিয়াই, আজ বীরভদ্র এ কুঠীর কর্ত্তা হইলেন। সমস্তই ভগবানের লীলা!

"কোন উপায় কি নাই? হায়! সত্য সত্যই কি আজ এই নীলকুঠীতে ব্রহ্মহত্যা দেখিতে হইল? কাহাকে বলি,—কাহার সহিত পরামর্শ করি? পরামর্শের ত লোক খুঁজিয়া পাই না। সকলেই ভয়ে জড়সড়, সকলেই আত্মহারা। মুখ দিয়া কাহারও বাক্ সরে না। কথা কহিলে পাছে বীরভদ্র আসিয়া তাহাকে ধরে এবং বলে,—'মোহর চুরিতে তোমার যোগ আছে!' ত্রাহি মধুসূদন! ত্রাহি মধুসূদন!—অন্তরে নীরবে সকলেই যেন এই কথাই বলিতেছে।"

এইরূপ নিরাশার কথা ভাবিতে ভাবিতে, বৃদ্ধের হৃদয়ে আশার কথাও উদিত হইল।—"আচ্ছা ভাব দেখি, এমন কেন হইল? বীরভদ্র,—বালকের প্রতি এত যত্ন দেখাইল কেন? যে বীরভদ্র, বালকের মূর্চ্ছাকালে একটু গরম দুধও দিতে চায় নাই, সে বীরভদ্র কেন ব্যস্ত হইয়া প্রহরী ডাকিয়া, বালকের আহারের নিমিত্ত মাগুর মাছ পুকুর হইতে ধরিয়া আনিতে বলিল? পাঁঠার ঝোলে

বালকের বল হইবে বলিয়া বীরভদ্র কেন তৎক্ষণাৎ পাঁঠা কাটিতে হুকুম দিল? আহারান্তে বালক যখন দেহে বল পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, খানিক এদিক্-ওদিক্ বেড়াইল, তখন বীরভদ্র এত আহ্লাদিত হইল কেন? আহ্লাদিত হইয়া বীরভদ্র ভৃত্যকে হুকুম দিল,—'আমার কাপড় আনিয়া উহাকে পরাইয়া দে।' শীত দেখিয়া বলিল,—'শাল আনিয়া দে।' এ সমস্তই ত দয়ার কাজ,—না আর কিছু? শীতে বালকের কষ্ট হইবে, এইটুকু অনুভব করিয়াই ত বীরভদ্র শাল আনিতে বলিয়াছিল। বালকের কষ্টে বীরভদ্রের কষ্ট, এইটুকু না হইলে ত শালের কথা উঠিত না। কতকটা দয়া অবশ্যই হইয়া থাকিবে, ইহার ভুল কিছুতেই নাই। কেবল দয়া বলি কেন,—বোধ হয়, ভালবাসাও জন্মিয়া থাকিবে। নচেৎ বীরভদ্র, শালের পরিবর্ত্তে কম্বল দিবার ত অনুমতি করিতে পারিত।

"কিন্তু দয়া এবং ভালবাসা কিসে হইল? চোরকে দয়া করা বা ভালবাসা বীরভদ্রের কোষ্ঠীতে ত লেখে নাই। বোধ হয়, বালককে নিদারুণ প্রহার করিয়াছিল বলিয়া বীরভদ্র কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া থাকিবে এবং প্রহারই মূর্চ্ছার কারণ,—বীরভদ্র ভাবিয়া থাকিবে। বীরভদ্র বোধ হয় ভাবিয়াছে, 'চুরির ত উপযুক্ত দণ্ড হইয়াছে, এইবার উহাকে খাওয়াইয়া-মাখাইয়া ছাড়িয়া দিই।" আর বালকের যেরূপ মুখশ্রী,—আকর্ণবিস্তৃত উজ্জ্বল চক্ষু,—বালকের বদন-মণ্ডলে যেন দেবভাব অঙ্কিত। গৌরবর্ণ বালক যেন, দ্বিতীয় গৌরাঙ্গ;—উহাকে ভাল না বাসিয়া কে থাকিতে পারে!

"বালকের উপর বীরভদ্রের যদি ভালবাসা এবং দয়া জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে ত সর্ব্বদিকেই সুমঙ্গল। তাহা না হইলে

উপায় কি? নীলকুঠীতে কিন্তু কাণাঘুসা শুনিতেছি, (যেহেতু প্রকাশ করিয়া কথা কহিবার কাহারও শক্তি নাই)—'বীরভদ্র দারোগা-বাবুকে নীলকুঠীতে আসিবার জন্য চিঠী লিখিতেছেন; দারোগা আসিলেই চোরকে ধরাইয়া দিবেন।' এ যে বড় খারাপ কথা।

"যিনি আমার মনিব, যিনি এই নীলকুঠীর একমাত্র অধিকারী, তিনি পরম হিন্দু এবং দয়াদাক্ষিণ্য-গুণযুক্ত। কোন গতিকে তাঁহাকে এই সংবাদ জানাইতে সক্ষম হইলে, বালক মুক্তিলাভ করিতে পারে। অথবা দেওয়ানজী মহাশয়ও এ সংবাদ যদি শুনিতে পান, তাহা হইলে বালকের পরিত্রাণের বিশেষ আশা আছে। এই উভয়ের মধ্যে যাঁহাকে হউক, জানাইতে পারিলেই বালক নিষ্কৃতি পায়; কিন্তু কেমন করিয়া জানাইব? আবার দারোগা আসিবার পূর্ব্বেই জানাইতে হইবে। একবার পুলিসের হাতে পড়িলে, পুলিস ত আর বালককে ছাড়িবে না। পুলিসের হাতে পড়িবার পর জানাইলে ফল কিছুই নাই। কিন্তু পুলিসের আড্ডা হইল—এ স্থান হইতে দুই ক্রোশ দূরে। আর তাঁহাদের বাড়ী হইল এখান হইতে ছয় সাত ক্রোশ অন্তরে। ইহার উপর বীরভদ্রের এখানে অসংখ্য অনুচর। 'পত্র লইয়া যাও' বলিলে দশজন লোক অমনি উর্দ্ধশ্বাসে থানায় দৌড়িবে। কিন্তু এখানে আমি একা,—বৃদ্ধ; চলচ্ছক্তিও তাদৃশ নাই। সুতরাং আমি, দারোগা আসিবার পূর্ব্বে মনিব মহাশয়কে কেমন করিয়া খবর দিব বল দেখি?

"ভাবিয়া ত কিছু কূল-কিনারা পাই না। আচ্ছা, এক কর্ম্ম করিলে হয় না? যদি সত্য সত্যই বীরভদ্র,—দারোগা বাবুকে

নীলকুঠীতে আসিবার জন্য চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই কথাটী বলিলে ক্ষতি কি ?—

"বালক এখনও অত্যন্ত কাতর আছে, বাহ্য অবয়বে সবল দেখা-ইলেও, অন্তরে দুর্ব্বল আছে। এ স্থলে দারোগা বাবু যদি হাতে হাতকড়ি দিয়া বালককে থানায় লইয়া যান, তাহা হইলে বালকের পথিমধ্যে মূর্চ্ছা যাইবার সম্ভাবনা। অতএব অদ্য রাত্রে আর দারোগা বাবুকে ডাকিয়া কাজ নাই ;—কল্য প্রাতে দারোগাকে আনিয়া ঐ বদ্‌মাইস্ চোর-বালকটাকে গ্রেপ্তার করিয়া দিন। যেমন কর্ম্ম, তেমনি সে ফলভোগ করুক।" আর যদি দেখি, বালকের উপর বীরভদ্রের দয়া বা ভালবাসা জন্মিয়াছে, তাহা হইলে ত কোন কথাই নাই।

"যা হউক, বালকের উদ্ধারের জন্য আমি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিলাম। বীরভদ্র আমাকে মোহর-চোরের সঙ্গীই বলুক, কিংবা মোহরে আমার ভাগ আছে বলুক, বালকের মঙ্গল-কামনায় সমস্ত সহ্য করিয়া বালকের উদ্ধারার্থ চেষ্টা করিব। যদি অদ্য রাত্রে বীরভদ্র আমার কথামত দারোগা বাবুকে পত্র লিখিতে ক্ষান্ত হন, তাহা হইলে এই রাত্রেই গোপনে ছদ্মবেশে আমি আমার সেই দয়াময় মনিবের নিকট দৌড়িয়া যাইব এবং নীলকুঠীর এই ভীষণ কাহিনী কীর্ত্তন করিব।"

এইরূপ চিন্তা করিয়া, যে ঘরে নির্জ্জনে বসিয়া বীরভদ্র চিঠী লিখিতেছিলেন, সেই বৃদ্ধ কর্ম্মচারী সেই কক্ষাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

বৃদ্ধ সেই নির্জ্জন-গৃহ-দ্বারে উপনীত হইয়া দেখিলেন, কক্ষের দ্বার রুদ্ধ। বৃদ্ধের মন তখন উত্তেজিত। তিনি দ্বার ঠেলিয়া ঈষৎ উচ্চরবে কহিলেন,—"নায়েব-দেওয়ান মহাশয়! একবার খিল খুলুন;—একটী বিশেষ কথা আছে।" নায়েব-দেওয়ান ভিতর হইতে উত্তর দিলেন,—"একটু অপেক্ষা করুন;—চিঠী লেখা শেষ হইলে খিল খুলিয়া দিতেছি।"

বৃদ্ধ। শীঘ্র খিল খোলা দরকার। কথা বড় গুরুতর।

বীরভদ্র! এ সময় আর আমাকে অধিক বিরক্ত করিবেন না। আপনার সহিত এখন কথা কহিলে বা খিল খুলিয়া দিলে, মনিবের কাজের ক্ষতি হইবে, অতএব আপনি অর্দ্ধদণ্ড কাল বা তাহাপেক্ষাও কম সময় নীরবে বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকুন। চিঠী লেখা শেষ হইলে তদ্দণ্ডেই আপনাকে খিল খুলিয়া দিতেছি।

বৃদ্ধ অগত্যা বাহিরে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

অর্দ্ধদণ্ডেরও কম সময়ে পত্র লেখা শেষ হইল,—বীরভদ্র গৃহদ্বার খুলিলেন। বৃদ্ধ গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক কহিলেন, "হে ধর্ম্মা-বতার! হে দয়াময়! আপনি রাগ করিবেন না"——

বীরভদ্র। আমি রাগ কেন করিব? কৈ, আমি কখন রাগ করি, বল দেখি?

বৃদ্ধ। না, না, তা, না,—রাগ কেন করিবেন? আপনি উচ্চপদস্থ, মহাসম্মানার্হ ব্যক্তি;—আপনার কথাতেই আমাদের ভয় হয়, আর আমাদের মনে হয়,—আপনি বুঝি রাগ করিলেন।

বীরভদ্র। বটে, বটে! রহস্য ত মন্দ নয় দেখিতেছি।

এই বলিয়া বীরভদ্র হিঃ হিঃ রবে বিকট হাস্য করিলেন; বলিলেন, "বলুন,—নির্ভয়ে বলুন, আপনার কি বিশেষ কথা আছে।" (ওরে কে আছিস্ রে, শীঘ্র দুইজন দরোয়ান আয়)।

বৃদ্ধ। চোর-বালকটাকে আজই কি পুলিসের হাতে দিবেন?

বীরভদ্র। হাঁ, আজ—এখনই দিব। সেইজন্য দারোগা বাবুকে আসিতে পত্র লিখিলাম।

বৃদ্ধ। কাল সকালে ঐ চোরকে পুলিসের হাতে দিলে কোনও ক্ষতি আছে কি?

বীরভদ্র। সমূহ ক্ষতি!—ঘরে চোর পুরিয়া রাখি কেমন করিয়া? আমার মনিব শুনিলে কি বলিবেন? যে চোর দিনের বেলা মোহর চুরি করিতে পারে, তাহা দ্বারা রাত্রিকালে কোন্ কুকার্য্য না হওয়া সম্ভব? বিশেষতঃ, এই নীলকুঠী-রক্ষার ভার আমার উপর আছে। ইহা আমার নিজের ঘর নয়। নিজের ঘর হইলে, হয় ত আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিতাম;— এ যে পরের ঘর। আমি আজ সেই পরের ঘরের রক্ষক। যখন চোরকে পুলিসের হাতে দিতেই হইবে, তখন দিবস এবং রাত্রি— এত বাদবিচারের আবশ্যকতা কি?

বৃদ্ধ। কিন্তু এক কথা এই হইতেছে, বদ্‌মায়েস বালকটা এখনও দুর্ব্বল আছে। আপনার সেবা ও শুশ্রূষা এবং আপনার প্রদত্ত আহারীয় সামগ্রী ভক্ষণে সে কতকটা সবল হইলেও, এখন অনেকটা দুর্ব্বল আছে; দারোগার হস্তগত হইলে পর, বালক যদি পথে মূর্চ্ছা যায় এবং সেই সঙ্গে পড়িয়া যায়, তাহা হইলে নানা বিভ্রাট ঘটিতে পারে।

বীরভদ্র। আমার নিকট হইতে পুলিসের হাতে চোর গেলেই আমি নিশ্চিন্ত। আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম ঐ খানেই শেষ। আমার হাত হইতে পুলিসের হাতে গিয়া বালক মূর্চ্ছিত হউক, পড়িয়া যাউক, তাহার মুখ দিয়া ভুক্‌ভুক্ রক্ত উঠুক্, বা সে এককালে মরিয়াই যাক্, তাহাতে আমার কি ?

বৃদ্ধ মনে মনে কহিলেন,—"বাপ্! বীরভদ্র বলে কি ?" প্রকাশ্যে কহিলেন, "চোরকে পুলিসের হাতে দিলেই কি আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্মের শেষ হইল ? ব্রাহ্মণ-বালকের প্রাণরক্ষা করা কি কর্ত্তব্য নয় ?"

বীরভদ্র। ও। বটে—বটে! পুলিসের হাতে দিলেই কর্ত্তব্য কর্ম্মের শেষ হইবে না। যতক্ষণ না উপযুক্ত প্রমাণ প্রয়োগের সাহায্যে ঐ চোর-বালককে অন্ততঃ ছয় মাস কাল জেলে দিতে পারি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য কর্ম্মের শেষ হইবে না। আর ব্রাহ্মণ-বালকের প্রাণরক্ষার কথা যাহা আমাকে বলিতেছেন, তাহাতে আমার হাত কি ? যে দুর্ব্বল হইবে, সে-ই আগে মরিবে। ব্রাহ্মণ-বালক চোর হইলে যে দণ্ড পাইবে না, বা মরিতে হইবে না, এমন কথা শাস্ত্রে কোথাও লেখা নাই। মুচি চোর হইলেও চোর, ব্রাহ্মণ চোর হইলেও চোর। পৈতা, তিলক বা টিকিতে চৌর্য্য কার্য্যের দোষ দূর করে না।

বৃদ্ধ। রমাপ্রসাদ যে ব্রাহ্মণ, সে কথা ছাড়িয়া দিন, রমাপ্রসাদ বালক ত বটে। বালকের অপরাধ কতকটা মার্জ্জনীয় নহে কি ?

বীরভদ্র। (যেন চমকিয়া উঠিয়া) সে কথা বলিবেন না,—সে কথা বলিবেন না।—বালককাল হইতেই দৃঢ় শাসন আবশ্যক। আপনি বলেন কি ? যে বাঁশকে কাঁচা বেলায় নত করা না হয়,

পাকা অবস্থায় তাহা কিছুতেই নত হইবার নহে। চোর-বালক রমাপ্রসাদকে যদি আমি এখন ছাড়িয়া দিই, তাহা হইলে ক্রমশ সে সিঁদ কাটিতে আরম্ভ করিবে; তারপর ডাকাতির দল বাঁধিবে; অবশেষে তাহার সাহস এবং বলবিক্রম এত বৃদ্ধি পাইবে যে, এক দিন দিবাভাগেই হয় ত রমাপ্রসাদ ডাকাতি করিয়া এই নীলকুঠী লুঠিয়া লইয়া যাইবে! কণ্টক-বৃক্ষের আদিতেই সমূলে উৎপাটন করা উচিত। চোর-বালক রমাপ্রসাদ যদি ছয় মাস কাল কারাদণ্ড ভোগ করে, তাহা হইলে ঐ খানেই সে মুসড়িয়া গেল,—আর বাড়িতে পারিবে না; যদি পথে বা অন্যত্র মরিয়া যায়, তাহা হইলে ত আরও ভাল হইল,—কণ্টক-বৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত হইল।

বৃদ্ধ। আপনি আজ উচ্চপদস্থ প্রধান কর্ম্মচারী; আপনি আজ নীলকুঠীর রাজা; ভগবান্ আপনাকে আরও বড় করুন;—আপনার সহিত কথার বাদানুবাদ করিয়া আমি যে আজ জয়ী হইতে পারিব, সে আশা আমার নাই। তবে আমার এই ভিক্ষা, ব্রাহ্মণ-বালককে অদ্য এই কুঠীতেই রাখুন,—দারোগার হাতে দিবেন না। বৃদ্ধের এই প্রার্থনা আপনি যদি দয়া করিয়া পূরণ করেন, তাহা হইলে আমি সফল-কাম হইব,—নচেৎ আমি নিরুপায়।

বীরভদ্র। আপনি যে দয়ার কথা বলিতেছেন, তাহা আমি বুঝি না। দয়া কাহাকে বলে? ইহা ত আমি ঠিক করিতে কিছুতেই পারিতেছি না। এই ধরুন, আপনার একজন নাক কাটিয়া লইয়া যাইতেছে, আপনি তাহাকে সাদর সম্ভাষণ আরম্ভ করিলেন, "বন্ধু! যেও না, যেও না,—এস, এস,—বস, বস, এক

ছিলিম তামাক খাও!—যদি একান্তই যাইবে, ত একটু জলযোগ করিয়া যাও।" এই কথা বলিয়া আপনি সেই নাসিকা-কর্ত্তনকারী বন্ধুর পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন। ইহার নাম কি দয়া? না, ইহাকে পাগলামি বা আহম্মকি বলে? আচ্ছা, যদি আপনি আমাকে ঠিক করিয়া বুঝাইতে পারেন যে, চোর-বালককে রাত্রিতে নীলকুঠীতে রাখিলে কর্ত্তব্য কর্ম্মের কোন ত্রুটী হইবে না,—তাহা হইলে চোরকে অদ্য রাত্রে আমি নীলকুঠীতে স্থান দিতে পারি।

বৃদ্ধ। (যোড়হাতে) আপনি উচ্চপদস্থ এবং আমার মনিব।—আমি অতি ক্ষুদ্র এবং আপনার অধীনস্থ কর্ম্মচারী। সুতরাং বাদানুবাদ করিয়া আপনাকে বুঝাইতে আমি একান্ত অক্ষম। দয়া-দাক্ষিণ্যের কথা ছাড়িয়া দিন, কেবল যদি "বৃদ্ধের কথাটী রক্ষা করিব,—বৃদ্ধের অনুরোধ রক্ষা করিব,"—এই ভাবিয়া বালককে এ রাত্রে নীলকুঠীতে স্থান দিতে পারেন, তবেই দিন—অন্য কোন কথা আর বলিতে পারিব না।

বীরভদ্র। এ যে কেমন উল্টা কথা হইল, আমি বুঝিলাম না। আপনি বৃদ্ধ;—অতএব আপনার কথা রক্ষা করিতে হইবে,—ইহার অর্থ আমার হৃদয়ঙ্গম হইল না। এ গ্রামে অন্ততঃ এক শত বৃদ্ধ ব্যক্তি আছে,—আমি কোনও কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছি, অমনি গ্রামস্থ একটী বৃদ্ধ আসিয়া বলিলেন,—"আমার কথাটী রক্ষা করিতে হইবে,—আপনি এই সঙ্কল্পিত কার্য্য করিতে পারিবেন না।" এইরূপে যে কার্য্যই করিতে যাইব, অমনি এক একটী বৃদ্ধ আসিয়া উপস্থিত হইবেন এবং বলিবেন,—"আপনি এই কার্য্য কারতে পারিবেন না।" বৃদ্ধেরই কথা রক্ষা করিতে হইলে, আমাকে চাকরি ছাড়িয়া, কাপড় ছাড়িয়া, দেশ ছাড়িয়া পলাইতে হইবে।

বৃদ্ধ। আমি ক্ষান্ত হইলাম।—আপনার কথার উত্তর দিবার আমার আর শক্তি নাই। আপনার যাহা ইচ্ছা করুন। ক্ষুদ্র,—বলবানের নিকট চিরদিন পরাজিত।

বীরভদ্র। আপনি শেষ কথাটী যাহা বলিলেন. তাহা ঠিক; কিন্তু এখানে ক্ষুদ্র-বলবানের উদাহরণ খাটে না। মনিবের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় আপনার সহিত এই সামান্য বিষয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা করিয়া আমি অর্দ্ধ দণ্ড কাটাইয়াছি। কি করা যুক্তিযুক্ত এবং ন্যায্য, এই বিষয় লইয়া উভয়ের অনেক বাগ্‌যুদ্ধ হইয়াছে, এবং এ বিষয়টী যতদূর সূক্ষ্মভাবে পর্য্যালোচনা করিতে হয়, তাহাও হইয়াছে। শেষে আপনি হারি মানিয়াছেন.—কথার উত্তর দিবার আপনার শক্তি নাই বলিয়াছেন।—সুতরাং ক্ষুদ্র-বলবানের উপমার এখানে সামঞ্জস্য রহিল কৈ?

বৃদ্ধ কথা কহিতে পারিলেন না,—বীরভদ্রের মুখপানে চাহিতেও সক্ষম হইলেন না,—ধীরে ধীরে বিষন্নবদনে সে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

আদেশমত দুই জন দ্বারবান্ যোড়হাতে গৃহদ্বার-সমীপে দাঁড়াইয়া ছিল। বীরভদ্র তাহাদিগকে কহিলেন,—"পুলিস-থানায় যাও, দারোগা বাবুর হাতে এই পত্র দিবে এবং তোমরা দারোগা বাবুকে এখনি সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিবে।"

পঞ্চাবংশ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি আটটা বাজে নাই, এমন সময় দারোগা দলে-বলে নীলকুঠীতে প্রবেশ করিলেন। দারোগা প্রবেশমাত্র, সেই নীলকুঠী-প্রদেশে যেন মহা-মহা নাটকের মহা-মহা অভিনয় হইতে লাগিল। ব্যপার কুরুক্ষেত্র কিম্বা লঙ্কাকাণ্ড,—বুঝিয়া লয়, সাধ্য কার? শুম্ভনিশুম্ভের পালা, না দক্ষযজ্ঞ, না মধুকৈটভ বধ,—কি,—কেমন করিয়া বলিব? ভূমিকম্প নয় ত?—না, আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম? না. সহস্র ঐরাবত এককালে ক্ষিপ্ত হইয়া মহাবেগে ইতস্ততঃ ধাবিত?

কি হইতেছে, তাহা জানি না। কতকগুলা লোক উচ্চরবে ডাকা'তেহাঁক হাঁকিতেছে। এক দল কোমর বাঁধিয়া লাঠী ঘাড়ে করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতেছে। দূরপ্রদেশে কথার বচসা করিতে করিতে, পাঁচ সাত জনে মারামারি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। কেহ বা তুড়ি লাফ খাইয়া পড়িতেছে। কেহ ঘোর রবে 'বাপ্ বাপ্' শব্দে দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ করিতেছে। কেহ, 'ভাই! কালী কালী বল' বলিয়া ডিগ্‌বাজী দিতেছে। কেহ বিকট হাস্য হাসিয়া দেয়ালে বাহু ঠুকিতেছে। গোশালা হইতে গো সকল দড়ি ছিঁড়িয়া পলাইতে আরম্ভ করিয়াছে। ভীরুগণ হরিনামের মালা হাতে লইয়া, কেবল মধুসূদনের নাম জপ করিতেছে। কে কাহাকে ধরিয়া বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছে. তাহার ঠিক নাই। কেহ বা কাহারও বুকে পদাঘাত করিতেছে। প্রহারিত হইয়া কেহ বা ভূমিতলে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেছে। ঐ রে দেখ দেখ, কলুদের ঘর পুড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। বহু লোক সেই দিকে

গিয়া, জল ঢালিয়া দিয়া আগুন নিবাইতেছে। কতকগুলি লোক গোয়ালাদের বড় ঘরের চালে উঠিয়া খড় খুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। মুদির দোকানে লুট হইতেছে কেন? যে যাহা পাইতেছে,—ঘি, ময়দা, চাল, ডাল;—যে যাহা পাইতেছে, সে-ই তাহা লইয়া পলাইতেছে। জহুরে বাগ্দীর গালে চড় মারিয়া, তাহার বড় খাসীটা কাড়িয়া লইয়া আসিতেছে কে? ময়রাদের বড় বউ দৌড়িয়া গিয়া ঘরে খিল দেয় কেন? হো হো শব্দে পাঁচ সাত জন লোক ময়রা-বাড়ীর দ্বার ঠেঙ্গায় কেন? গোবর্দ্ধন জেলের জাল কাড়িয়া লইয়া, দু'জনে তাহার দুই কাণ ধরিয়া লইয়া আসিতেছে কেন? প্রসন্ন চাষানী ধান ভানিয়া খায়;—তাহার ঢেঁকিটী উপড়াইয়া একজন বিকটাকার পুরুষ, কাঁধে করিয়া লইয়া আসিতেছে কেন? শ্রীদাম পালের একবোরা মিহি চাল, এক ব্যক্তি মাথায় করিয়া আনিতেছে, শ্রীদাম কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার পেছু পেছু চলিয়াছে কেন? শিশু-সন্তান কাঁদিয়া উঠিলে, 'বাছা! আর কাঁদিও না, ঐ দারোগা আসিয়াছে" বলিয়া মাতা ছেলেকে চুপ করাইতেছেন কেন? কাঁদুনে ছেলেকে (স্তন না দিয়াও) ঘুম পাড়াইবার সুবিধা-সুখ, জননীর এত হইল কেন? কেন এমন হইল, কিসে এমন হইল, তাহা ঠিক কেমন করিয়া বলিব? তবে দারোগা বাবু নীলকুঠীতে আবির্ভূত হইয়াছেন, ইহাই অদ্যকার নূতন ঘটনা। আর এক নূতন ঘটনা এই,—ঐ পৌষের শীতে দেখিতে দেখিতে হঠাৎ নভোমণ্ডল নব-মেঘমালায় পূর্ণ হইল। পৃথিবী ঘোর অন্ধকারে আবৃত হইল। বায়ু বেগে বহিতে লাগিল। টিপ টিপ জল পড়িতে আরম্ভ হইল।

দারোগা বাবু আসিবামাত্র বীরভদ্রের সহিত আপ্যায়িত করিয়া কহিলেন, "ও! কি ভয়ঙ্কর কথা! আপনার নীলকুঠীতে মোহর-

চুরি!—এ যে অরাজক হইয়া উঠিল দেখিতেছি! বলেন কি!—মোহর-চুরি? সত্য সত্যই নীলকুঠী হইতে মোহর-চুরি? ওঃ!"

বীরভদ্র। চুরি সত্যই ঘটিয়াছে। আমার মনিব শুনিলে কি বলিবেন, কেবল তাহাই ভাবিতেছি! যাহা স্বপ্নের অগোচর ছিল, তাহাই আজ নীলকুঠীতে ঘটিল।

দারোগা। সে চোর কোথায়?—কিরূপ আকৃতি?

বীরভদ্র। চোর ঐ পার্শ্বের ঘরে আছে।

দারোগা। হাতে হাতকড়ি পায় বেড়ী দেওয়া হইয়াছে?

বীরভদ্র। না।

দারোগা। ওঃ, হো! সর্ব্বনাশ করিয়াছেন! সে চোরকে আপনি এখনও চিনিতে পারেন নাই। সে যে, একটু সুযোগ পাইলেই এখনি নীলকুঠীর প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া পলাইয়া যাইবে। (জমাদারের প্রতি) শোন জমাদার! গ্রামে যত চৌকিদার আছে, যত ইতর চুয়াড় আছে,—তাহারা সকলে লাঠী ঘাড়ে করিয়া অদ্য রাত্রি এই নীলকুঠী বেষ্টন করিয়া থাকুক এবং তুমি তাহার তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত থাক।

জমাদার তথাস্তু বলিয়া যাত্রা করিলেন।

বীরভদ্র। আপনি নীলকুঠী বেষ্টনের যেরূপ বন্দোবস্ত করিলেন, তাহা ভালই হইয়াছে। কিন্তু আমিও নিশ্চিন্ত নই,—চোরকে নজরবন্দীতে রাখিয়াছি। চারি জন বলশালী দ্বারবান্ অনুক্ষণ চোরের পাহারায় নিযুক্ত আছে। এই বীরভদ্রের নিকট হইতে চোর কিছুতেই পলাইতে পারিবে না,—সে পক্ষে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। বরং পশ্চিমে সূর্য্য উদয় হওয়া সম্ভব, তথাচ নীলকুঠী হইতে চোর পালান কিছুতেই সম্ভব নহে। চোর এই

আমার মুষ্টির ভিতরই আছে; কার সাধ্য, আমার এই বজ্রমুষ্টি ভঙ্গ করে?

দারোগা বাবু হাসিতে লাগিলেন; কহিলেন,—"সামন্ত মহাশয়! আপনি ধন্য; চোরকে যে এরূপ ভাবে রাখিয়াছেন, তাহা আমি জানিতাম না। চোর জাতি, বড়ই ধূর্ত্ত বলিয়া আমি গৃহবেষ্টনের বন্দোবস্ত আজ্ঞা দিয়াছিলাম। কিন্তু আপনার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির নিকট চোরের ধূর্ত্ততা কোথায় লাগে? বুদ্ধিতে বলুন, বিবেচনাতে বলুন, বলে এবং কৌশলে বলুন,—আপনার তুল্য ব্যক্তি এ দেশে আর কে আছেন?"

উভয়ের প্রেম এইরূপেই গাঢ়তর হইতে লাগিল। পীরিতিটী যখন গাঢ়তম হইল, তখন বীরভদ্র দারোগা বাবুকে কহিলেন, "অনুগ্রহ করিয়া নীলকুঠীতে যখন আসিয়াছেন,—রাতও অনেক হইয়াছে,—তখন এইখানে অদ্য সকলের আহারাদি হইলেই ভাল হয় না? সকলই প্রস্তুত।—এক ঘণ্টার মধ্যে রন্ধন সমাধা হইবে।"

দারোগা। আপনি যখন বলিতেছেন, তখন আর আহারের বাধা কি আছে? কিন্তু ফরিয়াদীর গৃহে আহার করিতে, কেহ কেহ নিষেধ করিয়া থাকেন। তবে কি জানেন, আপনি অতি ভদ্র লোক; আপনার কথা লঙ্ঘন করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ।

বীরভদ্র। ফরিয়াদি আমি হইব না, এবং আমি হইলেও কোন দোষ ছিল না। আমি অদ্য সাক্ষী মাত্র। বিশেষতঃ মোহরের ত মালিক আমি নই।—মোহরের মালিক আমার মনিব; খাওয়াইতেছি আমি;—সাক্ষীর বাড়ী খাইলে কিছু দোষ আছে কি?

দারোগা। কিছুই নাই। দোষ থাকা দূরে থাকুক, বরং

খাওয়াই একান্ত কর্ত্তব্য। কারণ, সাক্ষীর সহিত একত্র আহার করিতে করিতে কথাচ্ছলে অনেক গুহ্য তত্ত্ব বাহির হইবার সম্ভাবনা। একবার কেন,—আপনার সঙ্গে আমি একশত বার খাইতে পারি। আপনি হইলেন—এদেশের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি। প্রত্যহ যে খাইতেছি, সে আপনারই খাইতেছি বলিলে দোষ হয় না। সে কথা যাউক।—তবে ফরিয়াদি হইতেছেন কে?

বীরভদ্র। খাজাঞ্জি মহাশয়,—যাঁহার জেম্মায় মোহর থাকে।

দারোগা। তিনি বেশ চতুর লোক ত? খাজাঞ্চি এজেহারে যদি গোল করেন, তবে সব মাটী হইবে। তাঁহাকে উপযুক্তরূপ শিখাইয়া রাখা হইয়াছে ত?

বীরভদ্র। না। কিন্তু তিনি সমস্ত ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। আর যাহা কিছু শিখাইতে হইবে, আপনার সহিত যুক্তিমত তাঁহাকে শিখাইব মনে করিয়াছি।

দারোগা। আচ্ছা, আচ্ছা, ভাল কাজই করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে শিখাইয়া লইব। তাহার পর, তিনি আমার নিকট এজেহার দিবেন। অন্যান্য সাক্ষীকেও শিখান চাই। আহারের পূর্ব্বে সকলকে ডাকিয়া একত্র বা একে একে শিক্ষা দিব। শিক্ষা পাইয়া যখন তাহারা পরিপক্ক হইবে, তখন একে একে তাহাদের এজেহার লিখিয়া লইব। ঘটনা সত্য হইলেও, আদালতে সেই সত্য বিষয়ের সাক্ষী দেওয়া বড় কঠিন কার্য্য। মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া বরং সহজ; কিন্তু সত্য সাক্ষী দেওয়া বড় কঠিন।

দারোগা বাবুর জন্য গড়গড়া আসিয়া পঁহুছিল। চেয়ারে উপবিষ্ট দারোগা বাবু ধূমপান করিতে লাগিলেন। তাম্রকূট-নেশায়

ভোর হইয়া কহিলেন,—"চোরকে আমি দেখিব,—চোরকে লইয়া আসুন। আচ্ছা সামন্ত মহাশয়! চোরকে এখনও কেন জীবিত রাখিয়াছেন?—কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করেন নাই কেন? নীলকুঠীতে মোহর-চুরি!—কার ঘাড়ে এমন দু'টো মাথা আছে যে, এ কর্ম্ম করিতে সে সাহসী হইতে পারে?

বীরভদ্র। মার-ধর বেশী করা হয় নাই। প্রথম প্রহারেই সে মূর্চ্ছিত হইয়াছিল। বহুকষ্টে তাহাকে চেতন করি। তার পর মাগুর মাছের ঝোল ও মাংসের ঝোল খাওয়াইয়া, তাহার দেহে বল-সঞ্চার করিয়াছি।

দারোগা। আমার চোর দেখিতে বড় কৌতূহল জন্মিয়াছে। শীঘ্র তাহাকে আনিতে বলুন।

বীরভদ্র,—ভৃত্যবর্গকে প্রথমে একখানি চেয়ার আনিতে বলিলেন।

দারোগা। চোরের আবার চেয়ার কেন? সে বোধ হয় বহুরূপী;—আপনাদিগকে সে ভুলাইয়াছে।

বীরভদ্র। সেরূপ চোর নহে,—এ চোর বড় ক্ষীণজীবী।

দারোগা বাবু হাসিয়া কহিলেন,—"এ চোর অনেক মায়া জানে।"

দেখিতে দেখিতে নূতন বসন পরিধান করিয়া উজ্জ্বল শাল গায়ে দিয়া, চোর আসিয়া চেয়ারে উপবেশন করিল। দারোগা বাবু তাহাকে যত কথা জিজ্ঞাসা করেন, চোর কোন কথার উত্তর দেয় না। কখন ভয় দেখাইয়া, কখন ভালবাসা দেখাইয়া, কখন কাকুতি-মিনতি করিয়া, চোরকে একটীমাত্র কথা কহাইবার জন্য দারোগা বাবু কত চেষ্টা করিলেন; কিন্তু দুরন্ত চোর তথাপি

উত্তর দিল না। চোরের কেবল নয়নদ্বয় হইতে ঝর ঝর জল ঝরিতে লাগিল। দারোগা বাবু শেষে কহিলেন, "এ চোর বটে, কিন্তু মায়াবী চোর,—কোন্ ছলে আপনাকে ভুলাইতে আসিয়াছে, বলিতে পারি না। এরূপ দুর্জ্জয় অভেদ্য চোর আমি কখন দেখি নাই।"

বীরভদ্র বিকটরবে, অষ্টক্রোশী কণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। দারোগা বাবুর কিরীচ ঝন্ ঝন্ নিনাদ করিল। চৌকিদারগণের চীৎকারে গগন ফাটিল। কৃষ্ণপক্ষের ঘোরা রজনী আরও ঘোরতরা হইল। বিদ্যুৎ চমকিল। গুরু গুরু মেঘ গর্জ্জিল। বালক রমা-প্রসাদ কিন্তু কিছুই শুনিতে পাইল না, কিছুই দেখিতে পাইল না, তাহার অবনী আজ সত্য সত্যই নীরব। রমাপ্রসাদের কণ্ঠ নীরব। অন্তর নীরব। অবনী নীরব।—তাহার এই বিশ্ব-সংসার,—এই চতুর্দ্দশ ভুবন আজ নীরবতায় পরিপূর্ণ।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি প্রায় এক প্রহর। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী। আকাশে মেঘ দেখা দিয়াছে। মাঝে মাঝে টিপি টিপি জলও পড়িতেছে। মেঘ-মহারাজের কোলে বসিয়া, সৌদামিনী-মহারাণী মধ্যে মধ্যে ঈষৎ হাসিতেছেন।

পৃথিবী মেঘরূপ মোটা কালো থানকাপড়ে আবৃত হইলেও শীত খুব। পৌষের কন্‌ক'নে শীত ;—ঘরের বাহির হয় সাধ্য কার! জগৎ বরফবৎ ঠাণ্ডা হইয়াছে। অদ্য গরম গরম ভুনী-

খিচুরী আহারের পর, আঁচাইবার সময়ই বিপদ্। কেহ কেহ আঁচাইবার ভয়ে বোধ হয়, আহার বন্ধ করিয়া থাকিবেন। অদ্য-কার ব্যাপারটী এমনি।

রাত্রি ত এক প্রহর অতীত হইতে চলিল; পল্লীগ্রামে এত শীতে কে আর জাগিয়া আছে বল? লেপ ঢাকা দিয়া, বালাপোষ মুড়ি দিয়া—কেহ বা লেপের উপর লেপ, কম্বলের উপর কম্বল চাপাইয়া নিদ্রা যাইতেছেন। তবে কবিগণ কহেন, প্রেমময়-প্রেম-ময়ীর এবং চোর-দস্যুর জাগিয়া থাকিবার ইহাই মাহেন্দ্রক্ষণ। এত শীতে ইহাঁরা জাগিয়া থাকেন কিনা আমি জানি না, এবং জাগিয়া থাকিলেও, ইহাঁদের ব্যবসা-বৃত্তি স্বচ্ছন্দে চলে কিনা, তাহাও বুঝি না। শোনা কথা লিখিলাম।

পল্লীগ্রামের অবনী এখন নীরব। শিয়াল সে সময় ডাকিয়া-ছিল কি না, কেমন করিয়া ঠিক বলিব? কিন্তু এমন শুনিয়াছি, শিয়ালদের ঘুম কিছু কম। সেই জন্য মানুষ এবং অন্যান্য পশু নিদ্রিত হইলেও, অর্থাৎ পল্লীগ্রামের অবনী নীরব হইলেও, এই স্থলে, চির প্রথানুযায়ী লিখিতে হইবে যে, শিয়াল ডাকিতেছে। ঐ কারণে আরও লিখিতেছি, কাল-পেঁচা ডাকিতেছে। বায়ু শন্ শন্ বহিতেছে। বৃক্ষগণ হেলিয়া-দুলিয়া একরূপ শব্দ করিতেছে। ঝিঁঝি-পোকা ঝিঁঝি করিতেছে। বৃক্ষপত্রে বৃষ্টিপতন-ধ্বনি শ্রুত হইতেছে। চৌকিদার হাঁকিতেছে। একটী আফিং-খোর বৃদ্ধ বালাপোষ গায়ে দিয়া আগুণ পোহাইতেছে, এবং তামাক সাজিয়া নলে কলিকা দিয়া গড়-গড় শব্দে হুকা টানিতেছে। একটী শিশু নিদ্রিত জননীর স্তন্যপান করিবে বলিয়া, করুণস্বরে কাঁদিতেছে। ইহার উপর মাঝে মাঝে মেঘ গর্জ্জন করিতেছে।

অবনী কিন্তু নীরব! হাতী মাড়াইলেও, অবনীর সংজ্ঞা হয় কিনা সন্দেহ!

অবনী নীরব হইলেও নীলকুঠীতে মহাধূম,—মহাসমারোহ-ব্যাপার! নীলকুঠীর চারিদিক্‌ আলোকময়। দপ্‌দপ্‌ মশাল জ্বলিতেছে। প্রায় এক শত চৌকিদার কোমর বাঁধিয়া, নীলকুঠীর চারিদিক্‌ বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান। এখানেও নীরব অবনী। চৌকিদারগণ কেবল 'আয় রে', 'গেল রে', 'ধর রে' বলিয়া হাঁকা-হাঁকি চেঁচা-চেঁচি করিতেছে, এবং মধ্যে মধ্যে আপনা-আপনি ঝগড়া করিয়া মারামারির উদ্‌যোগ করিতেছে।

নীলকুঠীর অভ্যন্তর-প্রদেশেও নীরব অবনী। কেবল দারোগা বাবুর আহারের জন্য পাঁঠা রশুই হইতেছে;—লুচি ভাজিবার যোগাড় হইতেছে। পাচক ব্রাহ্মণ অতিরিক্ত গাঁজা পায় নাই বলিয়া, অন্যান্য বাজে লোকের সাক্ষাতে মধ্যে মধ্যে ক্রোধভরে বিকট চীৎকার করিয়া উঠিতেছে; বলিতেছে,—"আমি কালই এ চাকরি ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইব।"

যে স্থলে দারোগা বাবু জাল-কিরীচ ঝুলাইয়া স-সাজে চেয়ারে উপবিষ্ট এবং প্রকাণ্ডকায় কৃষ্ণবর্ণ বীরভদ্র কালো বালাপোষ গায়ে দিয়া দারোগার দক্ষিণে চৌকির উপর সমাসীন, সেখানেও অবনী কিঞ্চিৎ নীরব। লোকে জানিত, বীরভদ্রের গলা চার-কুশী; কিন্তু অদ্য তাহা আটকুশী হইয়াছে। সে হিঃ-হিঃ বিকট হাস্যে কখন যেন পাহাড় খসিয়া পড়িতেছে, কখন বা ক্রোধান্বিত কণ্ঠ-স্বরে ভূ কম্পিত হইতেছে, কখন বা অস্ত্রের ঝনঝনা শব্দ, লাঠীর ঠক্‌ ঠক্‌ রবের সহিত মিলিত হইয়া, দুর্ব্বলচিত্তে ভীতি উৎপাদন করিতেছে। হইতেছে সব, ঘটিতেছেও সব,—অবনী কিন্তু নীরব

অবনীর নীরবতা সর্ব্ববাদিসম্মত কিনা, জানিনা। কিন্তু একটী ফুটফুটে গৌরবর্ণ সপ্তদশবর্ষীয় বালক বা যুবক নিশ্চয় যে নীরব, ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। যুবকের পরিধানে শুভ্রবসন। গায়ে শুভ্র আংরাখা। তদুপরি শাল। পায়ে নূতন জুতা।

বিবাহের বর নাকি? এ কি বিবাহযাত্রার উদ্‌যোগ হইতেছে? পুলিস কি সঙ্গে সঙ্গে শান্তি-রক্ষার্থ যাইবে?

বর হইলেই নীরব হইতে হয়। চোর হইলেও অনেক সময় নীরব থাকিতে হয়। যুবক বর না চোর? যুবক বরও নহে, চোরও নহে,—অথচ যুবক নীরব।

নীরব হউক, যুবকের চক্ষু দিয়া জল পড়ে কেন? জল পড়ুক, কোন কথা জিজ্ঞাসিলে,—সাধ্য-সাধনা করিলেও, যুবক উত্তর দেয় না কেন? কাঁদিতে নিষেধ করিলে চোখের জলপড়া বৃদ্ধি হয় কেন? যুবক কি বহুরূপী?—না মায়াবী?

যুবক ত আমাদের সেই রমাপ্রসাদ নয়? মুখের চেহারা সেই রকম বটে। কিন্তু এরূপ ভাল কাপড় পাইল কোথায়?—শাল পাইল কোথায়? মোহর-চোরকে নববস্ত্র দিয়া কে পূজা করিল? কে তাহাকে এরূপ উত্তম চেয়ারে বসাইয়া অভ্যর্থনা করিল? যুবক যদি কথা কহিত, তাহা হইলে কণ্ঠস্বর শুনিয়া নিশ্চয় করিয়া বলিতাম, যুবক রমাপ্রসাদ কিনা?

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

যামিনী ঘোরা। দারোগা বাবুর আহার—উৎসব,—সমারোহে, আহ্লাদে সমাপ্ত হইল। পৌষের রাত্রি বুঝি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। শ্রীমতী নীলকুঠীর কিন্তু নিদ্রা নাই। আলোক-ফুলে কবরী বাঁধিয়া, আলোক-মালায় বক্ষ বিভূষিত করিয়া, আলোক-মেখলায় নিতম্ব বিভাসিত করিয়া হে নীলকুঠীসুন্দরি! তুমি আজ মধুর অধরে এত মৃদু মৃদু হাসিতেছ কেন? এত উল্লাসিত কেন? এত উৎফুল্ল-হৃদয় কেন? সংসার-রঙ্গভূমে মানব মহানাটকের মহা-অভিনয় দেখিয়া, তোমার কি এতই প্রীতি পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে? সুন্দরি! উত্তমরূপে দেখ, এবং হাস। হাস্য রসের শেষ আছে কি না সন্দেহ!

খাজাঞ্চি মহাশয়, দারোগা বাবুর নিকট এজাহার দিতেছেন;—"থালে মোহর ঢালার পর, রমাপ্রসাদ থালার নিকট আসিয়া বসিল। বসিয়া এদিক্-ওদিক্ চাহিতে লাগিল। আমার মনে কেমন সন্দেহ জন্মিল।

দারোগা। কিসে তোমার সন্দেহ জন্মিল?

খাজাঞ্চি। রমাপ্রসাদের চঞ্চল চাহনি দেখিয়া এবং মুখের ভাব দেখিয়া।

দারোগা। মুখের ভাব কিরূপ দেখিলে?

খাজাঞ্চি। মুখের ভাব—চোর-চোর।

দারোগা। আচ্ছা, তবে বলিয়া যাও।

খাজাঞ্চি। যতবার আমি রমাপ্রসাদের মুখের দিকে চাহিয়াছি, ততবার উহার সহিত চোকো-চোকি হইয়াছে। শেষে স্থির করিলাম—উহার সহিত আর চোকো-চোকি করা হইবে না,—অথচ

ও ব্যক্তি কি করে, তাহা বক্র দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে। রমাপ্রসাদ যখন দুই তিন বার আমার দিকে চাহিয়া দেখিল যে, আমি উহার পানে চাহি নাই,—তখন সে আস্তে আস্তে তাহার হাত বাহির করিয়া, থালা হইতে একটী মোহর হস্ত দ্বারা তুলিয়া লইল।

দারোগা। কোন্ হাতে করিয়া মোহর লইয়াছিল?

খাজাঞ্চি। ডান হাতে।

দারোগা। রমাপ্রসাদ, মোহর চুরী করিবার সময় ডান হাতের কোন্ কোন্ আঙুলের দ্বারা মোহর ধরিয়াছিল, তাহা তোমার স্মরণ আছে কি?

খাজাঞ্চি। ভাল স্মরণ নাই,—তবে বোধ হয়, বৃদ্ধাঙ্গুলি তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা মোহর উঠাইয়া লইয়াছিল।

দারোগা। বালক তখন কোন্ মুখে বসিয়াছিল?

খাজাঞ্চি। পূর্ব্বমুখে।

দারোগা। আপনি তখন কোন্ মুখে ছিলেন?

খাজাঞ্চি। পশ্চিমমুখে।

দারোগা। মোহর লইয়া রমাপ্রসাদ কি করিল?

খাজাঞ্চি। মোহর কিছুক্ষণ মুঠার ভিতর রাখিল। তার পর মুঠা কাপড়ের নিকট লইয়া গেল। কোঁচার কাপড়ের কাছে হাত রাখিয়া অতি কৌশলে, সন্তর্পণে, অন্যে দেখিতে না পায়—এই ভাবে, ঠিক যেন বাজীকরের ন্যায়, সেই এক ডান হাত দ্বারাই, কোঁচার খুঁটে মোহরটী বাঁধিয়া ফেলিল। বাঁধার অল্পক্ষণ পরেই কোঁচার খুট পেট-কাপড়ে গুঁজিয়া রাখিল।

দারোগা। এই ব্যাপার দেখিয়া আপনি কি করিলেন?

খাজাঞ্চি। আমি কিছুই করি নাই। প্রথমে এই কাণ্ড

দেখিয়া, আমার গা কেমন শিহরিয়া উঠিল। আমি কেমন একটু স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম!

দারোগা। এ বড় আশ্চর্য্য কথা শুনিতেছি! আপনার তহবিলের মোহর চুরি গেল, চোরকে মোহর চুরি করিতে আপনি স্বচক্ষে দেখিলেন;—মোহরটী কোঁচার খুটে বাঁধিয়া, পেট-কাপড়ে রাখিতেও, আপনি স্বচক্ষে দেখিলেন। আপনার মোহর অপহৃত হইল, অথচ আপনি চুপ করিয়া রহিলেন কেন?—চোর চোর বলিয়া চেঁচাইলেন না কেন? তৎক্ষণাৎ উহার নিকট হইতে মোহর কাড়িয়া লইলেন না কেন? গাত্র-শিহরণ ও স্তম্ভন যখন দূর হইল, তখনই বা এসব কাজ করিলেন না কেন?

খাজাঞ্চি। হুজুর! যদি সত্যকথা বলিতে দেন তবে বলি, আমি সত্য বই কখন মিথ্যা জানিনা। চুরি হইবার পর আমি চুপ করিয়াই ছিলাম, ইহা সত্য। আমি ভাবিলাম, চোর ত আমাদের মুঠার ভিতর;—পলাইবে কোথা? এখন চেঁচাচেঁচি করিয়া কথা ফাস করি কেন? দেখি না, চোর আরও মোহর চুরি করে কিনা? দেখি না, চোরের দৌড় কত? হুজুর! এই জন্যই আমি চুপ করিয়াছিলাম।

দারোগা। কিন্তু আদালতে এ কথা বিশ্বাস করিবে কি না সন্দেহ।

খাজাঞ্চি। বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, আমি সত্য বই মিথ্যা জানিনা। আমার চৌদ্দ-পুরুষ কখন মিথ্যা কথা কয় নাই। আমাকে লাক টাকা গণিয়া দিলেও, আমি মিথ্যা কহিব না। আমি যাহা জানি, ঠিক তাহাই বলিলাম, ইহাতে আদালত বিশ্বাস করিতে হয় করুন—না করেন না করুন।

দারোগা। তা ত বটেই; আমিও সত্য কথার বিশেষ পক্ষপাতী। সত্য কথা বলিতেই আমি সকলকে সদাই উপদেশ দিয়া থাকি। সত্য-ধর্ম্ম পালনই আমার মহাব্রত। সদা সত্য কথা কহিলে স্বর্গে গতি হয়,—ইহা আমার পিতামহ মৃত্যুকালে বলিয়া গিয়াছিলেন। তুমি নির্ভয়ে সত্য কথা বলিয়া যাও,—পাপী, দুরাচার চোর,—তাহাতে খালাস পাউক, আর দণ্ডিত হউক, তাহাতে তুমি কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করিও না। আর বিচারক যদি বিচক্ষণ-বুদ্ধি হন, তাহা হইলে তোমার এই সত্য কথা শুনিয়াই, তিনি তৎক্ষণাৎ রমাপ্রসাদকে কারাগারে পাঠাইবেন। কারণ, তোমার সত্য কথার সামঞ্জস্য বেশ আছে।

খাজাঞ্চি। সামঞ্জস্য থাকুক, আর না থাকুক, আমি সত্য কথা বলিব। যদি পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উদয় হয়, তাহা হইলেও, সত্য-পথ হইতে আমি স্খলিতপদ হইব না। মিথ্যা কথা বলিবার কালে, আমার বুক কে যেন চাপিয়া ধরে, কণ্ঠ যেন রোধ হইয়া যায়। মিথ্যা আমি জানিও না বলিও না।

দারোগা। আচ্ছা, তার পর কি হইল?—বালক কি আরও মোহর চুরি করিয়াছিল?

খাজাঞ্চি। না, আমি সত্য কথা বলিব। বালকের নামে বৃথা অপবাদ দিব না। আমি ত বলিতে পারিতাম, বালক আরও পাঁচটা মোহর চুরি করিয়াছিল! কিন্তু তাহা যখন প্রকৃত ঘটনা নয়, তখন আমি কিছুতেই বলিব না, আপনি আমাকে মারিয়া খুন করিয়া ফেলুন, তথাচ আমি সে কথা বলিব না।

দারোগা। এতক্ষণে বুঝিলাম, তুমি প্রকৃত সাধু ব্যক্তি বটে। তার পর কি হইল?

খাজাঞ্চি। যখন দেখিলাম, বালক আর মোহর চুরি করিল না,—একটী মোহর লইয়াই ক্ষান্ত আছে, তখন নায়েব-দেওয়ানজী মহাশয়কে বলিলাম,—"এই ব্যক্তি আমার মোহর চুরি করিয়াছে।"

তখন নায়েব-দেওয়ানজী মহাশয় রমাপ্রসাদকে মিষ্ট ভৎর্সনা করিয়া, তাহার কোঁচার খুঁট হইতে মোহর বাহির করিয়া লইলেন।

দারোগা মহাশয় শেষে জিজ্ঞাসিলেন,—"মোহর চুরি করিবার সময় কে কে সেখানে ছিল, বেলা তখন কয়টা এবং রমাপ্রসাদ কখনই বা নীলকুঠী-গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল?"

খাজাঞ্চি তাহার যথাযথ উত্তর দিলেন। দারোগা কহিলেন,—"খাজাঞ্চি মহাশয়! এইবার তুমি আপনার এজেহারের নিম্নে সই কর।"

ধার্ম্মিক খাজাঞ্চি, ধার্ম্মিক দারোগার কথায় সেই ধর্ম্মময় পত্রে ধর্ম্ম-সই করিলেন।!

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

দারোগা,—বীরভদ্রকে কহিলেন,—"আপনি প্রথম সাক্ষী হউন।" বীরভদ্র উত্তর দিলেন,—"না। আগে অন্যান্য কর্ম্মচারী দ্বারা সাক্ষ্য দেওয়াইব। তাহাতে যদি প্রমাণ না হয়, তবে মনিবের মঙ্গলার্থ আমি স্বয়ং সাক্ষী দিব।"

দারোগা জনান্তিকে বীরভদ্রকে কহিলেন,—"অন্যান্য সাক্ষী খাজাঞ্চির ন্যায় পাকা লোক হইবে ত? আমি যেরূপ গোপনে শিক্ষা দিয়াছি, তদনুযায়ী বলিতে সক্ষম হইবে ত?"

বীরভদ্র। সক্ষম হওয়াই সম্ভব।

তখন এক দীর্ঘাকার, একহারা ব্রাহ্মণ দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিল —"সাক্ষী দিবার আবার ভাবনা কি? আমি চুরির সব দেখিয়াছি এবং জানি।"

দারোগা বাবু তাঁহাকে সম্মুখে পাইয়া বলিলেন,—"তুমি যখন চুরির সব জান, তখন তুমি প্রথম সাক্ষী হইবে। এখন এজাহার দাও,—বল, তোমার নাম কি?"

সাক্ষী। আমার নাম গোপাল।

দারোগা ঠিক করিয়া বল,—তোমার নাম কি শুধু গোপাল?

সাক্ষী। শুধু গোপাল নহে ত কি দুধু গোপাল?

বীরভদ্র। ভাল করিয়া সমজিয়া বল। কি গোপাল,—বুঝিয়া বল।

সাক্ষী। বুঝে সুঝে এ সোজা কথাটা আর কি বলিব? আমি জয়গোপালও নই, আর রামগোপালও নই,—কৃষ্ণগোপালও নই, নাড়ুগোপাল নই,—যদুগোপালও নই, তেলগোপালও নই,—আমি কেবল গোপাল।

বীরভদ্র। তোমাকে সে কথা জিজ্ঞাসা হচ্ছে না;—তুমি বাঁড়ুয্যে—মুখুয্যে, না,—চাটুয্যে—তাহাই খুলিয়া বল না!

সাক্ষী। আমি বাঁড়ুয্যে নই, মুখুয্যেও নই, চাটুয্যেও নই,—আমি গোপাল ভট্‌চায।

দারোগা। (জনান্তিকে বীরভদ্রের প্রতি) এ ব্যক্তি দ্বারা সাক্ষ্য দেওয়ান চলিবে না। অন্য সাক্ষী ডাকুন।

গোপাল ভট্টাচার্য্য একথা শুনিতে পাইয়া বক্ষঃ স্ফীত করিয়া, সোজা হইয়া, একটু খুঁড়াইয়া দাঁড়াইলেন। বাহু নাড়িয়া বলিলেন,

—কি ব'ল্লেন আমি সাক্ষ্য দিতে পারিব না? আমার চেয়ে ভাল সাক্ষী কোন্ শালা আছে, একবার দিক্ দেকি! আমার তিন পুরুষ হলো ঐ কাজ;—আমি সাক্ষ্য দিতে জানি না! সেবার দাঙ্গার মোকদ্দমায় হাইকোর্ট থেকে, ফাল সাহেব এসে তিন দিন আমাকে জেরা ক'রেছিল। তবু আমার মুখ বন্ধ হয় নাই। শেষে ফাল সাহেব আপনাআপনি কাবু হয়ে আমাকে ব'লে গেলেন, 'সাবাস্ সাক্ষী!" আপনারা দুজনে কাণা-কাণি ক'রে ও কি গুজগুজ্জ-ফুসফুস্ কচ্ছেন?—আমি সাক্ষ্য দিতে পারি না?—এ কথা শুনিলে আমার রাগ হয়,—আমার নামে কলঙ্ক হয়।

বীরভদ্র দারোগাকে কহিলেন, ভট্টাচার্য্যের সাক্ষ্য দেওয়া অভ্যাস আছে বটে। আপনি উহাকে মোহর-চুরি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন না,—ও কি বলে।"

দারোগা। তুমি কি কাজ কর?

সাক্ষী। আমি বাবুর বাড়ীর সকল কাজই করি।

দারোগা। কথার উত্তর হইল না—তোমার প্রতি কি কাজের ভার নির্দ্দিষ্ট আছে বল।

সাক্ষী। তা আমি জানি না। ভার-টার আমি কিছুই বুঝি না;—যখন যে কাজ পড়ে, তখন সেই কাজই করি;—আমা ছাড়া বাবুর কোন কাজই হবার যো নাই। আমি যা করি, তাই হয়।

দারোগা। (কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া) এই যে বাবুর ঘোড়ার ঘাস কাটিতে হয়, সে ঘাস কি তুমি কাট?

সাক্ষী। আমি বামুনের ছেলে,—ঘাস কাটিতে যাব কেন? ওসব কাজ আমার চাকরের চাকর করিয়া থাকে।

দারোগা। তবে তুমি কোন্ কাজ কর?

সাক্ষী। আমি বাবুর কাছে ব'সে থাকি। বাবুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কই——

দারোগা। বসিয়া থাকিয়া কি কর ?

সাক্ষী। ক'রব আর কি ?

দারোগা। তবু কি, কিছুই কর না ?

সাক্ষী। হাঁ কিছু কিছু করি বৈ কি। চাকর,—বাবুর অম্বুরী তামাক সাজিয়া আনিয়া দিল,—আমি ধরাইবার ছলে, আচ্ছা করিয়া তামাকটী খাইয়া, তার পর সেই কলিকা, বাবুর গুড়গুড়িতে বসাইয়া দিলাম। বাবু দু'চার টান টানিয়া ক্ষান্ত হইলেন। আমি আবার বাবুর গুড়গুড়ি হইতে কলিকা খুলিয়া লইয়া,—তামাক খাইতে আরম্ভ করিলাম। বাবুর কাছে এইত আমার কাজ। আমি কি বাবুকে ভয় করি, না সমীহ করি ?

দারোগা। তোমার পদের নাম কি ?—এখানে কেহ খাজাঞ্চি আছেন, কেহ দেওয়ান আছেন, কেহ নায়েব আছেন, কেহ ডিগ্রি-জারীর মুহুরী আছেন,—সেইরূপ তোমার ত পদের একটী-না-একটী নাম আছে ?

সাক্ষী। (ঈষৎ হাসিয়া) আমার পদের নাম—বাবুর স্থপুরিংটুংডাং।

এই কথা বলিয়া, গোপাল আপনা-আপনি অনেকটা হাসিয়া ফেলিলেন। হাসিয়া হাসিয়া বলিতে লাগিলেন,—"দারোগা মহাশয়! আপনি যে আমাকে জেরায় ঠকাবেন মনে ক'রেছেন, তা' পারবেন না। সাত দিন সাত রাত জেরা করিলেও আমাকে পাড়িতে পারিবেন না। আমি দেখ্‌তে ক্ষুদ্র মানুষটী, কিন্তু আমি সাক্ষ্য দিতে গেলে হাকিমদের ভয় হয়।"

বলিতে বলিতে এক-মুখ সরস হাসি, গোপালের দুই চোয়াল দিয়া, গড়াইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল।

দারোগা। আচ্ছা, তুমি চুরির কি জান?

সাক্ষী। চুরির সবই জানি।

দারোগা। সব কি জান, বলনা?

সাক্ষী। সবই জানি, তার কোন্‌টা বল্‌ব? কোন খান্‌টা বল্‌তে হবে, আপনি জিজ্ঞাসা করুন না? আপনি খেই ধরাইয়া না দিলে, আমি কেমন করিয়া বলিল?

দারোগা। চোরকে তুমি চিন?

সাক্ষী। চোরের সঙ্গে কি আমার এক পাঁচৌলে ঘর, না চোর আমার শালা-সম্বন্ধী,—যে চোরকে আমি চিনিয়া রাখিব? চোরেই চোর চিনে;—আমি কি চোর, তাই চোরকে চিনিব?

অদূরে রমাপ্রসাদ বসিয়াছিল। দারোগা বাবু, তাহার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সাক্ষীকে জিজ্ঞাসিলেন,—'ইনি কে?"

সাক্ষী। ইনি মানুষ।

রমাপ্রসাদের আকার-প্রকার উত্তমরূপ নিরীক্ষণ করিয়া, পুনরায় সাক্ষী কহিলেন,—"হাঁ, ইনি মানুষই ত। ইহাঁরও দুই হাত, দুই পা, দুই চক্ষু,—ঐ যে সব ঠিক্‌-ঠিক্‌ রহিয়াছে।—ইনি মানুষ নয়ত কি? (হাসিয়া) আমাকে যতই জিজ্ঞাসা করুন,—জেরায় কিছুতেই পাড়িতে পারিবেন না।"

দারোগা। সে সব কথা যাক্‌,—তোমাকে এই জিজ্ঞাসা করিতেছি, ইনি কি মোহর চুরি করিয়াছিলেন?

সাক্ষী। মোহর চুরি করা কাহাকে বলে? মোহর চুরির সময়, 'চুরি চুরি' বলিয়া একটা শব্দ উত্থিত হয় নাই যে, তদ্দ্বারা

বুঝা যাইবে, মোহর চুরি হইতেছে। তবে, এই ব্যক্তিকে এক মুঠা মোহর হাতে করিয়া, আমার সাক্ষাতে এবং অন্য সকলের সাক্ষাতে, নীরবে তুলিয়া লইতে আমি দেখিয়াছিলাম। আপনারা ধর্ম্মাবতার হাকিম;—তুলিয়া লওয়ার নাম যদি চুরি হয়, তবে উনি মোহর চুরি করিয়াছিলেন।—সে বিচার আপনারা করিবেন: (হাসিয়া) জেরায় আমাকে পাড়িতে পারিবেন না;—আমি লক্ষ সাক্ষ্য দিয়াছি।

দারোগা। তোমার বয়স কত?

সাক্ষী। আমার বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে নাকি?

দারোগা। প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দাও।

সাক্ষী। আরে আমি কি কোষ্ঠী আনিয়াছি যে, বয়স কত বলিব?—কাহার কত বয়স, কেহই ঠিক করিয়া বলিতে পারে না। ঘণ্টা, মিনিট, পল, অনুপলের তফাৎ হইবেই হইবে। তবে আন্দাজি বলিতে পারি এবং আপনিও আন্দাজে আমার বয়স ঠিক করিয়া লইতে পারেন;—সমস্তই আন্দাজি। সুতরাং এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসার আবশ্যকতা কি আছে? (হাসিয়া) জেরায় আমাকে পাড়িতে পারিবেন না,—মা কালীর বর আছে।

দারোগা। কর্ত্তা-বাবুর নিকট হইতে আপনি বেতন ক'টাকা পান?

সাক্ষী। আমি আবার বেতন পাইব কি? এক এক দিন খাজনাখানার চাবিই আমার হাতে থাকে। আমি অন্দরের ভিতর যাই;—পাঁচ হাজার টাকার গহনার বাক্স একলা লইয়া আসি;—আমার আবার মাহিনা কি? বাড়ীর মেয়েরা আমার সঙ্গে কথা কয়,—যখন যার যে জিনিষটীর দরকার, তখন তাহা আমাকে

কিনিয়া আনিয়া দিতে হয়।—আমা ভিন্ন মেয়েদের বাজার হাট হইবার যো নাই;—আমার আবার মাহিনা কি? কর্ত্তাবাবু আমাকে এত ভাল বাসেন যে, যে দিন পাঁঠা বলি হয়, সেদিন বাবু বলেন,—"ভটচায! আজি ভাল করিয়া মহাপ্রসাদ রশুঁই কর ত!" আমার আবার মাহিনা কি? আমি যা করি, তাই হয়! কর্ত্তাবাবুর সঙ্গে আমার এতই ভাব যে, আমি খারাপ রাঁধিলেও, তাঁহার বলিবার যো নাই যে, রশুঁই খারাপ হইয়াছে;—কেন না আমি রাগ করিব: সুতরাং আমার মাহিনা হইতেই পারে না। (হাসিয়া) হুঁহুঁ, যতই চেষ্টা করুন, জেরায় আমাকে পাড়িতে পারিবেন না। স্বয়ং ব্রহ্মার পুত্র পদ্মলোচন পাল আসিলেও জেরায় জব্দ করিতে আমায় সক্ষম হইবেন না। আমাকে মারিতে পারেন, কারাগারে পাঠাইতে পারেন, ফাঁসিতে দিতে পারেন; কিন্তু জেরাটীতে আমার কিছুই করিতে পারেন না।

দারোগা। বাবুর বাড়ী কি তোমাকে জল তুলিতে হয়?

সাক্ষী। (কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) এবার শক্ত জেরা দেখিতেছি। তা মিথ্যা কথা বলিব না।—যখন মা-ঠাকুরুণদের পবিত্র গঙ্গাজলের দরকার হয়, তখন এই ভট্টচায্ ভিন্ন ত অন্য কাহারও দ্বারা তাহা হইবার যো নাই। চাকরদের দ্বারা তাহা হইতে পারে না। গাড়ী করিয়া আনিবার যো নাই,—সহিস-কোচমান মুসলমান। বাবুর কাছারির পোষাক,—কাজেই জলের দিক্ দিয়া বাবুর পথ চলিবার যো নাই;—সুতরাং আমাকেই জল বহিতে হয়। আমি ব্যতীত ত বাবুর এক মুহূর্ত্ত চলে না।

দারোগা। জল কি ভাবে করিয়া বহিতে হয়?

সাক্ষী। আমি চুরি বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছি,—এ সব

সাতসতের কথা কেন ?—এ সব কথা আদালতে চলিতে পারে না—বে-আইনি কথা ;—আমি উত্তর দিতে বাধ্য নই।

দারোগা। তবে তুমি নিশ্চয় ভারে করিয়া জল আনিয়াছ।

সাক্ষী। তা আনিয়াছি, খুব করিয়াছি —তোমার কি ? আমি গোপাল ভট্চায্ ;—চা'র জেলায় আমাকে চেনে,—আমি বাবুর সুপুরি-টিংটিং,—আমি যদি ভারে করিয়া জল আনিয়া থাকি, তাহাতে আমার লাঘব কি আছে ? এই যে সেদিন শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধরিয়াছিলেন,—এই যে হনূমান্ গন্ধ-মাদন পর্ব্বত মাথায় ক'রে এনেছিলেন,—দরকার পড়্লে সব করতে হয়।—বিশেষতঃ মা-ঠাক্রুণদের জল কে না আনিতে চায় ?

দারোগা। আচ্ছা, তোমার বিবাহ কটী ?

এইবার গোপাল ভট্টাচার্য্য ক্রোধ-কম্পান্বিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"ফের যদি আপনি এইরূপ আইনের সহিত মিল না রাখিয়া আগড়ম্‌বাগড়ম কথা বলেন, তাহা হইলে আমি সব কথা প্রকাশ করিয়া দিব ;—মোহর চুরি হইয়াছে,—না হাতী চুরি হইয়াছে ; আমি মোহর চুরি দেখেছি কি না ! আমিত সন্ধ্যার পর এসেছি ; —আর তোমরা বল্‌ছ, মোহর চুরি হ'য়েছে দুপুর বেলা !— আরে আমার তুমি রে ! যা নয়, তাই কথা ! মোহর চুরির যদি আমি বিন্দুবিসর্গ জানি, ত আমায় দিব্য আছে। একটা দুধের ছেলেকে কোথেকে এনে, চোর ব'লে নাস্তা-খাস্তা করতে আরম্ভ ক'রেছে। আর আমি হয়েছি কিনা, রাজ-বাড়ীর বাঁধা সাক্ষী ;—তাই যেখানে যা হোক, নে-আয় শালা ভট্চাযকে ধ'রে।

বীরভদ্র। আরে ভট্‌চায, রাগ ক'চ্ছ কেন!—থাম, থাম।

সাক্ষী। আরে দেখুন দেখি, কোথায় চোরে মোহর চুরি কল্লে,—আর উনি কি না জিজ্ঞাসেন,—ভট্‌চাযের কটা বিয়ে।

বীরভদ্র। কাজটা বড় অন্যায় হইয়াছে।

দারোগা। (হাসিয়া) ভট্‌চায মহাশয়! রাগ কর্‌বেন্ না; কিন্তু আমি কেমন আপনাকে জেরায় হারাইয়া দিয়াছি।

সাক্ষী। (আরও ক্রুদ্ধ হইয়া) আপনার মতন দশ জন দারোগা এলে, আমাকে জেরায় জব্দ করতে পার্‌বেন না। তবে শুনুন,—বলি বিবাহের কথা,—

বীরভদ্র। থাম, ভট্‌চায থাম।

সাক্ষী। আরে, থাম্‌তে পারি কৈ? উনি যেরূপ একশ বার ঘ্যানর ঘ্যানর ক'চ্ছেন, তাতে ইচ্ছা হ'চ্ছে, এখনি বিবাহের কথাটা ব'লে ফেলি। ফেলি ব'লে—দেখুন! শেষে যে উনি দোষ দিবেন, ভট্‌চায জেরায় পাল্লে না, তা হ'বে না।

দারোগা। (ঈষৎ হাসিয়া) না ভট্‌চায মহাশয়! আপনাকে বলিতে হইবে না;—জেরায় আপনাকে কাবু করিতে পারি, আমার এমন ক্ষমতা নাই।

সাক্ষী। আপনি হাস্‌চেন কেন তবে?

এতক্ষণ অন্য সকলে টিপি টিপি হাসিতেছিল। 'হাস্‌ছেন কেন', এই কথা শুনিয়া, তখন সকলে হো হো হাসিয়া উঠিল। ভট্‌চাযের প্রতিদ্বন্দ্বী,—গদাধর পরামাণিক ছিল। সে হাসিয়া হাসিয়া ক্রমশ ভূতলে গড়াইয়া পড়িল। গড়াইয়া গড়াইয়া ক্রমশ ভট্‌চাযের দিকে যাইতে লাগিল। অনন্যোপায় ভট্টাচার্য্য তখন বিকট মধুর—বাপ্ বাপ্ রবে "নীল-কুঠীতে জ্যান্ত মাছে

পোকা পড়ে”—সঙ্গে সঙ্গে এই কথা আবৃত্তি করিতে করিতে দৌড়িয়া পলাইলেন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

হাসি থামিল। আবার অবনী নীরব হইল। আবার গাম্ভীর্য্যের ঘোর ঘনঘটা দেখা দিল। আবার কার্য্য আরম্ভ হইল। দারোগা, অন্যে না শুনিতে পায়, এমন ধীরে ধীরে, কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া, বীরভদ্রকে কহিলেন—“বেশী সাক্ষীর দরকার নাই। সাক্ষীর সংখ্যা অধিক হইলে, অনেক সময়, মোকদ্দমা হারিতে হয়। তিনটী উপযুক্ত পাকা সাক্ষী বাছিয়া স্থির করুন। তাহারা যদি ফরিয়াদীর এজেহারের সহিত ঠিক করিয়া, একভাবে জবানবন্দী দিতে পারে, তাহা হইলে জানিবেন, আমাদের মোকদ্দমায় নিশ্চয় জয় হইবে। তিনটী ভাল লোক সাক্ষী হইলেই হইল।

বীরভদ্র। তার আর ভাবনা কি? নীলকুঠীর অধিকাংশ লোকই উপযুক্ত।

একে একে তিন জন সাক্ষী আসিল। একে একে তিন জনের জবানবন্দী গৃহীত হইল। প্রত্যেক সাক্ষী কহিল,—“রমাপ্রসাদ, থালা হইতে ডান-হাতের দ্বারা, একটী মোহর তুলিয়া লয়। তার পর সে মোহর কোঁচার খুঁটে বাঁধিয়া, পেট-কাপড়ের ভিতর রাখে।—এই সেই চুরি-করা মোহর।”

দারোগা বড় আহ্লাদিত হইলেন। কহিলেন—“বস্! তিনটী

সাক্ষীতেই আমার যথেষ্ট। আর প্রয়োজন নাই। উত্তম প্রমাণ হইয়াছে।

বীরভদ্র। আর দু'একটী দ্বারা সাক্ষ্য দেওয়া হইলে ভাল হয় না কি?

দারোগা। না।—সাক্ষীর সংখ্যা অল্পই ভাল। কিন্তু অন্য এক রকমের আর একটী সাক্ষী থাকিলে মন্দ হয় না।

বীরভদ্রের সহিত দারোগার কাণে কাণে তখন কি একটী পরামর্শ হইল। বীরভদ্র তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গেলেন। একদণ্ড পরে ফিরিয়া আসিলেন। অল্পক্ষণ পরেই আর একটী সাক্ষী আসিল। সে কহিল,—"রমাপ্রসাদকে আমি চিনি। আমি ময়রা। বাতাসা, মুড়কী এবং সন্দেশ তৈয়ার করি। রমাপ্রসাদ আমার দোকানে একবার সন্দেশ চুরি করিয়া খাইয়াছিল।"

দারোগা চমকিয়া উঠিলেন,—এঁ্যা! বল কি! তোমার দোকানে চুরি হইল, তুমি থানায় খবর দাও নাই কেন?'

ময়রা। আজ্ঞে, একযোড়া সন্দেশ খাইয়াছিল, তার আর খবর দিব কি?

দারোগা। একটী সন্দেশ চুরি করা যা, এমন কি, আধখানা সন্দেশ চুরি করাও যা, একমণ সন্দেশ চুরি করাও তা।—চুরি উভয়তই। তুমি চুরির সংবাদ থানায় না দিয়া বড়ই মন্দ কর্ম্ম করিয়াছ। তুমি চোরকে প্রকারান্তরে প্রশ্রয় দিয়াছ। যে ব্যক্তি চোরকে প্রশ্রয় দেয়, আদালতে তাহার দণ্ড হয়।

ময়রা। আজ্ঞে, আমি গরীব মানুষ,—কি বলিতে কি বলিয়া

ফেলিয়াছি,—আমায় কি বলিতে হইবে, তাহা ভাল করিয়া বলিয়া দিন!

দারোগা। তুমি বলিবে, সন্দেশ খাইয়া দাম দেয় নাই।

ময়রা। এই চোর রমাপ্রসাদ আমার দোকান হইতে সন্দেশ তুলিয়া খায়। দাম চাওয়ায়, দাম না দিয়া, পলাইয়া গিয়াছিল। অদ্য রমাপ্রসাদ আমার দোকানে আসিয়া কহিল,—"তুমি রাগ করিও না,—তোমার দাম আমি শীঘ্রই দিব।" তার পর, কথায় কথায় আমাকে জিজ্ঞাসিল,—"আজ কলিকাতা হইতে নীলকুঠীতে মোহরের তোড়া আসিয়াছে নয়?" আমি বলিলাম,—"আজ হাতীতে করিয়া অনেক তোড়া আসিয়াছে। তবে মোহরের তোড়া কিনা, ঠিক বলিতে পারি না।" এই কথা শুনিবামাত্র রমাপ্রসাদ অমনি উঠিল। আমি কহিলাম,—"সন্দেশের দাম কৈ, দিলে না?" রমাপ্রসাদ কহিল,—"আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিতেছি; মোড়লবাড়ী আমার কিছু টাকা পাওনা আছে,—সেই টাকা অদ্য দিবার কড়ার আছে; আজ টাকা পাইলেই তোমার সন্দেশের দাম দিয়া যাইব।" রমাপ্রসাদের কথায় আমার সন্দেহ হইল। আমি তাহার পাছু পাছু গোপনে, তাহাকে প্রায় পঞ্চাশ হাত পথ দূরে রাখিয়া, চলিলাম। মোড়লবাড়ীর দিকে সে গেল না,—নীলকুঠীর দিকেই যাইতে লাগিল। ক্রমশ সে নীলকুঠীতে গিয়া প্রবেশ করিল। আমি ভাবিলাম, লোকটা কি মিথ্যাবাদী দেখ!—নিশ্চয়ই আজ ওর মনে কোন মন্দ মতলব আছে।

দারোগা। (জনান্তিকে বীরভদ্রকে) এরূপ পোষক প্রমাণ মন্দ হইবে না, কিন্তু আর একটু গুছাইয়া বলা দরকার। এলো-মেলো ভাবে কোন কথা বলিলে আদালতে টিকে না। যতদূর

সাধ্য, ততদূর আমি এখন কতকটা ঠিক করিয়া লিখিয়া লইলাম। আদালতে যে কটী কথা বলিতে হইবে, তাহা উহাকে পরে শিখাইয়া দিব। (একটু নীরব থাকিয়া) আচ্ছা, এ পাড়ায় এ এ ময়রা অপেক্ষা আর কোন ভাল লোক নাই কি? ময়রাকে কিঞ্চিৎ কাঁচা বলিয়া বোধ হইতেছে। পাকা লোক চাই,—পাকা লোক চাই?

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রমাপ্রসাদ এখন নীরব। কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ চেয়ারে উপবিষ্ট। তাঁহার চক্ষে পলক পড়িতেছে কি? তিনি কোন কথা শুনিতেছেন কি? শুনিতে পাইতেছেন কি? ব্যাপার দেখিতেছেন কি? বুঝিতেছেন কি?—না, তাঁহার চক্ষু অন্ধ হইয়াছে, কর্ণ বধির হইয়াছে, কণ্ঠ রোধ হইয়াছে?—তিনি কি মূক? তাঁহার মাথার উপর দিয়া এত যে, প্রলয়-ঝড় বহিয়া যাইতেছে, তথাপি তিনি এত ধীর, স্থির কেন? ধ্যানমগ্ন যোগীর ন্যায় নিশ্চল নির্ব্বিকার কেন?

দারোগা, সাক্ষীর জবানবন্দী শেষ করিয়া, রমাপ্রসাদের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া, পুনরায় কহিলেন,—"তোমার যদি কিছু বক্তব্য থাকে, তবে এখনও বল। চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে কেন? এবং এরূপ স্থলে চুপ করিয়া থাকিতেও নাই। চুপ করিয়া থাকিলে তোমারই ক্ষতি! তোমার উপর চুরির গুরুতর অভি-যোগ। ফরিয়াদির এজেহারে এবং সাক্ষিগণের জবানবন্দীতে তুমি চোর বলিয়া প্রমাণিত হইতেছ। যদি তুমি সত্য সত্যই

চুরি করিয়া থাক, তাহা হইলে সে কথা বলিয়া ফেল। সত্য কথা বলিলে, তোমার পক্ষেই মঙ্গল। দণ্ড কম হইতে পারে;—এমন কি, নাও হইতে পারে। তুমি যদি ডেপুটী বাবুকে একটু কাঁদিয়া কাঁদিয়া বুঝাইয়া বল,—"আমি ছেলে মানুষ, বুঝিতে পারি নাই,—মোহরের লোভ সামলাইতে পারি নাই, তাই একটী মোহর চুরি করিয়াছিলাম।" তাহা হইলে, ডেপুটী বাবু দয়াপরবশ হইয়া, তোমাকে খালাস দিতে পারেন। বড় জোর না হয়, দু'টাকা জরিমানা করিবেন। ভয় নাই, তুমি সত্য কথা বল,—সে দু'টাকা না হয় আমি আপন পকেট হইতে দিব। ভয় কি? আর তুমিত নিতান্ত ছেলে মানুষ নও;—সত্য কথা বলিলে পুণ্য হয়, মিথ্যা কথায় মহাপাপ;—এ সবও ত তুমি জান। সত্য কথা বলিলে ভগবান্ প্রসন্ন হন,—এমন কি, ডেপুটী বাবুর খালাস দিবার ইচ্ছা না থাকিলেও, ভগবান প্রসন্ন হইয়া, তোমাকে খালাস দিতে পারেন। তাই বলিতেছি, তুমি কদাচ সত্য পথ ছাড়িও না। আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর। আমি তোমার পরম সুহৃৎ। —আমাকে পর ভাবিও না। আমি যা বলিতেছি, তোমার মঙ্গলের জন্যই বলিতেছি। অতএব বল,—আমি মোহর চুরি করিয়াছি।"

বালক তথাচ নীরব রহিল।

দারোগা। দেখ, তুমি নিতান্তই ছেলে-মানুষ। সত্য কথা বলিয়া আত্মপ্রাণ রক্ষা কর,—আমার উপদেশ শুন। কেন মিথ্যা কথা বলিয়া মারা যাইবে? এরূপ প্রমাণের উপর তোমার অব্যাহতি পাইবার ত কোন উপায় নাই। সত্য কথা বল, হাকিমের দয়া হইবে,—তিনি তৎক্ষণাৎ তোমাকে ছাড়িয়া দিবেন।

বালক তথাপি কোন বাঙ্নিষ্পত্তি করিল না।

দারোগা। আচ্ছা কথা কহিতে যদি তোমার লজ্জাবোধ হয়, সর্ব্বলোকের সাক্ষাতে 'আমি চোর' এ কথা বলিতে যদি তোমার সরম লাগে, তাহা হইলে দোয়াত কলম কাগজ সম্মুখে দিতেছি,—তুমি কিরূপ ভাবে চুরি করিয়াছিলে, তাহা লিখিয়া সহি করিয়া দাও।

রমাপ্রসাদ দোয়াত-কলম-কাগজ কিছুই স্পর্শ করিলেন না,—যেমন ছিলেন তেমনিই রহিলেন।

দারোগা। তোমাকে ত বড় নির্ব্বোধ দেখিতেছি! তুমি আপনাআপনি আপনাকে চোর বলিয়া ধরা দিতেছ। 'তুমি কি চোর'?—এ প্রশ্নের উত্তর—'হাঁ' কি 'না' সকল আসামীই দিয়া থাকে। তুমি যখন কোন উত্তর দিতে সক্ষম হইতেছ না, তখন আদালত নিশ্চয়ই তোমাকে চোর বলিয়া ধরিয়া লইবে। অতএব, এরূপ নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ কখন করিও না। তুমি যদি চুরি না করিয়া থাক, ত স্পষ্টত বল না যে 'চুরি করি নাই!' আচ্ছা বল, শীঘ্র বল, বিলম্ব করিও না,—'চুরি করি নাই'।

রমাপ্রসাদ তথাচ নীরব।

দারোগা। দেখ, আমি অনেক দুষ্ট, সয়তান লোক দেখিয়াছি; কিন্তু তোমার মত তেঁদড় ছেলে আমি কখন দেখি নাই। চুরি করিয়া থাক, বল যে, 'চুরি করিয়াছি', আর যদি না করিয়া থাক ত, বল যে, চুরি করি নাই।'—এরূপ চুপ করিয়া থাকিলে আর চলিবে না—এ তামাসাও নয় মস্করাও নয়! তুমি দোষী কি নির্দ্দোষ—এ উভয় প্রশ্নের মধ্যে একটা উত্তর দিতেই হইবে। তুমি যদি উত্তর না দাও, তাহা হইলে আমার হাতের এক চড়ে তোমাকে সর্ষের ফুল দেখাইয়া দিব! বল, বল্‌ছি—

এই কথা বলিয়া দারোগা বাবু রমাপ্রসাদের মুখপানে চাহিলেন। দেখিলেন, রমাপ্রসাদ পূর্ব্বভাবেই অবস্থিত।

ভৎর্সনা বিফল দেখিয়া, দারোগা বাবু সক্রোধে কহিলেন,—“নিয়ে আয় ত রে, হাতুড়িটে;—ছোঁড়াটার সুমুখের দাঁতগুলো ভেঙ্গে ফেলে দিই।”

হাতুড়ি আসিয়া পঁহুছিল। বালক পূর্ব্বমত নীরব।

বারংবার বালক কর্ত্তৃক এইরূপ উপেক্ষিত হইয়া দারোগা বাবুর ক্রোধানল জ্বলিয়া উঠিল।—“হারামজাদ! পাজী বুজরুক! তুই জানিস্, আমার নাম রাম সিং দারোগা!—আমার ভয়ে বাঘে-বলদে এক-ঘাটে জল খায়!—আমি যদি তোকে দু'আধ-খানা করিয়া কাটিয়া ফেলি, তাহা হইলে তোকে এখানে রক্ষা করিবার কেউ নাই! ফের যদি চালাকি করিস্,—কথা না কহিস্, তাহা হইলে আমার এই দক্ষিণ হস্তের এক চড়ে তোকে সত্য-সত্যই যমালয়ে পাঠাইব। যদি যমপুরী যাইবার তোর সাধ না থাকে, তবে এখনও বল্‌ছি,—কথা ক।”

বালক নীরব।

তখন ক্রোধান্ধ দারোগা দৃঢ় দক্ষিণ হস্তে এক চড় উত্তোলন করিলেন।

বীরভদ্র ব্যাপার বিপরীত দেখিয়া, ধীরে দারোগার দক্ষিণ হস্ত ধারণপূর্ব্বক কহিলেন,—“আপনি ক্ষান্ত হউন। আমার কথা শুনুন। চুরির পর এরূপ পরীক্ষা কতক কতক হইয়াছিল। কিন্তু তখন এ ব্যক্তি কিছুতেই কথা কয় নাই। আমি চড় ছাড়া অনেকরূপ আরও কঠিন কঠিন প্রক্রিয়া করিয়াছিলাম, তথাপি এ ব্যক্তি কথা কয় নাই। শেষে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে লুটাইয়া

পড়িল; কেহ কেহ ভাবিল, বুঝি প্রাণে মরিল। তথাচ এই বিকার-প্রাপ্ত ব্যক্তি কথা কয় নাই। উহাকে চড়ই মার, দাঁতই ভাঙ্গিয়া দাও, আর শূলেই চাপাও,—ও কথা কহিবে না,—ও তেমন চোর নয়! তাই বলিতেছি, আপনি ক্ষান্ত হউন।”

দারোগা। আপনার কথা আমি লঙ্ঘন করিতে পারি না, কিন্তু অদ্য এই একচড়ে বাছাধনকে কথা কওয়াইয়া ছাড়িতাম!

বীরভদ্র। আপনার এক চড়ে রামপ্রসাদ কথা কহুক আর না কহুক,—মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইত, ইহা নিশ্চয়! আমি পূর্ব্বে একবার ইহার মূর্চ্ছা ভাঙ্গাইবার জন্য বহু কষ্ট পাইয়াছিলাম। শেষে মাগুর মাছের ঝোল ও পাঁঠার ঝোল দিয়া ইহাকে সবল করিয়াছি। আমি ইহার এরূপ সেবা-শুশ্রূষা না করিলে, আপনি আসামীকে দেখিতে পাইতেন না, হয়ত এতক্ষণে সে মরিয়া যাইত! আসামীর যখন মৃত্যুর লক্ষণ নাই, তখন আসামীকে সেবা করিয়া জীবিত রাখাই উচিত। জীবিত না রাখিতে পারিলে দণ্ড হইবে কার? দণ্ড হইলেই ত ফললাভ। এই দারুণ শীতে পাছে আসামীর কষ্ট হয় এবং আসামী রুগ্ন হইয়া পড়ে, সেই জন্য আসামীকে আমি আপন গাত্র-বস্ত্র দিয়াছি। আসামী এবং জামাতা উভয়েরই এক ভাবে প্রাণরক্ষা করিতে হয়। সুতরাং এক্ষেত্রে এরূপ আসামীর উপর আর উৎপীড়ন করা উচিত নয়। আপনি প্রমাণ পাইতেছেন,—আসামীকে মোহরসুদ্ধ গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যান,—আদালতে হাজির করিয়া দিন।

দারোগা। তবে তাহাই হউক। নিয়ে আয় ত রে, হাত-কড়ি ও বেড়ী। বড় শক্ত আসামী! আচ্ছা করিয়া হাতে হাত-কড়ি দিয়া, পায়ে বেড়ী দিয়া দুই জনে দু'হাতে ধরিয়া উহাকে

লইয়া যাইতে হইবে। সম্মুখে আট জন, পশ্চাতে আট জন— উহার প্রহরী থাকিবে।

বীরভদ্র। না, না, না;—তাহা করা হইবে না;—এ আসামীকে পথ চলাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে না! একটী হোঁচট খেলেই আসামী প্রাণে মরিবে। আসামীর প্রাণটী রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। অনেক কষ্টে আসামীর দেহে বলসঞ্চয় হইয়াছে। অতএব আসামীকে পাল্কী করিয়া লইয়া যাওয়া হউক, এবং পাল্কীর আগে পাছে পাহারা থাকুক।

দারোগা। আমি বুঝিতে পারিতেছি না—আপনার এ কিরূপ আসামী?

বীরভদ্র। আমিও ভাল বুঝিতে পারিতেছি না,—কেমন আসামী! আসামীর ত প্রাণরক্ষা চাই, তাই পাল্কীর বন্দোবস্ত করিতেছি। পায়ে বেড়ী দেওয়া হইবে না, হাতে হাত-কড়ি দিলেই হইবে!

দারোগা। তবে তাহাই হউক।

নীলকুঠীর পাল্কী-বেহারা আসিল।

হাতে হাতকড়ি বাঁধিয়া, বীরভদ্রের লাল শাল গায়ে দিয়া, আগে পাছে প্রহরী দ্বারা সংরক্ষিত হইয়া, পাল্কী চড়িয়া আসামী চলিলেন। হাতে সূতা বাঁধিয়া বর যেন বিবাহ করিতে বহির্গত হইলেন। মশালসমূহের মহা আলোকে দিক্‌সমূহ মহোজ্জ্বল হইল। দারোগা বাবু মোহর লইয়া, ঘোড়ায় চড়িয়া, আগে আগে যাইতে লাগিলেন। যাত্রাকালে বীরভদ্র, "এই মূল দলিল রহিল" বলিয়া, দারোগা বাবুর পকেটে একখানি কাগজ ফেলিয়া দিলেন। সূক্ষ্মদর্শী দারোগা অনুভবে বুঝিলেন,—এখানি নোট। পকেটে

হাত দিয়া নোট খানি একবার টিপিয়া দেখিলেন—নোটখানির গায়ে হাত বুলাইলেন। নোটখানি পঞ্চাশ টাকার কি একশত টাকার, ইহা ভাবিতে ভাবিতে প্রস্থান করিলেন। সর্ব্বজন-সমক্ষে সে মূল দলিল খুলিয়া দেখিবার তাঁহার সাহস হইল না। কেবল এই ভাবনাই হৃদয়ে বদ্ধমূল রহিল,—নোট পঞ্চাশ টাকার, কি একশত টাকার?

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নীলকুঠী হইতে পুলিশ-ষ্টেশন প্রায় দুই ক্রোশ হইবে। অমাবস্যার রজনী ঘোর অন্ধকারময়ী। আকাশপট ঘন মেঘমালায় সুসজ্জিত। টিপি টিপি জল পড়িতেছে! পথ পিচ্ছিল হইয়াছে! চোর-বর পাল্কী চড়িয়া যাইতেছে। আনন্দে, কি নিরানন্দে, তাহা কেমন করিয়া বলিব?

এক ক্রোশ পথ অতিবাহিত হইল। ঘোরা রজনী। ঘন-ঘটাময় ভৈরব অন্ধকারে সকলেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বৃক্ষগণও যেন নতশিরে ঘুমাইতেছে। জননীর কোলে শিশু সন্তানের ন্যায়, পাখীগণ নিদ্রিতবৃক্ষের কোলে, ঘোর-ঘুমে অভিভূত হইয়াছে। ঝিঁঝি-পোকা ডাক বন্ধ করিয়াছে। সেও কি ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল? এত শীতে, শৃগালও ত কৈ ডাকিতেছে না? পেচকের রব শুনিতে পাইতেছি না কেন? না না, ঐ শুন, দূরে—সুদূরে কালপেচক বিকটধ্বনি করিতেছে। সেই বিকট বিভীষণ-রবে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, চোর-বরকে লইয়া, দারোগা বাবু চলিয়াছেন।

গাঢ়তর অন্ধকার গাঢ়তম হইয়া উঠিল। ও! আবার ঐ কি শুনি,—ভীষণ-নিনাদ! পৃথিবীর সর্ব্বদিক্ ভেদ করিয়া, ঘোর আঁধার-তরঙ্গ কাঁপাইয়া, জানি না কোথা হইতে এক শব্দ হইতেছে,———

'বাপ্!

সকলের কর্ণ সেই দিকে গেল। চারি মিনিট কাল কেহই কিছু আর শুনিতে পাইল না। আবার দারোগার মনকে উদ্বেলিত করিয়া প্রহরী ও বাহকগণের হৃদয় আতঙ্কিত করিয়া,—ঐ শুন, ঐ শুন,—ভীষণ হইতে ভীষণতর শব্দ—ঐ শুন, কোথা হইতে আসিতেছে,—

'বাপ্'!

সেই বিকট 'বাপ্' 'বাপ্' রব যেন শাণিত ছুরিকার রূপ ধরিয়া সকলের অন্তর্দ্দেশ বিদ্ধ করিতে লাগিল।

বাহকগণ আর চলিতে পারিল না,—থমকিয়া দাঁড়াইল! প্রহরিগণ আর যাইতে পারিল না,—থমকিয়া দাঁড়াইল। দারোগা বাবু জিজ্ঞাসিলেন, "তোমরা দাঁড়াইলে কেন? চারি দিকে বন,—ব্যাঘ্রভয়, দস্যুভয় আছে,—হঠাৎ দাঁড়াইলে কেন?"

এই কথা বলিতে না বলিতে আবার সেই ভৈরব রব সকলের কাণে আসিয়া পঁহুছিল,—

'বাপ্'!

প্রধান প্রহরী যোড়হাতে, ধীরে ধীরে কহিল,—"হুজুর! ঐ শুনুন,—আমরা আর কি বলিব? কাছেই ঐ শ্মশান;—ঐ শ্মশানের পথ দিয়া আমরা যাইতে পারিব না।"

আবার মেঘ-গর্জ্জনের ন্যায় শব্দ হ ল,—

'বাপ্' !

প্রধান প্রহরী কহিল,—"ঐ শুনুন,—শ্মশানের দিক্ হইতে ঐ শব্দ আসিতেছে।"

দারোগা। শ্মশান পূর্ব্বদিকে। আমার বোধ হইল পশ্চিম দিক্ হইতে শব্দ আসিতেছে।

দ্বিতীয় প্রহরী। না,—রব আসিতেছে উত্তর হইতে।

প্রথম বাহক। না,—রব আসিতেছে,—দক্ষিণ হইতে।

সকলে স্থির করিয়া এক বাক্যে কহিল,—"রব যে দিক্ দিয়া আসুক, শ্মশানের পথ দিয়া অদ্য রাত্রে কিছুতেই যাওয়া হইবে না।"

দারোগা। এবার ভাল করিয়া শুন দেখি,—কোন্ দিক্ হইতে রব আসিতেছে ?

এবার একেবারে যোড়া শব্দ শুনা গেল,—

'বাপ্! বাপ্!!

প্রথম প্রহরী। তাই ত হুজুর, কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না। শব্দ মনে হইতেছে,—এবার দক্ষিণ হইতে আসিতেছে।

তখন সকলের মনে হইতে লাগিল, চারিদিক্ হইতে যেন 'বাপ্' 'বাপ্' শব্দ উত্থিত হইতেছে। আকাশ হইতে যেন 'বাপ্' 'বাপ্' শব্দ নীচে নামিতেছে।

দারোগা সকলকে উৎসাহ দিবার নিমিত্ত কহিলেন,—"ভয় কি আছে ? পুলিস-থানা আর তিন পোয়া পথের অধিক নহে। কোন ব্যক্তি হয় ত শূল-যন্ত্রণায় ছট্ফট্ করিয়া 'বাপ্' 'বাপ্'

শব্দ করিতেছে, তাহাতে আমাদের চিন্তার কারণ কি? বিশেষ আমরা এতগুলি বলবান্ ব্যক্তি অস্ত্রশস্ত্র সমেত আলোক লইয়া যাইতেছি। স্বয়ং দস্যুপতি রঘুনাথ আসিলেও আমাদের ভাবনার কোন কারণ নাই।

প্রথম প্রহরী। না হুজুর, ও শব্দ মানুষের নয়;—আপনি ভাল করিয়া শুনিয়া দেখুন না? কোন ব্যক্তি মরিয়া ভূত হইয়া, কোন বড় গাছের টঙে বসিয়া ওরূপ বিতিকিচ্ছি শব্দ করিতেছে। ঐ শুনুন,—ঐ শুনুন,—

'বাপ্! বাপ্' !!

শব্দ যেন আকাশ হইতে আসিতেছে।

দারোগা। ভয় নাই, ভয় নাই!—এত রাত্রে ত আর এ বনের ভিতর বসিয়া থাকা চলিবে না;—চল।

প্রহরী। না হুজুর! শ্মশানের পথ দিয়া আমরা যাইতে পারিব না।

দারোগা। যদি শ্মশানের পথ দিয়া যাইতে না পার, তবে সেই বাঁকা-পথ দিয়া চল। মিছামিছি আধ ক্রোশ পথ ঘোর হইবে, আর তোমাদের কষ্টও বৃদ্ধি হইবে।

প্রহরী। আমাদের কষ্টবৃদ্ধি হউক—আর আধ ক্রোশ কেন—দু'ক্রোশ পথ ঘোর হউক, শ্মশানের পথ দিয়া আমরা যাইতে পারিব না।

দারোগা। আচ্ছা, তবে বাঁকা পথ দিয়াই চল,—ভয় নাই, চল।

তখন সকলে অর্দ্ধ ক্রোশের অধিক ঘোর-পথ দিয়া,—কণ্টকময় কুপথ দিয়া, চলিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু ভয়েই হউক, আর

পথ কণ্টকাবৃত বন্ধুর বলিয়াই হউক, বাহকগণ দ্রুতপদে যাইতে পারিল না।

মাঝে মাঝে এক একবার শব্দ হয়,—

'বাপ্!'

সর্ব্বলোক অমনি চমকিত হয়! যতই তাহারা অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই সেই বিকট 'বাপ্' শব্দ সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল; —ততই সর্ব্বলোকের অন্তরাত্মা শুকাইতে লাগিল।

রাত্রি প্রায় আড়াই প্রহর অতীত হইল। দারোগা সদলে, বহু কষ্টে জঙ্গল-পথ অতিক্রম করিয়া, তখন পুলিস-ষ্টেশন যাইবার বাঁধা-পথে উঠিলেন। দারোগা কহিলেন, "আর ভয় কি আছে? এই বাঁধা পথ দিয়া আর আধ ক্রোশ আড়াই-পো গমন করিলেই থানা পাওয়া যাইবে।"

এমন সময়ে এক নিদারুণ সর্ব্ব-মর্ম্মভেদী শব্দ আসিল,—

'বাপ! বাপ!!'

প্রধান প্রহরী। ঐ দেখুন হুজুর!—ঐ শুনুন হুজুর!—শব্দ যেন ক্রমশই নিকটে আসিতেছে। বোধ হয়, যেন পঁচিশ হাত দূরে ঐ শব্দ রহিয়াছে। আমরা আর যাইতে পারিব না,— আমাদের শরীর এলাইয়া পড়িয়াছে।

দারোগা। ভয় কি, চল!—আর একটু গেলেই থানার ফটকের আলো দেখিতে পাইবে।

দারোগা বাবুর কথায় তাহারা আবার চলিতে আরম্ভ করিল।

কিয়দ্দূরে এক অশ্বত্থ-গাছের নিকট একটী তাল-গাছ ছিল। প্রধান প্রহরী অঙ্গুলি হেলাইয়া দারোগা বাবুকে বলিল, "হুজুর!

ঐ দেখুন,—কে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে! বোধ হয় যেন মাথা আকাশে ঠেকিতেছে! উহার হাত আমাদের দিকে আসিতেছে।"

সকলের চক্ষু সেই দিকে গেল। বাহকগণ ভয়বিহ্বল হইয়া "ওরে তাইত রে, তাইত রে" বলিয়া পাল্কীর সহিত ভূতলে গড়াইয়া পড়িল। সেই সময় আবার শব্দ হইল,—

'বাপ্! বাপ্!!'

তাহাদের মনে হইতে লাগিল, যেন ঐ দীর্ঘাকার তাল-গাছ-ভূত হইতে ঐ শব্দ আসিতেছে। দারোগা বাবু কিন্তু তালগাছকে তালগাছ বলিয়া বুঝিতে পারিলেন; বাহকগণকে ধমক দিলেন; এমন কি চাবুক মারিতেও উদ্যত হইলেন। বলিলেন,—"দেখ ঐ তালগাছ,—ও আর কিছুই নয়। ফের যদি ও রকম করিস্, তাহা হইলে তোদের হাড় ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করিয়া দিব।"

ভূতের ভয় অপেক্ষা প্রহারের ভয় অনেক সময় অধিক হয়। বাহকগণ পাল্কী কাঁধে করিয়া আবার চলিতে লাগিল। সেই 'বাপ্' 'বাপ্' শব্দ ক্রমশই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। মনে হইল, আর দশ পদ অগ্রসর হইলেই এই 'বাপ্' 'বাপ্' রব রাক্ষসীরূপে তাহাদিগকে গিলিয়া ফেলিবে।

ক্রমশঃ পুলিসষ্টেশন-ফটকের আলো দেখা গেল। কিন্তু 'বাপ্' 'বাপ্' ধ্বনি আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। হর্ষে বিষাদ হইল!

দারোগা বাবু ভাবিতে লাগিলেন, "এ কি! থানার ভিতর হইতে ঐ 'বাপ্, 'বাপ্' ধ্বনি আসিতেছে না? ওঃ এমন বিকট শব্দ ত আমি কখন শুনি নাই!"

দারোগা দ্রুতবেগে অশ্ব চালাইয়া দিলেন। বাহকগণ

দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। প্রহরিগণ দৌড়িতে আরম্ভ করিল। দ্বাদশ বজ্রের গম্ভীর নির্ঘোষের ন্যায় পুলিসষ্টেশন হইতে শব্দ আসিতে লাগিল——

'বাপ্! বাপ্!!'

পুলিশ-ষ্টেশনে পঁহুছিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে সকলেই স্তম্ভিত হইল। দেখিল, এক দীর্ঘাকার কৃষ্ণবর্ণ, ভীমের ন্যায় বলবান্ পুরুষকে, কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে দৃঢ়রূপে দড়ি বাঁধিয়া, অতি উচ্চ প্রদেশে টাঙ্গাইয়া রাখা হইয়াছে। সেই বীর পুরুষ কেবল কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে ভর দিয়া ঝুলিতেছেন। পদদ্বয় লৌহ-শিকল দ্বারা আবদ্ধ। বামহস্তটী লৌহ-শিকলদ্বারা কোমরে নিবদ্ধ। আর একজন টুলের উপর উঠিয়া, তাঁহার পৃষ্ঠদেশে মধ্যে মধ্যে বেত্রাঘাত করিতেছে। সেই ভীম-পুরুষ সন্ধ্যা হইতে রাত্রি তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত ঐ ভাবেই ঝুলান আছেন। তাঁহার দুইটী রক্তবর্ণ চক্ষু যেন আপনা-আপনি উপড়িয়া আসিতেছে। দীর্ঘ নিশ্বাস ঘন ঘন পড়িতেছে। বক্ষঃ স্ফীত হইতেছে। আর মাঝে মাঝে তিনি বলিতেছেন—

'বাপ্! বাপ্!!'

সর্বলোক অনিমেষ-লোচনে সেই পুরুষের পানে চাহিয়া রহিল। রমাপ্রসাদও পাল্কী হইতে নামিয়া পুরুষের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। দারোগা বাবু যেন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। তখন সেই ভীম-পুরুষ মধুর অথচ উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—

"ভাই! একবার কালী কালী বল! ভাই! একবার শঙ্করী শঙ্করী বল! ভাই! অন্য কথা কহিও না—অন্তরে কালী কালী বল!"

দারোগা বাবু সেই ভীম-পুরুষের আঙ্গুলের দাড় তৎক্ষণাৎ কাটিয়া তাহাকে নীচে নামাইতে হুকুম করিলেন এবং কহিলেন,—"অদ্য রাত্রি অধিক হইয়াছে, আমি বিশেষ ক্লান্ত হইয়াছি,—আসামী দুইজনকে যত্নের সহিত যথাস্থানে রক্ষা কর। আমি এখনি আপন প্রকোষ্ঠে গিয়া নিদ্রা যাইব।"

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কাত্যায়নীকে সকলেই ছাড়িয়াছিল, কেবল রঘুদয়াল ছাড়ে নাই! পোষা শালিক পাখীটী পর্য্যন্ত পলাইয়াছিল, কেবল রঘু-দয়াল পলায় নাই। পলায়ন দূরে যাউক, কাত্যায়নীর যত বিপদ্ বাড়িতে লাগিল,—অন্নকষ্ট যত অধিক হইতে লাগিল, কাত্যায়নীর সন্তানগণের প্রতি রঘুদয়ালের ততই অনুরাগ এবং আকর্ষণ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রঘুদয়াল আধ-পেটা খায়, কিন্তু রমাপ্রসাদকে, বধূকে এবং মাতা কাত্যায়নীকে উদর পূর্ণ করিয়া খাইতে অনুরোধ করে। লক্ষ্মী ত রঘুদয়ালের বুকের কলিজা। রঘুদয়ালের কখন কাঁধে, কখন কোলে, কখন মাথায়,—লক্ষ্মী শোভমানা হন। রঘু-দয়াল কখন ঐরাবত হয়, শ্রীমতী লক্ষ্মী তাহার পৃষ্ঠদেশে চড়িয়া উঠান-ময় বেড়াইয়া বেড়ায়। ইদানীং রঘুদয়ালের প্রভাতে কাজ হইয়াছিল,—লক্ষ্মীর জন্য দুগ্ধ-অন্বেষণ—যে কোন উপায়ে হউক, অর্দ্ধসের দুগ্ধ, রঘুদয়াল প্রাতে কাত্যায়নীর হস্তে দিয়া, আবার বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইত। এইবার সে, চাল, ডাল, নুণ, তেলের চেষ্টায় যাইত।

রঘুদয়ালের দ্রুতগমন-শক্তি অপূর্ব্ব। বহু শিক্ষা, বহু অভ্যাস এবং বহু যত্নে সে শক্তি সঞ্চিত হইয়াছিল। সে বিনাকষ্টে, সহজে দশ বার মিনিটে এক ক্রোশ পথ যাইতে পারিত। হাতে যদি উপযুক্ত লম্বালাঠী পাইত, তাহা হইলে আট মিনিটে এক ক্রোশ পথ যাইতে সক্ষম হইত। একদমে এইরূপে ষোল ক্রোশ পথ গিয়াও, রঘুদয়াল বিশেষ কষ্ট অনুভব করিত না,—হাঁপাইত না। এখনকার অধিকাংশ বাঙ্গালী—উকীল-বাঙ্গালী, সদরালা-বাঙ্গালী, ডেপুটী-বাঙ্গালী, কেরাণী-বাঙ্গালী, সম্পাদক-বাঙ্গালী,—এ কথা অবিশ্বাস করিতে পারেন; কিন্তু তখনকার সত্য সত্যই কতকগুলি লোক ঐরূপ দ্রুত চলিত। তখন শিক্ষা ছিল, শরীরে সামর্থ্য ছিল, উপযুক্ত আহার ছিল, ফূর্ত্তি ছিল, উৎসাহ ছিল, আবশ্যকতা ছিল,—কাজেই চলিতে পারিত। কিন্তু এখন লোকের চলচ্ছক্তি একরকম রহিত হইয়াছে। রেলগাড়ী, ট্রামগাড়ী, ঘোড়গাড়ী, গরুর গাড়ী, পাল্কী, ডুলি,—যে দিকে চক্ষু ফিরাইবে, সেই দিকেই যেন সমস্ত সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে এবং যানগণ যেন ডাকিতেছে,—"এস এস, আমার কাছে এস, আমার স্কন্ধে ভর কর;—আমি তোমায় সচ্ছন্দে লইয়া যাইব।" যিনি বাইশ টাকা রোজগার করেন, তিনিও পাঁচ পয়সা দিয়া ট্রামে চাপেন। বিল-সরকার টাকার তাগাদা করিতে যায়,—অনেক সময় ট্রামে চড়িয়া; মেছুনীরা শিয়ালদহ হইতে মাছ-সহ নূতন বাজারে যায়—ঘোড়-গাড়ী চড়িয়া। হলধর মুদী,—ধর্ম্মতলার-চারি-পয়সার-সেয়ারের-গাড়ীতে আলিপুর যায়। রামলক্ষ্মণ পিয়ন একদিন কলুটোলা হইতে বাগ্‌বাজার যাইবার জন্য পাঁচ পয়সা ট্রামভাড়া চাহিয়াছিল। নিম্নশ্রেণীর লোকের ত অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে। উচ্চশ্রেণীর

ব্যক্তিগণের অবস্থা যে কতদূর শোচনীয় হইয়াছে, তাহা বিজ্ঞ ব্যক্তি অনুমান করিয়া বুঝিয়া লউন। রৌদ্র একটু উত্তপ্ত হইলে এখন ঘোড়গাড়ীর উপর আবার 'খস্‌খসে' দেওয়া হইতেছে। এরূপ স্থলে পায়ে খিল ধরিবে না কেন? চলচ্ছক্তি রহিত হইবে না কেন? হাঁটুতে গেঁটে বাত ধরিবে না কেন? অক্ষুধা, অজীর্ণ, অম্লরোগ জন্মিবে না কেন? ডাইবিটিসই বা হইবে না কেন? এবং অকাল-মৃত্যুই বা ঘটিবে না কেন?

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী এরূপ পঙ্গু হয় নাই। এতটা মাংসপিণ্ড জড়ভরত হয় নাই। তখন কলিকাতা হইতে অনেক ভদ্রব্যক্তি, বর্দ্ধমানে হাঁটিয়া যাইত; বাঁকুড়ায় হাঁটিয়া যাইত; বীরভূমে হাঁটিয়া যাইত। ৺পূজার সময় বাটী যাইতে হইলে,—হাঁটিয়া যাইবার আমোদই বা কত! দশ বার জন ভদ্রব্যক্তি,—একত্র দলবদ্ধ হইয়া,—সঙ্গে ভৃত্যবর্গ এবং মুটে ও ভারী লইয়া ৺পূজার ছুটিতে বাটী যাইতেছেন;—প্রত্যহ ছয় ক্রোশ, আট ক্রোশ পথ চলিতেছেন; কিন্তু সে পথ হাটার কষ্ট আদৌ অনুভূত হইতেছে না। পথে পরস্পর আমোদ-আহ্লাদ করিতে করিতে, রসরঙ্গ-রসিকতা করিতে করিতে, সরস সঙ্গীত আলাপ করিতে করিতে, নানা নগর গ্রাম দেখিতে দেখিতে, নদ-নদী সরোবরের শোভা নিরীক্ষণ করিতে করিতে, নানা নূতন লোকের সহিত আলাপ করিতে করিতে, শস্যশালিনী বসুন্ধরার সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে করিতে, তাঁহারা চলিয়াছেন। কোথাও পর্ব্বত, কোথাও প্রস্রবণ, কোথাও দীর্ঘ দীর্ঘ বৃক্ষ, কোথাও মৃগযূথের কুন্দন, কোথাও ময়ূরকুলের নর্ত্তন,—সমস্তই পথিকের চক্ষের গোচরীভূত হইতেছে। আর ক্ষুধাই বা কি সুন্দর! আর, এ সূক্ষ্ম সুরুচির কালে,—রস

যদি বীভৎস না হয়, ত বলি,—কোষ্ঠ-খোলসা কিবা নয়ন-মনোহর এবং মনঃপ্রাণ-তৃপ্তিকর! তখন দ্রব্য-সামগ্রীও সুলভ ছিল। বেলা দশটার সময় চটিতে পৌঁছিয়াই কেবল "কি খাই, কি খাই" মনে হইত। দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মৎস্য—সমস্তই মিলিত। ভাস্তাড়ার হাটে, তখন পয়সায় দেড় সের খাঁটী দুধ পাওয়া যাইত। মৎস্য পয়সা-সের ছিল। ভাল ঘৃত টাকায় পাঁচ সেরের কম নহে। এই দধি-দুগ্ধ-ঘৃতের সহিত কণ্ঠ পর্য্যন্ত পূর্ণ করিয়া, খিচুড়ী খাইলেও কোনই কষ্ট ছিল না। বৈকালে অম্লজনিত মধুর মধুর বুক জ্বলিত না। পেটে ঠোস্ মারিত না। এইরূপ উৎকৃষ্ট আহারে, লোক-প্রতি তখন আড়াই পয়সার অধিক ব্যয় হইত না। পদব্রজে গমন, নির্ম্মল বায়ু-সেবন, নির্ম্মল পুষ্করিণী বা নদীর জলে স্নান,—ইহাই ক্ষুধার কারণ;—ইহাই নীরোগতার হেতু। এত যে উদর পূর্ণ করিয়া আহার; কিন্তু এক ক্রোশ পথ চলিলেই সব ভস্ম হইয়া যাইত,—আবার যে ক্ষুধা সেই ক্ষুধা!

কিন্তু সে দিন—সে কাল আর নাই। এখন পথ হাঁটিলেই অপমান! অপমান দূরে যাউক,—এখন পথ হাঁটিবারই যো নাই। প্রথমতঃ চলচ্ছক্তি রহিত,—একটু হাঁটিলেই হাপাইতে হইবে,—পায়ে ব্যথা জন্মিবে,—হাঁটু কামড়াইবে। দ্বিতীয়তঃ ঊর্ণ-নাভের জালের ন্যায় যেরূপ রেলপথ-বিস্তার হইয়াছে, তাহাতে হাঁটিবেই বা কোথায়? আবার রেলগাড়ী হইতে নামিলেই দেখিবেন,—ঘোড়গাড়ী, বা গরুর গাড়ী, বা পাল্কী। নদীর ধারে যদি রেল-ষ্টেশন হয়, তাহা হইলে নভোমণ্ডলের নক্ষত্রের ন্যায়, নদীর উপর পানসী শোভমান দেখিতে পাইবেন। কোন মাঝী যাত্রীকে "আমার নৌকায় আসুন" বলিয়া টানাটানি করিতেছে; কোন

মাঝী, যাত্রীকে কোলে করিয়া লইয়া হন হন চলিয়াছে; কোন মাঝী যাত্রীর পুঁটলি মাথায় করিয়া ছুটিতেছে;—যাত্রী, পুঁটলি কাড়িয়া লইয়া যাইবার ভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে তাহার দিকে দৌড়াইতেছে: কোন এক নৌকার মাঝী যাত্রীর ডান হাত ধরিয়াছে, অপর এক নৌকার মাঝী সেই যাত্রীর বাম-হাত ধরিয়া টানাটানি করিতেছে। যাত্রী "ছেড়ে দে, ছেড়ে দে" বলিয়া বিকট রব করিতেছে। তৃতীয় নৌকার মাঝী আসিয়া সেই যাত্রীর কোমর ধরিয়া সজোরে আকর্ষণ করিতেছে। বলিতেছে, "আমার নৌকা সর্ব্বোৎকৃষ্ট; আমার নৌকায় কর্ত্তা অনেকবার গিয়েছেন,—আমি আপনাকে চিনি, কর্ত্তা!" যাত্রী তখন তে-টানায় পড়িয়া, কাহাকে কি উত্তর দিবে, ভাবিয়া না পাইয়া, কেবল "ত্রাহি মধুসূদন, ত্রাহি মধুসূদন!" ডাক ছাড়িতেছে। ফলতঃ মানুষকে কেহ পথ হাঁটিতে দিবে না; যেন চলা নিষিদ্ধ। অথবা চলিলেই যেন ছয় মাস কারাদণ্ড হইবে,—এইরূপ কোন রাজ-আজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছে।

কিন্তু রঘুদয়ালের কালে চলা বৈ আর উপায় ছিল না। বড়-লোকে পাল্কী চড়িত; বাকী লোক পায়ে চলিত। স্ত্রীলোক, গয়া কাশী বৃন্দাবন চলিয়া যাইত; কদাচিৎ কখন গো-গাড়ীতে চড়িত।

নৌ-যান বড় সুখের যান! বিশেষ, সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিগণ সপরিবারে নৌকা করিয়া কাশী যাইতেন। নৌ-যান-ভ্রমণে স্বাস্থ্য আরও ভাল থাকিত। ক্ষুধাও বেশ বৃদ্ধি হইত! অশ্ব-যান সে কালে ছিল। অনেকে ঘোড়ায় চড়িতে ভালবাসিত। অশ্বারোহণে আনন্দও যেমন, উপকারও সেইরূপ।

যে দিক্ দিয়াই দেখুন, সেকালে বিলাসিতার উপকরণ-অভাবে।

লোকের স্বাস্থ্য ভাল ছিল; বলবীর্য্য অধিক ছিল। কষ্ট-সহিষ্ণুতা অধিক ছিল;—সঙ্গে সঙ্গে মনের স্ফূর্ত্তিও সমধিক ছিল।

এখন ইংরেজ-রাজত্বের মধ্যাহ্ন,—পূর্ণ সমৃদ্ধির কাল!—ঘোরঘটায় জয়ঘণ্টা চারিদিকে নিনাদিত,—এখন কিন্তু রেল-পথ ব্যতীত, তাড়িত-পথ ব্যতীত, অশ্ব-যান প্রভৃতি অসংখ্য যান ব্যতীত এ রাজত্ব কিছুতেই চলিবার নহে। আমরা এক পক্ষে যেন কলের মানুষ হইয়াছি;—কলে রহিয়াছি, কলে উঠিতেছি, কলে বসিতেছি,—যেন নিজের অস্তিত্ব নাই। জল—কলের, আলোক—কলের, নরদামা—কলের, পাইখানা—কলের;—কলিকাতার প্রত্যেক গৃহই যেন কলে নির্ম্মিত, কলে চালিত। প্রভাতে উঠিতে না উঠিতে দেখিবে, কথা নাই, বার্ত্তা নাই—কল-সুন্দরী ভড়্ভড়্ করিয়া তোমাকে জল দিতেছে। সন্ধ্যা সমাগত হইল, তুমি ঘরে সন্ধ্যা দিতে না দিতে,—দেখিতে পাইবে, পথে গ্যাসালোক বা বিদ্যুতালোক প্রজ্বলিত হইতেছে;—সে আলোকে তুমিও আলোকিত হইতেছ। আগে পাথরে লৌহ ঘর্ষণ করিয়া সোলার সাহায্যে আগুণ জ্বালিতে হইত; এখন দিয়াশলাই খস্ করিয়া ঘসিলেই আগুন এবং আলো! আমরা কি নিশ্চেষ্ট হইতেছি না?—অকর্ম্মণ্য হইতেছি না? অধিক আর কি বলিব, গান শুনিতে হইবে, এখন চৌষট্টী টাকা দিয়া একটী কল কিনিয়া আনিলেই হইল।—গোপাল উড়ের টপ্পা, কলে দিব্য গীত হইতে লাগিল! আমরা কি আত্মহারা হইতেছি না? বৃত্তিনিচয় আমাদের কি বিশুষ্ক হইতেছে না?

হইতেছি সবই। কিন্তু ইংরেজ-রাজত্বের এই সুখ-বসন্তকালে এ সমস্ত না হইলে ত চলিবে না! ধীরে ধীরে, অল্পে অল্পে, তিলে

তিলে আমাদের দেহ-মন ক্ষয় হইতেছে। আমরা বুঝিতেছি না; —বুঝিবারই বা উপায় কি? ইংরেজ আমাদের সুখের জন্য সমস্তই করিতেছেন সত্য; কিন্তু বিলাসিতার উপকরণ আমাদের সহ্য হয় না। ক্ষুদ্রের উদরে খাঁটী দুগ্ধ-ক্ষীর সহ্য হয় না। আমরা পীড়িত ও শয্যাগত;—বিলাসিতার তেজ—সুখের তেজ,—সহ্য করিবার আমাদের শক্তি নাই।

এই যে আমরা ইংরেজের শুভদৃষ্টিতে এবং দয়াগুণে সুখের অমৃতসাগরে ডুবিয়া আছি;—আচ্ছা,—আমাদের মধ্যে রঘুদয়ালের ন্যায় একজন জোয়ান বাহির করুন দেখি? একজন প্রভুভক্ত, কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি বাহির করুন দেখি? অমন একজন স্ফূর্ত্তিময়, তেজোময় পুরুষ বাহির করুন দেখি? অমন দীর্ঘাকার, প্রশস্ত-বক্ষ, ক্ষীণকটী, কৃষ্ণবর্ণ সুপুরুষ এখন মিলে কি? আমি ত কৈ দেখি নাই। তখন একটী রঘুদয়াল নহে, অমন অনেক রঘুদয়াল ছিল। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্যের ঘরেও তখন অনেক রঘুদয়াল-জাতীয় পুরুষ ছিল। কিন্তু হায়! যে কারণেই হউক, বঙ্গভূমি এখন রঘুদয়াল-শূন্য হইয়াছে। এখন বাড়ী বাড়ী অন্বেষণ কর, রঘুদয়াল পাইবে না। রঘুদয়াল নগরে নাই, গ্রামে নাই, পল্লীতে নাই,—এ সংসারে রঘুদয়াল আর নাই। আকাশপানে চাহিয়া দেখ,—রঘুদয়াল আর নাই! এই কল-কজ্জ্বাপূর্ণ সংসারে রঘুদয়ালের টিকিবার সম্ভাবনা নাই।—তাই বুঝি রঘুদয়াল আর জন্মগ্রহণ করেন না!

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

৺শঙ্করীপ্রসাদের ভবনে পূর্ব্ববৎ দ্বারবান্ ও রক্ষক থাকিয়াও, রঘুদয়াল মজুরি করিয়া, প্রত্যহ কিছু কিছু রোজগার করিত। লক্ষ্মীর দুধ আনিয়া দিবার পর, প্রাতে প্রায় আটটার সময় অর্থ উপার্জ্জন করিবার জন্য, সে বহির্গত হইত। রোজগার করিয়া যাহা কিছু পাইত,—বলাই বাহুল্য, তাহাতে চাল, ডাল, তেল, নুণ কিনিয়া আনিয়া, রঘুদয়াল কাত্যায়নীর হস্তে দিত। যেদিনকার যাহা অভাব, রঘুদয়াল তাহা বুঝিত এবং সেইরূপ সামগ্রীই কিনিয়া আনিত।

রঘুদয়াল কিন্তু গ্রামে মজুরি করিত না। যেখানে রঘুদয়াল বাহুবলে একদিন ভীমার্জ্জুনের সহিত তুলনায় হইত, সেখানে রঘুদয়াল মজুরি করা উচিত বোধ করিত না। বিশেষ গ্রামের লোক, রঘুদয়ালের দ্বারা নীচ মজুরি-কার্য্য করাইয়া লইতে চাহিত না। রঘুদয়ালও যদি কখন ঐরূপ কাজ চাহিত, গৃহস্থ বলিত,—"কাজ নাই।" রঘুদয়াল ভাবিত,—"বিপদ্ ত কম নয়!" এইরূপে রঘুদয়াল গ্রামে মজুরি করার আশা ছাড়িয়া দিয়া, দূরে—ভিন্ন গ্রামে মজুরি করিবার জন্য যাইতে লাগিল। ছয় ক্রোশ, আট ক্রোশ, দশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী গ্রামে রঘুদয়াল মজুরি করিতে যাইত এবং যথাসময়ে ফিরিয়া আসিত। যখন গোয়ালিনী, লক্ষ্মীর দুধ দেওয়া বন্ধ করে নাই, তখন রঘুদয়াল অতি প্রত্যূষে উঠিত। এমন কি, এক এক দিন একটু রাত থাকিতে উঠিয়া, পথ চলিতে আরম্ভ করিত। লম্বা লাঠী হাতে করিয়া, তাহার উপর ভর রাখিয়া, রঘুদয়াল বাঘের ন্যায় লাফাইয়া-লাফাইয়া, পথ অতিক্রম

করিত,—দৌড়িত না ;—রঘুদয়াল চলিত, বলিত,—"দৌড়নো অপেক্ষা, এরূপ চলায়, অধিক পথ অল্প সময়ে যাওয়া যায়।" দেড় ঘণ্টায় আট ক্রোশ পথ রঘুদয়াল সহজেই পঁহুছিত। রঘুদয়াল সেই গ্রামে গিয়া দেখিত, কৃষকগণ হল লইয়া প্রাতে মাঠে চলিয়াছে। কেহ বা কর্ষণ আরম্ভ করিয়াছে।

রঘুদয়াল কাহারও সহিত দলবদ্ধ হইয়া কাজ করিত না,—একা মজুরি করিত। বেতন হিসাবে কাজ করিত না,—ফুরান করিয়া কাজ করিত। কাহারও তেঁতুল গাছ কাটিতে হইবে,—রঘুদয়াল আট আনায় ফুরাইয়া লইল। গৃহস্থ ভাবিল, এই কাঠ কাটিতে অন্যূন চারি দিন লাগিবে। কিন্তু ভীম-পরাক্রম রঘুদয়াল তাহা ছয় ঘণ্টার মধ্যে কাটিয়া, কুচি কুচি করিয়া ফেলিল। তখনকার এক রোজের মজুরি দুই আনা বা ছয় পয়সা যথেষ্ট ছিল। রঘুদয়াল আট আনা লইয়া, বেলা দুইটা বা দেড়টার মধ্যে আপন গৃহে ফিরিয়া আসিল। নবীন বাবুর এখন হয় ত এ সব কথা অবিশ্বাস হইতেছে। কিন্তু এই ভাবে যদি আর শতাধিক বৎসর চলে, তাহা হইলে, তাৎকালিক নবীন বাবু, মানুষ কুড়ি মিনিটে এক ক্রোশ পথ চলিতে পারে, ইহাও হয়ত অবিশ্বাস করিবেন! অন্তিমে, এমন কি, মানুষ যে, আদৌ চলিতে পারে, ইহাও নবীন বাবুর অবিশ্বাস হইবে!

রঘুদয়াল কৌশলী ও হিসাবী। দূরস্থিত ভিন্ন গ্রামে গিয়া রঘুদয়াল নদীর ধারে দেখিল, বিশ জন লোক নৌকাখানি ঠেলিয়া জলে ভাসাইতে পারিতেছে না। রঘুদয়াল বলিল,—"আমাকে কি দিবে বল,—আমি নৌকা জলে নামাইয়া দিতেছি।" এক টাকা চুক্তি হইল। রঘুদয়াল সেই দল হইতে দুই তিনটী লোককে

বাছিয়া লইল। প্রত্যেককে দুই পয়সা দিব বলিয়া স্বীকার করিল;—বলিল,—"তোমাদিগকে বেশী কিছু করিতে হইবে না,—বাঁশ দিয়া যেখানে আমি ঠেলিব, আমার কথানুসারে তোমরা সেইখানেই ঠেলিবে এইমাত্র। তখন রঘুদয়াল কৌশল এবং হিসাব করিয়া এরূপ বল প্রয়োগ করিল যে নৌকা এক মিনিটের মধ্যে নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া আসিয়া জলে পড়িল। সুতরাং অদ্য এক মিনিটের রোজগার হইল,—রঘুদয়ালের সাড়ে চৌদ্দ আনা। এইরূপ দাঁও-মারা কাজ সে সতত খুঁজিত। বড় বড় শালের চকর-কাঠ বহিতে হইবে;—রঘুদয়াল বলিত, "আমাকে ক্রোইয়া দাও।" ক্রোন ঠিক হইলে, রঘুদয়াল রসী বাঁধিয়া হড় হড় করিয়া চকর-কাঠ টানিয়া আনিত। কিন্তু রঘুদয়ালের অধিক উপার্জ্জন ছিল,—বিবাহাদি উৎসবে, অন্নপ্রাশনে, পূজা-পার্ব্বণে। লাঠী-খেলা এবং কত রকম কুস্তির কলকৌশল সে দেখাইত। রঘুদয়াল দূরবর্ত্তী ভিন্ন গ্রামে গিয়া এইরূপ খেলা খেলিত এবং প্রায়ই জয়লাভ করিত; যে অর্থ পুরস্কার পাইত, তাহা কাত্যায়নী-পরিবারের ভরণ-পোষণে ব্যয়িত হইত। বিশ খানা গ্রামের লাঠিয়াল, রঘু-দয়ালকে গুরু বলিয়া পূজা করিত এবং দেখিলেই প্রণাম করিত, পায়ের ধূলা লইত। রঘুদয়ালের আকার-প্রকার, যুদ্ধকৌশল ও বিক্রম দেখিয়া, যখন কোন বড়লোক বলিত,—"রঘু! তুমি আমার এখানে থাক না,—খাইতে পরিতে দিব, আর মাসে পনর টাকা মাহিনা দিব।" রঘু যোড়হাতে বলিত,—"হুজুর! ক্ষমা করিবেন,—আমার এক বৃদ্ধ মা আছেন, তাঁহাকে একা রাখিয়া আমি কোথাও থাকিতে পারিব না!"

লক্ষ্মী রাঙা কাপড় ভাল বাসিত; রঘুদয়াল লাল কাপড় পুরস্কার

পাইলে তাহা আনিয়া লক্ষ্মীকে পরাইতে-পরাইতে বলিত,—"বল দেখি এ কেমন কাপড় ?"

লক্ষ্মী। বেশ কাপড়!—রাঙা-কাপড়,—অতি উত্তম কাপড়। কিন্তু তুমি কোথা পেলে বল ?

রঘু। আমি তোমার জন্য কিনিয়া আনিয়াছি।

লক্ষ্মী। না;—তুমি চাহিয়া আনিয়াছ! তোমার পয়সা কোথায় ? মা বলেন—"রঘুদয়াল পয়সা কোথায় পাবে ?" চাওয়া-কাপড় হ'লে, কিন্তু আমি পর্‌বো না ;—মা বারণ ক'রেছেন।

রঘুদয়াল নীরব থাকিত ; কথার আর কোন উত্তর দিত না।

তখন ডাকাতির প্রাদুর্ভাব ছিল। কিন্তু রঘুদয়ালের নামগুণে সে প্রদেশে ডাকাতি হইত না। যৌবনে, রঘুদয়াল প্রায় পঞ্চাশ দল ডাকাতকে, ডাকাতি করিবার সময় গ্রেপ্তার করিয়াছিল। যাহার বাড়ীতে ডাকাতি হউক, রঘুদয়াল লম্ফে লম্ফে তাহার গৃহে বেগে উপনীত হইত। ডাকাতগণকে বিকট চিৎকারে বলিত, "ফেল্ তলোয়ার!—ফেল্ লাঠী! যদি সে, লাঠী বা তরবারি না ফেলিত, তবে রঘুদয়াল তদীয় লাঠীর আঘাতে, ডাকাতের পা, এককালে জন্মের মত খোঁড়া করিয়া দিত। রঘুদয়ালের হুঙ্কার-রবে কত কত ডাকাতের হাতের লাঠী আপনা-আপনি খসিয়া পড়িত।

এইরূপে রঘুদয়ালের নাম-ডাক-পসার পড়িল। ডাকাতগণ তাহার শরণ লইল। বন্দোবস্ত এই হইল, তাহার গ্রামের বার ক্রোশের মধ্যে কেহ ডাকাতি করিবে না।

রঘুদয়াল পনর বৎসর কাল, খোরাক-পোষাক সহ মাসিক দশ টাকা বেতনে, শঙ্করীপ্রসাদের নিকট নিযুক্ত থাকিয়া, এইরূপ সিংহ-বিক্রমে কালাতিপাত করে। শঙ্করীপ্রসাদের মৃত্যু হইল,

সুখ-সূর্য্য ডুবিল, বিষয় বৈভব বিনষ্ট হইল,—কাত্যায়নী সর্ব্বস্বান্ত হইলেন। রঘুদয়াল কিন্তু সেইরূপই ভৃত্য রহিল ;—বিনা বেতনে এবং বিনা খোরাক-পোষাকে সেইরূপ ভৃত্য রহিল ; শুধু তাহাই নহে,—নিজে যাহা কিছু উপার্জ্জন করিত, তাহাও কাত্যায়নীকে দিয়া, সেইরূপই ভৃত্য রহিল !

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পাঠকের স্মরণ আছে, ইতিপূর্ব্বে কাত্যায়নীর গৃহে ডাকাতি হইয়াছিল। ডাকাতিতে, ঘটী বাটী, কাপড়-চোপড় যাহা কিছু ছিল, সমস্তই লুণ্ঠিত হয়। ডাকাতির পর এক কড়া কড়িও ঘরে ছিল না।

ডাকাতেরা কিন্তু কাত্যায়নী প্রভৃতি কাহাকেও উৎপীড়ন করে নাই, মারে নাই এবং মা শঙ্করীর গৃহেও প্রবেশ করে নাই। প্রবেশ করিলে বোধ হয়, লক্ষ্মীপূজার কড়ি, ধান এবং সেই মোহরটী থাকিত না। ডাকাতগণ বোধ হয় কিছু ভদ্র, এবং সভ্য।

মহাবীর, মহ -পরাক্রমশালী রঘুদয়াল কাত্যায়নীর গৃহে থাকিতে ডাকাতি হয় কিরূপে ? রঘুদয়াল সেদিন গৃহে ছিলেন না।—অর্থো পার্জ্জনাভিলাষে দশ এগার ক্রোশ দূরবর্ত্তী এক গ্রামে গিয়াছিলেন যথানিয়মে অপরাহ্নে তিনি সে গ্রাম হইতে প্রত্যাগমন করিতে উদ্যত হন। গ্রামের যিনি জমিদার, তাঁহার একমাত্র পুত্র,—সেই পুত্রকে সাপে কামড়াইয়াছে ;—চারি দিকে হাহারব উঠিয়াছে ;— অনেক মাল-বৈদ্য-রোজা আসিয়াছে ; কিন্তু কাহারও ঔষধে কিছু-

মাত্র উপশম হইতেছে না। পুত্রের প্রাণ যায়-যায়, মুখ দিয়া ফেন নির্গত হইতেছে।

জমিদার-পুত্রকে সাপে কামড়াইয়াছে, ইহা রঘুদয়ালের কাণে পঁহুছিল। রঘুদয়ালের আর বাড়ী যাওয়া হইল না। তিনি ফিরিলেন,—জমিদার-গৃহে উপনীত হইলেন। দেখিলেন, সদর-বাড়ীতে কেহ নাই,—কেবল এক ব্যক্তি বসিয়া আছে। কিন্তু অন্দর-বাটী লোকে লোকারণ্য এবং কোলাহলে ও ক্রন্দনে পরিপূর্ণ। রঘুদয়াল যোড় হাতে কহিলেন, "মহাশয়! একটী কথা আপনাকে বলিব।"

যে ব্যক্তি বসিয়াছিল, সে ব্যক্তি জমিদারী সেরেস্তার খাজাঞ্চী ও একজন প্রধান কর্ম্মচারী এবং জমিদারের সহিত নিকট সম্পর্কও আছে। রঘুদয়ালের কথা শুনিয়া তিনি বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "বাপু! বাড়ীতে আজ বড় বিপদ্—তুমি চলিয়া যাও,—এ সময় কি কথা-শুনিবার সময়?"

রঘুদয়াল। বিপদ্ আমি জানি। আমি একবার, যে ছেলে-টীকে সাপে কামড়াইয়াছে, তাহাকে দেখিব—ইচ্ছা করিয়াছি।

খাজাঞ্চী কেমন পূর্ব্ব হইতেই একটু রাগিয়াই ছিলেন;—তিনি কহিলেন, "তোমার কি রকম আক্কেল! কর্ত্তা, গৃহিণী এবং বধূগণ অন্দরে কাঁদিয়া গড়াগড়ি দিতেছেন;—রোগীর মৃত্যু-সময় উপস্থিত; তুমি কি সং দেখিতে যাইবে?—নেকালো হিঁয়াসে,—বদ্‌মায়েস!"

রঘুদয়াল। (যোড়হাতে) হুজুর! রাগ করিবেন না,—আমি মন্দভাবে আসি নাই,—আমি সাপে-কাটার একটু-আধটু ঔষধ জানি।

খাজাঞ্চী। এ কোথাকার পাগল? এ দেশের যত প্রধান প্রধান মাল-বৈদ্য আছে,—সাপের রোজা আছে, সকলেই উপস্থিত হইয়াছে। কেহই কিছুই করিতে পারিতেছে না;—আর তুমি বলিতেছ,—'একটু-আধটু জানি।' এ একটু-আধটু অষুধের কর্ম্ম নয়।—তুমি আর বিরক্ত করিও না,—ঘরে যাও। অন্দরের ভিতর গিয়া, তোমার আর বেশী গোলমাল বাড়াইবার আবশ্যক নাই।

রঘুদয়াল। হুজুর! আমাকে মাপ করিবেন,—রাগ করিবেন না,—আমাকে অন্দরে যাইতে না দিন,—সাপটা কোথায় আছে, বলিতে পারেন? আসিবার সময় পথে শুনিয়াছি, সাপটা ধরিয়া রাখা হইয়াছে. সাপটী আমি একবার দেখিব।

খাজাঞ্চী। তুমি যে বড় জ্বালাতন ক'রে মারলে দেখ্‌ছি! ছিনে-জোঁকের মত ছাড়তে চাও না! সে প্রকাণ্ড গোখুরো সাপকে দেখে তোমার হবে কি বাপু? আর তার কাছে যাবেই বা কে?

রঘুদয়াল। সাপের কাছে যেতে কোন ভয় নাই।

খাজাঞ্চী। ঐ দেখ,—দু রসী দূরে—বকুল গাছের তলায় একটী বৃহৎ জালা দেখিতে পাইতেছ? ঐ জালার ভিতর সাপটী পূরিয়া রাখা হইয়াছে; সাপ যেমনি লম্বা, তেমনি মোটা। আমার হাতের দুই গাও হইবে। তেজ কি! প্রধান মাল, একবার ঐ জালার মুখের পাথর খুলিয়াছিল। তাহাতে সাপ, চক্রের জোরে সরা ঠেলিয়া ফেলিয়া, দু'হাত উচ্চে উঠিয়াছিল। সাপ নয়,—ও কাল সাপ! সর্ব্বনাশ করিও না,—ওর নিকটে তুমি যেও না।

রঘুদয়াল। আজ্ঞে, কিছু ভয় নেই।—আপনি চুপ করিয়া বসিয়া কেবল দেখুন।

খাজাঞ্চী। ওরে, বাপুরে! তুমি কি জালার সরা খুলবে

নাকি? সরা খুলো না, খুলো না!—সে সাপ কোন গতিকে যদি জালা হইতে বাহির হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সমগ্র গ্রামবাসীকে কামড়াইয়া মারিয়া ফেলিবে।

রঘুদয়াল। মহাশয়! আর গোল করিবেন না,—একটু চুপ করুন। দেখুন না, আমি কি করি। কোন ভয় নাই।

রঘুদয়াল ধীরে ধীরে জালার অভিমুখে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই সর্পের গর্জ্জন কাণে যাইতে লাগিল। নিকটে গিয়া, সেই গভীর গর্জ্জন শুনিয়া তিনি কহিলেন,—"সাপ, সাপ, সাপ!—বাছা, বাছা, বাছা! তুমি অত রাগ করিয়াছ কেন? তোমাকে ছাড়িয়া দিব,—যাহাকে কামড়াইয়াছ, তাহাকে তুমি বাঁচাও।"

রঘুদয়াল ধরা হইতে ধূলা কুড়াইয়া লইলেন। ডান হাতে ধূলা রহিল, বাম-হাত দিয়া পাথর নামাইয়া ধীরে ধীরে সরা খুলিলেন। সাপ ধীরে ধীরে মাথা তুলিল। সতৃষ্ণ নয়নে যেন রঘুদয়ালের পানে চাহিয়া রহিল। রঘু কহিলেন, "কেন বেটা! তোর ভয় কি?" এই কথা বলিয়া তিনি হাতের ধূলা সব মাটিতে ফেলিয়া দিলেন; কেবল কিঞ্চিন্মাত্র ধূলা,—তিল পরিমাণ ধূলা, সর্পের মাথায় ফেলিলেন। আবার রঘু কহিলেন, "বেটা! ভয় নাই, ভয় নাই; আমি তোকে ছাড়িয়া দিব। এখন তুই আমার সঙ্গে আয়!—যাকে তুই কামাড়াইয়াছিস্, তাকে তুই বাঁচা।"

রঘু তখন, ডান হাতের দ্বারা সাপের গলদেশ ধীরে ধীরে ধরিলেন। সাপ নির্জ্জীব, তেজোহীন,—ধীরে ধীরে আপনা-আপনি তাহার মাথা নীচু হইল। রঘু আপন দক্ষিণ হস্তের উপর সাপকে শোয়াইয়া রাখিল। সাপের লেজ, রঘুর স্কন্ধদেশ অতিক্রম

করিয়া, পৃষ্ঠে বেণীর ন্যায় দুলিতে লাগিল। সাপ নিদ্রিত হইল। রঘু কহিলেন, "বেটা! ঘুমা ঘুমা।"

এই অবস্থায়, দক্ষিণ হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক, রঘু সর্প লইয়া, আহ্লাদে স্ফীতবক্ষ হইয়া, যথাসাধ্য দ্রুতপদে আসিয়া, খাজাঞ্চীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "বাবু মহাশয়! ভয় নাই, ভয় নাই, রোগী জীবিত হইবে। সর্প ভদ্রজাতীয়; রোগীর কোন ভয় নাই। নানা জাতীয় গোখুরা আছে। বন্য-গোখুরা হইলে কিছুতেই আমার কথা শুনিত না, রোগীও আরাম হইত না।"

খাজাঞ্চী—"সর্ব্বনাশ হইল, সর্ব্বনাশ হইল" বলিয়া বেগে পলাইবার উপক্রম করিল। এমন সময় বাবুর বাটীর একজন দ্বারবান কাঁদিতে কাঁদিতে বাহিরে আসিয়া কহিল, "খাজাঞ্চী মহাশয়! ছোট বাবু আর রক্ষা পাইলেন না।—আপনি শীঘ্র আসুন, কর্ত্তা ডাকিতেছেন।"

এই কথা বলার পর, দ্বারবানের নয়ন রঘুদয়ালের উপর পড়িল। দ্বারবান্ তাহাকে একবার দেখিল, দুইবার দেখিল,—তথাপি তাহার প্রতীতি জন্মিল না,—তিনবার দেখিল। শেষে কহিল, "একি! একি! এই যে দেখিতেছি,—গুরুজী নয়?—গুরুজীই বটে।"

দ্বারবান্ গুরুজীর পদতলে পতিত হইয়া তাহার পায়ের ধূলা মাথায় লইল; কহিল, "গুরুজী! রক্ষা করুন,—বড় বিপদ্! গুরুজী আপনি এত কাহিল কেন? আমি ত চিনিতে পারি নাই।"

রঘু আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "বীরে! বেঁচে থাক্; আমাকে চিন্‌তে পেরেছিস্ ত?"

দ্বারবানের নাম বীরবাহু। জমিদারের গৃহ-রক্ষক। বীরবাহুর শিক্ষক—রঘুদয়াল। তাহার নাম যেমন বীরবাহু,—বাহুদ্বয়ও

তেমনি আজানুলম্বিত। বীরবাহু প্রথমে ডাকাতের দলে ছিল; সর্দ্দার হইয়াছিল। রঘুর উপদেশে ডাকাতি ছাড়িয়া, গৃহস্থের গৃহে দ্বারবান্ হইয়াছে। বীরবাহু কাঁদিতে কাঁদিতে রঘুকে কহিল, "আপনি যখন আসিয়াছেন, তখন আর কোন চিন্তা নাই,—ছোট বাবু রক্ষা পাইবেন। শীঘ্র আসুন আমার সঙ্গে "

খাজাঞ্চী এই ব্যাপার দেখিয়া একেবারে হতভম্ব! বীরবাহু অগ্রে অগ্রে, মধ্যস্থলে রঘু, আর খাজাঞ্চী বিশ হাত অন্তরে—এই ভাবে তিন জনে অন্দরাভিমুখে যাইতে লাগিল।

—————

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

গোখুরা সাপে দংশন করিলে মানুষ বাঁচে কি? ডাক্তার কৃতান্তকুমার বি, এ, এম, বি, বলিয়া উঠিলেন, "না,—বাঁচে না। সাপ, কামড়াইবার পর, ক্ষতস্থানে বিষটী যদি ঢালিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে মানুষ কিছুতেই বাঁচে না। জগতে এমন কোন শক্তি নহে যে, তদ্দ্বারা সে বিষের কিঞ্চিন্মাত্রেও গতির প্রতিরোধ হইতে পারে।"

ডাক্তার-পুঙ্গব ভৈরব বাবু এম, ডি, একথার অনুমোদন করিয়া কহিলেন, "ঠিক্ কথা। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মণী, আমেরিকার বড় বড় শুভ্রচর্ম্ম বিশিষ্ট ডাক্তারগণ এ পর্য্যন্ত এ রোগের ঔষধ বাহির করিতে পারেন নাই; এবং আমি নিজে কোন সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে পুনর্জ্জীবন লাভ করিতে দেখি নাই।"

বাবু বিক্রমকেশরী,—বৈজ্ঞানিক নরশার্দ্দূল কহিলেন,—বিজ্ঞা-

নের বল অসীম অনন্ত হইলেও, বিজ্ঞান-বলে এক-মুহূর্ত্তে শত যোজন দূরস্থ পথের সংবাদ আনিতে পারিলেও, বিজ্ঞান কিন্তু এইখানে পরাজিত। বিজ্ঞানের ফাঁদ পাতিয়া চাঁদ ধরিতে পারি,—অধিক কি, এই বিজ্ঞান-বাগুরায় সমগ্র পৃথিবীকে বদ্ধ করিতে পারি, কিন্তু বিজ্ঞান সর্পদষ্ট ব্যক্তির নিকট অজ্ঞান।"

হলধর হোমিওপ্যাথ কহিলেন,—"সমস্ত কথাই যথার্থ। আমি কলেরার ভয় করি না, বসন্তে ভয় করি না, বিউবনিক প্লেগেও আমি অভয় দিয়া থাকি; কিন্তু যাই শুনিলাম, সাপে কামড়াইয়াছে, অমনি বুঝিলাম, রোগীর মৃত্যু নিশ্চিত।"

স্বদেশহিতৈষী, সুবক্তা শ্রীমান্ মহেন্দ্রনাথ ম্যাটসিনি বলিলেন—"আমি যদি সে সময় জীবিত থাকিতাম, অন্ততঃ আমি যদি সে সময় মাতৃগর্ভ হইতে বহির্গত হইতে পারিতাম,—যে সময় ডাক্তার ফেরার, এই ভারতীয় দীন প্রজাপুঞ্জের রক্তস্বরূপ এক লক্ষ টাকা গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে লইয়া, সর্পদংশন-চিকিৎসার বৃথা পরীক্ষা আরম্ভ করেন,—তাহা হইলে আমি তখন এরূপ প্রবলবেগে, বিরাট, বিশাল, বিষম আন্দোলন উপস্থিত করিতাম, দ্বাদশ দেবদারু তুল্য দীর্ঘ দীর্ঘ এত অধিক আবেদন করিতাম, হিমালয়ের তুঙ্গশৃঙ্গে দাঁড়াইয়া এরূপ অভ্রভেদী বিকট বক্তৃতা করিতাম যে, তাহাতে এই প্রলয়প্রতাপ বৃটিশ-সিংহ ভয়ে কম্পিত-কলেবর হইয়া আমার শরণ লইতেন!"

ফলতঃ, অধুনা ইহাই শুনিতে পাই, সভ্য-জগতে এবং শিক্ষিত জগতে সাপে-কামড়ানর ঔষধটী নাই। সুতরাং উকীল, হাকিম, স্কুল-মাষ্টার, ষ্টেশন-মাষ্টার, পোষ্টমাষ্টার পর্য্যন্ত বলেন, গোখুরা সাপে কামড়াইলে মানুষ আর বাঁচে না।

সভ্য-জগতে, শিক্ষিত-নগরীতে সাপের কামড়ের ঔষধ না থাকুক, কিন্তু অসভ্য-জগতে, অশিক্ষিত-পল্লীতে, কোন কোন ইতর ব্যক্তির নিকট সাপে-কামড়ানর উত্তম উত্তম ঔষধ ছিল। এখনও বুঝি কিছু কিছু আছে। সভ্যতার এত তীব্র বিভীষণ অগ্নিরশ্মিতেও বুঝি, আজিও সে সব মহৌষধ ভস্মীভূত হয় নাই!

রঘুদয়ালের কালে সভ্যতা কিঞ্চিৎ কম ছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া-রেল-পথের হাবড়ার ষ্টেশনে, তখন বনিয়াদ পত্তন আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। বহু লোক ঐ স্থানে জঙ্গল-কাটা-কার্য্যে তখন নিযুক্ত আছে মাত্র। সুতরাং তখন সভ্যতা-শ্বেত-পদ্মের কুড়ীটী মাত্র দেখা দিয়াছে। কাজেই, সে সময় রঘুদয়ালের নিকট সাপে কামড়ানর ঔষধ ছিল।

গ্রন্থকারও কিঞ্চিৎ অসভ্য। তিনি বিশ্বস্ত লোকের মুখে, সফল-সর্পচিকিৎসার কথা শুনিয়াছেন; বিষাক্ত-সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে আরোগ্য লাভ করিয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে দেখিয়াছেন!

আমাদের দেশে, বিশেষতঃ হুগলী-বর্দ্ধমান-বাঁকুড়া জেলায় আগে ঝাঁপান হইত। এখনও কোথাও কোথাও হয়। আগে হইত—মহা-সমারোহে এবং বহুগণ্ডগ্রামে; এখন হয়—নীরবে নিভৃতে স্বল্পসংখ্যক গ্রামে। ঝাঁপানের দেবতা মহাদেব মনসা ইত্যাদি। বহু দূরদেশ হইতে, বহু মাল-বৈদ্য-ওঝা একত্র হইত। তাহারা সঙ্গে করিয়া বহুবিধ ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর বিষাক্ত সর্প আনিত; বড় বড় ধুরন্ধর সর্প-ওস্তাদ আসিত। অসংখ্য শিষ্যের সংখ্যা গণনা করে কে? শিব-মন্দির-সমক্ষে বাঁশের বা কাঠের উচ্চ উচ্চ

মঞ্চ নির্ম্মিত হইত। এইরূপ বহুসংখ্যক বড় বড় মঞ্চ শিব-প্রাঙ্গণে সুশোভিত হইত। এক মঞ্চের সহিত অপর মঞ্চ, বাঁশ বা কাঠের দ্বারা সংলগ্ন থাকিত; ইচ্ছা করিলে, এক মঞ্চের লোক বাঁশ বা কাঠের উপর দিয়া, অপর মঞ্চে যাইতে পারিত। ওস্তাদগণ শিষ্য-সহ সাপের বহুসংখ্যক ঝাঁপি বা পেটারী লইয়া, সেই উচ্চ মঞ্চের উপর উঠিত এবং সর্পের বিষম খেলা আরম্ভ করিত।

ওস্তাদগণ তখন উন্মত্ত-প্রায়। এইজন্য একটা কথা আছে,—'ঝাঁপানে মাতিয়াছে।' প্রথমতঃ ওস্তাদগণ-মধ্যে বাদানুবাদ চলিল,—"এ সংসর কেহ কোন নূতন বিষাক্ত সর্প আনিতে পারিয়াছ কিনা?" যদি কোন ওস্তাদ কহিল যে, "হাঁ, পারিয়াছি" তখন তাহাকে প্রশ্ন করা হইল,—"এই সাপে কামড়াইলে, বাঁচাইবার ঔষধ আবিষ্কার করিতে পারিয়াছ কিনা?" যদি কোন ওস্তাদ কহিল যে, "হাঁ পারিয়াছি," অমনি চারিদিকে এক জয়-জয়-ধ্বনি উত্থিত হইল। প্রথমতঃ সেই সর্প, সর্ব্বসমক্ষে প্রদর্শিত হইল! অন্যান্য ওস্তাদগণ বাদানুবাদ আরম্ভ করিল, সর্প নূতনজাতীয় না পুরাতন? যখন বাদানুবাদে ঠিক হইল যে, সেই সর্প নূতন, তখন সেই ওস্তাদের আর সম্মানের সীমা রহিল না।

প্রথমতঃ এই কার্য্য শেষ হওয়ার পর, সর্পের অন্যরূপ প্রদর্শন আরম্ভ হইল। কোন ওস্তাদ তাহার শিষ্যের সর্ব্বাঙ্গ, সর্প দ্বারা ভূষিত করিল;—সর্পের উষ্ণীষ মাথায় পরাইল,—কুণ্ডলাকারে মস্তকে বেষ্টন করিয়া, সর্প ঠিক মধ্যস্থলে চক্র ধরিয়া রহিল। কোন সর্প কণ্ঠমালায় পরিণত হইল; কোন সর্প বলয় হইল; কোন সর্প মেখলার ন্যায় শোভিত হইল;—এইরূপে যে ওস্তাদ যতদূর পারিল, আপন আপন শিষ্যকে, সাধ্যানুসারে, ততদূর

সাজাইল। দর্শকমণ্ডলী-মধ্যে যদি কেহ বলিলেন,—“এই সাপ দুর্ব্বল, নিস্তেজ এবং ইহাদের বিষদন্ত ভগ্ন,—উহারা ছয় মাস বা এক বৎসর খাইতে না পাইয়া একরূপ মৃতের ন্যায় হইয়া আছে, তাই ঐ সর্পগুলিকে লইয়া মাল-বৈদ্যগণ যেরূপ ইচ্ছা নত করিতেছে এবং যথেচ্ছভাবে উহাদিগকে লইয়া ব্যবহার করিতেছে;— তাহা হইলে ওস্তাদ কহিল,—“কি বলিলেন মহাশয়! সাপ তেজোহীন, সাপের বিষদাঁত নাই? এই দেখুন, এই পরীক্ষা লউন!”

ওস্তাদ আপন রাক্ষসী ভাষায় কি এক অবোধ মন্ত্র-উচ্চারণ করিল। তখন সেই শিষ্যের মস্তকস্থ সর্প ক্রমশঃ স্ফীত হইতে লাগিল; চক্র আরও বৃহৎ হইল; চক্ষু ধক্ ধক্ জ্বলিতে লাগিল। আবার কি এক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ওস্তাদ সর্পের গায়ে হাত দিল,—সর্প ফোঁস ফোঁস গর্জ্জন আরম্ভ করিল। তখন ওস্তাদ কহিল, “মহাশয়! সর্প নীচে যাইতেছে, আপন বিক্রম দেখাইবে. আপনারা সাবধান হউন!”

সর্প ফণা বিস্তার করিয়া গভীর-গর্জ্জনে শিষ্যের মস্তক হইতে নিম্নাভিমুখে চলিল। লোক-সমূহ ভয়ে পলাইতে আরম্ভ করিল। ওস্তাদ কহিল,—“পলাইবেন না, সর্প মানুষ কামড়াইবে না। ছাগ আনিয়া দিউন,—দেখিবেন, সর্প দংশন করিবামাত্রই অৰ্দ্ধদণ্ড মধ্যে ছাগের প্রাণ-বিয়োগ হইবে। তখন বুঝিবেন, সর্পের বিষদাঁত ভগ্ন কি না?”

ছাগল আসিল; সাপ কামড়াইল। দেখিতে দেখিতে ছাগলের গায়ে যে সকল পোকা ছিল, টপ টপ পড়িতে লাগিল। ছাগলও অনতি-বিলম্বে মা মা রবে ভূতলে পতিত হইল। লোক সকল চমকিত হইল।

ওস্তাদের আদেশ-মত শিষ্য, সর্পের নিকট গিয়া, তাহার অঙ্গে ধূলার গুড়া কিঞ্চিৎ নিক্ষেপ করিল। সর্প আবার নিস্তেজ, নিষ্প্রভ এবং সঙ্কুচিত হইল। আবার শিষ্য সেই সর্পকে আপন মাথায় উষ্ণীষবৎ পরিল।

নানা রঙ্গের, নানা অবয়বের, নানা মুখের সর্পসমূহ ঝাঁপানে প্রদর্শিত হইত। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, হলুদবর্ণ, মিশ্রবর্ণ—বর্ণের তারতম্যই বা কত! বর্ণনা ভাষায় কুলায় না,—চক্ষে গিয়া দেখিতে হয়। কোন কোন গোখুরা-সর্প অতি দীর্ঘ—আট হাতের কম নহে; কোন সর্প বাননাবতার, কুলার মত প্রকাণ্ড চক্র; কিন্তু দৈর্ঘ্যে এক হাত বা দেড় হাতের অধিক নহে।

সর্প-প্রদর্শনের পর সর্প-যুদ্ধ। ভীষণ অলৌকিক ব্যাপার, তার পর সর্প-দংশন। এইবার প্রাণ লইয়া টানাটানি। কোন ওস্তাদ দর্শক-মণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে,—"দেখ, এই বিষাক্ত মহা কালসর্প আমার জিহ্বায় দংশন করিবে; আমি কিন্তু মরিব না;—মন্ত্র ও ঔষধ-সাহায্যে বাঁচিয়া উঠিব।" ওস্তাদ জিহ্ব বাহির করিল; তেজস্বী সর্প সজোরে জিহ্বায় দংশন করিল। আদেশমত শিষ্যগণ ওস্তাদকে ঔষধ খাওয়াইল; মন্ত্র উচ্চারণ করিল। তথাচ ওস্তাদ নিস্তেজ হইয়া পড়িল। মঞ্চের উপর শুইবার চেষ্টা করিল,—শিষ্যগণ শুইতে দিল না, ধরিয়া বসাইল। দুই ঘণ্টা কাল ঔষধ-সেবন এবং মন্ত্রোচ্চারণের পর আবার অল্পে অল্পে ওস্তাদ জাগিতে লাগিল। শুষ্ক তরু অল্পে অল্পে যেন সজীব হইয়া উঠিল। ওস্তাদ প্রাণ পাইল, হাসিল এবং বলিল,—"আমার এ ঔষধ ধন্বন্তরি সুধা!" যদি কেহ বলিত, "সর্পের বিষদন্ত ভগ্ন" তাহা হইলে আবার ছাগল দ্বারা পরীক্ষা হইত।

এইরূপে সর্পের খেলা প্রদর্শিত হইবার পর, ওস্তাদগণ, জনসাধারণ-মধ্যে, সর্প-দংশনের ঔষধ বিতরণ আরম্ভ করিত। বলিত,—"মন্ত্রাদি শিখিবার কাহারও সামর্থ্য নাই এবং অযোগ্য পাত্রে মন্ত্রাদির কথা বলাও গুরুকর্ত্তৃক নিষিদ্ধ আছে। কিন্তু দেখিও, সাপে কামড়ানর ঔষধ দিয়া, কাহারও নিকট হইতে পয়সা লইও না। যে ব্যক্তি পয়সা লয়, তাহার পাপের সীমা থাকে না। অধিকন্তু ঔষধেও শুভ-ফল ফলে না। অতএব সাবধান! পয়সা লইও না।"

ঝাঁপান এখনও কোন কোন গ্রামে আছে বটে, কিন্তু সেরূপ মহোৎসব হয় না, গুণী ওস্তাদও আসে না; সেরূপ ঔষধ মিলে না এবং সেরূপ মন্ত্রশক্তিও দৃষ্ট হয় না।

মাল-বৈদ্যগণ-কর্ত্তৃক সফল-সর্প-চিকিৎসা লুপ্ত হইবার প্রধান কারণ;—সমাজের উপেক্ষা যতই ইংরাজি শিক্ষার আড়ম্বর বৃদ্ধি হইতে লাগিল, শিক্ষিতগণ ততই মাল-বৈদ্যকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। মাল-বৈদ্যের গায়ে ইস্তিরি-করা পিরিহান নাই, পায়ে জুতা নাই, বুক পকেটে ঘড়ি নাই, মাথায় এলবার্ট টেড়ী নাই,—মাল-বৈদ্য ঘৃণার চক্ষে দৃষ্ট না হইবে কেন? জুড়ী হাঁকাইয়া চিকিৎসা করিতে যায় না,—মাল-বৈদ্য রোগী দেখিয়া প্রিসক্রিপ্‌সন করে না, ভিজিট লয় না, মাল-বৈদ্য ঘৃণাব চক্ষে দৃষ্ট না হইবে কেন? হাঁটুর-উপর উঠা ময়লা কাপড়-পরা, কোমর বাঁধা, ঝাঁকড়-মাকড় চুল, নথ ডাগর, পায়ের তলা ফাটা, আঙ্গুলগুলা বাখারি-বাখারি, রং কালো,—হে ইংরেজি বিজ্ঞান-বীরেশ্বর! এরূপ মাল-বৈদ্যের সহিত তোমার কথা কহিতে কষ্টবোধ না হইবে কেন? যাহাকে স্পর্শ করিলে হস্তধৌতের জন্য তোমাকে একখানি সাবান

ব্যয় করিতে হইবে, তাহাকে কি তুমি সহজে ঘরে স্থান দিতে চাও? শিক্ষার গুণে, মাল-বৈদ্য দেখিয়াই তোমার মনে হইবে,—এ বেটা কিছুই জানে না,—ভণ্ড, চোর এবং নরঘাতী!—দুইটা শিকড়-মাকড় দিয়া, দুইটা মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, ভুলাইয়া লোকের নিকট পয়সা উপার্জ্জন করাই ইহার ব্যবসা। বিশেষতঃ যখন ইউরোপের সমগ্র বৈজ্ঞানিক বীরগণ এ পর্য্যন্ত সর্প-দংশনের ঔষধ ঠিক করিতে পারেন নাই, তখন যে ঐ নেকূড়া-পরা, নিরক্ষর, অসভ্য বর্ব্বর জীব সর্পদংশনের সুচিকিৎসা জানিবে, ইহা কি কখন সম্ভব হয়?

এইরূপে দেশে সভ্যতালোক যতই প্রবেশ করিতে লাগিল, আলোকভীত পেচকের ন্যায় মাল-বৈদ্যগণ ততই লুক্কাইত, অন্তর্হিত হইতে থাকিল।

প্রাচীন ঋষি-প্রণীত গ্রন্থেও সর্পচিকিৎসার বিষয় বিস্তৃত বর্ণিত হইয়াছে। চরক পাঠ করুন, দেখিবেন অতি বিশদভাবে সর্প-চিকিৎসাপ্রকরণ সুলিখিত রোগের নানা অবস্থায় নানারূপ ঔষধের উল্লেখ আছে। সময়ে সময়ে গ্রন্থকার দর্প করিয়া বলিয়াছেন যে, রোগীর এই অবস্থায় এই ঔষধ প্রযুক্ত হইলে রোগী নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। হিন্দু-চিকিৎসা-শাস্ত্রে এক হিসাবে, চরক মাথার মুকুট-স্বরূপ! চরককে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুরু বলিয়া অনেকে মান্য করিয়া থাকে। আজ চরকের আংশিক অনুবাদ পড়িয়া ইউরোপ, আমেরিকা বিমোহিত। সেই মহাপ্রাজ্ঞ চরক, লোক ভুলাইবার জন্য মিথ্যা করিয়া, সর্পদংশন চিকিৎসা-বিষয়ক প্রবন্ধ এরূপ বিশদ এবং বিস্তৃত ভাবে লিখিবেন,—ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য কথা? না বুদ্ধি-মানের ধারণায় আইসে? তবে দুঃখ এই, চরকের চিকিৎসা এখন

উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পরীক্ষা করিয়া ফল দেখিবার লোক, এখনও জন্মগ্রহণ করে নাই। চরক, যে সকল গাছগাছড়া এবং শিকড়ের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ এখন লোকে চিনেই না। গুরু-উপদেশ ভিন্ন, চিনিয়া লইবারও এখন উপায় নাই,—কিন্তু গুরু নাই।

এইরূপ নানাকরণে এদেশে অধুনা সকল সর্পচিকিৎসা লোপ পাইয়াছে। আর আমরাও সর্পদংশনের চিকিৎসা নাই বলিয়া নিশ্চিন্ত আছি। কারণ, ইংরেজ বলিয়া দিয়াছেন,—সর্পদংশনের চিকিৎসা নাই।

তাই, রঘুদয়ালের ন্যায় সর্পচিকিৎসকও এখন আর দেখা যায় না। পাঠকের অবগতির জন্য বলিয়া রাখি, রাইট সাহেব নামক একজন ইংরেজ মাজিষ্ট্রেরের কন্যাকে সর্পদংশন করিলে, রঘুদয়াল সুচিকিৎসায় তাঁহাকে আরোগ্য করেন। বিলাতের কোন বৈজ্ঞানিক পত্রে সেই সময় এই অপূর্ব্ব চিকিৎসার কথা মৃতপ্রায় রোগীর জীবন-প্রাপ্তির কথা,—লিখিত হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে আন্দোলনও একটু আধটু তাৎকালিক ইংরেজ-বৈজ্ঞানিক চিকিৎসকদলমধ্যে হইয়াছিল। কিন্তু সে আন্দোলন স্থায়ী হইল না। যেমনই উদয়,—তেমনই বিলয়।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রঘুদয়াল হস্তে সর্প স্থাপনপূর্ব্বক বীরবাহুর সহিত জমিদারের অন্দরে পৌছিলেন। পৌছিয়াই, একটী হাঁড়ির ভিতর সর্পকে সযত্নে সংরক্ষণ করিলেন। হাঁড়ির মুখে সরা ঢাকা দিয়া, অর্দ্ধস্ফুট স্বরে কয়েকটী মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন।

জমিদার-পুত্রের বয়ঃক্রম পনর বৎসরের অধিক হইবে না। উজ্জ্বল গৌরকান্তি দেহ, সর্প-বিষে জর্জ্জরিত হইয়া, যেন নীলবর্ণ হইয়াছে। রোগী চেতনাহীন; জিহ্বা কতকটা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মুখ দিয়া অল্প অল্প ফেন নির্গত হইতেছে। নয়নদ্বয় রক্তজবা-কুসুমের ন্যায় লালবর্ণ।

রঘুদয়াল রোগীর অঙ্গে হাত বুলাইতে লাগিলেন। স্বয়ং জমিদার, তাঁহার পত্নী এবং তাহার মাতা,—গভীর আর্ত্তনাদ করিয়া রঘুদয়ালকে কহিলেন, "তুমি কে তাহা জানি না। যদি এই বালকের প্রাণদান দাও, তাহা হইলে, তুমি যাহা চাহিবে, তাহা দিব,—সর্ব্বস্ব দান করিব।"

রঘুদয়াল যোড়হাতে কহিলেন, "মা! কথা কহিবেন না। এ সময় যদি কাঁদেন এবং আমার সহিত কথা ক'ন, তাহা হইলে আমি রোগী আরাম করিতে পারিব না। আমি যাহা করি, তাহা নীরবে দেখুন এবং যাহা চাহি, তাহা নীরবে প্রদান করুন। কোন কথা কহিবেন না, কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন না, কোনরূপ তর্ক করিবেন না।"

সকলে নীরব হইলেন। রঘুদয়াল কহিলেন,—"এখানে আট জন লোকের অধিক থাকিতে পারিবে না। এই যে প্রায় পাঁচ

শত লোক অন্দরে উপস্থিত, ইহাঁদের সকলকে যোড়হাতে বলুন "আপনারা এখন বহির্ব্বাটীতে থাকুন; আমি যখন ডাকিব, তখন আপনারা আসিবেন।"

রঘুদয়ালের কথা শুনিয়া সর্ব্বলোক বহির্ব্বাটীতে গিয়া উপবেশন করিল। রঘুদয়াল কহিলেন,—"যে আট জন আপনারা এখানে থাকিবেন, রোগীর নিকটে কেহ বসিতে পাইবেন না,— অন্ততঃ দশ হাত দূরে অবস্থিতি করুন।"

বালকের পিতা, মাতা, পিতামহী প্রভৃতি দশ হাত দূরে গিয়াই উপবেশন করিলেন। বীরবাহু পাঁচ হাত দূরে রহিল। রঘুদয়ালের পরিচিত কোন এক জন ওস্তাদ মাল-বৈদ্য কেবল রঘুদয়ালের নিকট থাকিল।

রঘুদয়াল, কর্ত্তাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"এইবার আমি যাহা চাহিব, তাহা আমাকে আনাইয়া দিন। প্রথমতঃ একখানি ক্ষুর দিন এবং বৃহৎ একখানি শিল এবং তদুপযুক্ত একটী নোড়া দিন।

ক্ষুর আসিবামাত্র, রঘুদয়াল স্বহস্তে বালককে ঝটিতি নেড়া করিয়া দিলেন। যেন কত কালের শিক্ষিত পরামাণিক! রঘুদয়াল তিন কলসী শীতল জল চাহিলেন; পরিচিত মাল-বৈদ্যকে কহিলেন, "ধীরে ধীরে রোগীর মাথায় তুমি শীতল জল ঢালিতে থাক। আমি ঔষধ বাটিতে আরম্ভ করি।"

জমিদার-পুত্রকে সর্পে আঘাত করিয়াছে, এই সংবাদ পথে পাইয়াই রঘুদয়াল নদীর ধার হইতে কতকগুলি গাছগাছড়ার শিকড় বাছিয়া সঙ্গে আনিয়াছিলেন। রঘুদয়াল তন্মধ্যে হইতে কতকগুলি শিকড় লইয়া, স্বহস্তে শিলে বাটিতে আরম্ভ করিলেন। উত্তমরূপ

বাটা হইলে, রঘুদয়াল তাহার একখানি রুটী প্রস্তুত করিলেন। সেই রুটীখানি লইয়া রোগীর মাথায় টুপির মত বসাইয়া দিলেন।

রঘুদয়াল দুইটী পাতা বাছিয়া ধুইয়া লইলেন। সম্মুখে পত্রদ্বয় রাখিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিলেন। শিল ধুইয়া পাতা দুইটীকে নোড়া দিয়া থেঁতো করিলেন। তার পর পাতার রস নিঙ্‌ড়িয়া ক্ষুদ্র এক পাথর-বাটীতে রাখিলেন। একটী ঝিনুক লইয়া, সিকি তোলা আন্দাজ রস তাহাতে ঢালিলেন; রোগীর মুখে দিলেন। কিন্তু রোগীর রসপানের শক্তি আর নাই; রস অল্পে অল্প মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িতে লাগিল।

রঘুদয়াল তখন রোগীর দক্ষিণ এবং বামবাহু ক্ষুর দ্বারা অতি অল্প পরিমাণ চিরিয়া ফেলিলেন। তাহাতে অল্প অল্প রস ঢালিয়া দিলেন এবং কি একরকম আটা দ্বারা সেই ক্ষত স্থানের মুখ বন্ধ করিলেন। তৎপরে কাপড় জড়াইয়া সূত্র দ্বারা বাঁধিয়া রাখিলেন। পৃষ্ঠদেশ ক্ষুর দ্বারা ঐরূপ অল্প পরিমাণ চিরিয়া ফেলিলেন। ঐরূপ ভাবে ক্ষতস্থানের উপর রস ঢালিয়া দিলেন। ঐরূপ ভাবে আটা দিয়া ক্ষতস্থানের মুখ বন্ধ করিলেন এবং ঐরূপভাবে কাপড় দিয়া বান্ধিয়া রাখিলেন।

সর্প, বালকের দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে দংশন করিয়াছিল। রঘুদয়াল, এইবার সেই স্থানের পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। ক্ষুর দ্বারা দষ্ট স্থানটীকে রঘুদয়াল খণ্ড খণ্ড করিয়া চিরিলেন। একটী মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক ক্ষতমুখে একখানি শ্বেতবর্ণ পাথর বসাইয়া দিলেন। আর একটী পাতার রস লইয়া, রঘুদয়াল বালকের নাসারন্ধ্রে এবং কর্ণবিবরে ঢালিয়া দিলেন। সর্পদষ্ট স্থানের আট অঙ্গুল উপরিভাগে, রঘুদয়াল ক্ষুর বসাইলেন। একটু বেশী করিয়া

চিরিলেন। সেই কর্ত্তিতস্থানে রঘুদয়াল আপন মুখ সংলগ্ন করিয়া, বালকের গায়ের রক্ত চুষিতে আরম্ভ করিলেন। চুষিয়া কালো ঝুলের ন্যায় রক্ত তিনি মুখ দিয়া বাহির করিতে লাগিলেন। কিছু-ক্ষণ এইরূপ রক্ত বাহির করিয়া, রঘুদয়াল সেই ক্ষত-মুখে আর একখানি সাদা পাথর বসাইয়া দিলেন।

রঘুদয়াল এইবার কর্ত্তাকে কহিলেন, "উত্তম দধি পান্তাভাত, আমানি এবং ডাব দুইটী ও মাছের ঝোলের আপনি শীঘ্র যোগাড় করুন।"

কর্ত্তা তথাস্তু বলিয়া চলিলেন। গৃহিণী এবং তাঁহার শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণী তাঁহার অনুগমন করিলেন। তখন রঘুদয়াল এক অপূর্ব্ব স্বরে, অবোধ্য ভাষায়, একান্ত মনে মন্ত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন।

মন্ত্রের ভাষা বাঙ্গালা, কি হিন্দী, কি হিব্রু, কি সংস্কৃত,—তাহার কিছুই বুঝিবার যো নাই। ভাষা পদ্য কি গদ্য, তাহাও বুঝিবার শক্তি নাই। কখন সুর অতি উচ্চে উঠিতেছে, কখন বা সুর অতি নিম্নে নামিতেছে। রঘুদয়াল কখন হাসিতেছেন, কখন কাঁদিতেছেন, কখন বিরক্তি-ভাব প্রকাশ করিতেছেন, কখন বা মধুর কণ্ঠে মন্ত্র সঙ্গীত গাহিতেছেন, কখন মার মার শব্দ করিতেছেন, কখন বা বিকট অশ্লীল ভাষা উচ্চারণ করিতেছেন। সেই সকল বদ্‌খত বিশ্রী কথা শুনিলে কর্ণে অঙ্গুলি দিতে হয়। কিন্তু রঘুদয়াল তখন যেন উন্মত্ত,—বাহ্যজ্ঞান যেন নাই বলিলেই হয়। একগাছি ছোট বাঁশের কঞ্চি লইয়া, রঘুদয়াল কখন আপনার অঙ্গে প্রহার করিতেছেন, কখন ভূমিতলে প্রহার করিতেছেন, কখন বা ধীরে ধীরে রোগীর অঙ্গে মারিতেছেন; কখন বা হাঁড়ীর সরার উপর

আঘাত করিতেছেন। এইরূপ প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টাকাল রঘুদয়াল মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন।

বকিয়া বকিয়া তাঁহার গলার স্বর ভাঙ্গিয়া গেল। শেষে রঘুদয়াল হাঁড়ীর ভিতর হইতে সর্প বাহির করিলেন। সর্পকে সম্মুখে রাখিয়া তিনি, একবার মনে মনে মন্ত্র বলিতে লাগিলেন। নির্জ্জীব সর্প ক্রমশঃ সজীব হইতে লাগিল; সজীব হইয়া সুবৃহৎ চক্র ধরিয়া যেন দাঁড়াইয়া উঠিল। সর্পের স্বাভাবিক ধীর গর্জ্জন এবার আরম্ভ হইল। রঘুদয়াল তখন আহ্লাদে স্ফীত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া, গদ্গদ-কণ্ঠে হাততালি দিতে দিতে, নাচিতে নাচিতে কহিলেন,—"মা-ঠাকুরুণ! আর ভয় নাই, আপনার পুত্র প্রাণ পাইবে। কিন্তু সর্পকে ছাড়িয়া দিতে হইবে, মারিতে পাইবেন না।"

রঘুদয়াল,—রোগীকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, নয়নদ্বয় আর লালবর্ণ নাই। ক্ষতস্থানে সংলগ্ন সেই শ্বেত-পাথর দুই খানি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে; দেখিতে দেখিতে পাথর দুইখানি খসিয়া পড়িল। শিকড় বাটিয়া রঘুদয়াল রোগীর মাথায় যে প্রলেপ দিয়াছিলেন, সেই প্রলেপের রুটী খানি, রঘুদয়াল ধীরে ধীরে তুলিলেন। দেখিলেন, এক বিপরীত নিটোল ফোস্কা হইয়াছে। ক্ষুর দ্বারা সেই ফোস্কা রঘুদয়াল গালিয়া দিলেন। প্রায় এক পোয়া কালো রস নির্গত হইল।

রঘুদয়াল আবার হাততালি দিয়া নাচিতে লাগিলেন। রোগী চিৎ হইয়া পড়িয়াছিল; জিহ্বা কখন যে মুখের ভিতর অলক্ষিত-ভাবে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা কেহ দেখে নাই। দেখিতে দেখিতে রোগী পাশ ফিরিয়া শুইল।

পুত্রের পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন দেখিয়া, অদূরস্থিত পিতা-মাতার অন্তরে আনন্দ আর ধরে না। মায়ের চোখ দিয়া দরদরিত-ধারে জল পড়িতে লাগিল। রঘুদয়াল কহিলেন, "মা, কাঁদেন কেন? আর এক ঘণ্টা মধ্যে আপনার পুত্র জীবিত হইয়া উঠিবে।"

মাতা, স্ত্রীজন-সুলভ লজ্জা ত্যাগ করিয়া রঘুদয়ালকে উত্তর দিল,—"আমি আর থাকিতে পারিতেছি না;—তুমি অনুমতি কর, আমি ছেলেকে একবার বুকে লই।"

রঘুদয়াল কহিলেন,—"মা, একটু ধৈর্য্য ধরুন, কোলে করিবার কাল শীঘ্রই আসিতেছে।"

রঘুদয়াল একটী পাতার রস নিঙড়িয়া বাটীতে রাখিলেন। কহিলেন,—"শীঘ্র একটু টাটকা দুধ গরম করিয়া আনিয়া দিন।"

তৎক্ষণাৎ গো-দোহন হইল। দুধ গরম করা হইল। রঘু-দয়াল আধসের আন্দাজ দুধ লইলেন। সেই পাতার রস দুগ্ধে মিশাইয়া দিয়া, ছোট একখানি ঝিনুকে করিয়া, বালকের মুখে অল্পে অল্পে দিতে দিতে লাগিলেন।

দুধ এবার বালকের গণ্ড বহিয়া পড়িল না,—উদরস্থ হইল। রঘুদয়াল কহিলেন; "দেখুন মা! আপনার সন্তান দুগ্ধ খাইতেছে! আসুন, নিকটে আসুন, দেখুন,—কিন্তু কথা কহিবেন না। কাঁদিবেন না।"

মাতা,—পুত্রের নিকটে আসিল, বসিল, অনিমেষ নয়নে সন্তানের মুখপানে চাহিয়া রহিল।

বালক আবার পাশ ফিরিয়া শুইল। বালক এক একবার চক্ষু মুদে; এক একবার চক্ষু চাহে। আবার চক্ষু চাহিয়া বালক রঘুদয়ালকে দেখিল। অধিক দূর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে সক্ষম

হইল না। রঘুদয়ালকে দেখিয়া বালক চক্ষু নিমীলিত করিয়া, যেন বিশ্রাম করিতে লাগিল।

অর্দ্ধ দণ্ড পরে পুনরায় বালক চাহিয়া রঘুদয়ালকে দেখিল। ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, তুমি কে ?' তখন মাতাকে দেখিতে পাইয়া কহিল, "মা! তুমি এখানে কেন ? আমি কোথায় ?"

বালক আবার চক্ষু মুদিল।

রঘুদয়াল বালকের সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইতে লাগিলেন এবং মনে মনে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। বালক আবার জাগিয়া উঠিয়া কহিল, "মা! আমার বড় ক্ষুধা পাইযাছে। এ লোকটী কে মা ?

অনুমতিক্রমে বালকের পিতা,—পিতামহী নিকটে আসিল। রঘুদয়াল কহিলেন, "আর ভাবনা কি ? আপনার পুত্র এখনি উঠিয়া বসিবে। আপনি পুত্রের শিয়রে ডাব, দই, আমানি, পান্তা ভাত রাখিয়া দিন ; উঠিয়া বসিলেই আহার করিবে।"

ডাব আসিলে রঘুদয়াল ডাবের মুখ কাটিয়া, তাহাতে পত্ররস মিশাইলেন ; মিশাইয়া, অল্পে অল্পে বালকের মুখে দিতে লাগিলেন। বালক জাগিয়া উঠিয়া কহিল, "মা! আমার বড় প্রস্রাব পাইয়াছে।"

রঘুদয়াল সরা ধরিলেন। বালক পূর্ণ দুই সরা প্রস্রাব করিল। মূত্রত্যাগের পর বালক বালিশে ঠেস দিয়া বসিল, বলিল, "বড় ক্ষুধা। শীঘ্র কিছু খাবার দাও।"

রঘুদয়াল আবার ডাবের জল খাইতে দিলেন। এবার ঝিনুকে করিয়া নহে,—গ্লাসে করিয়া ; বালক, চুমুক দিয়া খাইল।

সর্প সেইরূপই ফণা ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। রঘুদয়াল

গললগ্নীকৃতবাসে সর্পকে প্রণাম করিলেন এবং সর্পের সম্মুখে পাত্রে দুগ্ধ রাখিয়া কহিলেন,—"দেবতা! তোমার জন্য এই দুগ্ধ আনিয়াছি, গ্রহণ কর।"

সর্প দুগ্ধ খাইল না। রঘুদয়াল কহিলেন, "কাহারও সাক্ষাতে সর্প দুগ্ধ খাইবে না। সর্পের সম্মুখে কাপড়ের পরদা টাঙ্গাইয়া দাও,—সর্পের দুগ্ধপান কার্য্য যেন কেহ দেখিতে না পান।"

পরদা টাঙ্গান হইলে, রঘুদয়াল কহিলেন,—"সর্প দুগ্ধ অল্পমাত্র খাইয়াছে, আর অধিক খাইবে না।"

রঘুদয়াল সর্পকে প্রীতিভক্তিভরে ধরিয়া হাঁড়ীর ভিতর রাখিয়া দিলেন; বলিলেন, "বালকের আহারের জন্য স্বতন্ত্র স্থান করুন, আমি একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইতেছি, দধির অদ্ধ অংশ লইয়া ঘোল করুন,—দধি ও ঘোল উভয়ই খাওয়াইতে হইবে।"

বালক আসনে বসিয়া পান্তাভাত,—দধি-ঘোল, আমানি-লবণ সংযোগে আহার করিল। ক্ষুধা এমনি প্রবল যে, সমস্ত আহারীয় সামগ্রীকে, বালক অমৃতময় বোধ করিতে লাগিল। বালকের ইচ্ছা, আরও কিছু অন্ন এবং ঘোল খায়? রঘুদয়াল নিষেধ করিলেন; বলিলেন, "রাত্রে আর নয়;—প্রাতে মা-শঙ্করীর পূজা দিয়া, মা-মনসার পূজা দিয়া, মাছের ঝোল ভাত আহার করিও; মায়ের নিকট ছাগ বলিদান দিয়া মায়ের প্রসাদস্বরূপ ছাগমাংস আহার করিও।"

স্বতন্ত্র, বিস্তৃত বিছানায় আসিয়া বালক উপবেশন করিল।

রাত্রি তখন তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। রঘুদয়াল কহিলেন,—"বহির্ব্বাটীতে বহু সংখ্যক লোক আপনার পুত্রকে দেখিবার জন্য ছটফট করিতেছে। এইবার তাহাদিগকে আসিতে

অনুমতি করুন। আর কোন চিন্তা নাই। আমি এই শিকড়টী আপনার হাতে দিয়া যাইতেছি, আপনি কাপড়ে বাঁধিয়া আপনার কাছেই রাখুন। এই শিকড়ের আঘ্রাণ মধ্যে মধ্যে বালককে লইতে দিবেন।”

তখন ব্রাহ্মণ-জমিদারের পায়ের-ধূলা মাথায় লইয়া, যোড়হাতে রঘুদয়াল কহিলেন, “মহাশয়! কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, এই-বার আমি বিদায় হইলাম। আমি চলিলাম,—অনেক দূর আমাকে যাইতে হইবে।”

ব্রাহ্মণ-জমিদার, “সে কি কথা?” বলিয়া বাষ্প-গদ্গদ কণ্ঠে বাহুদ্বয় দ্বারা রঘুদয়ালকে জড়াইয়া ধরিলেন। বলিলেন, “তুমি যাইবে কোথায়? এত অধিক রাত্রি হইয়াছে, এখন পর্য্যন্ত তুমি জলগ্রহণ কর নাই,—তুমি যাইবে কোথায়? আমার জননী স্বহস্তে তোমার জন্য রন্ধন করিয়াছেন, তুমি আহার কর, থাক;—তুমি আমার পুত্রের জীবনদাতা,—তোমাকে আমি ছাড়িতে পারি না। ঐ দেখ আমার পত্নী তোমার নিমিত্ত স্বর্ণ-থালে করিয়া পাঁচ শত মোহর লইয়া আসিতেছেন! ঐ দেখ, আমার পত্নী যে হীরক-অঙ্গুরীয় সদা আপন অঙ্গুলিতে পরিতেন, সেই সহস্রাধিক টাকা মূল্যের হীরক-অঙ্গুরীয় স্বর্ণ থালের উপর শোভা পাইতেছে। আর ঐ দেখ, আমার জননী তোমার জন্য আঁচল ভরিয়া অন্ততঃ দশ বার খানি বহু-মূল্য সোণার গহনা আনিতেছেন;—তাই বলিতেছি, তুমি যাবে কি। তোমার জন্য প্রাণ দিলেও, আমরা ঋণমুক্ত হইতে পারিব না,—সামান্য অর্থ ত ছার কথা।”

রঘুদয়াল হাসিয়া উত্তর দিলেন, “মহাশয়! মাপ করিবেন,—

সাপের চিকিৎসা করিয়া পয়সা লইতে নাই ;—আমি এক কাণা কড়িও লইব না। গুরুর নিষেধ আছে। আমি যোড়-হাতে বলিতেছি, আমার এক্ষণে এই উপকার করুন, আমাকে লোভ দেখাইবেন না। আমি ক্ষুদ্র মুটে মজুর ; আমাকে এই পারিতোষিক দিন্,—এই বর দিন্,—যেন আমি লোভ সম্বরণ করিতে পারি। তাহা হইলেই আপনি আমার নিকট ঋণমুক্ত হইবেন।"

জমিদার চোখের জলে ভাসিতে লাগিলেন, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"একি কথা! একি আশ্চর্য্য কথা! একি অভাবনীয় কথা! আমি তোমাকে এই গ্রামে বাস করাইব, মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম,—পাঁচ শত টাকা আয়ের একখানি তালুক তোমার নামে লেখা-পড়া করিয়া দিব, স্থির করিয়াছিলাম,—এ যে সকলই কল্পনা হইল! অথবা আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি!"

রঘুদয়াল কহিলেন,—"এ দাসকে ক্ষমা করিবেন ; অপরাধ লইবেন না!"

ব্রাহ্মণ-জমিদার উত্তর দিলেন, "আচ্ছা, সে সব কথা পরে হইবে। তুমি সমস্ত দিন মজুর-বৃত্তি করিয়াছ, এখনও অবধি পেটে কিছু পড়ে নাই,—এক্ষণে একটু জল খাও। তার পর, উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিবে। প্রাতে আমি তোমার বিষয় বিবেচনা করিব।"

রঘুদয়াল তখন সর্পের হাড়িটী ডানহাতে লইলেন ; বামহস্তে নিজের লম্বা লাঠী ধারণ করিলেন। কহিলেন,—"সর্পদষ্ট রোগীর গৃহে আমাদের জলগ্রহণ পর্য্যন্ত নিষেধ। সর্প-চিকিৎসা-বিদ্যা বড়ই কঠিন। দান গ্রহণ করিলে শুভ-ফল ফলে না, বিদ্যা লোপ পায়। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।"

এই কথা বলিয়াই উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া, দীনদরিদ্র অভুক্ত রঘুদয়াল লাঠী ঘাড়ে করিয়া, লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া নিমেষ মধ্যে বাটী পরিত্যাগ করিলেন। রঘুদয়াল বিদ্যুৎ-গতিতে ছুটিলেন। কেহ আর তাঁহাকে দেখিতে পাইল না।

ব্রাহ্মণ-জমিদার, পত্নী এবং জননী "ন যযৌ, ন তস্থৌ",—কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়বৎ স্পন্দহীন হইয়া রহিলেন: শেষে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ব্রাহ্মণজমিদার দ্বারবান্ বীরবাহুকে কহিলেন,—"বীরবাহু! দেখত, রঘুদয়াল কোন্ পথে গেল!"

বীরবাহু যোড়হাতে কহিল, "হুজুর! আমি কোথায় দেখিব? রঘুদয়াল এতক্ষণ দুই ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়াছে।"

এই একটী দিনমাত্র, রঘুদয়াল কাত্যায়নীর গৃহ-রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন না। দস্যু-দলপতিগণ, বহুদিন হইতে সুযোগ এবং সুবিধা অন্বেষণ করিতেছিল। অদ্য রঘুদয়াল, অমুক গ্রামে সর্প-চিকিৎসা কার্য্যে আটক পড়িয়াছেন শুনিয়া, তাহারা কাত্যায়নীর গৃহের যথাসর্ব্বস্ব লুঠিয়া লইয়া যায়।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কে কাত্যায়নীর গৃহে ডাকাতি করাইল, তাহা এখন শুনিবার আবশ্যকতা নাই। কোন দুরাচার ব্যক্তির যত্নে এবং ষড়যন্ত্রে, অর্দ্ধ-মৃত কাত্যায়নী-পরিবারের উপর এই ডাকাতিরূপ খড়্গাঘাত হইল, এখন তাহাও জানিয়া ফল নাই। কোন্ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির

জন্য, কোন মহাফল লাভের জন্য, কাত্যায়নীকে সর্ব্বস্বান্ত করা হইল, তাহা এখন শুনিয়াই বা ফল কি আছে?

ডাকাতির পর, কাত্যায়নীর প্রকৃত প্রস্তাবে অন্ন-কষ্ট হয়। এত দিন এ-জিনিষটা, ও-জিনিষটা, সে-জিনিষটা—বেচিয়া কাত্যায়নীর কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছিল! কিন্তু ডাকাতিতে সর্ব্বস্ব অপহৃত হইল,—বেচিবেন কি?

এই ডাকাতির কিছু কাল পরেই গোয়ালিনী দুগ্ধ দেওয়া বন্ধ করে, মুদী উঠনা বন্ধ করে; ধোপা কাপড়-কাচা বন্ধ করে এই সময় হইতেই প্রাতে রঘুদয়াল এবং বালক রমাপ্রসাদ, লক্ষ্মার নিমিত্ত দুগ্ধের জন্য সর্ব্বাগ্রে, দুগ্ধ কিনিতে বা দুগ্ধ মাগিয়া লইতে বাহির হইতেন।

একটী কথা আশ্চার্য্যজনক বোধ হইতেছে। কাত্যায়নী বলেন,—"প্রায় এক শত জোয়ান ব্যক্তি বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্রে ভূষিত হইয়া তাঁহার গৃহে ডাকাতি করে; ডাকাতগণ তাঁহাদিগকে প্রহার করে নাই, কটু-ভাষা বলে নাই, মা-শঙ্করীর গৃহ লুঠে নাই। লক্ষ্মীপূজার মোহর ও ধান লয় নাই।" কথা এই, রঘুদয়াল একা,—সহায় ও সম্পত্তিহীন;—অন্য বাহুবল, অর্থবল,—কিছুই নাই; রঘুদয়ালের বয়সও অনেক হইয়াছে। ঐ একশত জন জোয়ান এতদিন কি কেবল রঘুদয়ালের ভয়েই কাত্যায়নীর গৃহে ডাকাতি করে নাই? এই প্রবীণ বয়সে রঘুদয়ালকে যদি পাঁচজন ব্যক্তি, কি দশজন ব্যক্তি চাপিয়া ধরে, তাহা হইলে রঘুদয়ালের শক্তি সামর্থ্য কোথায় থাকে? একশত জোয়ানের নিকট এক রঘুদয়াল কি করিতে পারেন? তবে ডাকাতগণ কেন রঘুদয়ালের অনুপস্থিতির সুযোগ এতদিন খুঁজিতেছিল?

মানুষ অনেক সময়, নামের মহিমায় বা পসারের গুণে জয়লাভ করে। এখন রঘুদয়ালের বয়স বেশী হউক, কিন্তু নাম-মহিমা এবং পসার ছিল। দশ জন বাঙ্গালী একত্র বসিয়া আছেন, কিন্তু এক জন ইংরেজ বা আফগান্ যদি তাঁহাদিগকে ঘুসি উঁচান, তাহা হইলে দশ জন বাঙ্গালীই পলাইবেন। দশ জন বাঙ্গালীর শারীরিক বল একত্র করিলে, অবশ্যই একটী ইংরেজ বা আফগানের শারীরিক বলের অধিক হয়। বল যদি অধিকই হইল, তবে বাঙ্গালী পলায় কেন? ইহার কারণ,—ইংরেজে বা আফগানে নাম-মহিমা ও পসার!

সেইরূপ রঘুদয়াল নাম-মহিমা এবং পসার-গুণে, সর্ব্ববিজয়ী হইয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত, বয়স কিছু অধিক হইলেও, রঘুদয়ালের বলের হ্রাস তাদৃশ হয় নাই। গায়ে এখনও বিলক্ষণ জোর ছিল, জোর ছাড়া লাঠী বা তরবারি কৌশলে তাঁহার সমকক্ষ তখন কেহ সে দেশে ছিল না। জোরে এক গুণ হয়, কৌশলে দশগুণ হয়। রঘুদয়ালের ভৈরব হুঙ্কারে ডাকাতদল থর-থর কাঁপিত। তবে ইদানীং রঘুদয়ালকে লাঠীও বড় ধরিতে হইত না।

আরও কারণ আছে। ঐ প্রদেশস্থ যত লাঠীয়াল, ডাকাত এবং জোয়ান ব্যক্তি,—প্রায় সকলেই রঘুদয়ালের শিষ্য-প্রশিষ্য। ঐ প্রদেশে যে লাঠী ধরিতে জানিত, সেই ব্যক্তিই রঘুদয়ালকে গুরুজী বলিয়া সম্বোধন করিত এবং অনেকে প্রণাম করিয়া, তাঁহার পায়ের ধূলা লইত। সুতরাং যে গৃহের রক্ষক রঘুদয়াল, ডাকাতগণ কিরূপে সে গৃহে ডাকতি করিবে?

যে জমিদার,—কাত্যায়নীর গৃহে ডাকাতি করিয়াছিল, তাহার অধীনস্থ লাঠীয়ালগণ বলিত, "হুজুর! যে গৃহ রঘুদয়াল-কর্ত্তৃক

রক্ষিত, সহস্র ডাকাত আসিয়া, সে গৃহ ভেদ করিতে পারে না; রঘুদয়াল যদি ধনুর্ব্বাণ ধরে এবং তীর ছুড়িতে থাকে, তাহা হইলে, কে তাহার সম্মুখে তিষ্টিবে? সেই বিষাক্ত, ক্ষুরধার তীর যাহার গায়ে লাগিবে, সে-ই মরিবে। আমরা কাত্যায়নীর গৃহ লুণ্ঠন করিতে গিয়া, শুধু শুধু প্রাণ দিতে পারিব না। তবে রঘুদয়াল যে দিন সে গৃহে না থাকিবে, সেই দিন অনায়াসে সেই গৃহ লুণ্ঠন করিতে সক্ষম হইব।"

জমিদার বাবু দেখিলেন, তাঁহার লাঠীয়ালগণ রঘুদয়ালের ভয়ে ভীত। তিনি প্রকাশ্যে কাহাকে কোন কথা না বলিয়া, পঞ্জাব-প্রদেশ হইতে আট জন ভীষণ-আকৃতি পাঠান লাঠীয়াল আনাইলেন, এবং দেশস্থ লাঠীয়ালগণকে এই আজ্ঞা দিলেন, "তোমরা দেখ,—রঘুদয়াল কোন্ দিন গৃহে না থাকে;—সেই দিন ডাকাতি করিতে হইবে।"

এইরূপে, সর্প-চিকিৎসা-কার্য্যে, ভিন্নগ্রামে রঘুদয়াল যে দিন নিযুক্ত ছিলেন, সেই দিনই কাত্যায়নীর গৃহে ডাকাতি হইল। ডাকাতগণ কেবল রঘুদয়ালের খাতিরে এবং বুঝি মা শঙ্করীর মহাত্মে শঙ্করী-গৃহে প্রবেশ করে নাই, লুণ্ঠনও করে নাই।

সেই জমিদার, রঘুদয়ালকে ভাঙ্গাইয়া, আপন গৃহে দ্বারবান্ করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রত্যহ, দুই টাকা হিসাবে, মাসিক ষাট টাকা দিতে রঘুদয়ালকে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু রঘুদয়াল তাঁহার কথা শুনেন নাই। ঈষৎ ঠাট্টার সুরে বলিয়াছিলেন,—"আমি টাকার কাঙ্গালী নই!"

এত বড় পসার-প্রতিপত্তিসম্পন্ন দিগ্বিজয়ী পুরুষটা যখন তাঁহার হস্তগত হইল না, তখন জমিদার, রঘুদয়ালের উপর একটু

রাগিলেন। বিশেষতঃ কাত্যায়নীর গৃহ হইতে রঘুদয়ালকে তাড়াইতে না পারিলে, কাত্যায়নীর গৃহ-দখল সহজে ঘটিবে না। জমিদার, রঘুদয়ালকে জব্দ করিবার জন্য, রঘুদয়ালকে বিতাড়িত করিবার জন্য, নানারূপ উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

জমিদার-প্রভু কখন মনে করেন,—"রঘুদয়াল যখন ঘুমাইবে, তখন একজন গুপ্ত-ঘাতক পাঠাইয়া, তাহাকে কাটিয়া আসিলে হয় না? কিন্তু কাটিয়া আসে কে? প্রস্তাবই বা কাহার কাছে করি? তাই ত! আচ্ছা, কৌশলে বিষপ্রয়োগ করিলেই বা দোষ কি? আমি যে এ কার্য্য করিতেছি, তাহা কেহ টের পাইবে না; অথচ, রঘুদয়ালকে সহজ উপায়ে বিনষ্ট বা বিতাড়িত করিতে হইবে!

"একটু উচু চাল চালিতে হইবে। মহেশ তেলী কলিকাতায় ব্যবসাবাণিজ্য করিয়া, ভারি বড়মানুষ হইয়াছে। এখানে আমার জমিদারীতে তাহার বাস হইলেও, আমাকে সে আজকাল বড় একটা গ্রাহ্য করে না। তাহাকে জব্দ করিতে হইবে। ডাকাতি করিয়া তাহার বাড়ী লুণ্ঠন করিব, অন্ততঃ বিশ হাজার টাকা গহনা ও নগদে পাইব। বিশ হাজার টাকা পাই আর না পাই, এই ডাকাতি উপলক্ষ করিয়া রঘুদয়ালকে ডাকাত দলের দলপতি বলিয়া, গ্রেফ্তার করাইয়া দিব। এদিকে পুলিশ আমার হস্তগত। ডাকাতির দুই এক দিন পরে, দারোগা বাবুকে ডাকিয়া, গোপনে পরামর্শ করিয়া, বুঝাইয়া বলিব, "এ কাজ রঘুদয়ালের! আপনি যদি সাহায্য করেন, তাহা হইলে এখনি ডাকাতির কিনারা করিয়া দিই। কিন্তু রঘুদয়ালকে ধরা বড় শক্ত কাজ। রঘুদয়াল লাঠী ধরিলে, পাঁচ-শ লোককে ভাগাইতে

পারে; সুতরাং তাহাকে অতি সাবধানে এবং সুকৌশলে ধরিতে হইবে। বামাল শুদ্ধ গ্রেফ্তার করিয়া দিতে পারিলে, বড়ই ভাল হয়। তাহারও চেষ্টা দেখিতে হইবে।"

জমিদার এইরূপ সঙ্কল্প স্থির করিয়া, মহেশ তেলীর বাড়ী ডাকাইতি করাইল। অনেক সহস্র টাকার জিনিষ পত্র এবং নগদ কয়েক সহস্র টাকা লুটিয়া, তাহা আপন গৃহজাত করিল।

ডাকাতির দুই এক দিন পরে জমিদার আপন দরবারে বসিয়া হায়-হায় করিতে লাগিলেন;—"দেশ আরজক হইল! দেশে তিষ্ঠান ভার হইল! চারিদিকেই দস্যু-ভয় উপস্থিত! এ ডাকাতির যদি কিনারা করিতে না পারি,—ডাকাতগণকে যদি গ্রেফ্তার করাইতে না পারি, তাহা হইলে দেশে থাকা ভার হইবে।

দেখিতে দেখিতে দারোগা বাবু জমিদার-গৃহে আসিয়া পৌঁছিলেন। উভয়ে এক নিভৃত কক্ষে বহুক্ষণ ধরিয়া কি যে পরামর্শ হইল, তাহা কেহ শুনিতে পাইল না। শেষে দারোগা বাবুর মুখে এই ক'টী কথা শুনা গেল,—"বড় সাহেব বড়ই রাগ করিয়াছেন; এবার আমি যদি বামালশুদ্ধ ডাকাইতগণকে গ্রেফ্তার করাইতে না পারি, তাহা হইলে আমার চাকরি থাকিবে না।" জমিদার কহিলেন, "ভয় নাই।"

সেই প্রথমদিন,—সেই আদ্য দিনের কথা একবার স্মরণ করুন। রঘুদয়াল লক্ষ্মীর জন্য দুগ্ধ খুঁজিতে বাহির হইয়াছেন;—নিজগ্রামে দুগ্ধ পান নাই,—গ্রামান্তরে বাহির হইয়াছেন; এ দিকে দুগ্ধ-অভাবে লক্ষ্মীর কণ্ঠ বিশুষ্ক হইতেছে। কাত্যায়নী ভাবিতেছেন, "রঘুদয়াল কোথায় গেল,—এখনও ফিরিল না? যে রঘুদয়াল প্রত্যহ দুই দণ্ড বেলা অতীত হইতে-না-হইতে দুগ্ধ আনিয়া লক্ষ্মীকে

প্রদান করে, আজ বেলা এক প্রহর অতীত হইল, তবু রঘুদয়াল আসিল না কেন?—বেলা দেড় প্রহর অতীত হইল, রঘুদয়াল আসিল না কেন?”

কিন্তু রঘুদয়াল আর সে রঘুদয়াল নাই। রঘুদয়াল ধৃত, বদ্ধ, নিপীড়িত, জর্জ্জরিত, সংজ্ঞা-রহিত।

রঘুদয়াল দূরবর্ত্তী গ্রামান্তরে গিয়া, এক গোয়ালার গৃহে দুগ্ধ ভিক্ষা চাহিতেছেন;—বলিতেছেন, “তুমি আজ এখন অর্দ্ধ সের দুগ্ধ দাও,—পয়সা আজ ওবেলা,—নয় কাল দিব।”

গোয়ালা বলিতেছে,—“তোমাকে বিশ্বাস কি?—তুমি কে, দেখি নাই, তোমাকে চিনি না,—দুগ্ধ ধারে কেমন করিয়া দিই।”

রঘুদয়াল বলিতেছেন,—“আচ্ছা এক কর্ম্ম কর বিশ্বাস না হয়, আমি আজ তোমার সমস্ত গরুর জাব কাটিয়া দিতেছি। দুই বোঝা ঘাস করিয়া দিতেছি। তুমি আমাকে এই ভাঁড়ের এক ভাঁড় দুধ দাও।”

এই বলিয়া রঘুদয়াল একটী ভাঁড় গোয়ালাকে দেখাইলেন। বলিলেন,—“একটী বালিকা আছে,—দুগ্ধ না পাইলে সে প্রাণে মরিবে। তাই দুধের জন্য এত ব্যগ্র হইয়াছি? তোমার ঘরেও ত ছেলে মেয়ে আছে,—বল দেখি, ক্ষুধা পেলে তারা কত কাঁদে?”

গোয়ালা দ্বিরুক্তি করিল না। বলিল, “ভাঁড় বাহির কর, দুধ দিতেছি।”

রঘুদয়াল ভাঁড় বাহির করিলেন,—সে ভাঁড়ে এক সের দুধ ধরে;—গোয়ালা দুধ ঢালিতে লাগিল। আধ ভাঁড় দুধ হইল,—রঘুদয়াল বলিলেন, “আর না।”

গোয়ালা কহিল, “তোমার ভাঁড় পূর্ণ করিয়া দিতেছি,—লও।”

গোয়ালা দুগ্ধ ঢালিতেছে, রঘুদয়াল সতৃষ্ণ নয়নে দেখিতেছেন,— এমন সময় কি জানি, কোথা হইতে হঠাৎ কিম্ভূত-কিমাকার পর্ব্বতপ্রমাণ দেহবিশিষ্ট, অতুল-বলশালী দশ বারটা নর-রাক্ষস একেবারে আসিয়া, রঘুদয়ালকে ধরিয়া ফেলিল ; ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে বাঁধিয়া ফেলিল ; বাঁধিয়া রঘুদয়ালের পৃষ্ঠে কিল, চাপড় লাথী মরিতে আরম্ভ করিল।

তখন দুইজন জোয়ান গিয়া রঘুদয়ালের দুই হাত ধরিল ; দুই জন কোমর জড়াইয়া ধরিল ; একজন গলা জড়াইয়া ধরে, আর দুই জন পা ধরিয়া, পা দুইটাকে বাঁধিয়া ফেলে। রঘুদয়ালের দক্ষিণ হস্তে সেই ভাঁড়টী ছিল। একজন যেমন তাহার সেই হাত ধরিল, রঘুদয়াল অমনি কহিলেন "কর কি? কর কি? ভাঁড় পড়িয়া যাইবে।—দুধ নষ্ট হইবে!—দুধ নষ্ট হইবে যে।"

এই কথা বলিতে না বলিতে ভাঁড় ঠিকরাইয়া গিয়া, পঞ্চাশ হাত দূরে পড়িল। রঘুদয়াল দেখিলেন, অষ্টবজ্র একত্র হইয়া তাঁহাকে ধরিয়াছে,—আর কথা কহিলেন না। সেই দশ বার জন পাঠান-দস্যু এরূপ ভাবে রঘুদয়ালকে প্রহার করিল যে, রঘুদয়ালের আর চেতনা রহিল না।

রঘুদয়াল যখন অচেতন, তখন দারোগা, আট জন কনষ্টেবল এবং পঞ্চাশ জন চৌকিদার লইয়া সে স্থলে উপস্থিত হইলেন। তিনি সকলের সমক্ষে অচেতন রঘুদয়ালের কোমর হইতে গহনা ও টাকাপূর্ণ এক থলিয়া বাহির করিলেন। থলিয়ার মুখ খুলিয়া বলিলেন, "চোরাও-মাল পাওয়া গিয়াছে,—ডাকাতের মাল পাওয়া গিয়াছে। কতক পাওয়া গিয়াছে, অবশিষ্ট মাল পাইবার বোধ হয় আর ভাবনা নাই।"

তখন রঘুদয়ালের মুখে জল দেওয়া হইল। রঘুদয়াল জ্ঞান লাভ করিলেন। ডাকাতের দলপতি ধৃত হইয়াছে বলিয়া, চারিদিকে রব পড়িয়া গেল। একখানা গরুর গাড়ী করিয়া, রঘুদয়ালের হাতে হাতকড়ি পায়ে বেড়ী দিয়া, রঘুদয়ালকে থানায় লইয়া আসা হইল।

বেলা নয়টার সময় এই ঘটনা ঘটে। বেলা একটার সময় রঘুদয়াল থানায় আনীত হয়। দারোগা, বেলা একটা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, রঘুদয়ালের অনুচরগণের নাম বলিয়া দিবার জন্য এবং অবশিষ্ট মাল দেখাইয়া দিবার জন্য অনেক সাধ্য-সাধনা করেন। রঘুদয়াল বলে,—"আমি কিছুই জানি না। আমি নির্দ্দোষ। আমি এ জীবনে প্রায় পঞ্চাশটী ডাকাতের দল ধরিয়া দিয়াছি; আমি নিজে ডাকাতি করিব, ইহা কি আপনার বিশ্বাস হয়? কোন কুলোক, গভীর ষড়যন্ত্র করিয়া আমাকে এই অবস্থাপন্ন করিয়াছে; আমি নির্দ্দোষ,—আমাকে ছাড়িয়া দিন। আমি ইহার কিছুই জানি না।"

রঘুদয়ালের কথায় দারোগার কিঞ্চিন্মাত্র বিশ্বাস হইল না। দারোগা বাবু কহিলেন,—"এই ডাকাতের দলপতি বড় বদ্‌মায়েস। ইহার একটী আঙ্গুলে দড়ি বাঁধিয়া ইহাকে ঝুলাইয়া রাখ। দেখি, যন্ত্রণায় প্রকৃত কথা কবুল করে কি না! পশ্চাদ্ভাগে জলবিছুটী দাও এবং মধ্যে মধ্যে বেত্রাঘাত কর। দেখি, যন্ত্রণায় সত্য কথা স্বীকার করে কি না?

আদেশ,—কার্য্যে পরিণত হইল। রঘুদয়াল ঝুলিতে লাগিল; একটী আঙ্গুলে-দড়ী-বাঁধা রঘুদয়াল ঝুলিতে ঝুলিতে মাঝে মাঝে দোল খাইতে লাগিলেন।

যখন রঘুদয়ালের এই অবস্থা, তখন দারোগা বাবু, নীলকুঠীর নায়েব-দেওয়ান বীরভদ্রের নিকট হইতে এক পত্র পান যে, নীলকুঠীতে মোহর চুরী হইয়াছে,—শীঘ্র আসিবেন। বীরভদ্রের পত্র পাইয়া, দারোগা বাবু আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া ঘোড়সোয়ারে, যেন নক্ষত্রবেগে নীলকুঠী অভিমুখে ছুটিলেন। যাত্রাকালে রঘুদয়াল সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে ভুলিয়া গেলেন। এই অবস্থায় রঘুদয়ালকে কতক্ষণ রাখা হইবে, সে কথা তিনি কাহাকেও বলিলেন না, বা কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসাও করিল না। তাই রঘুদয়ালকে, দারোগা বাবুর প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত, ঐ অবস্থাতে থাকিতে হইয়াছিল।

রঘুদয়াল প্রায় দুই কি আড়াই ঘণ্টাকাল ঐ অবস্থায় থাকিয়া নীরব ছিলেন। নীরবে যন্ত্রণা সহ্য করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। যখন অসহ্য বোধ হইল, তখন রঘুদয়াল ধীরে ধীরে "বাপ্ বাপ্" ইত্যাকার ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। যতই বিলম্ব হইতে লাগিল, ততই "বাপ্ বাপ্" শব্দ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রাত্রি যখন দুইটা, তখন সেই গগনভেদী "বাপ্ বাপ্" শব্দে দিক্‌সমূহ পূর্ণ হইয়া উঠিল। শুনা যায়, দুই-ক্রোশ দূরস্থিত লোকসমূহ সেই শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত হইলেও ঐ "বাপ্ বাপ্" রবে চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী লোকের নিদ্রা-ভঙ্গ হইয়াছিল। সেই গভীর মর্ম্মভেদী নিনাদ শুনিয়া স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা আতঙ্কে শিহরিয়াছিল; বৃদ্ধগণ ভাবিয়াছিলেন,—"ইহাই বুঝি মহাপ্রলয়ের সূচনা!"

সেই রাত্রে দারোগা বাবু রমাপ্রসাদের সহিত থানায় আসিয়া পৌঁছিলেন; পৌছিয়াই, রঘুদয়ালের দড়ি কাটিতে হুকুম দিলেন।

রঘুদয়াল রমাপ্রসাদের সহিত মিলিত হইলেন। এক ছিল,—দুই হইল। সাহস বাড়িল। কিন্তু কে, কি জন্য থানায় আগমন করিয়াছে, পরস্পরের কি জন্যই বা এইরূপ দশা হইয়াছে, তখন কেহ তাহা বুঝিতে পারিল না এবং রঘুদয়ালের সাঙ্কেতিক নিষেধ-হেতু, রমাপ্রসাদও কোন কথা জিজ্ঞাসিতে সক্ষম হইল না।

শেষ রাত্রি; চারিটা বাজিয়াছে, পাঁচটা বাজে। শীত কাল; তাই এখনও অন্ধকার খুবই আছে। দারোগা বাবু,—'আসামী-গণকে উপযুক্ত স্থলে রাখ' বলিয়া শয়নাগারে গেলেন।

তখন কনষ্টেবল ও চৌকিদারগণ, রঘুদয়াল ও রমাপ্রসাদকে হাতে হাতকড়ী ও পায়ে বেড়ী দিয়া আবদ্ধ করিয়া একই গৃহে রাখিয়া দিল এবং আটজন চৌকীদার ও আটজন বলবান পাঠান উঁহাদের প্রহরিরূপে নিযুক্ত রহিল।

সমস্ত রাত্রি কেহ নিদ্রা যায় নাই। এইরূপ সুবন্দোবস্ত করিয়া কনষ্টেবল ও থানার অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ ঘোর-ঘুমে অভিভূত হইল!

এত যন্ত্রণার পর রঘুদয়াল ঘুমাইলেন কি?—রমাপ্রসাদ ঘুমাইল কি?

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দুঃখের-সাগরেও সময়ে সময়ে সুখের তরঙ্গ উঠে। মেঘ-ভরা আঁধার-আকাশে কখন কখন চাঁদও উঁকি মারে। রঘুদয়াল এবং বালক রমাপ্রসাদ শৃঙ্খলাবদ্ধ, অবরুদ্ধ, প্রহারিত, প্রপীড়িত, মর্ম্মাহত, ভূশয্যায় শায়িত,—আজ দুই জনে এক ঘরে; সুতরাং

আহ্লাদিত, পুলকিত, স্ফীত। রঘুদয়ালকে কারাগারে দেখিয়া বালক রমাপ্রসাদ যেন নিধি পাইল। রঘুদয়ালও রমাপ্রসাদকে পাইয়া কেমন যেন প্রাণ পাইল,—অঙ্গুলির ব্যথা বুঝি দূরে গেল।

দারোগা বাবুর হাজত-গৃহটী লম্বা প্রায় পনর হাত হইবে, চওড়া সাড়ে চারি হাতের বেশী নহে। রঘুদয়াল গৃহের এক পার্শ্বে উপবিষ্ট অথবা অর্দ্ধশায়িত। তাহার পর দুইজন প্রহরী উপবিষ্ট। তাহার পর রমাপ্রসাদ শায়িত। গৃহের জানালা দুইটী; কবাট একটী। বড় বড় লোহার এক-অঙ্গুল অন্তর ফাঁক গরাদে আছে। দ্বার-দেশে লৌহ-নির্ম্মিত এবং বাহির হইতে চাবি দেওয়া। প্রত্যেক জানালার নিকট দুইজন করিয়া প্রহরী দণ্ডায়মান এবং লৌহদ্বারের নিকট চারিজন প্রহরী দণ্ডায়মান। হাজতগৃহে পাহারার এইরূপ বন্দোবস্ত ছিল।

বন্দোবস্ত অনেক সময় পাকা থাকে বটে, কিন্তু কাজ তদনুযায়ী সকল সময়ে ঘটে না। প্রহরিগণ জাগিয়া থাকিবার কথা; কিন্তু প্রহরিগণ নিদ্রিত। শীতকালে প্রহরিগণ প্রায় রাত্রি তিনটা পর্য্যন্ত রঘুদয়ালকে লইয়া জাগিয়াছে। শেষ রাত্রি আর না ঘুমাইয়া কি বাঁচিতে পারে? ঘুমান নাই কেবল রঘুদয়াল আর রমাপ্রসাদ। ঠিক বলিতে পারি না,—একজন প্রহরীও বুঝি ঘুমায় নাই।

বালক রমাপ্রসাদ নিদ্রার ভাণ করিয়া শুইয়া আছেন বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে মুখটী তুলিয়া উঁকি মারিয়া এক একবার রঘুদয়ালকে দেখিতেছেন। রঘুদয়াল নিবদ্ধ হস্তদ্বয় উত্তোলন করিয়া নীরবে বলিতেছেন,—"না, অমন করিয়া উঠিও না—দেখিও না। নিস্তব্ধ, নীরব থাক।" রমাপ্রসাদ অমনি শুইয়া পড়িতেছে।

রমাপ্রসাদ এবং রঘুদয়াল উভয়েই উৎকণ্ঠিত। রমাপ্রসাদ

ভাবিতেছেন, "কেন রঘুদয়াল এরূপভাবে বন্দী হইল?" রঘুদয়াল ভাবিতেছে,—"রমাপ্রসাদ কেন এরূপভাবে বন্দী হইল?" রমাপ্রসাদ ভাবিতেছেন,"রঘুদয়ালের ন্যায় সাধু ব্যক্তি এ সংসারে বিরল, রঘুদয়াল ভীমের ন্যায় বলশালী বটে,—কিন্তু চুরী ডাকাতি কখন করে নাই, বরং চোর ডাকাত ধরাই তাহার কার্য্য। যে রঘুদয়াল ভিখারী দেখিলে আপনি না খাইয়া ভিখারীকে অন্ন দেয়, সে রঘুদয়াল আজ এমন কি কুকর্ম্ম করিল যে, তাহাকে ধরিয়া আনিয়া আঙ্গুলে দড়ি বান্ধিয়া, কড়ি-কাঠে ঝুলাইয়া রাখা হইল? তবে কি রঘুদয়াল কাহারও সহিত দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধাইল? কিন্তু রঘুদয়াল ত কলহপ্রিয় নহে! মাতার অনুমতি ভিন্ন সে ত সহসা কখন অস্ত্রধারণ করে না! কেন এমন হইল?—কিছু ত বুঝিতে পারিতেছি না! বিভীষিকা যে চারিদিকেই দেখিতেছি!"

রঘুদয়াল ভাবিতেছেন,—"এই দুগ্ধপোষ্য বালক কোন্ অপরাধে হাজতে আসিল? অপরাধ সামান্য হইলে কেহ ত ইহার জামিন হইতে পারিত! অপরাধ বোধ হয়,—গুরুতর। খুন করিয়াছে নাকি? তাও কি কখন সম্ভব? আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না!—ব্যাপার কি? গতিক কি?"

রমাপ্রসাদ ভাবিতে লাগিল,—"রঘুদয়ালকে ধরিল কেমন করিয়া? সহজে ত ধরা দিবার পাত্র নয়! অন্যায়রূপে বলপূর্ব্বক বৃথা অভিযোগে রঘুদয়ালকে গ্রেপ্তার করা বড়ই কঠিন কর্ম্ম। তবে কি, ও সত্য সত্যই দোষী?—তাই ধরা দিয়াছে? যে লোক লাঠী ধরিলে পাঁচ শত লোক ভয়ে পলায়, সে লোক যে বিনা দোষে সহজে ধরা দিবে, এমন ত বোধ হয় না! তবে অবশ্যই রঘুদয়াল কোন দোষ করিয়া থাকিবে।"

উভয়েই ভাবনা-সাগরে নিমগ্ন ; উভয়েই কূলে উঠিতে অক্ষম। উভয়েরই বুক ফাটিতেছে, কিন্তু মুখ কাহারও ফুটিতেছে না। তাই রমাপ্রসাদ বিছানা হইতে এক একবার ঝাঁকিয়া ঝাঁকিয়া উঠিয়া রঘুদয়ালের প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিতেছিল। কিন্তু চতুর রঘুদয়াল ইঙ্গিতে তাহাকে ওরূপভাবে উঠিতে নিষেধ করিতেছিল। এইরূপে প্রায় বিশ মিনিট কাল অতীত হইল।

উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

যে দুইটী প্রহরী হাজত-গৃহের ভিতর উপবিষ্ট ছিল, তাহারা বাল্যকালে রঘুদয়ালের নিকট লাঠী-খেলা শিখিয়াছিল। রঘুদয়াল একণে তাহাদিগকে চিনুক আর নাই চিনুক, কিন্তু তাহারা রঘু-দয়ালকে বেশ চিনে। রঘুদয়ালের সহস্রাধিক সাগরেদ। হয়ত কোন লাঠীয়াল অন্য গুরুর নিকট লাঠী-খেলা শিখিয়া, রঘুদয়া-লের সহিত দুই তিন দিন লাঠী খেলিয়া, লাঠী-খেলা শেখার পাঠ সাঙ্গ করিল। রঘুদয়ালের নাম-ডাক এইরূপই জাঁকিয়াছিল। যখন অন্যান্য বহিঃস্থ প্রহরিবর্গ ঘোর ঘুমে অচেতন হইল,—কাহা-রও বা সতেজে নাক ডাকিতে লাগিল, তখন ভিতরস্থ একজন প্রহরী "কোন্ হায়," "ক্যা হায়," বলিয়া ঈষৎ উচ্চ চীৎ-কার করিয়া উঠিল। তথাচ কাহারও ঘুম ভাঙ্গিল না, নাক-ডাকা বন্ধ হইল না।

বালক রমাপ্রসাদ থতমত খাইয়া বলিয়া উঠিল,—"বে আমরা ত কিছু করি নাই!"

রঘুদয়াল একদৃষ্টে প্রহরীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। প্রহরী যোড়হাতে অতি ধীরে ধীরে কহিল—"গুরুজি! চিনিতে পারিয়াছেন কি?"

রঘুদয়াল ধীরে উত্তর দিলেন,—"কথা কহিও না। এই বেং ছোট সরু লাঠী একগাছি আছে, উহা লইয়া জানালা গলাইয়া, জোরে বাহিরে ফেলিয়া দাও। তারপর দ্বারে ঠুক্ ঠুক্ শব্দ কর। অবশেষে আমার সহিত কথা কহিও।"

রঘুদয়ালের আজ্ঞামাত্র প্রহরী তাহাই করিল। তথাচ বাহিরের কোন প্রহরী জাগিল না।

প্রহরী পুনরায় রঘুদয়ালের নিকট গিয়া বসিল এবং কহি , "আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন কি?

রঘুদয়াল। না।

প্রহরী। চিনিতে না পারিবারই কথা। আজ প্রায় বার চৌদ্দ বৎসর হইল, আপনার নিকট আমি লাঠী-খেলা শিখিয়াছিলাম। আপনি তিনদিন শিক্ষা দেন এবং বলেন,—"তোমার ওস্তাদ ভাল ছিলেন, তুমি বেশ লাঠী খেলিতে জান। তোমার লাঠী-খেলা দেখিয়া আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার শিক্ষা শেষ হইয়াছে। তুমি ঘরে যাও।" এই বলিয়া আপনি আমাকে সে দিন পায়স পিষ্টক আহার করাইয়া বিদায় দিলেন। গুরুজি! আপনার ঋণ পরিশোধ হইবার নহে।

রঘুদয়াল! তোমার নাম কি?

প্রহরী। নাম নাই বা শুনিলেন? এখানে আমি গণেশ চৌকিদার বলিয়া পরিচিত।

রঘুদয়াল। বাড়ী কোথায়?

প্রহরী। তাহাই বা আপনার জানিয়া ফল কি? লোকে জানে, আমার বাড়ী বর্দ্ধমান-জেলায়।

রঘুদয়াল। তুমি কোন্ জাতি?

প্রহরী। গুরুজি! মাপ করিবেন,—আপনি কি আমাকে চিনিয়াছেন?

রঘুদয়াল। ভাল চিনিতে পারি নাই। তুমি কি জাতিতে ব্রাহ্মণ?

গণেশ চৌকিদারের পৈতা ছিল না, অথচ রঘুদয়াল তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিলেন ও তাহার পায়ের ধূলী মাথায় দিতে বলিলেন। গণেশ,—গুরুজীর মাথায় আপনার পায়ের ধূলা দিল। আদেশ অনুসারে গুরুজীর বক্ষে পায়ের ধূলা দিল; গুরুজী কহিলেন, —"প্রাণ জুড়াইল!" এবং জিজ্ঞাসিলেন, "আপনার এ অবস্থা কেন? আপনি সমৃদ্ধিশালী, প্রতাপবান্, ব্যক্তি হইয়া এ নীচ কর্ম্মে প্রবৃত্ত কেন?

প্রহরী। গুরুজি! আমার কাহিনী বলিবার পূর্ব্বে আমি আপনার কাহিনী শুনিবার জন্য বড় ব্যগ্র হইয়াছি। আপনার নিকট হইতে চোরাও মাল বাহির হইল শুনিয়া, আমি চমকিত হইয়াছি। আপনি ডাকাতি করিয়াছেন শুনিয়া, আরও বিস্মিত হইয়াছি। আপনি জাতিতে গোপ বটে; কিন্তু আপনার ন্যায় ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ব্রাহ্মণের মধ্যে পাওয়াও সুদুর্লভ। এ কি এ! কেন এমন হয়।

রঘুদয়াল। আমার কাহিনী আঠার-পর্ব্ব মহাভারত! পরে বলিব।

প্রহরী। আমারও তাহা অপেক্ষা কিছু কম নহে।

রঘুদয়াল। আচ্ছা সে সকল কথা এখন থাকুক,—পরে শুনিব ও শোনাইব—উপস্থিত উদ্ধারের উপায় কি ?

প্রহরী। সেই উপায় ঠিক করিব বলিয়া, আমিও আমার এই বন্ধুর সহিত জাগিয়া বসিয়া আছি। আপনাকে রক্ষা করিব বলিয়াই অদ্য আমরা কৌশলে এই গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রহরী নিযুক্ত আছি।

রঘুদয়াল। তোমাদের অপর পার্শ্বে যে বালকটী শুইয়া আছে, ওটী আমার লোক জানিবে। আমাকে উদ্ধার করিতে হইলে, উহাকে অগ্রে উদ্ধার করা উচিত।

প্রহরী। ওটী কে ?

রঘুদয়াল বালকের যথাযথ পরিচয় দিলেন।

প্রহরী জিজ্ঞাসিল,—"ঐ বালক কোন অপরাধে আজ হাজতে আসিয়াছে ?"

রঘুদয়াল। আমি তাহার কিছুই জানি না। আমি হাজতে আসার পর ঐ বালক আসিয়াছে।

প্রহরী কহিল,—"এ পুলিশ-থানা, অনেক সময় যমের দক্ষিণ-দ্বারস্বরূপ, এখানে আর দুই এক দিন থাকিলে আপনার প্রাণ ও বালকের প্রাণ যায়-যায় হইবে। অতএব পলাইবার উপায় চিন্তা করুন।"

রঘুদয়াল। হাতে হাতকড়ি, পায়ে বেড়ী, দ্বার রুদ্ধ,—পলাইব কেমন করিয়া ?

প্রহরী। উপায় আছে। অনুমতি করেন ত, হাতের হাতকড়ি ভাঙ্গিয়া দিই, বেড়ী ভাঙ্গিয়া দিই।

রঘুদয়াল। তুমি যদি কোন দোষ না লও, তাহা হইলে আমি

নজেই হাতকড়ি ভাঙ্গিয়া ফেলি। বয়স একটু বেশী হইলেও হাতকড়ি ভাঙ্গিবার ক্ষমতা এখনও আমার আছে।

রঘুদয়াল আপন হাতকড়ি ভাঙ্গিলেন, পায়ের বেড়ী ভাঙ্গিলেন। ধীরে ধীরে রমাপ্রসাদের হাতকড়ি ভাঙ্গিয়া দিলেন, পায়ের বেড়ী ভাঙ্গিয়া দিলেন। রঘুর বিক্রম দেখিয়া প্রহরী অবাক্ হইল। রঘু কহিলেন,—"যাহা আমার আয়ত্তাধীন ছিল, তাহা করিলাম। এক্ষণে দরজা ঠেলিয়া কেমন করিয়া বাহির হইব, তাহার উপায় বলিয়া দাও।"

প্রহরী কহিল,—"কোন চিন্তা নাই! জানালার গরাদে কাটা আছে। অর্দ্ধেকটা খুলিয়া লইলে অর্থাৎ তিনটী গরাদে খুলিয়া লইলে যে ফাঁক হইবে, সেই ফাঁক দিয়া আপনাকে ও বালককে বাহির করিয়া দিব।"

প্রহরী তাহাই করিল। বালক এবং রঘুদয়াল পলাইলেন। তখনও ভোর হয় নাই, উষা দেখা দেয় নাই—তখনও কিঞ্চিৎ রাত ছিল।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

রমাপ্রসাদ এবং রঘুদয়াল উভয়েই মুক্তিলাভ করিলেন। উভয়ে ধীর-পদবিক্ষেপে অথচ দ্রুতগতিতে পুলিশ থানা এড়াইলেন। গ্রাম্য-পথে না গিয়া, রঘুদয়াল মাঠের দিকে অ-পথ ধরিলেন। নালা, ডোবা কণ্টকবন পার হইয়া, রঘুদয়াল মাঠের মাঠে চলিতে লাগিলেন। বালক রমাপ্রসাদ রঘুদয়ালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে

থাকিল। রঘুদয়ালের চলন এবং বালকের দৌড়ান এক। মাঠের শেষ প্রান্তে এক তালবন ছিল। এক বহুকালের পুষ্করিণী; তাহার চারিধারে দীর্ঘ দীর্ঘ তাল গাছ। তালগাছের সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় বটগাছ, বড় বড় তেঁতুলগাছ, বড় বড় অশ্বত্থগাছ জন্মিয়াছে। দূর হইতে দেখিলে এক ভয়ানক জঙ্গল বলিয়া প্রতীতি হয়। সেই তালবন জনমানব-শূন্য। হিংস্রজন্তু-পূর্ণ বলিয়া লোক-প্রসিদ্ধ! তালবনে পৌঁছিয়া রঘুদয়াল দেখিলেন, রমাপ্রসাদ হাঁপাইতেছে। কহিলেন,—"তুমি এই এক ক্রোশ পথ চলিয়াই হাঁপাইতে, আরম্ভ করিলে? এখনও আমাদিগকে বার চৌদ্দ ক্রোশ পথ যাইতে হইবে; তবে বিশ্রাম করিতে পাইবে। যদি বেশী দূর যাইতে না পার, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অদ্য ধরা পড়িবে। আমার সঙ্গে এই টুকু চলিয়া আসিতে হাপাইলে!—এখনও প্রায় সমস্ত পথই বাকী।"

রমাপ্রসাদ। এতটা পথ তোমার সঙ্গে দৌড়িয়া আসিলাম; হাপাইব না?

রঘুদয়াল। আমার সহজ চলনেই তোমাকে দৌড়িতে হই-য়াছে; কিন্তু আমি যখন দৌড় ধরিব, তখন তুমি কিরূপে আমার সঙ্গে যাইবে, তাহাই ভাবিতেছি। ব্যাপার বড় কঠিন দেখিতেছি। তুমি ছেলে মানুষ; কখনও বেশী পথ চল নাই;—দৌড়িয়াই বা দশ বার ক্রোশ পথ কেমন করিয়া যাইবে?

রমাপ্রসাদ। দশ বার ক্রোশ পথ?—দুই ক্রোশ পথ যাইতে পারিব কি না সন্দেহ। আমি এই এক ক্রোশ পথ আসিয়াই হাঁপাইতেছি।

রঘুদয়াল তখন বালককে হাঁপাইতে দেখিয়া কহিলেন,—"বৎস,

ব'স, বিশ্রাম কর। দেখ আমরা মুক্তিলাভ করিয়া বড়ই বিপদে পড়িয়াছি। হাজতে থাকিলে এক রকম থাকিতাম ভাল। বাহিরে আসিয়া কেবলই ধরা পড়িবার আশঙ্কা। একবার যদি ধরা পড়ি, তাহা হইলে দ্বিগুণ কি চতুর্গুণ দণ্ড পাইব। আমি যদি একা হইতাম, তাহা হইলে কোন চম্বা ছিল না। আমি লম্বা লম্ফে এক প্রহর বেলা হইতে না হইতে এ মুলুক ছাড়াইতে পারিতাম। কিন্তু তুমি সঙ্গে আছ; তোমাকে একা রাখিয়া কোথায় যাই, কেমন করিয়াই বা যাই? ভবিবারও আর সময় নাই। এখনি আকাশ ফরসা হইবে,—এখনি কাক ডাকিবে।"

রমাপ্রসাদ। সর্দার দাদা! কোন্ অপরাধে তোমাকে হাজতে আনিয়াছিল?

রঘুদয়াল। সে সব কথা বলিবার এখন সময় নয়। পলাইবার উপায় চিন্তা কর।

রমাপ্রসাদ। পলাইব আর কোথায়? আমি আর হাটিতে পারি না। আচ্ছা, এই তালবনে লুকাইয়া থাকিলে হয় না?

রঘুদয়াল। তুমি ছেলেমানুষ। প্রভাত হইলে পুলিশ-কনেষ্টবলগণ কি তালবন খুঁজিতে বাকী রাখিবে? তাহারা এই তালবন তন্ন তন্ন ও পাতি পাতি করিয়া খুঁজিবে! এই দেশের চার পাঁচ ক্রোশ পথ ব্যাপিয়া, তাহারা আমাদের অন্বেষণে ব্যাপৃত থাকিবে। সুতরাং অন্ততঃ আট ক্রোশ দূরে গিয়া আমাদিগকে থাকিতে হইবে। উঠ, উঠ,—আর বিলম্ব করিও না। ঐ দেখ, এখনও গাছপালায় রাত রহিয়াছে; আকাশে অন্ধকার রহিয়াছে। এখন এক মুহূর্তের দাম অনেক। যদি আপনাকে বাঁচাইতে চাও, ত উঠ।

রমাপ্রসাদ কথা কহিলেন না, রঘুদয়ালের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

রঘুদয়াল। আমি জানি, তুমি উঠিতে পারিবে না; আমি জানি তুমিই বিভ্রাট ঘটাইবে। এক কর্ম্ম কর; আমি যা বলি, তা শুন। যদি আপন প্রাণ বাচাইতে চাহ, তবে অন্যমত করিও না। ঐ দেখ বুঝি ফরসা হইয়া আসিতেছে। উঠ, উঠ,—দাঁড়াও।

বালক রমাপ্রসাদের ভয় হইল; তিনি উঠিলেন, তিনি দাঁড়াইলেন। সভয় নেত্রে কহিলেন,—সর্দ্দার দাদা! দেখ, দেখ, ঐ দু'জন কে লোক আসিতেছে না? বোধ হয় আমাদিগকে ধরিতে আসিতেছে।

রঘুদয়াল। (হাসিয়া) ও কিছু নয়,—ও একটা গাছ। অন্ধকারে ঐরূপ দেখা যাইতেছে।

রমাপ্রসাদ। আমার মনে হইয়াছিল মানুষ।

রঘুদয়াল। তোমার সঙ্গে কোন কথা কহিবার দরকার নাই। তুমি নীরব থাক বৃথা সময় নষ্ট করিও না। শুন,—তুমি আমার পিঠ আকাড় করিয়া ধর; কাঁধে মাথা রাখ:—আমি আমার এই পাগড়ী দ্বারা ও বস্ত্র দ্বারা, পিঠে অচ্ছা করিয়া বাঁধিয়া লই। তোমাকে এইরূপ ভাবে পিঠে করিয়া আমি দৌড়িব।

রমাপ্রসাদ কি একটা কথা কহিতে যাইতেছিলেন; রঘুদয়াল কহিলেন,—"চুপ কর খবরদার! যদি কথা কও, তোমাকে এই খানে রাখিয়া যাইব।"

রমাপ্রসাদ ভয়ে আর কথা কহিতে পারিলেন না। রঘুদয়াল তাঁহাকে যেরূপ ভাবে পিঠ ধরিতে বলিয়াছিলেন, তিনি সেইরূপ ভাবে পিঠ ধরিলেন। রঘুদয়াল বস্ত্র দ্বারা কড়াকড় তাঁহাকে বুকের

সহিত বাঁধিয়া রাখিলেন। রমাপ্রসাদ বুঝি ভাবিলেন,—"ইহা অপেক্ষা আমার হাজত ভাল ছিল।"

রঘুদয়াল দৌড়িলেন। আইস,—তীর, তারা, উল্কা, বায়ু! একবার রঘুদয়ালের সঙ্গে দৌড়ের পরীক্ষা দাও।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

পবনবেগে কিয়দ্দূর রঘুদয়াল গমন করিয়াছেন,—রমাপ্রসাদ জিজ্ঞাসিলেন, "সর্দার দাদা! এদিকে কোথায় যাইতেছে? এদিকে আমাদের বাড়ী নয়?"

রঘুদয়াল। হাঁ! আমি যে স্থানে গিয়া লুকাইব ঠিক করিয়াছি, সেই স্থানে যাইতে হইলে আমাদের গ্রামের নিকট দিয়া যাইতে হয়। আর মনে করিয়াছি গন্তব্যস্থানে পৌছিবার পুর্ব্বে মায়ের সঙ্গে একবার দেখা করিয়া যাইব। কারণ, বোধ হয়, মা, তোমার জন্য এবং আমার জন্য বড়ই ভাবিতেছেন। এই দেখ, তিন-পোয়া পথের অধিক নয়—ঐ যে গ্রাম! একটু ভোর ভোর অন্ধকার থাকিতে আমরা গ্রামে গিয়া পৌছিব।

রঘুদয়াল-ডাকগাড়ী তখন বার মিনিটে এক ক্রোশ পথ চলিতেছে।

রমাপ্রসাদ। মা কি এতক্ষণ বাঁচিয়া আছেন! মা, বউ, লক্ষ্মী,—বোধ হয় না-খাইয়া এতক্ষণ মরিয়া গিয়াছেন।

রঘুদয়াল। বল কি?—হইয়াছে কি? আজিকার ঘটনাই বা কি? আর তুমি হাজতেই বা ছিলে কেন, সংক্ষেপে বল।

রমাপ্রসাদ। অদ্য বেলা দশটা পর্য্যন্ত যখন তুমি ফিরিয়া

আসিলে না, তখন আমাদের ভাবনা হইল। ঘরে এক মুঠাও চা'ল ছিল না। তার উপর চারি জন অতিথি আসিয়াছিল। এদিকে দুধের অভাবে লক্ষ্মীর প্রাণ যায়-যায়। তখন মা,—লক্ষ্মী-পূজার একটী মোহর আনিয়া আমায় দিলেন এবং সেইটী ভাঙ্গাইয়া সমস্ত জিনিষপত্র কিনিয়া দিতে বলিলেন। আমি নীলকুঠীতে মোহর ভাঙ্গাইতে গেলাম। সেখানে গিয়া দেখি, নীলকুঠীর অনেক মোহর গুণ্‌তি হ'চ্ছে। গণনায় একটি মোহর কমিল। স্থির হইল,—অবশ্যই এখানকার কোন ব্যক্তি ঐ মোহর চুরি করিয়াছে। সকলের কাপড়-ঝাড়া লয়। আমি ভাবিলাম, কাপড়-ঝাড়া লইলে আমার নিকট একটী মোহর বাহির হইবে এবং আমাকেই অবশ্য চোর বলিয়া ধরিবে। আমি তখন মোহরটীকে কাপড়ের খুঁট হইতে খুলিয়া নীলকুঠীর দেওয়ানজার জুতার দিকে গড়াইয়া দেওয়াই স্থির করিলাম। যেই ঐ ভাবে মোহর গড়াইতে গিয়াছি, অমনি আমাকে চোর বলিয়া ধরিল! তার পরে এই হাজত।

রঘুদয়াল। চিন্তা করিও না; কোন ভয় নাই,—চল।

রঘুদয়াল যখন স্বগ্রামে গিয়া পৌঁছিলেন, তখনও কাক ডাকে নাই। তখনও কোন কৃষাণ ধান কাটিতে বাহির হয় নাই। কেবল সেই নামগাওয়া বৈরাগী হরিনাম গাইতেছিল;—

হরিনাম বিনে আর কি ধন . ছ ,সংসারে,
বল্ মাধাই মধুর স্বরে!
শিব, ত্যজে কাশী শ্মশানবাসী, এই হরিনামের তরে;
সে যে আপনি হর—গঙ্গাধর পঞ্চমুখে গান করে;—
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

নারদ-ঋষি দিবানিশি বীণা যন্ত্রে গান করে ;
ঋষি, যারে দেখে, তারে বলে, বল হরি বদন ভ'রে ॥
গৌর নিতাই এরা দু'ভাই নাম বিলায় ঘরে ঘরে ;
এরা, অযাচকে প্রেম যাচে জেতের বিচার না করে ॥
হরিনামের গুণে, গহন বনে, শুষ্ক তরু মুঞ্জরে ;
এই, হরিনাম-সুধারস পিওরে বদন ভ'রে ॥
আমরা দু'ভাই অশেষপাপী—বিখ্যাত এ সংসারে ;
হরিনামের বলে অবহেলে যাব রে ভব-পারে ॥
হরিনামের গুণে, গহন বনে একলা গেল ধ্রুব রে ;
প্রহ্লাদ অগ্নিকুণ্ডে রক্ষা পেলে শিলা ভাসে সাগরে ॥
জগাই বলে, আয় রে মাধাই গঙ্গাজলে স্নান ক'রে ;
হরিনামের তরি ঘাটে বাঁধা যে ডাকে তায় পার করে ॥

রঘুদয়াল ফটকের নিকট দাঁড়াইলেন। বস্ত্রের বন্ধন খুলিয়া দিলেন। রমাপ্রসাদ পিঠ হইতে অবতরণ করিলেন। উৎকণ্ঠিত রঘুদয়াল সে হরিনাম-গান, একবার কাণ পাতিয়া না শুনিয়া থাকিতে পারিলেন না।

রঘুদয়াল দেখিলেন, ফটকের দ্বার খোলা। মনে সন্দেহ হইল,—"খোলা কেন ?' রমাপ্রসাদকে বলিলেন, "তুমি এখানে দাঁড়াও। আমি গিয়া দেখিয়া আসি, মা কোথায় আছেন ?"

তাহাই হইল। বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া রঘুদয়াল দেখিলেন, অধিকাংশ দ্বারই উন্মুক্ত। রঘুদয়াল অন্দরে পৌঁছিয়া ডাকিলেন,—"মা, মা ! কোথায় তুমি মা ?"

কেহ সাড়া দিল না।

রঘুদয়াল পুনরায় ডাকিলেন, "মা! মা! সাড়া দিতেছ না কেন মা? তুমি কোথায় মা?"

তথাচ কেহ উত্তর দিল না। যে কক্ষে মাতা শয়ন করেন, সেই কক্ষে রঘুদয়াল প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, মা নাই।

যে কক্ষে লক্ষ্মী ও বধূ শয়ন করেন, সে কক্ষে গিয়াও দেখিলেন, লক্ষ্মী ও বধূ নাই।

শঙ্করীর মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, মা শঙ্করীও নাই।

তথাচ রঘুদয়ালের মনে সন্দেহ ঘুচিল না। রঘুদয়াল আবার ডাকিলেন,—"মা, মা! সাড়া দাও। লক্ষ্মী! লক্ষ্মী! লক্ষ্মী! তোর ত শেষ রাত্রে ঘুম ভাঙ্গে, তুই বা কথা কহিতেছিস না কেন?"

অবোধ রঘুদয়াল ভাবিলেন, ইহারা বুঝি ছাদে গিয়াছে। রঘুদয়াল ছাদে উঠিলেন: দেখিলেন, কেহই নাই।

রঘুদয়াল নীচে নামিলেন, পাকশালা, গোশালা দেখিলেন; অতিথিশালা দেখিলেন,—কেহই নাই, কিছুই নাই, জনপ্রাণী নাই।

রঘুদয়ালের চক্ষে জল আসিল। "কোথায় মা, কোথায় মা" বলিয়া রঘুদয়াল বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন; "মা! তুমি বৃদ্ধা; বধূ! তুমি অল্পবয়স্কা; লক্ষ্মী! তুমি বালিকা;—এ তিন-জনের ত কোথাও যাওয়া সম্ভবপর নহে। কেহ কি তোমাদিগকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। অথবা দস্যুদল তোমাদিগকে প্রাণে মারিয়া গঙ্গায় ভাসাইয়া দিয়া গেল।"

"মা শঙ্করি! তুমিই বা কোথায় গেলে? কে তোমায় লইয়া গেল?"

কাঁদিতে কাঁদিতে রঘুদয়াল বাটীর বাহির হইয়া আসিলেন।

কাঁদিতে কাঁদিতে রমাপ্রসাদকে কহিলেন, “ভাই! সর্ব্বনাশ হইয়াছে,—মা নাই, বধূ নাই' লক্ষ্মী নাই!—ইঁহারা কোথায় গিয়াছেন, জানি না। ভাই! সর্ব্বনাশ হইয়াছে!”

বালক উচ্চরবে কাঁদিয়া উঠিলেন। রঘুদয়াল প্রকৃতিস্থ হইয়া বালককে কহিলেন, “ভাই! কাঁদিবার সময় নয়। এস, সেইরূপ ভাবে পিঠে উঠ! আর এখানে কিছুক্ষণ বিলম্ব করিলেই আমরা ধরা পড়িব।'

রঘুদয়াল পূর্ব্বভাবে রমাপ্রসাদকে পিঠে বাঁধিলেন; বাঁধিয়া দ্বিগুণ দণ্ডে দৌড়িলেন।

দেখিতে দেখিতে কোথায় নিভাও হইয়া গেলেন। রঘুদয়ালকে আর কেহ দেখিতে পাইল না।

এখন ৺শঙ্করীপ্রসাদের পরিবারবর্গ সকলেই নিরুদ্দিষ্ট হইলেন জ্যেষ্ঠ ভবানীপ্রসাদ বহুদিন নিরুদ্দিষ্ট। তিনি মৃত, কি জীবিত, তাহা কেহ জানে না। কাত্যায়নী, যশোদা দেবী, লক্ষ্মী—নিরুদ্দিষ্ট!—তাহারা বলপূর্ব্বক অপহৃত,—মৃত কি জীবিত, তাহা কেহ জানে না। আর রঘুদয়াল ও রমাপ্রসাদ চক্ষুর অগোচরে অবস্থিত,—পৃথিবীর কোন্ নিভৃত প্রদেশে লুক্কায়িত, তাহাও কেহ জানে না। কোথায় গেল, কোথায় লুকাইল, কি করিল—আবার ধৃত হইল কি না, তাহাও কেহ জানে না।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী।

দ্বিতীয় ভাগ।

কলিকাতা,

৩৮। ২ ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী-ইলেক্‌ট্রো মেসিন প্রেসে,

শ্রীনুটবিহারি রায় দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী।

দ্বিতীয় ভাগ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

খুব ভোরে উঠিয়া, একজন বৈরাগী বাড়ী বাড়ী নাম গাহিতেছিলেন। ভোর যে, তখন রাত্রি ছিল। রাত্রি থাকিলেও, অন্ধকার তত ছিল না। অকাশে পূর্ণচন্দ্র সমুদিত। পূর্ণিমা তিথি। বসন্তকাল। ফাল্গুন মাস ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তের পূর্ব্বক্ষণ বড়ই রমণীয়। বৈরাগী সেই সময় উঠিয়া করতাল লইয়া, উচ্চ-মধুরকণ্ঠে, বাড়ী বাড়ী হরিনাম গান আরম্ভ করিয়াছেন,—

"জয় যজ্ঞেশ্বর, জগদীশ্বর, জগজ্জন জগৎপালন!
হৃষীকেশ হরি, রাসবিহারী, রমানাথ রাধামোহন!
হরি বিশ্বম্ভর, বংশীধর, শ্রীধর গিরিধারণ!
(তুমি) অনাথের নাথ, শ্রীপতি শ্রীনাথ, দীননাথদীনতারণ!"

এমন গগনভেদী মধুর-কণ্ঠধ্বনি আমি কখন শুনি নাই। বিশেষ, বিষয় হইল হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন। কাজেই, লোক-কর্ণে মধুর হইতে

মধুরতর বোধ হইতে লাগিল। মধুমাখা হরিনাম গান শুনিয়া, অনেক গৃহস্থেরই ঘুম ভাঙ্গিল। কেহ ছাদে উঠিয়া,—কেহ জানালা খুলিয়া,—কেহ গৃহদ্বার উন্মোচনপূর্ব্বক বাহিরে আসিয়া, সেই গান শুনিতে লাগিল। সকলেরই ইচ্ছা বৈরাগী তাহার নিকট একটু অধিকক্ষণ দাঁড়াইয়া গান গায়। কেহ বা মুখ ফুটিয়া, বাবাজীকে একটু বেশী সময় গান করিতে বলিলেন। কিন্তু বৈরাগী সেকথা শুনিলেন না; কোন উত্তর দিলেন না; কেবল, যোড়হাত করিলেন; সেই যোড়হাতের এই ভাব,—যে— "আমাকে ক্ষমা করিবেন; আমি অধিকক্ষণ দাঁড়াইতে পারিব না।" বৈরাগী আপন মনে গাহিতে গাহিতে চলিতে লাগিলেন,—

"ত্রিলোকপালক বালকবেশেতে কর বসুদেব-দুঃখ-নাশন।
তুমি নরকান্তকারী, নরকান্তি ধরি, নরকুলে জন্ম-গ্রহণ।
(হরি) ভকতবৎসল, ভবতারণ ভানুজ ভয়ভঞ্জন।
তুমি গোলোকের পতি, অগতির গতি, গোকুলচন্দ্র গোপীমোহন।
ব্রজেন্দ্রনন্দন, ব্রহ্ম-সনাতন, বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত ঐ চরণ।"

বৈরাগীর বয়ঃক্রম আটচল্লিশ বৎসর হইলেও, তাহার দেহে বিলক্ষণ শক্তি। বক্ষঃ প্রশস্ত। কোমরটী সরু। মাথায় টাক। আকৃতি কিঞ্চিৎ খর্ব্ব। পরিধান,—গেরুয়া বসন। কাপড়খানি ঘেরাটোপের মত পরা,—কাছা নাই। গায়ে একখানি লাল বনাত। মাথায় হরিনামের নামাবলী জড়ান,—পাগড়ী বাঁধা। একটী হরিনামের ঝুলি বুকে ঝুলিতেছে। সেই ঝুলির ভিতর ডান হাতটী দেওয়া আছে। যখন গান গাহিতেছেন, তখন উল্লাসপূর্ণ হইয়া, ডানি হাত, ঝুলি হইতে বাহির করিয়া, দুই হাত তুলিতেছেন এবং মাঝে মাঝে বৈরাগী নাচিতেছেন। এক এক-

বার যখন গান বন্ধ হইতেছে, তখনই ডান-হাত ঝুলির ভিতর দিয়া হরিনাম করিতেছেন। তাহাও মনে মনে নহে, স্পষ্টাক্ষরে সুর-সংযোগে,—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

হরিনাম থামিলে, আবার গান আরম্ভ হয়,—

"ওহে যোগীন্দ্র, মুনীন্দ্র, ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র চরণেতে লয় শরণ॥
হরি দামোদর, দ্বারকানাথ, দৈত্যকুলনাশন।
তুমি হরহৃদি-নিধি, নিরবধি বিধি করে পদ-সেবন।
মুনিগণ-শিরোমণি, তুমি চিন্তামণি, নারদাদি-মুনি-ধ্যানধন।
করুণা-কটাক্ষে, অকিঞ্চন পক্ষে, কর রক্ষে ভববন্ধন॥"

এইরূপ গাহিতে গাহিতে বৈরাগী-ঠাকুর প্রায় এক ক্রোশ কি দেড় ক্রোশ পথ অতিক্রম করিলেন। যেখানে বাঙ্গালীর বাড়ী আছে জানেন, সেইখানে গিয়াই গান ধরেন। এইরূপে ৺কাশী-ধামে বাঙ্গালীটোলার প্রায় সর্ব্বস্থান এবং অন্যান্য পল্লীতে দুই একটী স্থানে গান গাহিতে গাহিতে, ভ্রমণ করিয়া, বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। ঐ গানটী তথায় সম্পূর্ণরূপে আবৃত্তি করিলেন। অবশেষে, বৈরাগী দশাশ্বমেধ ঘাটে আসিয়া, উপবেশনপূর্ব্বক আর একটী গান ধরিলেন। তখন পূর্ব্বদিকে উষা দেখা দিল। মধুর বসন্ত-বায়ু, আরও মধুর হইয়া বহিতে লাগিল। গঙ্গার সেই নির্ম্মল জল,—তাহার উপর তীর্থমহাত্ম্য! তদুপরি,—কমকণ্ঠে হরিনাম-গুণ গান! মনে হইল,—বুঝি ইহাই সাক্ষাৎ গোলোকপুরী; ইহাই সাক্ষাৎ কৈলাসধাম।

দশাশ্বমেধ-ঘাটে লোকের যখন অধিক সমাগম হইতে আরম্ভ

হইল, তখন বৈরাগী ধীরে ধীরে সে স্থান হইতে উঠিয়া, বাঙ্গালী-টোলার ভিতরে প্রবেশ করিলেন এবং ক্রমশঃ কোথায় যে মিলাইয়া গেলেন, তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কিছু কম পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ৺কাশীধামে বাঙ্গালী-টোলায় প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে একজন বৈরাগী ঐরূপই হরিনাম গান করিয়া বেড়াইতেন। উচ্চ গগনভেদী অথ, মধুর-কণ্ঠধ্বনি ছিল বলিয়া, লোকের মন তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। বৈরাগীকে কেহ কিছু দিতে চাহিলে, বৈরাগী তাহা গ্রহণ করিতেন না। ঐ বৈরাগীর এই সাধুতা দেখিয়া, "ধন্য ধন্য" পড়িয়াছিল।

বৈরাগী কাশীধামে দুই সপ্তাহের অধিককাল ঐরূপ নাম গাহিলেন। অনেক ভদ্র ব্যক্তি তাঁহাকে চাল ডাল প্রভৃতি দিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু তিনি বলিলেন,—"এখন লইব না; মাসান্তে লইব।"

এক দিন বৈরাগী এইরূপ নাম গাহিয়া গাহিয়া রাজপথে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে এক ক্ষুদ্র কুটীর হইতে, এক দীর্ঘাকার পুরুষ বহির্গত হইয়া, বৈরাগীকে নিকটে ডাকিল। বৈরাগী তাহার মুখপানে চাহিলেন। দীর্ঘাকার পুরুষ কহিলেন,—"আর কেন, এস, আমার ঘরে এস! আমি চিনিয়াছি।"

বৈরাগী। অধিক গোল করিও না,—আমি তোমার বাটী চিনিয়া রাখিলাম। নগর-ভ্রমণ ও হরিনাম সাঙ্গ হইলে, আমি তোমার নিকট আসিব।

দীর্ঘাকার পুরুষ। পথে জন-মানব নাই। কেহ দেখিতে পাইবে না। এস, আমার বাটীতে।

এই বলিয়া দীর্ঘাকার পুরুষ, খর্ব্বাকৃতি বৈরাগীর দক্ষিণ হস্ত ধরিল; ধরিয়া টানিয়া আনিল; নির্জ্জন ঘরে বসাইল; বসাইয়া দ্বারে ও ঘরে খিল দিল। বৈরাগী হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসিল,—"তুমি কোথা হ'তে হে এখানে এলে বলো দেখি?"

দীর্ঘাকার পুরুষ। তুমি বলো দেখি, তুমি কোথা থেকে এখানে

এই বলিয়াই দুই জনায় হা স।

বৈরাগী। তোমার সঙ্গে যে এত শীঘ্র এবং এত সহজে দেখা হবে, তা আমার মনে ছিল না। আজ বড় আনন্দ,—বড় আহ্লাদ যে, তোমার দেখা পেলুম।

দীর্ঘাকার পুরুষ। তুই কাশীতে এসে, এ কিরকম করছিস্ বল দেখি? অত ভোরে উঠে, গান গেয়ে গেয়ে বেড়িয়ে কি হচ্চে?

বৈরাগী। আর কি করি ভাই বল্? গবান্ গনাট: দিয়েছেন! একবার গেয়ে নিচ্চি,— কাশীতে। তামাক আছে' বলতে পারিস্? একবার তমাক সেজে খাওয়া দেখি?

এমন সব স্থলে তামাকের অর্থ—গাঁজা। দীর্ঘাকার পুরুষ 'গাঁজা সাজিল'; আপনি খাইল, বৈরাগীকে খাওয়াইল। বৈরাগী গাঁজা খাইয়া কহিল,—"এই শালার কাশীতে শীত দেখেছিস্! দুপুর বেলা যেমনি গরম, আর এই ভোর বেলাটায় তেমনি শীত। এ একটু বনাতে কি শীত ভাঙ্গে?"

দীর্ঘাকার পুরুষ। এ ছেঁড়া বনাত খানা কোথা পেলি?

বৈরাগী। ভগবান্ দিলেই পাই; না দিলেই না পাই। বনাতের আবার অভাব কি? নিলেই হয়; না নিলেই না হয়।

এই কথা বলিতে বলিতে উভয়েই হাস্য করিয়া উঠিল।

বৈরাগী। ভাগ্যে তোর ঘরে তামাক ছিল, তাই শীতটে একটু ভাঙ্গলো।

দীর্ঘাকার পুরুষ। মদ খাবি?

বৈরাগী। দিলেই খাই; না দিলেই না খাই। অদৃষ্টে যদি আজ মদ লেখা থাকে, ত কে খণ্ডাবে?

দীর্ঘাকার পুরুষ। আচ্ছা ধর্—আচ্ছা নে। ঐ মাটির ভাঁড়টা তোল্। মাটির ভাঁড়টী কাত হইয়া শুইয়াছিল। বৈরাগী তাহাকে উঠাইয়া নিজের হাতের উপর বসাইল।

দীর্ঘাকৃতি পুরুষ বোতল হইতে মদ্য ঢালিয়া দিল। বৈরাগী এক ভাঁড় মদ খাইল।

দীর্ঘাকার পুরুষ জিজ্ঞাসা করিল,—"আর একটু খাবি?"

বৈরাগী। না আর খাব না। অনেক দিন মদ খাই নাই। আবার বেশী নেশা হবে কিনা, তাই ভাব্‌চি।

দীর্ঘাকার পুরুষ। আরে খা—খা! আর একটু, দেখ! তোর তিন বোতলে নেশা হয় না, আর এই আধপো এক ভাঁড়ে নেশা হবে!

বন্ধুর অনুরোধ রক্ষা না করিলে, পাছে বন্ধু বিরূপ হন, এই জন্য বৈরাগী আর এক ভাঁড় মদ খাইলেন।

দীর্ঘাকার পুরুষ। মাছ ভাজা খাবি?

বৈরাগী। গরম গরম পাই ত খাই।

দীর্ঘাকার পুরুষ। শুট্‌কী মাছ আছে।

বৈরাগী। বেশ হবে,—বেশ হবে! শুট্‌কী মাছ পুড়িয়ে দে। বড় মজাদার লাগবে।

আহারাদি সম্পন্ন হইলে, উভয় বন্ধুতে প্রেমালাপ আরম্ভ হইল।

দীর্ঘাকার পুরুষ। আচ্ছা তুই পালালি কি করে বল্‌ দেখি? তোকে এক শ জনে বাড়ী ঘেরাও কল্লে। আমি ঠাওরালেম, এইবার বাছাধনকে পুলি-পোলাও খেতে হবে। কিন্তু তুই ভাই! আচ্ছা পালিয়েছি স্। তোর চেয়ে বাহাদুর লোক আর নেই। দে শালা! তোর পায়ের ধূলো!

এই বলিয়া দীর্ঘাকৃতি পুরুষ,—খর্ব্বাকৃতি বাবাজীর পায়ের ধূলো লইতে চেষ্টা করিল।

বাবাজী কহিল,—"রোস্, রোস্! তোর পায়ের ধূলা আমি নেবো, কি আমার পায়ের ধূলো তুই নিবি, এ বিষয়ে আগে বিচার কর্‌তে হবে। তোর হাতে হাতকড়ি, পায়ে বেড়ী,—কোমরে বেড়ী দিয়ে, তোকে জাহাজে চড়িয়ে দ্বীপ-চালান ক'রেছিল। তুই জাহাজ থেকে লাফিয়ে গঙ্গাসাগরে প'ড়েছিলি; তার পর ডুব-সাঁতার কেটে একটা গাঁয়ে উঠেছিলি। সে খবরও আমি পেয়েছিলুম। তার পরে, একবার খবর পেলুম যে, তুই দাঙ্গা ক'রে তিনটে খুন করেছিস্; তোর ফাঁসীর হুকুম হয়েছে। যে দিন ফাঁসী হবে, তার পূর্ব্ব দিন হাতকড়ি ভেঙ্গে,—বেড়ী ভেঙ্গে,—জেলখানার পাঁচীর ডিঙ্গিয়ে পালিয়ে গিয়েছিস্। তাই বল্‌চি, বাহাদুর আমি না তুই? অতএব তুই আমাকে পায়ের ধূলো দে!"

দীর্ঘাকার পুরুষ। তবে একটা মাঝামাঝি মিটিয়ে নে;—তুই আমাকে পায়ের ধূলো দে;—আমিও তোকে পায়ের ধূলো দিই।

বৈরাগী। আমি যে ভাই! কৈবর্ত্ত; আমার পায়ের ধূলো তোকে কি ক'রে দেবো?

দীর্ঘাকার পুরুষ তখন উন্মত্ত মাতাল। সে কহিল, আরে রেখে বোস্! এ কাশীতে সে সব বাধে না। এখানে ছত্রিশ জাতি এক। এ সোণার জায়গা—বেশ মজার পবিত্র স্থান।

এই বলিয়া উভয়েই উভয়ের পায়ের ধূলো লইল এবং উচ্চ-হাসি হাসিয়া, উভয়ে একবার কোলাকুলি করিল; কোলাকুলি করিতে করিতে হাসিয়া হাসিয়া, শেষে ভূমে গড়াগড়ি দিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দীর্ঘাকার পুরুষ। আরে ভাই। ফরসা হ'য়ে আসছে! এইবার আস্তে আস্তে কথা কই আয়; লোকজন সব এইবার উঠ্‌বে।

বৈরাগী। তুই এত দেশ বেড়ালি, এত কাণ্ড করলি;—কাশীতে এসে ভয় হলো নাকি? কার ভয়ে এমন আস্তে আস্তে কথা ক'ব?

দীর্ঘাকার পুরুষ। ভয় যদি তোর মোটেই হয় নাই, তবে তুই কাশীতে এত ভোর রাত্রে বৈরাগী সেজে, গান গেয়ে বেড়াচ্ছিস্ কেন? এবং আমার বাড়ী ঢুকিবার পূর্ব্বে আমাকে গোল করিতে নিষেধই বা করিলি কেন?

বৈরাগী। বটে ভাই, বটে ভাই! ঠিক্ ব'লেছিস্!

দীর্ঘাকার পুরুষের নাম জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়,—উপাধি

স্রায়। নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী কোন পল্লীতে ইহাঁর জন্মস্থান। অতি শৈশব অবস্থাতেই জয়গোপাল পিতৃ-মাতৃহীন। অন্য অভিভাবক কেহ ছিল না। জয়গোপাল বাল্যকালে পরের বাড়ী মাগিয়া খাইয়া, দিনযাপন করিত। হাড়ে-মাসে জড়িত গঠন, দীর্ঘ আকার —হঠাৎ দেখিলে খুব জোয়ান বলিয়া বোধ না হইলেও, জয়গোপালের গায়ে বিলক্ষণ শক্তি ছিল। শক্তির অপেক্ষা সাহস অধিক ছিল। বাল্যকালেই জয়গোপাল বাঘের মুখে যাইতে ভয় করিত না। মাঠে বাঘ আসিয়াছে, গোরু ধরিতেছে,—অমনি লম্বা জয়গোপাল লম্বা লাঠী লইয়া, লম্বা লম্বা লাফে মাঠের দিকে দৌড়িল। জয়গোপাল একবার লাঠীর দ্বারা ঠেঙ্গাইয়া, এক বড় নেকড়ে বাঘ বধ করিয়াছিল। বন্য শূকর দেখিলে ত, জয়গোপাল নিধি পাইত। শূকরও দৌড়িতেছে, জয়গোপালও পশ্চাৎ পশ্চাৎ বল্লম লইয়া দৌড়িতেছে। যতক্ষণ না শূকরটীকে হনন করিতে পারিত, ততক্ষণ জয়গোপাল ঘরে ফিরিত না। জয়গোপালের শিয়াল মারিবার শক্তি সমধিক জন্মিয়াছিল। শূন্যহস্তে দৌড়িয়া গিয়া, শিয়াল মারিত। এইজন্য জয়গোপাল নাম পাইয়াছিল—শিয়ালমারা। বেটো নৌকা নদীতে ডুবিয়াছে, আরোহিগণ হাবুডুবু খাইতেছে, কেহ বা ডুবিয়া তলাইয়া যাইতেছে,—জয়গোপাল এই ব্যাপার দেখিয়াই ঝুপ করিয়া জলে ঝাঁপ দিল; কাহাকে পিঠে করিয়া, কাহাকে বা হাত ধরিয়া টানিয়া ডাঙ্গায় তুলিতে লাগিল। এদিকে ধনুর্ব্বিদ্যায় শিয়ালমারা সিদ্ধহস্ত ছিল। এক এক তীরে, সে এক একটী শূকর বধ করিত। জয়গোপাল বঙ্গের কোন বিখ্যাত ওস্তাদের নিকট নানারূপ অস্ত্র-বিদ্যা শিক্ষা করে। জয়গোপালের যত বয়স বাড়িতে লাগিল, ততই তাহার উদরান্নের চিন্তা বৃদ্ধি

পাইতে থাকিল। অবশেষে জয়গোপাল ডাকাতের দলে মিশিল; শেষে নিজে ডাকাতের দলপতি হইল। এই অবস্থায় জয়গোপালের নাম ছিল—শিয়ালমারা; আত্মনাম গোপন ছিল।

বৈরাগীর নাম হরিচরণ দাস; জাতিতে কৈবর্ত্ত। নিবাস মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কোন গ্রামে। হরিচরণ চাষী ছিল। আলু, বেগুন, পটোল তাহার জমিতে প্রচুর পরিমাণে জন্মিত; মাথায় বাজরা লইয়া, সে হাটে যাইত; স্বচ্ছন্দে সংসার চালাইত। মধ্যে কয়েক বৎসর অজন্মা হইল। অনাবৃষ্টি-নিবন্ধন দেশে অন্নকষ্ট উপস্থিত হইল। হরিচরণ তাহার জমিতে ফসল পাইল না, রাজ-খাজনা দিতে অসমর্থ হইল; জমিদার বাকী-খাজনার নালিশ করিয়া হরিচরণের গোরু বাছুর সমস্তই বেচিয়া লইলেন। খাইতে না পাইয়া, হরিচরণের স্ত্রী এবং পুত্র শীর্ণ-কলেবর হইল। স্ত্রী-পুত্রের ক্রমশঃ উদরাময় পীড়া জন্মিল; শেষে তাহারা প্রাণে মরিল।

হরিচরণ খর্ব্বাকৃতি ছিল। তাহার বক্ষঃ বিশাল ছিল, কোমর সরু ছিল, দেহ লোহার ন্যায় কঠিন ছিল;—হরিচরণ কোমর বাঁধিয়া, লাঠী ঘাড়ে করিয়া দাঁড়াইলে, বেশ একজন জোয়ান বলিয়া বোধ হইত। হরিচরণ বড়লোকের বাড়ী দ্বারবান্ হইল। এই দ্বারবান্-অবস্থায় হরিচরণ সঙ্গীত শিক্ষা করে। বড়লোকের বাড়ী অনেক কালোয়াৎ আসিত, অনেক গায়ক আসিত;—সঙ্কীর্ত্তন হইত, যাত্রা-কীর্ত্তন-কবি হইত, হরিচরণ মনঃসংযোগে সে সকল গান শুনিত, অন্তরস্থ করিত এবং স্থানান্তরে গিয়া লুকাইয়া লুকাইয়া সে সকল গান গাহিত।

হরিচরণ মধুরকণ্ঠ ছিল এবং তাহার গলার সুর সতেজ ছিল।

সুর অতীব উচ্চে উঠিত। ক্রমশঃ প্রকাশ পাইল, হরিচরণ গান জানে। সঙ্গীতজ্ঞ বড় বাবুরও তখন হরিচরণের উপর দৃষ্টি পড়িল। তিনি হরিচরণকে গাহিতে বলিলেন।—হরিচরণ লজ্জিত হইল; যোড়হাতে বলিল,—"আমি ক্ষুদ্র, অধম, আমি গান জানি না।" এইরূপ দুই একদিন বলা-কহার পর, হরিচরণ বাবুর সম্মুখে গান ধরিল। সেই মধুর-গম্ভীর আওয়াজ শুনিয়া বাবু মুগ্ধ হইলেন এবং হরিচরণকে একযোড়া শাল পুরস্কার দিলেন। প্রত্যহ সন্ধ্যার পর বাবুর সম্মুখে হরিচরণের গান হইতে লাগিল। হরিচরণ এখন আর দ্বারবান্ নাই;—বেনিয়ান্ গায় দেয়, চটী-জুতা পায় দেয়, বাবুর পরা পুরাণ ফুল-পেড়ে কাপড় পরে, আর বাবুর সম্মুখে স্বতন্ত্র আসনে সর্ব্বদা বসিয়া থাকে। এই যে, হরিচরণের ক্রমশঃ ঈষৎ টেড়ী দেখা দিতেছে। তাই ত, হরি-চরণের কাপড়ে আতরের গন্ধ কেন? মাথায় ফুলেল-তেলের গন্ধ কেন? গোঁফে কলপ কেন? কোঁচান না হইলে যে কাপড়খানা পরা হয় না! সদাই পাণ খাইয়া হরিচরণ অধরোষ্ঠকে এত লাল-বর্ণ করিয়া রাখে কেন? মাঝে মাঝে শীশে গান গায় কেন? প্রভুদত্ত কোর্ত্তার পকেটে গোলাপ ফুল গুঁজিয়া রাখে কেন?

এ আবার কি রকম দেখি? ঐ শুনুন,—হরিচরণ কৈবর্ত্ত, সাধু ভাষায় কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছে। হরিচরণ এখন হাটকে হট্ট, পুকুরকে পুষ্করিণী এবং হাতীকে গজ বলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

মজা দেখুন! মজা দেখুন! কৈবর্ত্ত-নন্দন আবার লেখা-পড়া শিখিতে আরম্ভ করিয়াছে। "শিশুবোধক" কিনিয়া ক, খ, গ, মুখস্থ করিতেছে। 'কয়ে করাত বলিতেছে, 'ঙ'-য় লাঙল

বলিতেছে ; 'ঞ'-য় চাবি-কাটি বলিতেছে ; 'ক্ষ'-য় ক্ষুর বলিতেছে। এইরূপ বলিতে বলিতে একদিন দেখা গেল,—হরিচরণ পাঠ আরম্ভ করিয়াছে,—

"বন্দ মাতা সুরধুনী, পুরাণে মহিমা শুনি,
পতিতপাবনী পুরাতনী।
বিষ্ণুপদে উপাদান, দ্রবময়ী তব নাম,
সুরাসুর-নরের জননী ॥"

দেখিতে দেখিতে হরিচরণ ভাল বাঙ্গালা এবং কিঞ্চিৎ সংস্কৃত শিখিল। হরিচরণের গুণ ছিল,—যাহা একবার দেখিত, তাহাই শিখিত এবং তাহার অনুকরণ করিতে পারিত। মনিব যাহা ভাল বাসিত, হরিচরণ তাহাই করিত। ক্রমে ক্রমে হরিচরণ মনিবের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া দাঁড়াইল। হরিচরণের মধুর উচ্চকণ্ঠ,—প্রিয়পাত্র হইবার বিশেষ কারণ। তাল-জ্ঞান তাদৃশ না থাকিলেও, হরিচরণ কণ্ঠে দিগ্বিজয়ী। সমাগত বহুবিধ ওস্তাদের নিকট গান শুনিয়া এবং কথঞ্চিৎ শিখিয়া, হরিচরণ একজন সুগায়কও হইল। প্রভুর ভালবাসার যখন পরম পাত্র হইল, হরিচরণ তখন অন্দরেও যাতায়াত আরম্ভ করিল।

হঠাৎ একি দেখি? মনিবের বৈঠকখানায় কেহ নাই। হরিচরণ নির্জ্জনে নিভৃতে কোমর দুলাইয়া, মাথায় এক হাত কোমরে এক হাত দিয়া,—এমন, খেমটা নাচে কেন?

ইহার এক সপ্তাহ পরে প্রভু প্রত্যূষে উঠিয়া, বৈঠকখানায় বসিয়া ডাকিতেছেন—'হরিচরণ! হরিচরণ' হরিচরণ সাড়া দিল না। প্রভু উচ্চকণ্ঠে আবার ডাকিলেন,—'হরিচরণ! হরিচরণ' তবু দুষ্ট হরিচরণ সাড়া দিল না! প্রভু আসিবার

অর্দ্ধদণ্ড পূর্ব্বে যে হরিচরণ, প্রভুর আগমন প্রতীক্ষা করিয়া, যোড় হাতে দাঁড়াইয়া থাকিত, প্রভু দ্বারা বহুবার আহূত হইয়াও, সে হরিচরণ আজ সাড়া দিল না কেন?—নিকটে আসিল না কেন?—আজ্ঞাপালন করিল না কেন? হরিচরণের অন্বেষণ জন্য চারিদিকে চর দৌড়িল। কিন্তু হরিচরণকে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না! বৈঠকখানায় বসিয়া, প্রভু বিষণ্ন মনে কেবল ভাবিতে লাগিলেন।

এ কি! অন্দর হইতে ক্রন্দনধ্বনি উঠে কেন? এ কার গলা? বাবুর পরিবারের নয়! মায়েরও নয়! ঠিক যেন বাবুর বাড়ীর সেই বুড়ী ঝির গলা! না,—না,—তা—নয়! বাবুর মায়েরও ত গলার আওয়াজ আসিতেছে! তিনি যেন "হায়! কি সর্ব্বনাশ হ'ল" বলিয়া কাঁদিতেছেন। বাবু শশব্যস্তে অন্দরে গেলেন; গিয়া শুনিলেন, বাবুর বাটীর অতি প্রাচীন বিধবা ঝির কন্যা নাই! প্রাতঃকাল হইতে, কন্যাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। কন্যার নাম,—'কামরাঙ্গা।' সে বালবিধবা। এইরূপ কিংবদন্তী,—কামরাঙ্গার বয়ঃক্রম সতর বৎসর উত্তীর্ণ হইতে এখনও চারি মাস বাকী।

বাবু খানিক স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। একবার এদিক্ ওদিক্ চারিদিক্ চাহিলেন; শেষে বলিলেন,—"সর্ব্বনাশই বটে! হরিচরণের এই কাজ। কামরাঙ্গা নিশ্চয়ই হরিচরণের সঙ্গে গেছে।"

গৃহিণী আসিয়া কহিলেন,—"আরও যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে দেখিতেছি; বাবুর ক্যাস বাক্স কৈ? আমার গহনার বাক্স কৈ?" বাবু দৌড়িয়া গিয়া, ঘরের ভিতর ঢুকিলেন; দেখিলেন, লোহার সিন্দুকের চাবি খোলা। তখন বুঝিলেন যে, এ সমস্তই হরিচরণের কাজ। হরিচরণ এবং কামরাঙ্গাকে অন্বেষণার্থ চারি দিকে চর

ও দূত প্রেরিত হইল। কিন্তু হরিচরণ এবং কামরাঙ্গাকে কোথাও পাওয়া গেল না।

কামরাঙ্গাকে লইয়া হরিচরণ অনেক দেশ ফিরিল। শেষে সে, বৰ্দ্ধমানের সদরঘাটের মাঝি হইল। দিনে মাঝিগিরি করে, রাত্রি কালে সিঁদ দেয়, চুরি করে—হরিচরণের দিনে রেতে রোজগার চলিল। এই সময়ে হরিচরণ নাম লইয়াছিল—নবীন ধাড়া। উপার্জ্জন বেশ দশ টাকা হইতে লাগিল বটে, কিন্তু কামরাঙ্গা কামিনী লইয়া, নবীন ধাড়া বড়ই বিব্রত হইল। তাহার বাটীতে এই কামরাঙ্গা-কামিনী-ঘটিত এক ভয়ানক মারামারি হইয়া গেল। নবীন ধাড়া একা, প্রতিপক্ষ আট জন। নবীন বিলক্ষণ শক্তিশালী পুরুষ হইলেও, আট জনের সহিত অৰ্দ্ধদণ্ড যুঝিয়াই ভূতলে পতিত হইল। তাহার কোমরে লাঠী পড়িল, পায় লাঠী পড়িল, পিঠে লাঠী পড়িল, মাথায় লাঠী পড়িল। সকলেই ভাবিল, নবীন ধাড়া মরিয়াছে। শ্রীমতী কামরাঙ্গাও, প্রাণেশ্বর নবীন ধাড়াকে পরাজিত এবং বিগতায়ু দেখিয়া, বিজয়ী এবং আয়ুষ্মান্ ঐ অষ্ট জন ব্যক্তির অনুগমন করিলেন।

নবীন ধাড়া কিন্তু মরিল না। তবে সে মাঝিগিরি কাজ ফেলিয়া, সদরঘাট হইতে পলাইতে বাধ্য হইল। তারপর, সে ডাকাতের দলে মিশিল। তখন তাহার নাম হইল,—মটর। কালক্রমে সেই দীর্ঘাকৃতি পুরুষ—শেয়ালমারার সহিত মটরের পরিচয় হইল। কখনও শেয়ালমারার দলে, কখনও বা অন্য দলে, যখন যেরূপ সুবিধা পাইত, তখন সেই রূপেই মটর সেই দলেই থাকিত। একবার, মটর গ্রেপ্তার হয়-হয় হইয়াছিল। তাহাকে প্রায় দুই শত লোক চারি দিকে বেষ্টন করিয়াছিল। মটর প্রমাদ

গণিল। বুঝিল,—এইবার মৃত্যু নিশ্চয়। যে বাড়ীতে ডাকাতি করিতে গিয়াছিল, সেই বাড়ীর উচ্চ প্রাচীরে আসিয়া, মটর তখন ঢাল-খাঁড়া লইয়া দাঁড়াইল, আর অমনি লম্ফ দিয়া দলে পড়িয়া তে-রে-রে-রে শব্দে সেই লোক-ব্যূহ ভেদ করিয়া চলিল। মটরের সেই ভীষণ অগ্নি-মূর্ত্তি—সেই ভয়ঙ্কর তে-রে রে-রে শব্দ শুনিয়া, লোক সকল ত্রস্ত হইল। মটরের ভয়ে,—কালান্তক যমোপম মটরের সেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়া,—কে কোথায় দৌড়িয়া পলাইল। মটর তরবারির আঘাতে দুই চারি জনকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া, বেগে ঊর্দ্ধশ্বাসে আপন গন্তব্যপথে ছুটিল। মটরের সিংহ-বিক্রমের কথা শুনিয়া, দশ ক্রোশ দূরস্থিত লোকগণ পর্য্যন্ত ভয়ে চমকিত হইল। ফৌজদারি আদালত হইতে মটরকে ধরিবার জন্য গ্রেপ্তারী-পরওয়ানা বাহির হইল; হুলিয়া হইল। কিন্তু তাহাকে আর কেহ ধরিতে পারিল না। শেষে, তাহাকে ধরিবার জন্য পুলিশ সাহেব গোয়েন্দা নিযুক্ত করিলেন। মটর যখন শুনিল, তাহাকে ধরিবার জন্য নানারূপ ষড়যন্ত্র হইতেছে, অর্থ দ্বারা বশীভূত হইয়া তাহার সুহৃদ্ মিত্রগণ পর্য্যন্ত তাহাকে ধরাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে, মটর তখন বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিল; কৌপীন পরিল; গেরুয়া-বসন ধরিল, দাড়ী রাখিল; নাকে তিলক কাটিল; বিভূতি মাখিল; মাথায় জটা পাকাইল এবং ভিক্ষাই উপজীবিকা করিল। মটর হরিনাম করিতে করিতে বঙ্গদেশ ছাড়িল। তাহার কণ্ঠ মধুর ছিল। মটর যে বাড়ীতে গিয়া একবার এইরূপ গান আরম্ভ করে,—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে,"—

সেই বাড়ীতেই গৃহস্থ তৎক্ষণাৎ ভিক্ষা না দিয়া থাকিতে পারে না। গৃহস্থ বলে,—"দেবতা! আর একবার হরিনাম করো; তোমার ঐ সুললিত কণ্ঠে আর একবার হরিনাম করো।" মটর কহিল,—"আমি ক্ষুদ্র ব্যক্তি; আমার কণ্ঠ কর্কশ; আমি আবার কি গান করিব? তবে হরিনামের এমনই গুণ, যে ব্যক্তি যেমন করিয়াই গা'ক, নামের গুণেই গান মিষ্ট লাগিবে। আমি কি জানি,—মূর্খ। গৃহস্থ কহিল,—"আপনি যা জানেন, তাই গান' আপনার কথাও অমৃত।" মটর গান ধরিল,—

কীর্ত্তন—কাওয়ালী।

"হরিবোল হরিবোল ব'লে,
কে যায় ন'দের বাজার দিয়ে।
ওরে, সোণার নূপুর রাঙ্গা পায়!
ওরে, নগর দিয়ে হেঁটে যায়, (দেখ রে)
হেলে পড়ে, নিতায়ের গায়।
ও, দেখ রে নূপুর পঞ্চম গায়!
ওরে, মারলি কান্দা নিতায়ের গায়!
(দেখ রে রক্তে অঙ্গ ভেসে যায়)।
ওরে, জগাই বলে মাধাই ভাই!
এমন রূপ আর দেখি নাই!
এমন নাম আর শুনি নাই!
ও—ভাই রে! এমন নাম আর শুনি নাই)।

হরিনাম শুনিয়া গৃহস্থের মন গলিয়া গেল; মটরের পায়ের ধূলা মাথায় লইল। নানাস্থলে এইরূপ পূজা পাইয়া, মটর সানন্দ-মনে চলিতে লাগিল। ভাবিল, এ এক রকম ত বড় নূতন মজা

দেখিতেছি! অন্নের অভাব ত আদৌ হয় না। অধিকন্তু প্রচুর সম্মান-ভক্তি-আদর পাওয়া যায়। ধর্ম্মের যখন ব্যবসায়ই করিতে হইল, তখন উত্তমরূপেই করা ভাল। মটর পথে যাইতে যাইতে কোন এক দোকানে একটী পাথরের কৃষ্ণঠাকুর কিনিল। কৃষ্ণ ঠাকুরের ব্যবসায়ে আরও শ্রীবৃদ্ধি হইল। এখন যেখানে যান, সেখানেই মটর আগে কৃষ্ণঠাকুরটীকে বাহির করিয়া, তাঁহার পূজা আরম্ভ করেন এবং অর্দ্ধস্ফুট স্বরে স্তব-পাঠাদি করিতে থাকেন। লোকের ভক্তি ইহাতে আরও বৃদ্ধি হয়। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে,—"বাবাজী ঠাকুর! আপনার আহার কি হইবে?" তিনি জিব কাটিয়া বলেন,—"আমার আহার ত কিছুই নাই; নারায়ণের প্রসাদই আমার আহার; শ্রীবিষ্ণুর দর্শন এবং স্পর্শনই আমার আহার; তাঁহার নাম-গানই আমার আহার।" মটর এই সকল কথা যত বিনাইয়া বিনাইয়া বলে, লোকের ভক্তি-তরঙ্গ তত আরও বাড়িয়া যায়। এইরূপে ধর্ম্মের বাণিজ্য করিতে করিতে, মটর গ্রেপ্তারী পরওয়ানার ভয়ে, সুহৃদ্‌গণের ষড়যন্ত্র-ভয়ে, ৺কাশীধামে আসিয়া পৌঁছিলেন। কাশীতে আসিয়া তিনি নাম লইলেন,—শ্রীবৈষ্ণব-দাস সনাতন বৈরাগী। এখানে আসিয়া তিনি নিষ্কাম-ধর্ম্মী হইলেন। কেহ কিছু দিতে আসিলে তিনি গ্রহণ করিতেন না; বলিতেন,—"অর্থ কৃমিকীট তুল্য, কামিনীকাঞ্চন আমি স্পর্শ করি না।" একদিন কাশীর একটী বড় মহাজন,—সনাতন দাসের সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া, শাল দান করিয়াছিলেন। সনাতন হাসিয়া সেই শাল সর্ব্বজন-সমক্ষে ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। সেই দিন হইতেই, তাঁহার নাম-পসার কাশীধামে পড়িয়া গেল। তিনি বলিতেন,—নাম প্রচারই তাঁহার ধর্ম্ম। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে অতি

প্রত্যুষে তিনি কাশীর বাড়ী বাড়ী—প্রত্যেক বাঙ্গালীর বাড়ী—নাম গাহিতেন। মধুর কণ্ঠে মুগ্ধ হইয়া যদি কোন হিন্দুস্থানী তাঁহার গান শুনিতে চাহিত, তাহা হইলে, তাহার বাড়ীও তিনি গান গাহিতেন। বাড়ী বাড়ী গান গাওয়ার দরুণ কেহ কিছু দিবার প্রস্তাব করিলে, তিনি কিছুই লইতেন না।

কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, সনাতন দাস বৈরাগীর তবে উদর পূর্ণ হইত কিরূপে? উদর পূর্ণ হইত এবং বাটীভাড়া আদি প্রদত্ত হইত,—চৌর্য্যবিদ্যা দ্বারা। ঐ যে, রাত থাকিতে তিনি উঠিতেন এবং বাড়ী বাড়ী নাম গাহিতেন, ঐ সময়ে আবশ্যক মত গৃহস্থের বাটী হইতে চুরি করিতেন। চৌর্য্যকার্য্যে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এমন বেমালুম ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিতেন যে, কাহার সাধ্য, তাহা জানিতে পারে? তবে, চুরী বেশী করিতেন না। যেরূপ খরচের তাঁহার দরকার হইত, সেইরূপই করিতেন।

আহার কার্য্যে সনাতন বৈরাগী বিশেষ পটু ছিলেন। কাশীতে আসিয়া তাঁহার মাছ ভাল লাগিত না। সনাতন কাশীর মাছের মোটেই ভাল আস্বাদ পাইতেন না। অথচ, এদিকে মাছই তাঁহার বিশেষ প্রিয় বস্তু ছিল। সনাতন মাছের পরিবর্ত্তে প্রত্যহ দেড় সের মাংস খাইতে আরম্ভ করিলেন। ঘি, দুগ্ধ, আটা এবং আতপান্ন যাহা পাইতেন, তাহাই খাইতেন। সনাতন নিদারুণ গঞ্জিকাসেবী ছিলেন; কতকটা মদ্যপায়ীও ছিলেন। প্রত্যহ আট আনা পয়সা গাঁজায় এবং মদে খরচ করিতেন। সনাতনের আর একটী গুণ ছিল,—পরস্ত্রীপানে খরদৃষ্টি। পরস্ত্রী-প্রার্থী হইলেও, এই তিন মাসের মধ্যে,—সনাতন সুবিধামত স্ত্রী-রত্ন লাভ করিতে পারেন নাই। রাত থাকিতে যখন নাম গাহিতে

বাহির হইতেন, তখন গৃহস্থের গহনার বাক্স এবং সঙ্গে সঙ্গে অসতী নারীরও অন্বেষণ করিতেন। গহনা এবং টাকার বাক্স ৫।৭টী পাইয়াছিলেন; কিন্তু সুবিধামত অসতী-নারী প্রাপ্ত হন নাই।

এইরূপে মাসত্রয় হরিনাম গান করিবার পর, এক দিন সেই দীর্ঘাকৃতি শিয়ালমারা বন্ধুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। সাক্ষাতের পর উভয়ের যেরূপ কথাবার্ত্তা হইল, তাহা পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ঐ যে কালো বামুনটী আসিতেছেন, উনি কে জান? হাড়ে-মাসে জড়িত, নাতিখর্ব্ব নাতিদীর্ঘ দেহ;—গেরুয়া-বসন পরিয়া, "হরিবোল হরিবোল" করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছেন,—ঐ কালো বামুনকে চেন কি? সর্ব্বাঙ্গে হরিনামের ছাপ, যেন খ'য়ে গোখুরার সাঙ্গাত; আড়াই হাত হরিনামের ঝুলি গলায় দোদুল্যমান; আজ দশ বৎসরকাল পেন্সন ভোগ করিলেও, পাকা গোঁফে উত্তমরূপে কলপ মাখানো; আর হরিবোলের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে আঁকর দিতেছেন,—'হরি হে! পার কর!'—'দীনবন্ধু হে! ত্রাণ কর!'—ঐ কালো বামুনের কথা কিছু অবগত আছ কি?

কৃষ্ণবর্ণ ব্রাহ্মণ,—কাশীবাসী! কাশীতে মৃত্যু হইলে মোক্ষলাভ হয়, শিবপ্রাপ্তি হয়, ইহা শুনিয়া তিনি কাশীবাস আরম্ভ করিয়াছেন। কেহ জিজ্ঞাসিলে স্পষ্টতই পরিচয় দেন;—"আমি কাশীবাসী!" কাশীবাসী বলিয়াই যে তিনি বারমাসই কাশীতে

থাকেন, এমন নহে। যখন বঙ্গদেশে আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার আবশ্যক হয়, তখন তিনি কাশী ছাড়িয়া বাড়ীতে আসেন। যখন প্রজার ঘর জ্বালাইয়া প্রজার সর্ব্বনাশ করিবার অভিলাষ হয়, তখন কিছু দিনের নিমিত্ত তিনি বাটীতে শুভাগমন করেন। যখন পুত্রকন্যার বিবাহ দিবার কাল উপস্থিত হয়, তখন তিনি একটী দিনের জন্য কাশী হইতে স্বগ্রামে উপস্থিত হন। বাটীর পৈতৃক দুর্গাপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, সরস্বতীপূজা, লক্ষ্মীপূজা, রথ দোল—সমস্তই উঠিয়া গিয়াছে। যদি কেহ জিজ্ঞাসেন,—"মহাশয়! ঘরের সমস্ত পূজা-পার্ব্বণ উঠাইলেন কেন?" তিনি অমনি জিহ্বা কাটিয়া বলেন,—"আমিই ত কাশীবাসী হইয়াছি, আমার ত কাশী ছাড়িয়া আসিবার যো নাই,—কেমন করিয়া গৃহে দুর্গোৎসবাদি পূজা বজায় রাখি বলুন?" কাশীতে যদি কেহ তাঁহাকে বলেন,—"মহাশয়! এ কাশীধামে প্রতিমা আনিয়া অন্নপূর্ণা পূজা করিলে মহাপুণ্য হয়?" তিনি জিহ্বা কাটিয়া অমনি বলেন,—"তা কি আমার করিবার যো আছে,—ঘরে যে দোল দুর্গোৎসব অন্নপূর্ণা আদি সমস্ত পূজাই হইতেছে; দোকর পূজা কেমন করিয়া করি?—পিতৃপুরুষগণের নিষেধ আছে।" পিতৃ-মাতৃ-আদ্যশ্রাদ্ধ সম্বন্ধেও ঠিক ঐ একই ভাবের কথা বলিয়া থাকেন। কাশীতে বাদশটী ব্রাহ্মণ-ভোজন এবং সাত খানি কাপড় বিতরণ করিয়াই বলেন,—"একলা মানুষ, কত দিকে কত করিব?—দেশে সোণা-রূপার ঘড়া দিয়া দানসাগর হইয়াছে; বিশ হাজার কাঙ্গালীকে এক টাকা করিয়া নগদ দেওয়া হইয়াছে; পাঁচ হাজার ব্রাহ্মণ-ভোজন হইয়াছে।—ধন্য আমার বুকের ছাতি। আবার এদিকে গিন্নী খুব ক'রচে কি না!—তিনি ব'লেন,—'প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে

এক এক জোড়া শাল দিতে হইবে।' আমি কি করি! গিন্নীর কথা ত আর ঠেল্‌তে পারি না,—তিনিই হ'লেন আমার লছ্‌মি;—কাজেই কাশ্মীর থেকে বস্তা বস্তা শাল এনে বিতরণ কর্‌তে হ'লো। একলা মানুষ, ক'দিক্ দেখবো?" আবার এদিকে বঙ্গদেশে বাটীতে আসিয়া সকলকে নিরুত্তর করিয়া বলিলেন,—"কাশীতে লক্ষ ব্রাহ্মণ-ভোজন, আরলক্ষাধিক কাঙ্গালী-বিদায়! প্রথম, এক টাকা করিয়া কাঙ্গালী-বিদায় করি; যখন দেখি, পঞ্চাশ হাজার টাকা কাঙ্গালী-বিদায়ে গিয়াছে, তখন বুঝিলাম, ভারি বিপদ্!—টাকা নাই, সকলই নোট। দশ টাকা, পঞ্চাশ টাকা, এক শ টাকা, হাজার টাকা—বলিব কি, কেবলই নোট! তখন গিন্নীর কাছ থেকে চাবী-কাটী নিয়ে চোরা-কুঠরী দেখ্‌তে গেলাম, সেখানেও যদি টাকা থাকে। কিন্তু সে ঘর খুলিয়া দেখি, কেবলই কোম্পানীর কাগজ! বড় বড় দপ্তর-বাঁধা, তাড়া-করা, আলমারী ভরা কেবলই কোম্পানীর কাগজ! তখন মধুসূদনের নাম জপ করিতে করিতে, তিন লক্ষ টাকার নোট কালেক্টরীতে পাঠাইয়া দিলাম! কালেক্টর সাহেব আমার নাম শুনিয়া, বিশেষ খাতির করিলেন; বলিলেন, আজ ত টাকা দিতে পারি না, খাজনা-খানা বন্ধ হইয়া গিয়াছে;—কাল অতি প্রত্যূষে তোমার টাকা পাঠাইয়া দিব।' লোক ত কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিল, আমারও চক্ষে জল আসিল। তখন রামসিং শালওয়ালার নিকট গিয়া পড়িলাম। সে বলিল,—'আমি পঁচিশ হাজার টাকা দিতে পারি। নোট ভাঙ্গাইয়া ২৫০০০ পঁচিশ হাজার টাকাই তখন ঘরে আনিলাম। কিন্তু এদিকে তখনও পঞ্চাশ হাজার কাঙ্গালী মজুত; কি করি হুকুম দিলাম যে,—'রূপেয়া বাটালি কর্‌কে আধা আধা কাট্‌কে কাট্‌কে দেও। কাশীতে

সেই দিন হইতে আমার নামে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। লোকে বলিল,—স্বয়ং কাশীরাজও এমনটী করিতে পারেন নাই।”

কাশীবাসী স্বয়ং লাঠী ধরিতে পারেন না। দাঙ্গা হাঙ্গামাকে ভয় করেন। কিন্তু জাল-জালিয়াতে, মোকদ্দমার তদ্বিরে এবং পরস্বাপহরণে তিনি সিদ্ধহস্ত। নিজে ত উত্তমরূপই সাক্ষ্য দিতে পারেন, কিন্তু সাক্ষী শিখাইতে তিনি অদ্বিতীয়। নিজে জমিদার হইয়া অনেক পত্তনিদার ও দরপত্তনিদারের সত্ব গোপনে এবং কৌশলে নিলাম করিয়া লইয়াছেন। এজন্য আদালতে হুলস্থূল মোকদ্দমা বাধিয়াছে; কিন্তু ‘কাশীবাসীকে’ পাপ-কার্য্যে লিপ্ত বলিয়া, কেহ ধরিতে পারে নাই। সাক্ষ্য দিবার কালেও সেই হাতে হরিনামের ঝুলি, নাকে রসকলি, কপালে হরিনামের ছাপ, বুকে হরিনামের ছাপ, পিঠে হরিনামের ছাপ, বাহুমূলে হরিনামের ছাপ,—এ সমস্তই থাকে।

কাশীবাসীর আর এক গুণ—“ইন্দ্রিয়-দোষ।” সে গুণ দ্বাদশ বৎসর বয়স হইতে আরম্ভ হইয়া, তাঁহার এই একষট্টি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এই উনপঞ্চাশ বৎসর-কাল আবাধে অবিশ্রান্ত-ভাবে, তর-তর গতিতে—ভাদ্র মাসের গঙ্গার একটানা স্রোতের ন্যায়—চলিয়াছে। তিনি কাশীতে আসিয়া পণ্ডিত পাইলেই জিজ্ঞাসিতেন,—“গুরুজি! বলিতে পারেন, আমার ইন্দির-দোষ এখনও যায় না কেন? আমার এতখানি বয়স হ’লো, ছেলে হ’লো, ছেলের ছেলে হ’লো—সে ছেলেরও আবার ছেলে হইতে চলিল,—তথাচ আমার ইন্দির-দোষ যায় না কেন?”

কর্ম্মোপলক্ষে যে নগরে তিনি থাকিতেন, সে নগরে তাঁহার দুইটী রক্ষিতা বাঁধা উপপত্নী ছিল। ইহা ব্যতীত অবাঁধা বেশ্যা যে

কত ছিল, তাহার হিসাব করিয়া উঠিতে পারি নাই। কাশীবাসী দোলের সময় নগরের প্রায় প্রত্যেক বেশ্যাকেই লাল-কাপড় বিতরণ করিতেন; ৺দুর্গোৎসবের সময় মনোমত বারাঙ্গনাকুলকে ঢাকাই কাপড়ে আপ্যায়িত করিতেন। এই ত গেল—বহিঃ-প্রদেশের ইন্দ্রিয়-দোষ; কিন্তু দুষ্টলোকে এমনও বলিয়া থাকে, অন্দরমধ্যেও সে দোষ ঘটিয়াছিল। পুত্রবধূ, পৌত্র-বধূ, ভ্রাতৃ-বধূ, ভাগিনেয়ী, শ্যালিকা, গৃহদাসী—এ সমস্ত জীবেও কাশীবাসীর সে দোষ জন্মিয়াছিল। সাধারণতঃ পরস্ত্রী দেখিলেই, তাঁহার লোভ-লালসা বলবতী হইত। বলবতী হইত না,—কেবল আপন বিবাহিতা স্ত্রীতে। তাঁহার সহধর্ম্মিণী সদাই যেন তাঁহার বিরক্তির পাত্রী ছিলেন।

নারী-ঘটিত ব্যাপারে কাশীবাসী বড় স্পষ্টবক্তা;—খল-কপটতা তাঁহাতে বড় বেশী ছিল না। বন্ধুবান্ধবকে তিনি বলিতেন;—"যুবতী স্ত্রীলোক দেখিলেই, তাঁহার মুখটী পানে, বুকটী পানে, কাঁকালটী পানে—চাহিতে বড় ইচ্ছা হয়।" তিনি অতি প্রত্যূষে—এমন কি দুই দণ্ড রাত থাকিতে উঠিয়া, স্ত্রীলোকদের স্নানের ঘাটে বসিতেন। স্ত্রীলোকেরা কেমন করিয়া স্নান করে, জলখেলা করে, কাপড় কাচে, মাথা মুছে, গা মুছে এবং স্নানান্তে যুবতীগণের অঙ্গে কিরূপ তাহাদের আর্দ্র বসন বসিয়া যায় এবং সেই কাপড় ভেদ করিয়া কিরূপে সেই গৌরাঙ্গ ফুটিয়া বাহির হয়, তাহা তিনি অনিমিষ-লোচনে, দার্শনিক-কবির ন্যায় কেবল অবলোকন করিতেন। তিনি বলিতেন,—"যুবতী যখন কলসী কাঁখে করিয়া, নিতম্ব হেলাইয়া, কোমর দোলাইয়া,—আমাকে পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়া যায়, তখন ভগবান্‌কে ডাকি, হে ভগবন্! আমাকে

মক্ষিকারূপ ধারণ করিবার মন্ত্র দান কর, আমি এই স্থূল মানবদেহ পরিত্যাগ করিয়া, মক্ষিকা হইয়া একবার কামিনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ,—একবার কামিনীর অগ্রে অগ্রে,—কামিনীর সঙ্গে তালে তালে চলিয়া যাই; কখন বা কামিনীর কণ্ঠদেশে, কখন অধর-পল্লবে, কখন বা কামিনীর উরস-যুগলে, কখন বা কটীতটে, কখন বা উত্তমাঙ্গে উপবেশন করিয়া কাল কাটাই।" তিনি বন্ধুকে জিজ্ঞাসিতেন,—"ভাই! বলিতে পারো, কেন আমার এমন হয়? এ রোগের কি কোন ঔষধ নাই?"

মদ, বেশ্যা এবং পর-নারীর দাস হইলেও, কাশীবাসী পরিমিতব্যয়ী ছিলেন। লোকে তাঁহাকে কৃপণ বলিত। কিন্তু তিনি ঠিক কৃপণ ছিলেন না। ভিখারী আসিলে তাড়াইয়া দিতেন বটে, কিন্তু অমুক বেশ্যা-কন্যার পুনর্ব্বিবাহ উপস্থিত, একথা শুনিলে তিনি সেই কন্যার মাতাকে অন্ততঃ একান্ন টাকা দান করিতেন। কন্যা-দায়-গ্রস্ত কোন ব্রাহ্মণ অথবা আশ্রয়হীন কোন ব্যক্তি সাহায্য চাহিলে কিছুতেই সাহায্য পাইত না, কিন্তু কাশীবাসীর কর্ণকুহরে যদি এমন কথা প্রবেশ লাভ করে যে, অমুক-বেশ্যা বিপদ্‌গ্রস্তা,—আদালতে তাহার নামে অভিযোগ আনিয়াছে, অমনি কাশীবাসী উকীল-বাড়ী ছুটিলেন; বেশ্যারক্ষার্থ চাঁদা তুলিতে লাগিলেন এবং বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন—বেশ্যাদের ন্যায় অনাথা রমণী এ সংসারে আর নাই। উহাদের মা-বাপ নাই, পতি-পুত্র নাই, ঘর নাই, বান্ধব নাই,—কেহই নাই—উহাদিগকে রক্ষা করিলে ইহকালে বিপুল যশ এবং পরকালে অনন্ত স্বর্গ আছে।" পুরুষ-ভিখারীর উপর কাশীবাসী বড় চটা ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু স্ত্রী-ভিখারীগণের মধ্যে যদি যুবতী ভিখারিণী দেখিতেন, তাহা

হইলে সেই যুবতীর আদরের আর সীমা থাকিত না। একটী যুবতীর খাতিরে, তিনি চার পাঁচটী বৃদ্ধাকে ভিক্ষা দিতে প্রস্তুত ছিলেন।

নগরে যখন কাশীবাসীর ঘোরতর সম্মান, তখন যদি কেহ বলিত,—"মহাশয়! আপনার গ্রামে একটী পুষ্করিণী খনন করুন না!—বড়ই জলকষ্ট, লোকে পাক-মাখা জল খাইয়া বাঁচিয়া আছে। আপনি একটী পুকুর কাটাইয়া দিলে, সহস্র সহস্র লোক জলপান করে এবং আপনার যশঃ কীর্ত্তন করে। কাশীবাসী উত্তর দিতেন,—'ছি ছি ছি! দেশের কথা আমার কাছে তুলিও না। আমার দেশের সব বেটাই ছোট লোক। পরহিংসা পর-কুৎসা লইয়া তাহারা প্রাণধারণ করে। পরের কিসে মন্দ হয়, ইহা তাহাদের স্বতঃপরত চেষ্টা। আমার দেশের লোকগুলা মরিয়া গেলেই, আমি খুসী হই। তাদের জন্য আমাকে পুকুর কাটাইতে বল? সাগরের অতল জলে আমি আমার ধন-সম্পত্তি নিক্ষেপ করিতে পারি, কিন্তু গ্রামে আমি পুকুর কাটাইতে পারি না। আমার পৈতৃক যে পুষ্করিণীটী আছে, সেইটী আমি শীঘ্র অন্য স্থান হইতে মাটি ও ময়লা আনিয়া বুজাইয়া দিব স্থির করিয়াছি। আরে ছি! নেমকহারাম বেটাদের জন্য আমি পুকুর কাটাইয়া দিব? তারা চোর বদমাইস,—!"

কর্ম্মোপলক্ষে বঙ্গদেশে যে নগরে তিনি বাস করিতেন, সে নগরে তাঁহার নিজের ঘর-বাড়ী ছিল এবং গাড়ী-ঘোড়া ছিল। ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত নাগরিকগণের সহিত সদাই তিনি মিশিতেন এবং সভ্য ও সম্ভ্রান্ত-সমাজে তিনিও একজন সভ্য ও সম্ভ্রান্ত হইয়া উঠেন। আলাপ-আপ্যায়িত, লোকের মন বুঝিয়া কথা বলা, মিষ্টভাষণ—

এসব ব্যাপারে তাঁহার চিরকৃতিত্ব ছিল। যখন তাঁহার বয়স পঞ্চাশ বৎসর হইল, তখন দেখি, কাশীবাসী হঠাৎ গীতা-পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন; অর্থাৎ পণ্ডিতে গীতাপাঠ করিতেছেন, তিনি শুনিতেছেন। মাঝে মাঝে গীতার ব্যাখ্যাও হইতেছে। এরূপ প্রা দুই মাস কাল গীতা পড়িয়া তিনি কাশী গমন প্রথম আরম্ভ করিলেন; তখন মাঝে মাঝে কাশী যান আর ঘরে আসেন। এইরূপ দুই তিন বৎসর কাটাইয়া, তিনি কাশীবাসী নাম লইলেন। লোক দেখিলেই বলিতেন, সংসারে আর আমার আস্থা নাই, সংসার ভুয়াবাজী মাত্র,—এই শেষ দশাটা কাশীতে কাটাইব স্থির করিয়াছি; দুই বৎসর পরে তাঁহার কাশীর প্রতি বিশেষ অনুরাগ জন্মিল। সেই প্রথম পক্ষের আদিরক্ষিতা বেশ্যাটীও কাশীতে গিয়া বাস করিল। দ্বিতীয় বাঁধা বেশ্যাটী মহানগরে প্রাণ পরিত্যাগ করিল। একবার পুরা এক বৎসর কাল কাশীতে থাকিয়া তিনি নগরে ফিরিলেন। বন্ধু-বান্ধবগণকে বলিলেন,—'কাশীর মত সুন্দর স্থান আমি ইহজীবনে আর দেখি নাই। এখানে যাহা কষ্টে পাওয়া যায় না, কাশীতে তাহা অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখানে যাহা অতি দুর্মূল্য, কাশীতে তাহা অতি সস্তা। এখানে যাহা সাত রাজার ধন—একটী মাণিক দিলে মিলে না, কাশীতে তাহা দুগণ্ডা পয়সা দিলে পাওয়া যায়।" বিশ্বস্ত বন্ধুগণ জিজ্ঞাসিলেন,—"কি হে ভায়া! খুলিয়াই বল না, সেখানে কি হইয়াছে?

কাশীবাসী। ভাই! বলিলে বিশ্বাস করিবে না, কাশীতে এক শ্রেণীর গৃহস্থ ঘরের মেয়ে যত চাও, ততই পাইবে। বড় বড় সতী স্ত্রীলোক চাহিবামাত্র—এমনি মা অন্নপূর্ণার কৃপা—অমনই পাওয়া যায়! বল্‌বো কি,—বল্‌লে ত তোমারা কেহই বিশ্বাস করিবে

না,—তুমি কোন স্ত্রীলোককে মনে মনে চাহিতেছ, স্ত্রীলোক অমনি সে কথা জানিতে পারে! বাবা বিশ্বনাথের এমনি মাহাত্ম্য!—অমনি সেই স্ত্রীলোক তোমার কাছে আসিয়া হাজির হইবে। বড় বড় সম্ভ্রান্তবংশীয়া স্ত্রীলোকগণ গোপনে দাসীর দ্বারা সংবাদ পাঠাইয়া থাকেন,—যেন হুকুম করিলেই আসিয়া হাজির হয়। সকলই বিশ্বনাথের কৃপা! আরতি দেখিবার পর,—কি শুভক্ষণেই বিশ্বেশ্বরের আরতির সৃষ্টি হইয়াছিল!—কুলমহিলাগণ ঘরে আর ফিরে না; ভদ্র ভদ্র পুরুষগণকে চরিতার্থ করিয়া, রাত্রি দ্বিপ্রহরে কি আড়াইপ্রহরে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া থাকে। যদি তাহাদের পিতা বা স্বামী বা ভ্রাতা জিজ্ঞাসা করে,—'তোমাদের আসিতে এত রাত হলো কেন?' তাহারা উত্তর করে, 'দুর্গাবাড়ী কি এখানে?—আমরা তিন ক্রোশ দূরে গিয়াছিলাম,—যত দেবালয় সব দেখিয়া আসিয়াছি।'

বন্ধু। ভায়া! তোমার কাহিনী বড় অদ্ভুত দেখিতেছি। এ যে দু'পয়সায় তিন কুড়ি ইলিস পাওয়া যায় দেখিতেছি! ভায়া! বেশ্যারা তোমাকে গৃহস্থের মেয়ে বলিয়া ঠকায়; বেশ্যারা দর বাড়ায়!

কাশীবাসী! আরে ছি! গৃহস্থ-ঘরের সতী স্ত্রীগণকে তুমি বেশ্যা বলিয়া সম্বোধন করিও না। ভদ্র-মহিলাকে ওরূপ অকথা-কুকথা বলিতে নাই। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তাহারা সতী। সতীর চেহারা স্বতন্ত্র। আমি কি সতী চিনি না! সতী না হইলে, তাহারা অত লজ্জাশীলা হইবে কেন! সে যাহা হউক, এক্ষণে সতীকে অসতী বলিয়া, তুমি আর পাপ সঞ্চয় করিও না।

বন্ধু। ভায়া! তাহাই হউক,—তোমার মুখেই ফুল-চন্দন পড়ুক! আমাকে একবার কাশীতে নিয়ে চল।

কাশীবাসী। তোমাকে একা নহে ভায়া! নগরে যত সম্ভ্রান্ত লোক আছে, সকলকে কাশী নিয়ে যাবো, তবে আমার মনের দুঃখ যাবে! কাশী এমন ভাল জায়গ',—যদি জানিতাম, তাহা হইলে আমি ছেলেবেলা হইতেই কাশীতে বাস করিতাম,—কাশীর মাটি কামড়িয়া খাইতাম।

আর বেশী কথায় কাজ নাই,—ঐ যে কাশীবাসী আমাদের সম্মুখেই আসিতেছেন। আহা কিবা বাঁকা বাঁকা ভাব! কিবা নেচে নেচে চলন! কিবা কটীতটের দোলন! কিবা খেম্‌টা তালে নয়ন-কুন্দন!

একটু সরিয়া দাঁড়াও। কাশীবাসী যাইতেছেন,—পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াও।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

৺কাশীধামের কোতোয়ালী দেখিয়াছ? বড় রাস্তার ধারেই এখন কোতোয়ালী বা পুলিশ-থানা। কোতয়ালীকে দক্ষিণে রাখিয়া পশ্চিমমুখে যে গলি গিয়াছে, তাহার নামটী জানো ত? গলিতে কি আছে, তাহা জানো ত? গলির দুইধারে দোকান-শ্রেণী,—বিবিধরূপে সজ্জিত। প্রত্যেক গৃহই দ্বিতল। প্রথম-তলে পুরুষ ব্যবসায়ী, দ্বিতীয়-তলে নারী ব্যবসায়ী। নিম্ন-তলে কোন দোকান,—আতর গোলাপ, ফুলেল-তৈল্যের গন্ধে ভুর-ভুর করিতেছে, কোন দোকান, মালাই, রাবড়ি, দধি, ক্ষীরাদির লহরী-লীলায় দুর্ব্বল মানবের মনঃপ্রাণ হরণ করিতেছে;—কোন দোকানে

রাশীকৃত থাক্ থাক্ বরফি সাজানো;—যেমন গিরি-শৃঙ্গের উপর গিরিশৃঙ্গ শোভমান, বরফির শোভাও তদ্বৎ। কোথাও পিতলের সামগ্রী সুবর্ণের ন্যায় ঝক্ ঝক্ করিতেছে। কোথাও পর্ব্বতপ্রমাণ বস্ত্রাদির সমাবেশ। কোথাও হীরা-মণি-মুক্তা আভা বিকিরণ করিতেছে। কোথাও বারাণসীসাড়ী ও বারাণসীশালের বাহারে পথিকের মন পাগল করিয়া তুলিয়াছে। আর কোথাও সেই বিপদ্‌ভঞ্জন, দুঃখনিবারণ, সংসারক্লিষ্ট মানবের একমাত্র-অবলম্বন, তাল তাল তামকু, নৈবিদ্যের ন্যায় সজ্জিত রহিয়াছে। আতরের গন্ধ ভাল লাগে না, অট-ডি-রোজের গন্ধ ভাল লাগে না, দশগুণা চামেলি-গন্ধও ভাল লাগে না,—কিন্তু সেই পবিত্র স্বর্গীয় প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়ান্ গন্ধে,—সেই তাম্রকূটের মহাসৌরভে মন কেবল মোহিত হয়। হায়! ঐ সেই দোকান! সেই নন্দন-কানন,—সেই ইন্দ্রপুরী,—সেই গোলোকধাম! রসগোল্লা চাই না, রাতাবি-সন্দেশ চাই না, লেডিকেনি চাই না,—গঙ্গার ইলিস-মাছের টাট্‌কা ডিম ভাজাও চাই না,—চাই কেবল ঐ দোকানের আট-আনা-সের তামাক। সমুদ্র-মন্থন-কালে কি এ তামাকের উৎপত্তি হইয়াছিল? ধন্বন্তরির-সুধা-কলসের মধ্য-স্তরে কি, এ তামাক বিদ্যমান্ ছিল? আপণ-শ্রেণী-মধ্যে তামাকের দোকান পূর্ণচন্দ্র স্বরূপ! দেবগণের মধ্যে যেমন ইন্দ্র, নাগগণ-মধ্যে যেমন বাসুকি, শৈলগণ-মধ্যে যেমন হিমালয়, নদীগণ-মধ্যে যেমন গঙ্গা, সেইরূপ পৃথিবীর যাবতীয় দ্রব্যগণ-মধ্যে তামাক। আমার বোধ হয়,—স্বর্গরাজ্য, কৈলাসপুরী বা গোলোকধাম স্বতন্ত্র কোথাও অবস্থিত নয়। এই পৃথিবীতেই স্বর্গ, এই পৃথিবীতেই নরক, এই পৃথিবীতেই কৈলাসপুরী বা গোলোকধাম,—এই পৃথিবীতেই

পাতাল বা পিশাচভূমি পাওয়া যায়। কেননা, ইহ-সংসারে তাম্রকূট বিরাজিত থাকিতে অন্য স্বর্গ বা বৈকুণ্ঠপুরী বা গোলোক-ধাম সম্ভবে না। তাম্রকূটবর্জ্জিত দেশই,—নরক, পাতাল বা পিশাচ-ভূমি।

এই গলির নাম—ডালকি-মণ্ডি। দোকান-শ্রেণীর নিম্ন-তলে একটীমাত্র তামাকের স্বর্গ-রাজ্য আছে, উপরি-তলে কিন্তু অনন্ত স্বর্গ রাজ্য! উপরি-তলে বারমাস বসন্ত। এখানে নক্ষত্রপুঞ্জ নাই, কেবলই পূর্ণচন্দ্রের হাট। দেখুন দেখি,—ঐ গবাক্ষপানে চাহিয়া দেখুন দেখি,—কিবা শোভার উদয় হইয়াছে! এখানি কি শরৎ-কালীন পূর্ণিমার চাঁদ?—না মধুমাসের চতুর্দ্দশীর চাঁদ? একবার নিবিষ্টচিত্তে ভাবিয়া, বুঝিয়া দেখুন দেখি? এই যে প্রত্যেক গবাক্ষেই এক একটী চাঁদের উদয় দেখিতেছি! আবার দেখ,—ঐ বারেন্দার পানে চাহিয়া দেখ, কতগুলি পূর্ণিমার চাঁদ একত্র হইয়াছে! চাঁদের কি মেলা বসিয়াছে? গগন-চাঁদের বাক্‌শক্তি নাই, শ্রবণশক্তি নাই, দৃষ্টিশক্তি নাই,—কিন্তু ঐ দেখ, গবাক্ষের চাঁদসমূহ কেমন মৃদু-মধুর হাসিতেছে! হাসিতে হাসিতে সুধা ক্ষরিতেছে, কি মুক্তা বর্ষিতেছে,—কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না। একি! বীণাযন্ত্রে সেই সুর মিলাইয়া কেহ গান করিতেছেন, না, নারী-পূর্ণশশি-কণ্ঠে কোমল কূজন-ধ্বনি হইতেছে? বিধাতা কি নারী-পূর্ণশশীর নয়নযুগল এমনি বাঁকা করিয়া গড়িয়াছিলেন? বিধাতা যে ভাবেই গড়ুন, নয়ন কিন্তু বাঁকা হইয়া আছে। হে ডালকি-মণ্ডি-গলি! তুমি সহরের সার-সর্ব্বস্ব! বাবা বিশ্বনাথের মাহাত্ম্য,—তোমা অপেক্ষা অধিক কিনা, তাহা দার্শনিকগণের ভাবিবার বিষয়। হে গলি-রাজ! তুমি বালক-বৃদ্ধ-যুবার আশ্রয়-

ভূমি,—তোমাকে নমস্কার। তুমি শান্তির সুখ-নিকেতন,—তোমাকে নমস্কার। তুমি কলঙ্কহীন পূর্ণশশী,—তোমাকে নমস্কার। তুমি বালকের গুরু, যুবকের ঠাকুরমহাশয়, বৃদ্ধের ভিক্ষাধাপ,—তোমাকে নমস্কার। তুমি বিনামেঘে বজ্রাঘাত,—তোমাকে নমস্কার। হে নারী-পূর্ণচন্দ্র! তুমি ডালকি-মণ্ডির ব্রহ্মাস্ত্র,—তোমাকেও নমস্কার। তুমি কাঙালের কোহিনুর,—তোমাকে নমস্কার।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দুইটী সাধু হরিগুণ-গানে বিভোল হইয়া, নাচিয়া নাচিয়া আসিতেছেন; কখন হাতধরাধরি করিয়া নাচিতেছেন, কখন গলা জড়াজড়ি করিয়া নাচিতেছেন; কখন স্বতন্ত্রভাবে নাচিতেছেন;—যেন উন্মত্তের নাচ। কখন একে,—অন্যের গায়ে গিয়া পড়িতেছেন; কখন অন্যে,—একের গায়ে গিয়া পড়িতেছেন; কখন ধূলায় লুণ্ঠিত হইতেছেন;—যেন মুমুক্ষু সন্ন্যাসীর নাচ। উভয়েই এই গানটী গাহিতেছেন;—

মূলতান—একতালা।

"হরিনাম লইতে অলস হ'য়ো না!
রসনা! যা হবার তাই হবে!
দুখ পেতেছ না আরো পাবে!
ঐহিকের সুখ হ'ল না ব'লে কি,
ঢেউ দেখে না ডুবাবে?

রাখ রাখ নাম যতন করি,
যদি তরাবে তরী এ ভববারি,
হরি ভবের কর্ণধার, জীবের মূলাধার,
(পঞ্চমুখে) ভব যায় ভাবে!
রেখো রেখো সে নাম সদা সযতনে,
নিও নিও রে নাম শয়নে স্বপনে,
সযতনে থেক, হরি ব'লে ডেক,
এ দেহ ত্যজিবে যবে।"

নাচে এবং গানে এলোমেলো ভাব থাকিলেও, তাল মান লয় কিন্তু ঠিক আছে। বিশৃঙ্খলাতেও শৃঙ্খলা আছে। পাগলামিতেও স্থিরবুদ্ধি আছে। অচৈতন্যেও চেতনাভাব আছে।

সুর বড় মিঠা। অতি মৃদু-মন্দ-মধুর আওয়াজ। ঐ মৃদুতার মধ্যে কণ্ঠ যতটুকু উচ্চ হওয়া সম্ভবে, ততটুকু উচ্চ হইতেছে। তাঁহাদের গান শুনিলে মনে হয় যে, শ্রোতৃবৃন্দকে শুনাইবার জন্য তাঁহারা গান গান নাই; কেবল আপন ভাবে আপনারা মাতোয়ারা হইয়া গান গাহিতেছেন। তাই কণ্ঠস্বর বুঝি এত মৃদু; আর অকৃত্রিম বলিয়া কণ্ঠস্বর বুঝি এত মধুর!

গান শুনিবার জন্য পথে অনেক বাঙ্গালী দাঁড়াইল; অনেক হিন্দুস্থানী দাঁড়াইল। কিন্তু গান শোনাইবার জন্য তাঁহারা কোথাও স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন না। আপন মনে ধীরে ধীরে ডালকি-মণ্ডির গলি ছাড়াইয়া, চৌরাস্তার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ঐ সময়েই আমাদের সেই কাশীবাসী চৌরাস্তা পার হইয়া, ডালকি-মণ্ডি-প্রবেশোদ্যত হইতেছিলেন। উভয়ের গান শুনিয়া, কাশীবাসী থমকিয়া দাঁড়াইলেন। তীব্রদৃষ্টিতে উভয়

হরিনাম-গায়ককে তিনি একবার দেখিয়া লইলেন। দেখিয়াই তাঁহার কেমন যেন ভাব জন্মিল। তাঁহার শরীর কেমন রোমাঞ্চিত হইল। চক্ষু দিয়া (সত্য সত্যই) জল পড়িতে লাগিল। কাশী-বাসী আর থাকিতে পারিলেন না, তিনি হাততালি দিয়া আপনা আপনি নাচিতে আরম্ভ করিলেন; নাচিয়া নাচিয়া উভয় গায়কের সুরে সুর মিলাইয়া সেই গানও ধরিলেন ;—

"হরিনাম লইতে অলস হ'য়ো না,
রসনা! যা হবার তাই হবে।"

দেখিতে দেখিতে কাশীবাসী,—গায়কদ্বয়ের সহিত একত্র সম্মি-লিত হইলেন। তিন জনে তখন একদেহ একপ্রাণ হইয়া গাহিতে লাগিলেন দর্শক আরও অধিক জমিল।

গাহিতে গাহিতে অকস্মাৎ কাশীবাসী ভূপতিত হইলেন। তাঁহার আর উত্থান-শক্তি নাই, উপবেশন-শক্তি নাই, নড়ন-চড়ন নাই।—কাশীবাসী জীবিত, না মৃত, না মূর্চ্ছিত? কাশীবাসী যাহাই হউন, সেই দুই ব্যক্তির গান মোদ্দা থামিল না,—তাঁহারা উভয়ে কাশীবাসীকে বেষ্টন করিয়া গান গাহিতে লাগিলেন। যেমন নাচ, তেমনি গান। এবার জোরে জোরে গান হইতে লাগিল; নাচও জোরে জোরে হইতে লাগিল। চারি দিকে ধ্বনি উঠিল,— 'একজন বাবাজীর দশা পাইয়াছে,— বুঝি তিনি বাঁচিবেন না, —বুঝি তিনি সশরীরে গোলোকধামে যাইবেন।' একজন দর্শক আসিয়া পাখার বাতাস করিতে লাগিল; একজন দর্শক আসিয়া মৃত বা মূর্চ্ছিত বাবাজীকে কোলে লইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু সক্ষম হইল না,—সমস্ত শরীর এলাইয়া পড়িয়াছে, বিষম ভারি হইয়াছে;—কেবল আপন কোলে কাশীবাসীর মাথাটী রাখিয়া,

হায় হায় করিতে লাগিল। আর একজন আসিয়া কাশীবাসীর চোখে-মুখে জল দিল। কাশীবাসী আবার প্রাণ পাইলেন, যেন চমকিয়া উঠিলেন; উঠিয়াই আবার তাঁহাদের সুরে সুর মিলাইয়া গান ধরিলেন; আবার সেইরূপ হাততালি দিয়া তাঁহাদের সহিত নাচিতে লাগিলেন।

প্রথম গায়কদ্বয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি দীর্ঘাকার, এবার তাহার 'দশা' পাইল। অনেকে পাখার বাতাস দিল, মুখে-চোখে-নাকে জল দিল, কিন্তু তাহার সে মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল না। মৃতের ন্যায় দেহ পরিদৃশ্যমান হইল। চারি দিকে হায় হায় রব উঠিল। কাশীবাসী সকলকে কহিলেন,—"চিন্তা নাই, চিন্তা নাই, আমি এ মূর্চ্ছা ভাঙ্গাইতেছি। এ মূর্চ্ছা জলে ভাঙ্গিবে না, পাখার বাতাসে ভাঙ্গিবে না—কেবল সেই হরিনাম-সুধারস ইহাঁকে পান করিতে দাও,—এখনি মূর্চ্ছার অবসান হইবে।" এই কথা বলিয়াই তিনি গান ধরিলেন,—

"হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে॥"

ঐ গানে সেই খর্ব্বাকৃতি দ্বিতীয় ব্যক্তিও উচ্চকণ্ঠে যোগ দিলেন। যে নামের গুণে. গহনবনে শুষ্ক-তরু মুঞ্জরিয়া উঠে, যে নামের মহিমায় যমুনা উজান বাহিয়া থাকে,—যে নাম-মন্ত্রে পর্ব্বত গলিয়া দ্রবময় হয়,—সেই নাম-গান উচ্চকণ্ঠে গীত হইবামাত্র, সেই দীর্ঘাকৃতি পুরুষ আবার উঠিয়া, হাসিতে হাসিতে, তালি দিতে দিতে, নাচিতে নাচিতে গাহিতে লাগিলেন,—

'হরিনাম লইতে অলস হ'য়ো না,
রসনা! যা হ'বার তাই হবে!

ঐহিকের সুখ হ'ল না ব'লে কি
ঢেউ দেখে লা ডুবাবে ?'

এই দীর্ঘাকৃতি পুরুষ আমাদের সেই শিয়ালমারা। ঐ খর্ব্বাকৃতি পুরুষ, আমাদের সেই সমাতন বৈরাগী।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ত্রিমূর্ত্তি এক হইল! কাশীবাসী, শিয়ালমারা এবং সনাতন দাস বৈরাগী—এই তিন জনেই এক সঙ্গে গাহিতে গাহিতে কাশীর রাজপথ দিয়া চলিতে লাগিলেন। সনাতন দাস সুকণ্ঠ এবং সুগায়ক; তাঁহার গানের গুণে বাঙ্গালী শ্রোতৃবৃন্দ,—সেই গায়ক দলের সঙ্গ ছাড়িতে পারিল না। কাশীবাসীর সুরবোধ একটু আছে বটে, গাহিতেও তিনি পারেন বটে; কিন্তু গলার সুর তেমন্ নয়। শিয়ালমারা,—গানে কাশীবাসী অপেক্ষাও কিঞ্চিৎ উৎকৃষ্ট। যাহা হউক, তিন জনে, মিলিয়া-মিসিয়া গাহিয়া এক রকম রাজপথ "মাৎ' করিয়া যাইতেছিলেন।

গায়ক দল, বাঙ্গালী টোলার পথের দিকে অগ্রসর হইলেন। যতই বাঙ্গালীটোলার দিকে যান, দর্শক-সংখ্যা ততই অধিক হয়। শ্রোতা অধিক হইলে, বাজনা ব্যতীত, গান ভাল জমে না। শুধু কণ্ঠ-সঙ্গীতে বড় আসর রক্ষা হয় না। গান একটু থামাইয়া, কাশীবাসী, গায়কশ্রেষ্ঠ সনাতন দাসকে জিজ্ঞাসিলেন, "বাবাজী প্রভু! খোল আনাইব কি ?"

সনাতন দাস। শ্রী——শ্রীখোল! মরি মরি! কি মধুর

নাম! শ্রীখোল আসবেন কি? যদি তিনি অনুগ্রহ করিয়া আসেন তবে তাঁহাকে আসতে বলুন।

এই কথা বলিতে বলিতে, সনাতন দাসের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

শিয়ালমারা এখনও ক্রন্দনের কসরৎ এতটা শিখেন।

বাল্য কাল হইতে লাঠিবাজী কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া এবং ইতর-সমাজে সর্ব্বদা থাকিতেন বলিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেও ভাল শিখেন নাই! তিনিও তখন চোখে কাপড় দিয়া, ভক্তি-মিশ্রিত ক্রন্দনের সুরে বলিয়া উঠিলেন,—"কি বল্লিরে সোনা ভাই! —শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত দেবের শ্রীখোল আসিতেছেন? আহা! এমন সুধামাখা বোল আমি যে কখনো শুনি নাই রে।"

কাশীবাসী পিতৃমাতৃ-বিয়োগে কখন চোখের জল ফেলেন নাই, —ভগিনী ও ভ্রাতার বিয়োগে কখন দুঃখ-প্রকাশও করেন নাই,—ভগবান্ না করুন,—যদি পুত্র-কন্যার শোকও কাশীবাসীর লাগে, তাহা হইলে তিনি কাঁদেন কি না, ইহাই প্রতিবেশিগণ বহুদিন-হইতে ভাবিতেছেন। শ্রীখোলের নামে যখন দুইজন পরম-ভক্ত কাঁদিয়া উঠিল, তখন তাঁহার এ ক্ষেত্রে চুপ করিয়া থাকা নিতান্ত অভদ্রতা—লোকে তাঁহাকে অপ্রেমিক মনে করিতে পারে,—লোকে তাঁহাকে অভক্ত মনে করিতে পারে,—সুতরাং এরূপ স্থলে না কাঁদিলে ত নিস্তার নাই। কাশীবাসী ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া বলিলেন,—"তাই বটে রে, ভাই সকল! মরি রে, শ্রীখোল! তোর প্রেমের বালাই নিয়ে মরি রে! আমার দয়াল মহাপ্রভু নেচেছিলেন,—তোর বাজনা শুনে রে! মরি রে,— মরি রে,—!"

উর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া এইরূপ কথা বলিতে বলিতে কাশীবাসী আপন চাদর দ্বারা চক্ষুদ্বর্য় জড়াইয়া ফেলিলেন এবং সনাতন দাসের পদপ্রান্তে পতিত হইয়া বলিলেন,—"প্রভু! আপনি সামান্য মনুষ্য নন,—অথবা আপনি দেবতা! মানবগণকে ছলিবার জন্যই বুঝি আপনি কৃপাপূর্ব্বক পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন! পায়ের ধূলা দিন, একবার মস্তক পবিত্র করি; বক্ষে ঐ পদরজঃ রাখিয়া বক্ষঃ শীতল করি এবং ঐ পদরজের আস্বাদ জিহ্বা দ্বারা গ্রহণ করিয়া, চির-পিপাসার নিবৃত্তি করি।"

এই কথা বলিতে বলিতে, কৈবর্ত্ত সনাতন দাসের পদধূলি লইয়া ব্রাহ্মণ কাশীবাসী মাথায় দিলেন,—মুখে দিলেন,—বুকে দিলেন।

সনাতন দাস বলিয়া উঠিলেন,—"করেন কি মশাই!—করেন কি মশাই! আমি অতি ক্ষুদ্র—অতিক্ষুদ্র! আমি কীটের অধম,—আমি দাসানুদাস। হরিহে! গৌরাঙ্গ! এ সকলই তোমারই লীলা!"

এই কথা বলিয়া, উর্দ্ধদিকে চাহিয়া ঊর্দ্ধে হস্ত উত্তোলন করিয়া তর্জ্জনী সঞ্চালন-পূর্ব্বক সনাতন দাস বলিয়া উঠিলেন,—"ভাই সকল! একবার হরি হরি বলো!—হরি হরি বলো!"

বহু দর্শক একত্র হইয়াছিল;—হরিধ্বনিতে চারিদিক্ পূর্ণ হইল।

হরিনাম যখন নিবিয়া গেল, তখন কাশীবাসী আবার কহিলেন,—"এই বাঙ্গালীটোলার ভিতরেই আমার বাড়ী; সুধাময় শ্রীখোল আমার বাটীতেই আছেন; আদেশ করেন ত লোক দ্বারা আনয়ন করি।"

সনাতন। শ্রীখোল বহন করিবার সুখ আমিত আর অন্য কাহাকেও দিতে পারি না,—সে যে আমার প্রাণের ধন,—সে যে আমার বুকের সামগ্রী! তবে আমি এমন কি পুণ্য করিয়াছি যে, শ্রীখোল বহিবার আজ অধিকারী হইব! হায় রে শ্রীখোল! তুই মহাপ্রভুর গলে দুলিয়াছিলি,—আমার এমন কি সৌভাগ্য যে, তুই আজ আমার গলে দুলিবি!

বলিতে বলিতে আবার ক্রন্দন, আবার দীর্ঘনিশ্বাস!

কাশীবাসী। (যোড়হাতে) যদি দয়াময় অনুগ্রহ কল্লেন, তবে একটি কথা আমি বলি। প্রভু গো! আমার বাটীতে একবার পায়ের ধূলা দিবেন কি? আমার ক্ষুদ্র কুড়ে-ঘর একবার পবিত্র করিবেন কি? (জিহ্বা কাটিয়া) হায় হায়! কি বলিলাম! দেবতা কি মানুষের ঘরে আসেন! উঁহারা আমার ঘরে আসিবেন কেন?

সনাতন। আমাকে ও-সব কথা বলিবেন না!—আমি অতি নিকৃষ্ট,—আমি অতি পাপিষ্ঠ! (কোথা হে গৌরাঙ্গ। সমস্তই তোমারই লীলা!) আপনিই যথার্থ সাধু! আপনিই যথার্থ মহাপ্রভুর সেবক! ভাই বোষ্টমদাস! তুমি কি আমার পর?—তুমি যে আমার ভাই! তোমার বাড়ী কি আমার পরের ঘর? তুমি আর আমি যে এক!

কাশীবাসী। তবে অনুগ্রহ করিয়া, প্রভু অধীনের গৃহের দিকে শ্রীপদ সঞ্চালন করুন।

সনাতন। আপত্তি কিছুই নাই,—একটী কথা হইতেছে এই,—হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়া আজ আমার হৃদয়ে এখনও পূর্ণ প্রেম-তরঙ্গ উথলিয়া উঠে নাই। যতক্ষণ আমি সে হরিনাম-প্রেমে না মজি, ততক্ষণ ত আমার আহার নিদ্রা নাই,—কেবল নাম গানই

করি ; নেচে নেচে, কেঁদে কেঁদে চারিদিকে নাম-গানই করিয়া বেড়াই।

কাশীবাসী। দাসানুদাসের বাটীতে শ্রীখোলের সঙ্গেই না হয় আজ নাম-গান হবে! দয়াল প্রভুর কি তাহাতে বাধা আছে ?

সনাতন। বাধা কি ভাই ? নাম-গানের প্রেমের ঢেউয়ে, সে যে বাধা-বাধ ভেঙ্গে যাবে ভাই ?

কাশীবাসী তখন বাবাজীদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া, শ্রোতৃমণ্ডলী-পরিবৃত হইয়া, আপন গৃহাভিমুখে চলিলেন। সনাতন দাস একটী নূতন গান ধরিলেন ;—

"কি প্রেমধন গৌর এনেছে এ নদীয়ায় রে !
ওরে, কলসে কলসে ঢালে, তবু না ফুরায় রে !
নদীয়ার নাগরী যত জল আনতে যায় রে !
(ও'রে) কাঁখের কলসী থুয়ে গৌর পানে চায় রে !
গৌর নিতাই দুটী ভাই, নাচে আর গায় রে !
কুল ডুবায়ে উঠলো ঢেউ, লাগলো জীবের গায় রে !
গৌর বলে, নিত্যানন্দ তুমি গুণের ভাইরে !
(ওরে) তুমি থাক মায়ের কোলে, আমি ব্রজে যাইরে !

গান গাইতে গাইতে বহু গলি পার হইলেন ; কখন উত্তর-মুখে, কখন দক্ষিণ-মুখে, কখন পূর্ব্ব-মুখে, কখন পশ্চিম-মুখে,—এই ভাবে যাইতে লাগিলেন,—গলি আর ফুরায় না। গলির গলি তস্য গলি, অলিগলি,—তথাচ কাশীবাসীর গৃহ পাওয়া যায় না। শিয়ালমারার রাগ হইল,—কারণ, তাহার ক্ষুধা পাইয়াছে। সে ভাবিতে লাগিল,—"সনাতন কাজটা ভাল করে নাই,—কোথাকারের একটা বে-আক্কিলে আধপাগলা মিন্‌সের সহিত এতদূর আসিয়া

পড়িল,—না আছে তার বাড়ী, না আছে তার আহারের বন্দো-বস্ত।” শিয়ালমারা রাগে, ক্ষোভে, একবার সনাতন দাসের পিঠ টিপিল। টিপিয়া বোধ হয় এইরূপ মনোগত ভাব জানাইল,—“বলি, আর যাও কোথায়? এ যেন ‘নিশিতে’ টানিয়া লইয়া যাইতেছে! এ শালার-বেটা-শালার না আছে ঘর, না আছে দুয়ার,—কোথায় একটা বেশ্যার বাড়ী থাকে,—আর আমাদের মত ‘হরিবোল’ ‘হরিবোল’ ব’লে নাচে! তাই বলি, সনাতন দাস,—আর বেশী এগিয়ো না।”

সনাতন দাসের কিন্তু গানের বিরাম নাই। সেই গান একবার ফুরাইতেছে, আবার গোড়া হইতে আরম্ভ করিয়া সেই গান চলি-তেছে। প্রেম হওয়া চাই কি না! নাচেরও বিরাম নাই। কাশীবাসী গানে যেমন হউন, নাচে কিন্তু মন্দ নন; সনাতন দাসের সহিত হাততালি দিয়া, সেই একসাই নাচিতেছেন। কখন কোমর দুলিতেছে;—কখন বুক দুলিতে,—কখন হাততালি বন্ধ হইয়া বাহুদ্বয় ঊর্দ্ধদিকে উঠিতেছে,—কখন আবেশে সম্মুখ দিকে হেলিতেছেন, কখন পশ্চাদ্দিকে হেলিতেছেন;—কখন বায়ুকোণে, কখন অগ্নিকোণে, কখন ঈশানে, কখন নৈঋতে; সে হেলা-হেলির বিরাম নাই, বিশ্রামও নাই;—কিন্তু তথাচ তাঁহাদের প্রকৃত প্রেম উপজিল কি না, তাহা সনাতন ঠাকুরই জানেন, আর কাশীবাসীই জানেন।

এদিকে যত নাচের ধূম, ওদিকে শিয়ালমারা কিন্তু ততই চটিয়া লাল হইতেছেন; না নাচিলে নয়,—তাই একবার তিনি নাচের অনুকরণ করিতেছেন,—গান কিন্তু অনেকক্ষণ ছাড়িয়া দিয়াছেন।

কাশীবাসী এতক্ষণ চলিয়া চলিয়া গান চালাইতেছিলেন, এখন

একবার দাঁড়াইয়া গান আরম্ভ করিলেন; দাঁড়াইতে দেখিয়া শিয়াল-মারা ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইল; আর সে থাকিতে পারিল না,—হার মুখ ফুটিয়া কাশীবাসীকে বলিয়া ফেলিল,—"চলুন না মহাশয় শীঘ্র! কোথায় যেতে হ'বে এখন আর পথে দাঁড়াইয়া গান করিবার সময় আছে কি?"

তখন কাশীবাসী গলায় কাপড় দিয়া যোড়হাতে কহিলেন,—"আসুন, আসুন; এই অধম জীবের কুঁড়ে ঘরের সম্মুখেই আসিয়াছেন। আসুন, আসুন!—আসিতে আজ্ঞা হউক। ভক্ত বৈষ্ণবের পদ-রজে আজ আমার এই কুঁড়ে ঘর পবিত্র হ'লো।"

শিয়ালমারা এদিক্-ওদিক্ চাহিয়া দেখিতেছে,—কুঁড়ে ঘর কোথায়? তাইত উহার কুড়ে ঘরটী কৈ?

কাশীবাসী। আপনারা দুই জনে অগ্রে অগ্রে চলুন। আমি আপনাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছি। এ যে আপনাদেরই ঘর।

শিয়ালমারা সবিস্ময়ে দেখিল,—এ ত কুঁড়ে ঘর নহে,—এ যে এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা!—গোলাপী রঙে ফলানো। গোলাপী রঙ্গের মোটা মোটা থাম। গোলাপী রঙের ফটক। গোলাপী রঙের কাপড়পড়া দ্বারে দ্বারবান্; আর গোলাপী-বসনাবৃতমধুরহাসিনী ঝি কাশীবাসী ভক্ত বাবাজী দুটীকে অগ্রে রাখিয়া, নিজে পশ্চাতে থাকিয়া, কেবল 'চলুন, এই আমার কুঁড়ে-ঘরে চলুন,'—এইরূপ ধ্বনি করিতেছেন। শিয়ালমারার মোদা পা উঠিতেছে না,—সে সেই কুঁড়ে-ঘরই খুঁজিতেছে,—এ অট্টালিকায় যাইবে কি করিয়া? সনাতন দাস কিন্তু গানেই বিভোর। উৎকণ্ঠিত শিয়ালমারা তখন স্পষ্টতঃই জিজ্ঞাসিলেন,—"মহাশয়! কুঁড়ে-ঘর কৈ?—এ যে রাজ-অট্টালিকা।"

কাশীবাসী। (জিহ্বা কাটিয়া) বলিতে নাই,—বলিতে নাই,—আমার ত কিছুই নয়,—এ সমুদয় শ্রীগৌরাঙ্গকে অর্পণ করিয়াছি।—ইহাই আমার কুঁড়ে-ঘর!—অতি ক্ষুদ্র অতি ক্ষুদ্র, অতি অকিঞ্চিৎকর! আমার কিছুই নয়, আমার কিছুই নাই,—এ সমস্তই মহাপ্রভুর সেবার জন্য,—অতি ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র,—কাক-বিষ্ঠা,—তস্য বিষ্ঠা!

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর, ভক্তত্রয় অট্টালিকার উঠানে প্রবেশ করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

গোলাপী-রঙের অট্টালিক প্রাঙ্গণে প্রবিষ্ট হইয়া, আবার গায়কদল তেজে উৎসাহে উদ্দীপিত হইয়া, শ্রীখোল-বাজনার তালে তালে, গান আরম্ভ করিয়া দিলেন। কাশীবাসীর গৃহে দুখানি খোল ছিল। প্রত্যহ সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাঁহার বাটীতে হরি-সঙ্কীর্ত্তন হইত। দুইটী মাহিনা-করা বাবাজী প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে আসিয়া, হরিগুণগান করিত। ঐ সঙ্গে দুই চারি জন বিনামাহিনার বাবাজী এবং কয়েক জন প্রেমিক প্রতিবেশী আসিয়া, সেই হরি-সঙ্গীতে যোগ দিতেন। ফলতঃই কাশীবাসীর ঘরে প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় এক মহাসমারোহ-কাণ্ড ঘটিত।

কিন্তু আজ প্রাতেই বিপরীত ব্যাপার। কাশীবাসীর মাহিনা-করা বাবাজী দুইটী এই বিপরীত ব্যাপারের সংবাদ শ্রবণমাত্রেই, নক্ষত্রবেগে প্রভুভবনে গিয়া উপনীত হইলেন। উপনীত হইয়াই,

কাঁদিতে কাঁদিতে দুই বাহু তুলিয়া নাচিতে নাচিতে, তাঁহাদের সহিত হরিগান জুড়িয়া দিলেন। প্রতিবেশী দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে যাঁহারা গাহিতে জানিতেন, তাঁহারাও কোমর দুলাইয়া ঐ সঙ্গে মিলিয়া গেলেন। যাঁহারা গাহিতে জানিতেন না, তাঁহারা কেবল ঈষৎ হুঁ। করিয়া, সুর উচ্চারণের ভাণ করত, গোলে হরিবোল দিয়া, তালে-বেতালে হাততালি দিতে দিতে, তালে-বেতালে কটি-তট ঘুরাইতে ঘুরাইতে, সঙ্কীর্ত্তনের পরম সুষমা সংবৰ্দ্ধন করিতে লাগিলেন।

কাশীবাসীর দুখানি খোলের মধ্যে একখানি খোল প্রভু সনাতন দাস বৈরাগীর গলদেশে ঝুলিতেছিল। সনাতন দাস পাকা লোক। গাহিতে যেমন, বাজাইতেও তেমনি। গান গাহিতে গাহিতে খোল বাজাইতে সনাতন দাস বিলক্ষণ পটু ছিলেন। শিয়ালমারা গান গাহিতে ত ভাল জানিতেন না, বাজাইতে তদধম ছিলেন। দ্বিতীয় খোলখানি কাশীবাসী প্রথমে আনিয়া শিয়ালমারার হাতে দেন। শিয়ালমারা ভাবিল, এ এক নূতন বিপদ্ উপস্থিত দেখিতেছি। দলে মিশিয়া, গান গাওয়া এক রকম গোলে-মালে চলে, কিন্তু বাদ্যবাদন, বিশেষতঃ খোল-বাদন গোলে-মালে ফাঁকি দিয়া সারিয়া লইবার ত যো নাই। দুইখানি খোল এক হইয়া বাজিবে, ঠিক ঠিক তাল দিতে হইবে,—এ কাজ যে বড়ই কঠিন! ভাবিতে ভাবিতে বুদ্ধি আসিল। শিয়ালমারা, কাশীবাসীর হস্ত হইতে খোল লইয়া, প্রথমে একবার কাঁদিবার চেষ্টা করিয়াছিল; তাহা ভাল হইল না। তখন খোলকে মাথায় রাখিয়া, শিয়ালমারা কাঁদ-কাঁদ সুরে বলিতে আরম্ভ করিল,—"শ্রীখোলরে! তুই আমার মাথায় থাক্! তোকে কোন প্রাণে

মাথা থেকে নামিয়ে গলায় ঝুলাব রে! আর হে শ্রীখোল! যদিই তোকে গলায় ঝুলাইয়া রাখি, হৃদয়ের হার করিয়া হৃদয়েই গাঁথিয়া রাখি, তাহা হইলেই বা তোমায় বাজাইব কেমন করিয়া? বাদ্য-কালে শ্রীঅঙ্গে যদি বাজে, শ্রীমুখে যদি আঘাত লাগে, তখন তাহা আমি কোন্ প্রাণে সহ্য করিব? রে শ্রীখোল! ঐ নবনীত-কোমল অঙ্গে, চপেটাঘাত কি কখন শোভা পায়!" এই কথা বলিয়া, খোল মাথায় লইয়া, শিয়ালমারা তখন চোখে কাপড় দিয়া কাঁদিতে লাগিল। ক্রন্দন শেষ হইবামাত্র, শিয়ালমারা কাশী-বাসীকে কহিল,—"শ্রীখোলের শ্রী-অঙ্গে আমি চপেটাঘাত করিতে পারিব না; আপনি এই শ্রীখোল লউন।" এই কথা বলিয়া তৎ-ক্ষণাৎ—মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া, শিয়ালমারা খোলখানি কাশী-বাসীর গলদেশে ঝুলাইয়া দিল। সর্ব্ববিষয়ে-পণ্ডিত কাশীবাসী, গতিক বুঝিয়া, বিশেষ বাক্যব্যয় না করিয়া, গানের সহিত, যথা-সাধ্য খোল বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। মাহিনা-করা বাবজীদ্বয় যখন আসিয়া দেখিল, তাহাদের মনিব খোল বাজাইয়া বড়ই কষ্ট পাইতেছেন, তখন তাহাদের মধ্যে একজন বাবাজী, কাশীবাসীর নিকট হইতে খোল লইয়া আপন গলদেশে ঝুলাইল। বাবাজী-দ্বয় গায়কও বটেন, বাদকও বটেন।—সনাতন বৈরাগীর সহিত সঙ্গত করিয়া, এক-কণ্ঠ হইয়া, মধুর হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনে মাতিলেন। ঘোর-রবে ঘনঘটাশব্দে সঙ্কীর্ত্তন চলিতে লাগিল।

শিয়ালমারা কিন্তু ক্ষুধায় আকুল। কখন যে সঙ্কীর্ত্তন ভাঙ্গিবে, তাহা ত কিছু বুঝিতেছি না; এই ভাঙ্গে, ভাঙ্গে-ভাঙ্গে হয়, আবার তৎক্ষণাৎ দ্বিগুণ উৎসাহে সঙ্কীর্ত্তনকারিগণ, উর্দ্ধে বিপরীত বিপরীত লম্ফ দিয়া, বিপরীত বিপরীত ডাক ডাকিতে থাকেন। আবার

শিয়ালমারার মুখ-কমল শুকাইয়া যায়। শিয়ালমারা ভাবিতে লাগিল,—"এ যে মহা বপদে পড়িলাম। পলাইবার যো নাই; যেন নাগপাশে বদ্ধ আছি। বোধ হইতেছে, ধর্ম্ম-কর্ম্ম আমাকে পোষাইল না। আর সনাতন শালারই বা কি আক্কেল! তো বেটার কি আর এখনও প্রেম হয় না? ধন্য বাছা তুই! কি শেখাই শিখে ছিলি!"

যতই বেলা হইতে লাগিল, সঙ্কীর্ত্তনের প্রবল বেগ ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকিল; আর ততোধিক শিয়ালমারার ক্ষুধানল দাউ-দাউ জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। শিয়ালমারা প্রতিজ্ঞা করিল,—"সোণা শালা আর দশ মিনিটের অধিক কাল যদি গান গায়, বেটার বুজরুকি আমি ভেঙে দিব। তাই বা কেমন করিয়া ভাঙ্গিব? ভাঙ্গিতে গেলে যে, দুজনেই মারা পড়িব। ভিড় ঠেলিয়া কাণে কাণে উহাকে এ কথা বলিলে হয় না কি?"

শিয়ালমারা কাণে কাণে বলিবার চেষ্টা করিল; গোলে-মালে সনাতন দাস শুনিতে পাইল না। হাঁকাহাঁকি রবে এ গোপনীয় কথাই বা বলি কেমন করিয়া? অন্তরে শেষে একটী সুবুদ্ধি আসিল। যে সুরে সঙ্কীর্ত্তন হইতেছিল, সে সুরটী শিয়ালমারা ভাল করিয়া ভাঁজিয়া লইল! ভাঁজিয়া সনাতন দাসের কাণের গোড়ায় মুখটী লইয়া গিয়া, অর্দ্ধস্ফুট স্বরে গাইতে আরম্ভ করিল,—

"ওরে সোণা!
আমার পানে একবার চেয়ে দেখ না;
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় আর ত প্রাণ বাঁচে না!
আমি ম'লাম, তুই গান থামা না!"

ইঙ্গিতে সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া, চতুর সনাতন দাস

সেই সময় খোলখানা খুব জোরে বাজাইয়া দিলেন এবং গানের সুরেই শিয়ালমারাকে উত্তর দিলেন ;—

"ভাই! তুই দশা পা'না,

না হ'লে যে গান থামে না।"

আর বেশী কথা বলিতে হইল না। শিয়ালমারা অমনি মুখ গুঁজিয়া, ধড়াস করিয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন এবং মূর্চ্ছিত হইলেন। মূর্চ্ছা সহসা ভাঙ্গিল না দেখিয়া, গায়কদল শশব্যস্ত হইল। শীত কতকটা থাকিলেও কেহ পাখা আনিল; কেহ জল আনিল ; কেহ 'দয়াল মহাপ্রভুর কৃপা" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

গান থামিল।—কাশীবাসী দৌড়িয়া গিয়া শিয়ালমারাকে ধরাধরি করিয়া তুলিয়া চিৎকরিবার চেষ্টা করিলেন। শিয়ালমারা তখন ভারি—বিষম ভারি,—বুঝি হিমালয়অপেক্ষাও ভারি। কাশীবাসী কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন,—"এ দেহে বুঝি প্রাণ আর নাই। নহিলে এত ভারি হইবে কেন? প্রাণ সেই বংশীবদন মধুসূদন শ্রীগোলোকের শ্রীহরির নিকট শ্রীগোলোক ধামে চলিয়া গিয়াছেন। অহো! শূন্যদেহ কিনা তাই এত ভারি।" এইরূপ কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাশীবাসী যত কথা কহিতেছেন, নিম্ন মুখ, ভূমিসংলগ্ন শিয়ালমারা ততই হাসি আর চাপিয়া রাখিতে পারিতেছেন না। যখন তিনি ধড়াস করিয়া পড়েন, তখনই তাঁহার একটু হাসি আসিয়া ছিল, তাই তিনি মুখ গুজিয়া পড়েন। তারপর যখন লোক তাঁহাকে বাতাস করিতে থাকে, তখন হাসির মাত্রা আরও একটু বৃদ্ধি পায়। অবশেষে যখন কাশীবাসী আসিয়া, তাঁহার গায়ে হাত দেন এবং ধরাধরি করিয়া চিৎ করিবার চেষ্টা

করেন, তখন তাঁহার গায়ে কেমন কুতু-কুতু লাগিতে থাকিল, হাসির মাত্রা চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইল। অথচ এদিকে কথাটী কহিবার যো নাই। অন্তিমে যখন কাশীবাসী কান্নার সুরে বলিতে লাগিলেন,—"ইহাঁর প্রাণটী গোলোকধামে চলিয়া গিয়াছে,"—তখন ত শিয়ালমারা একবারে হাসিময় হইয়া উঠিলেন। কাজেই কাশীবাসী তাহাকে তুলিবার জন্য, যতই টানাটানি করেন, ততই শিয়ালমারা বুকে ভর দিয়া, ভূতলের সহিত সজোরে সংলগ্ন থাকেন।

চতুর সনাতনদাস প্রকৃত তত্ত্ব অনুমানে কথঞ্চিৎ অবগত হইয়া, বলিলেন,—"আর বিলম্ব করিও না, আর বিলম্ব করিও না, "শীঘ্র উহার কাণের গোড়ায় দুইখানি শ্রীখোল লইয়া গিয়া খুব জোরে জোরে বাজাইয়া দাও, আর সকলে মিলিয়া অনবরত হরিধ্বনি কর? হরিধ্বনি বন্ধ করিতে যতক্ষণ না বলি, ততক্ষণ কেবল একসা হরিধ্বনি কর।" জোরে খোল বাজাইতে লাগিল; জোরে হরিধ্বনি হইতে লাগিল; কেহ কাহারও কথা আর শুনিতে পাইল না।

সনাতন দাস তখন শিয়ালমারার ভূসংলগ্ন মুখের নিকট, আপন মুখ লইয়া গেলেন; জিজ্ঞাসিলেন,—"হয়েছে কি? উঠ্‌ছিস না কেন?" শিয়ালমারা কহিলেন,—"দম ফাটিয়া প্রাণ যায় ভাই হাসি আর যে টিপিয়া রাখিতে পারিনে।"

সনাতন। আমি একটী কথা বলি, শোন;—আমি এই নামাবলী-চাদর দিয়ে তোর মুখ ঢেকে দিচ্চি; তুই নামাবলিতে মুখ ঢেকে উঠে বোস! যদি হাসি পায়, একান্তই না থাকৃতে পারিস্, তবে ঐ ঘোমটার মধ্যে একটু আধটু হাসিয়া লইবি! আমি কথার ছলে সব দোষ ঢাকিয়া লইব।"

নামাবলীর প্রকাণ্ড এক ঘোম্‌টায় শিয়ালমারা মুখ ঢাকিয়া উঠিয়া বসিলেন। লোক সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসিল,—"মহাপ্রভুর মুখ ঢাকা কেন? আমরা যে শ্রীমুখ-দর্শনে অভিলাষী হয়েছি।" সনাতন দাস বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"আহা প্রভু! গোলক ধাম থেকে এই এলেন কিনা!—তাই বুঝি নরলোকের মুখ এখন দেখবেন না ব'লে, প্রভু এখন মুখ ঢেকে আছেন।"

এ কথা শুনিয়া শিয়ালমারা ঘোম্‌টার ভিতর ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সনাতন দাস অমনি কহিতে আরম্ভ করিলেন,—"প্রভু এখন বুঝি সম্পূর্ণরূপে নরলোকে আসেন নাই। ঐ দেখুন, ঐ শুনুন, তিনি শ্রীমতী লক্ষ্মার সহিত কত হাস্য পরিহাস করিতেছেন। আবার জোরে বাজাও শ্রীখোল; আবার সকলে মিলিয়া হরি হরি বল।"

নবম পরিচ্ছেদ।

যথানিয়মে যথাসময়ে, সঙ্কীর্ত্তন শেষ হইল। সনাতন দাস এবং শিয়ালমারা গঙ্গাস্নানে বহির্গত হইলেন। গৃহস্বামীকে বলিয়া গেলেন,—"আমাদের নানারূপ তপজপ আছে, আসিতে একটু বিলম্ব হইবে।"

রাজপথে বাহির হইয়াই শিয়ালমারা সনাতন দাসের কাণের কাছে মুখটী লইয়া গিয়া ধীরে ধীরে কহিল,—"ভাই! আর ত বাঁচি না। ক্ষুধায় যে পেট জ্বলিয়া যাইতেছে।"

সনাতন। চুপ কর। এখানে কোন কথা কহিও না। এক

পোয়া পথ না গেলে, তোমার অন্য কথা শুনিব না! এখন খুব ধীরে ধীরে উভয়ে,—

'হরিবোল - হরি হরি বোল
হরিবোল—হরি হরিবোল !'

এই কথা বলিতে বলিতে যাই চ ।

শিয়ালমারা। (আস্তে-আস্তে) এতক্ষণ না খাইতে পাইলে আমিত প্রাণে মরিব। খালি পেটে আর এক পোয়া পথ চলা আমার কর্ম্ম নয়।

সনাতন। দেখ, তুমি যদি এত গোল কর, তাহা হইলে আমি তোমায় ফেলিয়া, এখনি অন্যদিকে চলিয়া যাইব।

শিয়ালমারা। তোমার ভাই! মতলব আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আচ্ছা তবে যাই চল,—তোমার সঙ্গে হরিবোল —হরিবোল, করিতে করিতে যাই।

গঙ্গার ধারে ধারে তাঁহারা বহুদূর আসিলেন! মাঝে মাঝে শিয়ালমারা জিজ্ঞাসিলেন,—'একপোয়া পথ কি এখনও হয় নাই?' সনাতন দাস উত্তর দেন,—'আধপোয়াও এখন হয় নাই।' শিয়াল-মারা জিজ্ঞাসেন,—'হরিনাম ছাড়িবার কি এখনও সময় হয় নাই?' সনাতন দাস উত্তর দেন,—'হরিনাম ছাড়িতে এখনও আধ ঘণ্টা বাকী।" শিয়ালমারা বলেন,—'ভাই! তোমার হরিনাম করিতে রাজী আছি, পথ চলিতে রাজী আছি, আমাকে কিছু খাওয়াও ভাই!' সনাতন দাস বলেন,—'খাওয়াইব কেমন করিয়া?— হাতে ত সিকি পয়সাও নাই।'

এইরূপ হরিনামের সহিত গল্প কথিতে করিতে তীর•বেগে দুই বন্ধু,—এখন্ যেখানে গঙ্গার পুল, রেল-ষ্টেশন বর্ত্তমান,—

সেইস্থানে আসিয়া পৌঁছিলেন। সনাতন দাস কহিলেন,—"ভাই এইবার হরিনাম পরিত্যাগ কর; লোকালয় অনেকটা ছাড়াইয়া আসিয়াছি, বাঙ্গালি এদিকে নাই।"

গঙ্গাগর্ভে উভয়ে অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিলেন। সনাতন দাস কহিলেন, —"ক্ষুধা কি আমারও পায় নাই? কিন্তু এত ব্যস্ত হইলে চলিবে কেন? আমরা এখন সাধু—ঈশ্বরের অবতার বিশেষ;—স্নানের পূর্ব্বে দোকানে বসিয়া জল খাইলে লোকে মনে করিবে কি? চিন্তিত হইও না,—এই খানেই তোমার জল খাবার জুটাইয়া দিতেছি।'

শিয়ালমারা। তোমার নিকট নিকি পয়সাও নাই বলিতেছ অথচ জল খাবার জুটাইয়া দিবে কেমন করিয়া?

সনাতন। আগে জলখাবার না আগে পয়সা? দোকানে বসিয়া, জল খাবার কিনিয়া, উদর পূর্ণ করিয়া খাইয়া, তবে ত পয়সা দিতে হইবে।

শিয়ালমারা। তা বটে।

সনাতন। এখন কথা হইতেছে, জল খাইয়া স্নান করিবে, না স্নান করিয়া জল খাইবে?

শিয়ালমারা। তবেই ত মুস্কিল দেখিতেছি। আমি দু রকমই করিব;—জল খাইয়া স্নানটা ও করিব, এবং স্নান করিয়াও জল খাইব।

সনাতন। তাহা হইবে না। যা হয়, এক রকম ঠিক কর।

শিয়ালমারা। তবে আমি জল খাইয়াই স্নান করিব।

নিকটবর্ত্তী একখানি দোকানে একজন হিন্দুস্থানী গরম গরম পরোটা ভাজিতেছে। সনাতন দাস আধা-হিন্দী আধা-

বাঙ্গলা ভাষায়, হিন্দুস্থানী হালুইকরকে জিজ্ঞাসিলেন,—"এই যে তুমি লুচি পরেটা ভাজিতেছ, ইহার ময়দায় ময়ান কেমন আছে?"

শিয়ালমারা রাগ করিয়া খুব আস্তে আস্তে সনাতনের কাণের কাছে বলিলেন, "পয়সা নাই—কড়ি নাই, তোমার অত ময়ানের খোঁজ কেন?—যা হয়, হ'লেই হলো!"

সনাতন দাস সে কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বলিলেন,—"দেখ, হালুইকর ঠাকুর! আজ একটী সাধু-ভোজন হইবে;—ভাল ঘি, ভাল আটা যদি থাকে, তুমি যদি ভাল রকম ভাজিতে শিখিয়া থাক এবং প্রতি এক সের আটাতে অন্ততঃ এক পোয়া ময়ান দিতে যদি পার, তাহা হইলে আমাকে লুচি দিবে,—নচেৎ আমি চাহি না।"

হালুইকর। সাধু ভোজন হবে, সুতরাং আমি খারাপ আটা, খারাপ ঘৃত দিব কেন? আর ময়ান যেমন দিতে বলিবেন, তেমনই দিব, তাহাতে আমার আপত্তি কি আছে?

সনাতন। লুচি ভাজিবার পূর্ব্বে, তোমাকে গঙ্গাস্নান করিতে হইবে, এবং এক শ আট বার বাবা বিশ্বনাথের নাম লইতে হইবে; তার পর পরিশুদ্ধ পট্টবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক, অতি পরিশুদ্ধ স্থানে বসিয়া, পরিশুদ্ধ পাত্রে তোমার লুচি ভাজিতে হইবে।

হালুইকর। আহা! সাধু-ভোজন হইবে,—আমাকে যে রকম আজ্ঞা করিবেন, আমি সেই রকম করিব।

সনাতন। তবে শীঘ্র গঙ্গায় স্নান করিয়া আইস;—খবরদার দেরি করিও না। সাধু-সেবার সময় বুঝি অতিবাহিত হইয়া যাইতেছে।

সাধু-সেবার সময় অতিবাহিত হইতেছে শুনিয়া, হালুইকর

বড়ই ব্যস্ত ও বিব্রত হইল। সে দীর্ঘ লম্ফ দিয়া, একেবারে গঙ্গাজলে গিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল। স্নানান্তে এক-শ—আটবার 'বাবা-বিশ্বনাথ,—বাবা-বিশ্বনাথ' করিল এবং স্বয়ং এক কলসী গঙ্গা-জল কাঁধে করিয়া আনিল; অতি উৎকৃষ্ট যে আটা ছিল, তাহা ভিজাইল; খর-খর একপোয়া ময়ান দিল এবং উৎকৃষ্ট ঘৃত লুচি ভাজিতে আরম্ভ করিল।

আটায় জল দিবার পূর্ব্বে হালুইকর সনাতনকে জিজ্ঞাসিল, "কতগুলি আটা ভিজাব?—দুই সের ভিজাইব কি?"

সনাতন। (হাসিয়া) এ কথার উত্তর আমি দিতে পারি না। বাবার যদি কৃপা হয়,—এমন কি পাঁচ সের দশ সের যত দিবে,—তিনি খাইয়া ফেলিবেন; আর বাবার যদি কৃপা না হয়, তাহা হইলে একখানি লুচিও তিনি খাইতে পারিবেন না। দেখ, হালুইকর! সাধুজনের সেবা করা সকলের অদৃষ্টে ঘটে না। আমি আজ তিন দিন কাল এই মহাসাধুটীকে পাইয়াছি;—এ পর্য্যন্ত কিছুই খাওয়াইতে পারি নাই। তিন দিনের পর আজ ইহাঁর কৃপা হইল।—অনেক সাধ্য-সাধনা করাতে বলিলেন,—'আমি লুচি খাইব।'

হালুইকর ইতস্ততঃ করিয়া ক্রমশঃ আড়াই সের আটা ভিজাইল। ভক্তির সহিত, সজোরে ময়দা খাসিতে লাগিল। এদিকে সনাতন ও শিয়ালমারা দূরস্থিত এক বৃক্ষমূলে গিয়া উপবেশন করিলেন। সনাতন কহিলেন,—'দেখ বন্ধু! তুমি আর কথা কহিও না, চক্ষু বুজিয়া এখানে বসিয়া থাক;—আমি তোমাকে এই খানে লুচি আনাইয়া দিতেছি। হালুইকর তোমাকে হাজার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেও, তুমি উত্তর দিবে না। হরিনামেরঝুলিটী

গলায় ঝুলাও। ঝুলির মুখটী বেশ ফাঁক করিয়া রাখ। আর নামাবলীখানি উত্তমরূপে গায়ে দাও। এমনি ভাবে ঐ বস্ত্রখানি গায়ে দিবে যে, একখানি লুচি, গুটাইয়া মুখে দিবার সময়ও বেমালুম ভাবে নামাবলীর ভিতর দিয়া যেন হরিনামের ঝুলিতে পড়িতে পারে! আর কোমরে আর একটী হরিনামের ঝুলি বাঁধো। প্রথম হরিনামের ঝুলিটী যখন লুচিতে পূর্ণ হইবে, তখন শীঘ্রহস্তে, ঝটিতি সে ঝুলি খুলিয়া ফেলিয়া দ্বিতীয় ঝুলির আংটাটী গলার মালায় লাগাইয়া দিবে। বন্ধু! আমার কথা বুঝিতে পারিতেছ ত?"

শিয়ালমারা। তোমার কথা ভাই! অনেকক্ষণ হইতেই বুঝিতেছি। বলি, এত শিখ্‌লে কোথায়?

সনাতন। ভগবান্ শেখালেই শিখি! সে যা হ'ক, আমি যে রকম বলিলাম, সে রকম পারিবে তো?

শিয়ালমারা। তা সমস্তই পারিব। তবে আমার একটু দোষ আছে,—আমার বড় হাসি পায়। যদি কার্য্য-কালে হাসিয়া ফেলি, ইহাই আমার ভাবনা।

সনাতন। বন্ধু! তুমি হাসির ভাবনা ভাবিও না! তাহা আমি বেশ ঢাকিয়া লইব। হাসিলেই বলিব, নারায়ণ লক্ষ্মীর সহিত এইবার হাস্য-পরিহাস করিতেছেন। অথবা বলিব, এইবার বুঝি আমার প্রতি, অথবা হালুইকরের প্রতি,—শুভদৃষ্টি হইবার উপক্রম হইয়াছে।

শিয়ালমারা। ভাবো,—(ভবিষ্যতের ভাবনা একটু ভাবা ভাল) হালুইকর যদি হরিনামের ঝুলির ভিতর লুচি দেখিতে পায়?

সনাতন। সে চিন্তা তোমায় করিতে হইবে না। আমি

অমনি বলিয়া উঠিব,—'এই সাধু ব্যক্তি স্বয়ং নারায়ণ কিনা,—তাই বুঝি লক্ষ্মীর জন্য ছাঁদা লইয়া যাইতেছেন!'

শিয়ালমারা। এ কথা বলিলেই কিন্তু প্রহার!

সনাতন। না-হে না! তুমি ভক্তের মন বুঝ না—মূর্খ হিন্দুকে তুমি চিন না!—একটু ভক্তি জন্মাইয়া পসার করিয়া লইতে পারিলে আর কি রক্ষা আছে! তখন সাদা কালো হইবে,—কালো, লাল হইবে,—লাল হলুদ হইবে,—হলুদ, বেগুনী হইবে—বেগুনী ধূসর হইবে,—আবার ঐ ধূসর ক্রমশঃ সাদা হইবে। তাই বলি ভক্তি বড় শক্ত সামগ্রী। যাহা দেখাইবে তাহাই দেখিবে; যাহা বলাইবে, তাহাই বলিবে;—যাহা শুনাইবে, তাহাই শুনিবে।

শিয়ালমারা। তোমার কথা ত ভাই! সব শুনিলাম। হালুইকর বেটার যদি ভক্তিই না হয়, তখন উপায়?

সনাতন। আঃ! এত ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কাজ করা চলে না!

শিয়ালমারা। আমি বর্ত্তমানও ভাবিতে চাহি না,—ভবিষ্যতও ভাবিতে চাহি না,—অতীত কালও ভাবিতে চাহি না,—আমাকে যা বলিবে, তাই করিতে প্রস্তুত আছি,—কেবল আমাকে একগাছি লাঠী যোগাড় করিয়া দাও। আমি শিয়ালমারা,—আমার হাতে লাঠী থাকিলে এক-শত লোক একত্র হইয়াও আমার কিছু করিতে পারে না। আর এই কাশীতে লাঠীবাজ লোকই বা ক'জন আছে?—ক'জনই বা লাঠী খেলিতে জানে?

সনাতন। (হাসিয়া) আচ্ছা, আমি যদি লাঠী ধরি!

শিয়ালমারা। (হাসিয়া) তোমার মত দশ-পনরটা লোকও লাঠী ধরিয়া, আমার কিছু করিতে পারে না। এই লাঠীর তেজে,

আমি একবার দুই শত পুলিশের মধ্য দিয়া পলাইয়া আসিয়া-ছিলাম ;—অন্ততঃ পঁচিশটা পুলিশের মাথা ফাটাইয়া খুন করিয়া-ছিলাম। তোমার যেরূপ বুকের ছাতি চওড়া, আমার সেরূপ নয় বটে,—তোমার শারীরিক বল হয়ত আমা অপেক্ষা বেশী আছে, কিন্তু লাঠীর বল, আমা অপেক্ষা বেশী হওয়া কিম্বা আমার সমান হওয়া, কখনই সম্ভবপর নহে। বাঙ্গালার বারোটা জেলায় লাঠী-খেলায় আমি জয়ী বলিয়া প্রসিদ্ধ।

সনাতন দাস,—শিয়ালমারার হাত ধরিয়া কহিলেন,—"বন্ধু! আমার অবিদিত কিছুই নাই,—আমি সব জানি। কে ভাল লাঠীবাজ,—কে মন্দ লাঠীবাজ,—কে কেবল নামে বিকায়, কে কেবল কার্য্য দেখাইয়া যশোলাভ করে,—এ সমস্তই আমার নখ-দর্পণের মধ্যে। তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,—"বাঙ্গালা দেশে, তোমা অপেক্ষা ভাল লাঠীখেলোয়াড় কি একেবারে নাই?"

শিয়ালমারা। একজন আছেন। তিনি আমার গুরুদেব!

সনাতন। তাঁহার নাম বল দেখি।

শিয়ালমারা। আমার গুরুর নাম রঘুদয়াল।

সনাতন। ঠিকই হইয়াছে। আমিও তাঁহারই কথা ভাবিতে-ছিলাম। রঘুদয়ালের কাছে লাঠী ধরে,—বাঙ্গালায় এমন বীর নাই।

শিয়ালমারা। গুরুদেবের লাঠীর তেজে একবার এক উন্মত্ত-হস্তী ধরাশায়ী হইয়াছিল! লাঠীতে তাঁহাকে বাঘ শীকার করিতে দেখি নাই বটে, কিন্তু অনেক বন্য শূকর তাঁহার লাঠীর দ্বারা হত হইয়াছে। তাঁহার লাঠীর তেজে বড় বড় বৃক্ষের ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। বন্দুকের গুলিতেও আমার তত ভয় হয় না,—তাঁহার লাঠীতে আমার যত ভয় হয়; সে সব কথা এখন থাক—আমার

কাছে আগে এক গাছি লাঠী রাখ, তার পর, আমাকে যা করিতে বলিবে, তৎক্ষণাৎ তাই করিব!

সনাতন দাস,—গুরুজী রঘুদয়ালের উদ্দেশে, বহুবার প্রণাম করিয়া কহিলেন,—লাঠীর ভাবনা কি? ঐ দেখ নিকটে বড় বড় বজরা বাঁধা রহিয়াছে। এক একটা বজরায় লম্বা লম্বা আট শটা দাঁড় আছে। যদি তেমন তেমন দেখ, তবে লাফাইয়া গয়া, দাঁড় খুলিয়া আনিলে, লাঠীর কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

শিয়ালমারা। এ কথা যুক্তিযুক্ত বটে। এখন তবে আমাকে কি করিতে হইবে, বলো।

সনাতন। যাহা যাহা করিতে হইবে, তাহা কতক আগেই বলিয়াছি,—এখন শেষ অংশ শ্রবণ করো। আসল কথা এই, তুমি যত পারিবে, তত খাইবে; দুইটি বৃহৎ হরিনামের ঝুলিতে যত পারিবে লুচি তুলিবে,—ঠাসিয়া ঠাসিয়া, হরিনামের ঝুলি পূর্ণ করিয়া, লুচি ভর্ত্তি করিবে। ইহা ত গেল—এক পক্ষের কথা। অপর পক্ষ হইতেছে এইরূপ;—তোমার লুচি-ভোজ-নের সময়—কখন তোমার সম্মুখে, কখন তোমার পার্শ্বে, আমি বসিয়া থাকিব। আমারও দুইটী বড় হরিনামের ঝুলি আছে, তাহা ত তুমি জানো! আমিও নামাবলী গায়ে দিয়া বসিব। হালুইকর কিছু সর্ব্বদা সম্মুখে থাকিবে না,—কখন লুচি আনিতে যাইবে, কখন জল আনিতে যাইবে,আর মাঝে-মাঝে আমি তাহাকে এমন এক একটা ফরমায়েস করিব, যাহাতে তাহার অন্ততঃ আট দশ মিনিট কাটিয়া যাইবে। আর সেই সময়ে তুমি আমার দিকে, তোমার পাত হইতে লুচি ফেলিয়া দিবে,—আমি অমনি বেমালুম লইয়া, হরিনামের ঝুলিতে পুরিতে থাকিব।

শিয়ালমারা। তা খুব পারিব। তবে এক কথা হইতেছে,—আমি খাইতে বসিলে, দু'চার জন দর্শক জুটিবার সম্ভাবনা।

সনাতন। ঠিক কথা,—ঠিক কথা। তবে, তাহার জন্য চিন্তা নাই। একটু কাজ করিলেই হইবে। প্রথমে হালুইকরকে বলিব,—'এই বাবাজী কাহারও সাক্ষাতে ভোজন করেন না। তবে তোমার-আমার সাক্ষাতে করিতে পারেন,—অন্য দর্শক যেন না আসে।'

শিয়ালমারা। সাধু পরামর্শ বটে।

সনাতন। আর একটী কাজ করিতে হইবে। প্রথমে, তোমার পাতে লুচি দিলে, কিছুতেই তুমি সে লুচি তখন খাইবে না;—চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যেন ভগবানের নাম জপ করিতেছ, এই ভাব দেখাইবে। তার পর, যখন আমি অনেক সাধ্য-সাধনা করিব, তখনও তুমি লুচি খাইবে না। হালুইকরও অনেক সাধ্য-সাধনা করিবে, তখনও তুমি লুচি খাইবে না। তার পর আমি আমার বুকে ও মাথায় ইট মারিতে আরম্ভ করিব;—হালুইকর জানিতে না পারে এবং দেখিতে না পায়, এই ভাবে মধ্যে মধ্যে চক্ষু খুলিয়া আড়-চোখে দেখিয়া লইবে, আমি কি করিতেছি। মাথা দিয়া এবং বুক দিয়া যখন অল্প অল্প রক্ত বাহির হইতে আরম্ভ হইবে, তখনও তুমি লুচি খাইবে না। শেষে যখন আমি বলিব যে, 'আমি অদ্য প্রাণত্যাগ করিব' এবং এই কথার সঙ্গে সঙ্গে ধড়াস্ করিয়া বুকে এক ইট বসাইব, তখন তুমি ঈষৎ হাস্য করিয়া কণামাত্র লুচি লইয়া, একবার ঠোঁটে ঠেকাইবে। তার পর, আবার যা-কে তাই হইয়া বসিয়া থাকিবে।

শিয়ালমারা। যাহা বলিতেছ, তৎসমস্তই আমি করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু ক্ষুধা যেরূপ পাইয়াছে এবং ইতি মধ্যে লুচি ভাজার যেরূপ সৌরভ উঠিয়াছে, তাহাতে, পাতে লুচি দিলে আমি 'হাম-হাম' করিয়া না খাইয়া থাকিতে পারিব কি না,—ইহাই কেবল ভাবিতেছি! কণামাত্র লুচি মুখে দিতে গিয়া, অন্যমনস্কে যদি এককালে গোটা চারিখানি লুচি মুখে ফেলিয়া দিই, তাহা হইলে উপায় কি? এ যে বড় বিষম ব্যাপার হইল, দেখিতেছি। সম্মুখে সুস্বাদু আহারীয় সামগ্রী প্রস্তুত থাকিবে,—ক্ষুধার্ত্ত আমি,—আহারার্থ উপরুদ্ধ হইয়াও, আহার করিতে পারিব না,—আহারের জন্য মাথা কুটিলেও, আহার করিতে পারিব না,—এ ব্যাপার কি বড় বিষম নয়?

সনাতন। ধৈর্য্য ধারণ কর, ধৈর্য্য ধারণ কর;—এত ব্যস্ত হইলে চলিবে না।

শিয়ালমারা। ধৈর্য্যটী ত প্রাতঃকাল হইতে ধরিয়াই আছি। —বেলা একটা বাজিতে চলিল, আমার আর সাধ্য নাই যে, এ ধৈর্য্যটীকে ধরিয়া রাখি।

সনাতন। হাতে পয়সা নাই, অথচ ময়ান-দেওয়া গরম-গরম লুচি খাইতে হইবেই;—ঘি-টুকু, আটা-টুকু ভাল হওয়া চাই;—এরূপ স্থলে, ধৈর্য্য না ধরিলে, চলিবে কেন? লোকে পয়সা দিয়া জিনিষ খরিদ করে,—তুমি কি তোমার ধৈর্য্যটী দিয়া জিনিষ খরিদ করিতে অক্ষম হইবে?

শিয়ালমারা। তাহাই হউক। যত দূর সাধ্য, ধৈর্য্য ধরিব।

দুই বন্ধুতে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়, হালুইকর প্রণাম করিয়া উভয়কে জানাইল যে, পুরী প্রস্তুত।

সনাতন। অতি উত্তম কথা। কিন্তু প্রভু ত কাহারও সাক্ষাতে আহার করিবেন না। সাধু সদাই নির্জ্জনে আহার করিয়া থাকেন।

হালুইকর। তা নির্জ্জনেই যদি আহার করেন, তাহাতেই বা ক্ষতি কি আছে? আমার দোকানের পাশে একখানি ছোট চালা আছে,—চারিদিক তার ঘেরা,—সেই ঘরে বসিয়াই সাধুর সেবা হইবে।

সনাতন। না, না, তাহা হইবে না,—ইনি মহা সাধু,—পর-গৃহে বাস করেন না,—পরগৃহে উপবেশন করেন না,—এই গঙ্গার গর্ভে, এই গাছের আড়ালে, ইহাঁর ভোজনের আয়োজন করিয়া দাও, এইখানেই সন্তুষ্ট-মনে ইনি ভোজন করিবেন।

হালুইকর সাধুকে আবার যোড়হাতে প্রণাম করিল; করিয়া আবার বলিল,—"তাহাই হউক!"

তদনন্তর হালুইকর, তাহার ভৃত্য এবং সনাতন—এই তিন জনে একত্র হইয়া, প্রভুর ভোজনার্থ স্থান পরিস্কার করিতে আরম্ভ করিল। তখন সনাতন দাস গললগ্নীকৃতবাসে, যোড়হাতে কাঁদ-কাঁদ মুখে সাধুকে কহিলেন,—"শ্রীশ্রীমহাপ্রভু! দয়াল ঠাকুর! একবার কৃপা করুন!—এ দীনহীন অভাগার প্রতি একবার প্রসন্ন হউন! আপনার নিমিত্ত লুচি প্রস্তুত হইয়াছে;—হালুইকর শুদ্ধ মনে, শুদ্ধ দেহে শুদ্ধ ঘৃত আটা দ্বারা পবিত্র গঙ্গাজলের সাহায্যে লুচি প্রস্তুত করিয়াছে;—দয়াল হরি! একবার গাত্রোত্থান করুন? এই দরিদ্র ব্যক্তির মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন."

হালুইকর যোড়হাতে কহিল, "বাবা! আমি গরিব, এবং আমি মূর্খ,—আমার ঘরে ভাল জিনিষ থাকিবার সম্ভাবনা কোথায়? —এবং আমা দ্বারা উত্তমরূপে লুচি তৈয়রী হইবারই বা আশা

কোথায়? নিজগুণে যদি কৃপা করিয়া আহার করো, তবে আমি কৃতার্থ হই।"

তখন উভয় ভক্তের অনুরোধে, বাঞ্ছাকল্পতরু হরি আর থাকিতে পারিলেন না,—উঠিয়া দাঁড়াইলেন, দাঁড়াইয়া খানিক চক্ষু মুদিয়া রহিলেন! সনাতন কহিলেন,—"প্রভু! চক্ষু চাহুন,—এই পথ দিয়া চলুন।"

এইরূপে শিয়ালমারা ভোজন-স্থানে গিয়া উপনীত হইলেন,—এবং এক কুশাসনে গিয়া বসিলেন।

সনাতন উঠিয়া বলিলেন,—"হালুইকর! তোমার চাকরকে এখান হইতে সরিয়া যাইতে বলো। এখানে কেবল প্রভুর অনুগ্রহে, একমাত্র তুমিই থাকিতে পারো,—আর কেহই থাকিতে পারিবে না।"

হালুইকর ভৃত্যকে দূরে যাইতে বলিল এবং আরও কহিল, "তুমি দূরে প্রহরি-স্বরূপ থাকো,—কেহ যেন এ দিকে কোনরূপে প্রভুর ভোজনকালে না আসিতে পারে।"

ভৃত্য যোড় হাতে 'তথাস্তু' বলিয়া সরিয়া গেল।

হালুইকর সনাতনকে কহিল,—"তবে এই বারে আমি লুচি লইয়া আসি।"

সনাতন কহিল, "হাঁ, উপযুক্ত অবসর হইয়াছে।"

হালুইকর লুচি আনিতে গেল; এদিকে সনাতন দেখিল যে, গঙ্গায় ফুল ভাসিয়া যাইতেছে। কাশীর গঙ্গায় অনেক সময় ফুল ভাসে। ফুল তুলিয়া আনিয়া, সনাতন শিয়ালমারার সম্মুখে বসিয়া মহাধ্যানমগ্ন হইয়া, শিয়ালমারাকে যেন পূজা করিতে লাগিল, হালুইকর থালপূর্ণ লুচি লইয়া আসিল,—নর দ্বারা নর পূজা

দেখিয়া সে অবাক্ হইল,—এবং সেই লুচির থালাখানি শিয়ালমারার সম্মুখে রাখিয়া যোড়হাতে দাঁড়াইয়া রহিল।

দেখিতে দেখিতে সনাতনের পূজা শেষ হইল,—ধ্যান ভাঙ্গিল। সনাতন কহিল, "প্রভু! দয়াময়! এইবার ভোজন করুন,—আমার নয়ন-মন সার্থক হউক!"

পূর্ব্বকার আদেশ ও ইঙ্গিতমত শিয়ালমারা কোন কথাই কহিল না,—কেবল নীরবেই রহিল। তখন সনাতন দাস, পূর্ব্ব কথামত, বুকে ও মাথায় ইট ভাঙ্গিতে লাগিল। যখন বুক মুখ দিয়া রক্ত পড়িতে আরম্ভ করিল,—তখন শিয়ালমারা কণামাত্র লুচি লইয়া আপন মুখে ও ঠোঁটে ঠেকাইল। "ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট"—এই বলিয়া, হাততালি দিয়া, সনাতন সানন্দে নাচিতে লাগিল। আর মাঝে-মাঝে বলিতে লাগিল,—"প্রভু সদয় হইয়াছেন,—প্রভু সদয় হইয়াছেন,—আমার কপাল ফলিয়াছে।"

হালুইকর এই ব্যাপার দেখিয়া, শিয়ালমারাকেও সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, যোড়হাতে মৃদুস্বরে 'জয় বিশ্বনাথ, জয় বিশ্বনাথ,—জয় বিশ্বনাথ।' এইরূপ ধ্বনি করিতে লাগিল। সনাতন দাস যোড়হাতে মধুরকণ্ঠে "হরিনাম সত্য,—হরিনাম সত্য,—হরিনাম সত্য" বুলি ধরিল।

এইরূপে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইল। কিন্তু সেই কণামাত্র স্পর্শ করিয়া শিয়ালমারা আর লুচি স্পর্শ করিল না। তখন সনাতন কহিতে লাগিল, "হায় হায়! আবার একি হইল! প্রভু! একবার দয়া করিয়া পুনরায় দয়ার স্রোত বন্ধ করিলে কেন? আমি অতি অভাজন, অকৃতী, অক্ষম,—আমি পাপী নরাধম,—হে প্রভু! হে অনাথের নাথ দীনবন্ধু! কৃপা কর,—কৃপা কর!"

যখন কিছুতেই প্রভু কথা কহিলেন না, তখন সনাতন আবার বুকে ও মাথায় ইট ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। "আমি এইরূপে প্রাণত্যাগ করিব,—অথবা গঙ্গাজলে ঝাঁপ দিয়া মরিব,—অথবা পর্ব্বত হইতে লাফ দিয়া, ভূতলে পড়িয়া পঞ্চত্ব পাইব,—হে প্রভু! আহার করো, নচেৎ এ দাসকে আর দেখিতে পাইবে না।"

হালুইকরও যোড়হাতে কহিতে লাগিল, "আমার রন্ধনের বুঝি কিছু দোষ হইয়া থাকিবে,—তাই প্রভু সেবা করিতেছেন না। অথবা আমি অশুদ্ধ বস্ত্রে আটা ভিজাইয়াছি,—তাই বুঝি প্রভু রাগ করিয়াছেন। অথবা পাতে কেবল পুরি দিয়াছি,—কোনরূপ ব্যঞ্জন দিই নাই,—তাই বুঝি প্রভুর আহার করিতে রুচি হইতেছো না। হায়! আমি কি করিলাম! কত পাপ-পঙ্কে মজিলাম"—এইরূপ বলিতে বলিতে হালুইকরের দু'নয়নে জলধারা বহিতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে হালুইকর সনাতনকে জিজ্ঞাসিল,—"উত্তম গোল আলু আমার নিকট আছে, কিছু আলুর দম করিয়া আনিয়া প্রভুকে দিব কি?"

সনাতন। না, না, না,—ব্যঞ্জন উনি খান না, উহাতে উহাঁর স্পৃহা নাই;—প্রভু বলিয়াছিলেন,—"কেবল মাত্র লুচিই খাইব।" বিশেষতঃ আলু অতি অপবিত্র সামগ্রী;—বিলাতি জিনিস।—আলু কি সাধুলোকের যোগ্য? যদি তুমি আলুর দম রাঁধিয়া, প্রভুর ভোজন-পাত্রে দাও, তাহা হইলে প্রভু হয়ত ক্রোধে এখনি তোমাকে ভস্মো করিয়া ফেলিতে পারেন।'"

হালুইকর কুণ্ঠিত হইয়া কহিল, "না, না, ভাই আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি;—আমি মূর্খ মানুষ,—অত কি জানি!"

সনাতন দাসের ডাকাতি-কালে, নানারূপ কল-কসরৎ অভ্যাস

ছিল। সনাতন দাস কহিল,—"দয়াল প্রভু! তবে আপনি কি সত্য সত্যই খাইবেন না? যদি না খান, তবে আমি আপনার সম্মুখে মাটিতে মাথা রাখিয়া, ঊর্দ্ধদিকে পা করিয়া থাকিব এবং যাবজ্জীবন এই ভাবেই কাটাইব।"

এই কথা বলিতে বলিতে সনাতন দাস বাজীকরের ন্যায়, নিম্নে মৃত্তিকার উপর মাথা স্থাপন করিল এবং আকাশের দিকে পা দুটী তুলিয়া রহিল।

হালুইকরের মুখে আর কথা নাই। সে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া, বিস্ময়বিমুগ্ধনেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল। নিম্নমুখ ঊর্দ্ধপদ সনাতন, হালুইকরকে কহিল,—"হে হালুইকর! তুমিও নিশ্চিন্ত থাকিও না,—আমি যাহা বলি, তাহাই করো,—নইলে প্রভুর কোপে হয়ত তোমার ঘর-বাড়ী দগ্ধ হইয়া যাইতে পারে। তুমি অন্য কিছু করিতে পারিবে না,—তুমি দুই হাত তুলিয়া ঊর্দ্ধবাহু হইয়া কেবল দাঁড়াইয়া থাকো, আর মুখে—'বাবা বিশ্বনাথ,—বাবা বিশ্বনাথ'—এই কথা উচ্চারণ করো।"

ভক্ত হালুইকর তাহাই করিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

যখন ষোল কলা পূর্ণ হইল, তখন শিয়ালমারা দুই একখানি লুচি ধীরে ধীরে খাইতে আরম্ভ করিল।

নিম্নমুখ সনাতন দাস, হালুইকরকে কহিল "যতক্ষণ না প্রভুর আহার শেষ হয়, ততক্ষণ আমরা এইরূপ ভাবে অবস্থিতি করিব। আমরা সহজ আকার ধরিলে, কি জানি, গোঁসাই-প্রভু যদি রাগ করেন! তাই বলি, আপনি ঐরূপ ঊর্দ্ধবাহু হইয়া থাকুন, আমিও

ঊর্দ্ধপদ হইয়া থাকি। আপনাকে আর একটী কাজ করিতে হইবে। আপনি ত ঊর্দ্ধবাহু হইয়াই আছেন,—ইহা ব্যতীত আপনাকে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, এই সাধু প্রভুর ধ্যান করিতে হইবে। আপনার রন্ধনের যে দোষটুকু আছে, ধ্যানে সে দোষটুকু কাটিয়া যাইবে।”

উত্তমরূপ ময়ান-দেওয়া, পরিপাটীরূপে ভাজা, গরম-গরম উৎকৃষ্ট আটার লুচি, ক্ষুধার্ত্ত শিয়ালমারা, পরম পরিতোষের সহিত, সনাতন দাসকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিয়া খাইতে লাগিল। যতগুলি লুচি দিয়াছিল, অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমস্তই ভক্ষণ করিয়া ফেলিল।

সনাতন দাসের রাগ হইল। মনে মনে কহিল, “এমন ত আনাড়ি খাইয়ে দেখি নাই! গলায় সংলগ্ন হরিনামের ঝুলি তবে কিসের জন্য রহিয়াছে? লোকটা কি বোকা? হরিনামের ঝুলিতে আগে বারো আনা লুচি ফেলিতে হয়—সিকি মাত্র খাইতে হয়,—ইহাই হইল আহারের নিয়ম। এতক্ষণ হালুইকর চক্ষু বুজিয়া ছিল,—সুবিধাও বেশ ঘটিয়াছিল,—কিন্তু আমার দুরদৃষ্ট-বশতঃ শিয়ালমারা-শালা, চুরি করিয়া হরিনামের ঝুলিতে লুচি ফেলিতে ভুলিয়া গেল।”

নিম্নমুখ, ঊর্দ্ধপদ সনাতন দাস, এইবার ঊর্দ্ধমুখ, নিম্নপদ হইল। আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল; কহিল,—“হালুইকর ঠাকুর! গ্রহ প্রসন্ন হইয়াছে;—সৌভাগ্যের আর সীমা নাই।”

হালুইকর এতক্ষণ চক্ষু বুজিয়া, ‘বাবা বিশ্বনাথ’—‘বাবা বিশ্বনাথ’ করিতেছিলেন। তিনি সনাতন দাসের কথা শুনিয়া চক্ষু মেলিলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন,—“হইয়াছে কি?”

সনাতন। হইতে বাকী আর কিছুই নাই,—ষোল কলাই পূর্ণ হইয়াছে। আকাশের চাঁদ হাতে আসিয়াছে। তুমি হয় ত তোমার বাটী গিয়া দেখিবে, তোমার স্ত্রীর রূপার অলঙ্কারগুলি সব সোণার হইয়া গিয়াছে। সোণার অলঙ্কারগুলি হীরক-খচিত হইয়াছে! একান্তই তাহা যদি না হইয়া থাকে, তাহা হইলে, তুমি এক বৎসরের মধ্যে দেখিবে, তোমার এক প্রকাণ্ড চকমিলান বাড়ী হইয়াছে; তোমার হাতী-শালায় হাতী বাঁধা আছে,—ঘোড়াশালায় ঘোড়া বাঁধা আছে;—তুমি হয় ত রাজা হইয়াছ,—তোমার স্ত্রী হয় ত রাণী হইয়াছেন,—এবং তোমার কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য অনেক রাজপুত্র দেশ-বিদেশ হইতে আসিতেছে। অদ্য যে শুভকার্য্য সংঘটিত হইল, তাহাতে তুমি রাজা কেন—সম্রাট্ হইতে পারো। সকলি হরির কৃপা,—বাবা বিশ্বনাথের ইচ্ছা।

হালুইকর। (যোড়হস্তে) মহাশয়! হইয়াছে কি? ঘটিয়াছে কি?

সনাতন। তুমি কি চক্ষু থাকিতে অন্ধ? দেখিতে পাইতেছ না,—বাবার কৃপা হইয়াছে। উনি স্বয়ং সমস্ত লুচি খাইয়া ফেলিয়াছেন,—পাতে একখানিও নাই! দেবতা, কবে মানবের সাক্ষাতে আহারীয় সামগ্রী খাইয়া থাকেন? কিন্তু আজ প্রত্যক্ষ দেবতা, মানব-সমক্ষে আহার করিলেন। হালুইকর হে! তোমার জন্ম সার্থক হইয়াছে। তুমি চতুর্ব্বর্গ ফললাভ করিবে বলিয়া, বোধ হইতেছে। তুমি আর অধিক দিন বাঁচিবে কিনা, সে পক্ষে আমার সন্দেহ জন্মিতেছে। এত তপস্যা করিয়া, এত সাধ্য-সাধনা করিয়া, এত দিন আমি যাহা পারি নাই, আজ

তুমি তাহাই ঘটাইলে। অথবা তুমি মহাপুরুষ,—ঈশ্বর জানিত ব্যক্তি। হরি হে কৃপাসিন্ধু! পার করো। বাবা বিশ্বনাথ! তুমিও রক্ষা করো।

হালুইকর। (যোড়হাতে) দেবতা! অদ্য কৃপা করিয়া, এ অধীনের প্রস্তুত সমস্ত লুচি খাইয়াছেন। আরও লুচি খাইবেন কি? আরও লুচি আনিয়া দিব কি?

সনাতন। দেবতা ত মৌনী,—কাহারও সহিত কথা ক'ন না। উহাঁকে কি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে আছে! লুচি পাতে তুমি দিয়া যাও; উহাঁর ইচ্ছা হয় খাইবেন, না ইচ্ছা হয় না খাইবেন। তোমার অদৃষ্টে যদি আরও সুখ থাকে, দেবতা আবার এখনি খাইতে আরম্ভ করিবেন। অদৃষ্টে যদি কষ্ট থাকে দেবতা খাইবেন না।

হালুইকর। তবে আমি লুচি আনিতে যাই! লুচি আর অধিক ভাজা নাই,—পঁচিশ-ত্রিশ খানি আন্দাজ ভাজা আছে। আরও একসের ময়দার কি লুচি ভাজিয়া আনিব?

সনাতন। আমি এক সের—দুই সের লুচি জানি না,—স্তূপাকার করিয়া বাবার পাতে লুচি সাজাইয়া দাও। দেখিও, যেন গরম গরম লুচি হয়,—ঠাণ্ডা লুচি হইলে বাবা রাগ করিবেন,—হয় ত কিছু-তেই খাইবেন না। তোমার ঘরে ভালো গাওয়া ঘি কতটুকু আছে?

হালুইকর। দেড় সেরের বেশী নাই।

সনাতন। আচ্ছা, ঐ দেড়-সের গাওয়া ঘিতে যত আটার লুচি হইতে পারে,—আপাততঃ তুমি ততগুলি লুচি ভাজিয়া বাবার পাতে আনিয়া দাও। (সুর একটু নরম করিয়া) আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোমার সন্ধানে, নিকটে গয়লাবাড়ী

আরও কি খাটী গাওয়া ঘি পাওয়া যাইতে পারে? যদি তাহা হয়, আরও সেরখানেক—পোওয়া পাঁচেক—সাত পোওয়া বা এগার পোওয়া, অথবা পনের পেওয়া—যাহা যৎকিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিতে পার,—একটু গাওয়া ঘৃত সংগ্রহ করিয়া রাখিও। দেবতা যদি প্রসন্ন হন, তাহা হইলে কি আর রক্ষা থাকিবে,—তোমার শুভাদৃষ্টে সমস্তই আহার করিয়া ফেলিবেন। বুঝি তোমার কপাল ফলিয়াছে!—দেবতার আহার—আজ অপূর্ব্ব ব্যাপার দেখ!

হালুইকর। (যোড়হাতে) যে আজ্ঞা। একটা কথা বলিতেছিলাম—দেবতা কি কিছু দুধ খাইবেন না?

সনাতন। না, না, না,—তাহা তুমি পারিবে না,—সে কৃষ্ণবর্ণ গাভী চাই,—হলুদ-রঙ্গের বৎস চাই,—মকর-সংক্রান্তিতে প্রসব হওয়া চাই,—তিন 'বেয়ানে'র অধিক হয় নাই,—এমন ধারা যুবতী গাভী হওয়া চাই। সেই দুগ্ধে যদি মালাই তৈয়ারী করিয়া আনিতে পারে', তাহা হইলে সেরখানেক মালাই আনিও।

হালুইকর। আমার গাভী কৃষ্ণবর্ণ বটে, কিন্তু বৎস হলুদবর্ণের নহে। মকর-সংক্রান্তিতে প্রসব হয় নাই বটে, কিন্তু পৌষ মাসের মধ্যেই প্রসব হইয়াছে এবং এই দ্বিতীয়বার বৎস প্রসব করিয়াছে। এরূপ গাভীর দুগ্ধে মালাই তৈয়ারী করিলে, দেবতার ভোগে লাগিবে না কি?

সনাতন। (মাথা চুল্‌কাইতে) তাই ত, তাই ত, তাই ত! অনুকল্প—অনুকল্প বটে। কুশ অভাবে কেশে,—মধু অভাবে গুড়! —হাঁ, এক রকম চলিতে পারে বটে। তবে এরূপ স্থলে তুমি মালাইটা অতি উত্তমরূপে তৈয়ারী করিবে এবং এক সেরের পরিবর্ত্তে দেড় সের বা পৌনে দু'সের তৈয়ারী করিবে।

হালুইকর চলিল। সনাতন দাস তাহার পাছু ডাকিয়া আবার কহিল,—"ওহে বাপু! একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি। দেবতা অনেকক্ষণ পাত শূন্য করিয়া বসিয়া আছেন। লুচি যেমন যেমন ভাজা হইবে,—অর্থাৎ চার-গণ্ডা ভাজা হইলেই, তোমার কোন আত্মীয় ব্যক্তি দ্বারা তাহা পাঠাইয়া দিবে। সে ব্যক্তিকে গঙ্গাস্নান করাইবে এবং শুদ্ধ কাপড় পরিতে দিবে,—তবে সে লুচি ছুঁইতে পারিবে।"

হালুইকর। তাহাই করিব।

ভক্তি-গদ্গদচিত্তে, রোমাঞ্চিত হইয়া, বাবা বিশ্বনাথের পদ ধ্যান করিতে করিতে, হালুইকর মহাশয় লুচি ও মালাই প্রস্তুত করিতে প্রস্থান করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

হালুইকর দৃষ্টির বাহির হইবামাত্র, সনাতন দাস এক উচ্চ হাসিয়া'হাসিয়া উঠিল। কহিল,—"শালা, বদমাইস, শিয়ালমারা! তুই শালা কোন্ আক্কেলে সব লুচিগুলো খেয়ে ফেল্‌লি? হরিনামের ঝুলি তোর গলায় বেঁধে, চারি দিকে কাপড় ঢাকা দিয়ে, দিব্য করে তোকে সাজিয়ে রাখ্‌লুম এবং এত ক'রে তোর কাণে মন্তোর দিলুম যে, 'লুচি পেলে একে একে প্রায় সমস্তই হরিনামের ঝুলির ভেতর ফেল্‌বি এবং দু'এক খানা মাত্র খাবি'—তার তুই কিছুই করলি নে। তোর মত বেইমান লোক আর এ সংসারে নেই।"

শিয়ালমারা (হাসিয়া) ভাই! ফিদেখানি কেমন? তোর

যদি এমন ক্ষিদে হ'তো, তা হলে তুই পাতখানা অবধি খেয়ে ফেলতিস্। রাগ করিসনে ভাই! এবার লুচি পেলে, তোর জন্যেও কিছু রাখবো, আমিও কিছু খাবো।

সনাতন। লুচিগুলো পাতে পড়লেই যেন অমনি গো-গ্রাসে খেতে আরম্ভ করিস্‌নে। যতক্ষণ না আমি ইশারা করবো, ততক্ষণ খাবি নে।

শিয়ালমারা। আমি অত ইশারা টিশারা বুঝি না,—লুচি পাতে পড়লে, খানিক চুপ করে থেকেই, আমি খেতে আরম্ভ করবো।

সনাতন। এ সব কাজে তুই বড় কাঁচা দেখচি। আমার দুঃখ এই, তুই এখনো পাকা হতে পাল্লিনে। বিশেষরূপ শিক্ষা না হইলে, এ সব ব্যবসা চলে না। লাঠিখেলা সোজা,—ডাকাতি করা সোজা,—সিঁদ দেওয়া সোজা,—চুরি করা সোজা,—কিন্তু এরূপ ব্যবসা বড় শক্ত! আমাদের ব্যবসা মানুষ ভোলা-নো।—সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ব্যবসা। ব্যবসা যেমন কঠিন, সুখ তেমনি অনেক! অনেক রকম কসরত শিখতে হয়!

শিয়ালমারা। আমি ত ডাকাতি করিয়া চিরকালই কাটাইয়াছি,—এ সব কাজ ত ভাল জানি না;—কাজেই বাধ-বাধ ঠেকে ও হাসি আসে। হাঁরে সনা! তুই এত পাকা হলি কিসে? হাঁরে! তোর গুরু কে? তোর লাঠিখেলা শিখাইবার গুরু ত রঘুদয়াল,—কিন্তু এই তোর বুজরুকি শিখাইবার গুরু কে?

সনাতন। আমি ইতিপূর্ব্বে একদল সন্ন্যাসীর সঙ্গে কিছুদিন বেড়াইয়াছিলাম। তাদের উপর লোকের আদর অভ্যর্থনা ও যত্ন দেখিয়া আমারও সন্ন্যাসী হইতে ইচ্ছা গেল। দেখলাম, প্রায়

সকল বেটা সন্ন্যাসীরই বুজরুক্,—এমন কুকাজ নাই যে, তাহারা গোপনে করে না। আর মানুষ দেখিলেই দেবতা সাজে,—দণ্ডী সাজে,—পরমহংস সাজে,—মহান্ত সাজে।—কেহ বলে যে, 'আমি মৌনী; কেহ বলে যে, আমি কেবল বায়ু ভক্ষণ করিয়াই থাকি; 'আমি একপোয়া দুধ খাইয়া জীবনধারণ করি; কেহ বলে, 'পাতা খাই"; কেহ বলে, 'লতা খাই'; কেহ বলে, আমি যা পাই, তা 'খাই।'—কেহ মন্ত্র পড়িতে পড়িতে মূর্চ্ছা যায়; কেহ বুকের উপর আগুণ জ্বালিয়া কুল-কাঠের হোম করে—

শিয়ালমারা। (কথায় বাধা দিয়া) রোস্ ভাই! একবার—একটা প্রশ্ন করে নেই। বুকের উপর আগুন-জ্বালাটা কি রকম?

সনাতন (হাসিয়া) তুই শালা তাও জানিস্ না। এক রকম তেল আছে,—হয় ত কোন গাছের আটা হইবে;—সেই তেল সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া, চিৎপাত হইয়া শুইয়া, বুকের উপর আগুন জ্বালিয়া, হোম করিতে হয়। সেই তেল গায়ে মাখিলে, আগুনের উত্তাপ আর গায় তত লাগে না।—একেবারে যে লাগে না, তা নয়, বেশী উত্তাপ লাগে না।

শিয়ালমারা। আমি যদি দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা বুকে কুল কাঠের আগুন জেলে হোম করি, তা হ'লেও কি, (বুকে সেই তেলটুকু মেখেছি ব'লে) আমার গায়ে ফোসকা হবে না,—কি গা-জ্বালা করবে না?

সনাতন। দূর পাগল! চব্বিশ ঘণ্টা কি, বুকের উপর কেউ আগুন জেলে হোম করে? ও সব কল আছে, কৌশল আছে, কসরত আছে।

শিয়ালমারা। সে কি রকম ভাই?

সনাতন। তোকে তত কথা এখন কেমন করে বুঝিয়ে বলবো? বাসায় ফিরে যেয়ে, তোকে একথাও বল্‌বো এবং আরও অনেকরূপ শিক্ষা দেবো। এ ব্যবসা বড় উত্তম ব্যবসা। সংসারে এর চেয়ে ভাল ব্যবসা আর নাই। দেবতা লইয়া ব্যবসা করিতে পারিলে, অল্প দিনে বড় মানুষ হওয়া যায়। আর আমি ত তোকে সাক্ষাৎ দেবতা সাজবো মনে ক'রেছি। তুই যদি ভাল ক'রে দেবতা সাজ্‌তে পারিস্, আর আমি যদি তোর চেলাগিরি কর্‌তে পারি, তা হ'লে ত এক বছরেই রাজা হতে পারি। রাজা বলি কেন, দেবতা যে রাজা অপেক্ষা অনেক বড়,—ভগবান্ হ'তে পারি! আহারের কোন কষ্ট থাক্‌বে না; এদেশের যত ভাল ভাল সামগ্রী উদরস্থ হবে; আর যত সুন্দরী স্ত্রীলোক আমাদের সেবা কর্‌বে; সে কথা আর কি বলবো তোকে;—তখন যা হ'বে, তুই দেখ্‌তে পাবি আর বলবি —'সনাতন দাস আচ্ছা ব্যবসা বার ক'রেছিল বটে!"

শিয়ালমারা। (সবিস্ময়ে) বটে, বটে! এ পথ যে এমন সুন্দর পথ, তা আমি জান্‌তুম, না। আমি ভাবতুম, ধর্ম্মের পথ বড়ই কষ্টদায়ক—বড়ই নীরস, কঠোর।

সনাতন। এমন সরল, সুখকর পথ সংসারে আর নাই। এখন পয়সা খরচ করিয়া, দিন-রাত ঘুরিয়া ফিরিয়া, একটী গৃহস্থ-মেয়েকে হস্তগত করিতে পারিতেছ না,—তখন গণ্ডায় গণ্ডায় সুন্দরী ষোড়শী, সপ্তদশী, পঞ্চদশী, একাদশী, দ্বাদশী, ত্রয়োদশী,—যাহা চাহিবে, তাহাই—তোমাকে সদা বেষ্টন করিয়া থাকিবে। তুমি যে, রাবড়ি ভালবাসো, তাহা আমি জানি। এখন এক পোয়া রাবড়ীর জন্য তুমি কতই বিব্রত হও,—তখন রাবড়ীর সরোবর তোমার সম্মুখে খোদিত হইবে। সেই সরোবরে তুমি ঝাঁপ দাও

সাঁতার কাটো ;—ডুবিয়া থাকো,—যা ইচ্ছা তাই করো,—সুন্দরী-গণের সহিত ঝাঁপ দিতে পারো,—সাঁতার কাটিতে পারো,—ডুবিতে পারো,—যা ইচ্ছা তাই করো,—কিছুরই অপ্রতুল থাকিবে না। তুমি ছাগ-মাংস ভাল বাসো নয় ? তোমাকে কত বুঝাইব ?—ছাগমাংস, কেন,—তুমি যদি সিংহ মাংস ভালবাসিতে, তাহা হইলে, সেই সিংহ-মাংসও তখন অক্লেশে জুটীয়া যাইত। ব্যবসা ভাল করিয়া চালাইতে পারিলে, এ ব্যবসায়ে দুপুর রাত্রে বাঘিনীর দুধও মিলে !

শিয়ালমারা। (সবিস্ময়ে) বলিস্ কিরে ভাই ! তাইত।—আমি এ ব্যবসা চালাইতে পারিব ত ?

সনাতন। পার্‌বি বৈ কি ! পার্‌বি ব'লেই ত শিষ্য ক'রেছি। বাঙ্গলা দেশ জয় ক'রে, আমরা এখন তিন মাসের পথ কাশীতে এসেছি। বাঙ্গলা দেশ জয় ক'রেছিলাম—লাঠীতে ও ডাকাতিতে, আর কাশী জয় কর্‌ব—সাধুসেজে ও দেবতা সেজে।

শিয়ালমারা। আচ্ছা, তুই যে সেই সন্ন্যাসীর দলে ঢুকে-ছিলি,—তার পরে কি হ'লো ?

সনাতন। সেই সন্ন্যাসীর-দল,—লোক দেখিলেই ত সাধুর ভাণ করিত !—কেহ ফুঁ দিয়া মুখ হইতে আগুন বাহির করিত ; কেহ একমুঠা ধূলা লইয়া, তাহা হইতে শিবলিঙ্গ বাহির করিত,—লোকে অবাক্ হইত। কত বড় বড় লোক ভক্তি-ভাবে তাহাদিগকে পূজা করিত, প্রণাম করিত, আহার দিত, টাকা দিত।—এইত গেল সদরের ব্যপার। অন্দরের ব্যাপার ছিল—অতি ভয়ানক। এমন কুকর্ম্ম পৃথিবীতে নাই যে, তাহারা লুকাইয়া-লুকাইয়া করিত না।

শিয়ালমারা। সে কি রকম কুকাজ ভাই ? আমরা তজানি,

আমরাই মন্দ—কুকর্ম্ম করিয়া থাকি!—সে কি রকম কুকর্ম্ম,—শীঘ্র বলো ভাই!

সনাতন। ব্যস্ত হইও না,—চুপ্ চুপ্। ঠিক হইয়া ব'সো,—ঐ হালুইকর লুচি লইয়া আসিতেছে। ভালো করিয়া কাপড় গায়ে দাও,—হরিনামের ঝুলিটী ঠিক রাখো। দেখিস্, এবার যেন ফাঁকি দিস্ না—বায়ো আনা লুচি হরিনামের ঝুলিতে পূরিতে হইবে।

শিয়ালমারা পূর্ব্ববৎ আসনে সমাসীন হইলেন। সনাতন দাস ফুল লইয়া, স্তিমিত নেত্রে শিয়ালমারার সম্মুখে বসিয়া ধ্যান-মগ্ন যোগীর ন্যায় একান্ত মনে যেন অভীষ্ট দেবতার পূজা করিতে লাগিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সনাতন কহিলেন, "হালুইকর! প্রভুর পাতে লুচি দিয়াই তুমি এখান হইতে সরিয়া পড়। অদূরে গিয়া ঊর্দ্ধবাহু হইয়া চক্ষু বুজিয়া, দক্ষিণমুখে দণ্ডায়মান থাকো; আর পূর্ব্ববৎ, মুখে "বাবা বিশ্বনাথ—বিশ্বনাথ করো।"

দক্ষিণ-মুখে দাঁড়াইতে বলিবার উদ্দেশ্য এই, হালুইকর শিয়াল-মারার ভোজন-ব্যাপার আর দেখিতে পাইবে না। দক্ষিণ দিকে মুখ করিলে, শিয়ালমারার দিকে পিঠ করা হয়। আদেশানুসারে, ভক্ত হালুইকর তদবস্থাতেই দাঁড়াইয়া রহিল।

এদিকে সনাতনের মহাপূজা আরম্ভ হইল। তিনি এক একবার এক একটী ফুল শিয়ালমারার গায়ে ফেলেন, আর আধা-

সংস্কৃত আধা-বাঙ্গালা ভাষায়, খাম্বাজ রাগিণীতে, এক উদ্ভট মন্ত্র উচ্চারণ করেন,—আর সুমুখ পানে হালুইকরকে এক একবার তাকাইয়া দেখেন এবং তন্মুহূর্ত্তে সেই গব্য-ঘৃতে পাক করা এক একখানি সরস লুচি, শিয়ালমারার পাত হইতে লইয়া, আপনার উদর-গহ্বরে ফেলিয়া দেন। পূজার কার্য্য এইরূপ দুই চারি মিনিট চলিতে-না-চলিতে, লুচির প্রায় বারো আনা শেষ হইয়া আসিল। অথচ হরি-নামের ঝুলির ভিতর পাঁচ সাত খানির বেশী লুচি পড়িল না দেখিয়া, সনাতন তখন সজোরে স্তব আরম্ভ করিল ;—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেসু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা
ফেলহ ঝুলির মধ্যে চক্রাকারাং সর্ব্বথা ॥
স্তূপীকুরু স্তূপীকুরু ক্ষুধাব্যাধিনা পীড়িতঃ।
গোলাকারং চক্রোকারং তং বস্তু অপার্থিবম্ ॥
গৃহে গত্বা কিং খাবে তুমি যদি সঞ্চয় না কুরু।
অহো মূর্খস্ত্বং মূর্খস্ত্বং অহং কিং করবাণি তু ॥"

সনাতন দাস এবার ঠকিল। স্তব পাঠ করিয়া, ইঙ্গিতে-ইশারায়, যখন সে আপন মনোভাব ব্যক্ত করিতেছে, তখন শিয়াল-মারা অবশিষ্ট লুচিগুলি আপন উদরসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে। সনাতন হালুইকরকে ডাকিল,—"ঠাকুর! এদিকে এস,—আর লুচি থাকে ত নিয়ে এস, তোমার অদৃষ্ট প্রসন্ন হয়েছে।"

হালুইকর। ভাজা হইলে, আমার পুত্র এখনি লুচি লইয়া আসিবে,—আমি এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া আসিয়াছি ; এবং সেই সঙ্গে মালাইও আসিবে। মালাই একটু পাতলা হইবে। আমি একটু অগ্রগামী হইয়া দেখি,—পুত্র এখন কত দূর।

হালুইকর পুত্রান্বেষণে চলিল। এদিকে সনাতন,—শিয়াল-মারাকে কহিল, "তুই শালা, বড় বেকুব!"

শিয়ালমারা। আমি শালা বেকুব, না তুই শালা বেকুব?

সনাতন। আমি বেকুব কিসে?

শিয়ালমারা। তুমি যেরূপ দুঃসাহসিকের কাজ আরম্ভ করিয়াছিলে, তাহাতে বড় পুণ্যবল ছিল, তাই ধরা পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গিয়াছ!

সনাতন। আমি ধরা পড়িতে গেলাম কেন?

শিয়ালমারা। তুমি যখন আমার পাত হইতে লুচি লইয়া খাইতে আরম্ভ করিলে, তখন আমার প্রাণটা ধুক্ ধুক্ করিতে আরম্ভ করিল। বুঝি এইবার মজিলাম,—হালুইকর যদি একবার পিছন ফিরিয়া চক্ষু চাহিয়া দেখিয়া থাকে, তাহা হইলে ত গিয়াছি।

সনাতন। তাইত বলিতেছিলাম, তুই বেটা নিরেট বোকা! প্রথম কথা হইতেছে, দেখিবার কোন সম্ভাবনা নাই,—পিছন ফিরিবার পূর্ব্বেই আমি ত সাম্‌লাইয়া লইব; কিন্তু যদি হালুইকর দেখিয়া ফেলে, এবং সন্দিহান হইয়া তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ অমনি উত্তর দিব,—"হালুইকর হে! তোমার অদৃষ্ট প্রসন্ন হইয়াছে। দেবতা ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া আজ চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন;—তাই দেখিতেছ না, দুইটি হাত লুচির সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে।"

শিয়ালমারা। আমার দুইটী দক্ষিণ হাত না হয় লুচির সহিত সংযুক্ত রহিল;—দু'হাত দিয়াই আমি খাইতেছি; কিন্তু হালুই-কর যদি জিজ্ঞাসে,—"দুইটী দক্ষিণ-হস্তের মধ্যে একটী দক্ষিণ-

হস্ত সনাতন দাসের মুখে উঠে কেন?—একি ব্যাপার?"—তখন তুমি ভাই, কি বলিবে বলো দেখি?

সনাতন। তো বেটার মত বিষম বোকা এ সংসারে আর নাই! তখন বলিব,—"বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্,—ভক্তের দাস ভগবান্, এই অধম ভক্তকে,—এই ক্ষুধার্ত্ত ভক্তকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক এক হাতে লুচি লইয়া আপন মুখে দিতেছেন, আর অন্য হাতে লুচি লইয়া এই অধম ভক্তের মুখে দিতেছেন।"

শিয়ালমারা। (সবিস্ময়ে) ভাই সনাতন! তুমি এত কথা কোথা হইতে শিখিলে,—আমায় বলো।—আমার বড় কৌতূহল জন্মিতেছে।

সনাতন। শিখিয়াছি, সেই সন্ন্যাসিদল হইতেই,—আর শিখিতেছি, নিজে আক্কেল করিয়া,—সূক্ষ্ম বুদ্ধি খাটাইয়া। গুরুগণ-মুখ হইতে সূত্র অভ্যাস করিয়াছিলাম, আর নিজে ভাবিয়া ভাবিয়া ভাষ্য-টীকা করিতেছি;—কাজেই বিদ্যা চূড়ান্ত হইয়া উঠিতেছে! তোমারও বুদ্ধি-শুদ্ধি আছে—তুমিও শীঘ্র শিখিতে পারিবে।

শিয়ালমারা। শিখিতে পারিলেও তোমার মত অত উচ্চে উঠিতে ভাই! কখন পারিব না।—উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া বড় কঠিন,—ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে তাহা কখন হইবার নহে।

উভয়ের এইরূপ সদালাপ চলিতেছে, এমন সময় অদূরে দৃষ্ট হইল, হালুইকর পুত্রসহ লুচি ও মালাই লইয়া আসিতেছে!

সনাতন। আর নয়,—নীরব হও,—পূর্ব্ববৎ উপবেশন করো। মুদ্রনেত্র হইয়া থাকো। এক মিনতি এই,—গতবারের মত,

পাতে লুচি দিলেই, যেন খাইতে আরম্ভ করিও না,—একটু ধৈর্য্য ধরিও। ধৈর্য্য ধরিতে শিক্ষা না করিলে, এ পথে মুক্তি নাই।

শিয়ালমারা। আচ্ছা, তাহাই করিব।

সনাতন। তবে এক কর্ম্ম করো,—হরিনামের ঝুলি হইতে লইয়া, শীঘ্র আটখানি লুচি পাতে রাখো,—শীঘ্র রাখো,—ঐ যে হালুইকর আসিয়া পড়িল। এ সব পথের পথিক হইতে হইলে, শীঘ্রহস্ত হওয়া চাই। বাজীকরের ন্যায় কৌশলী হওয়া চাই।

শিয়ালমারা। দাঁড়াও ভাই! দাঁড়াও; একদিনে কি আর এত শেখা যায়?

ঝুলি-মধ্যবর্ত্তী আটখানি লুচি লইয়া, তৎক্ষণাৎ শিয়ালমারা আপন পাতে রাখিল। পুত্রসহ হালুইকর এক ধামা লুচি লইয়া ও বড় এক পাথরবাটী-পূর্ণ মালাই লইয়া, নিকটে আসিয়া পৌঁছিল। শিয়ালমারা-সনাতন উভয়েই পূর্ব্ববৎ সুকৌশলে লুচি এবং মালাই খাইল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

হালুইকর পয়সা লয় নাই। লুচির দাম লইতে হইবে বলিয়া সনাতন, হালুইকরকে অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়াছিল, কিন্তু হালুইকর কেবল জিহ্বা কাটিয়া বলিয়াছিল,—বাপ্‌রে! উনি সাক্ষাৎ দেবতা; উঁহার কাছ হইতে কি পয়সা লইতে পারি? সেই দিন হইতে হালুইকর, শিয়ালমারা-রূপ দেবতার,—প্রধান এবং প্রথম শিষ্য হইল। শিয়ালমারা ভোজনকালে হরিনামের ঝুলির

ভিতর যে সকল লুচি লুকাইয়া রাখিয়াছিল, তাহার অধিকাংশই, গঙ্গার ধারে নির্জ্জনে বসিয়া, সনাতন দাস উদরস্থ করিল। তখন হৃষ্ট-পুষ্ট-বলিষ্ঠ দুই ভক্ত হরিনাম গান গাহিতে গাহিতে কাশী-বাসীর গৃহাভিমুখে চলিল।

তখন বেলা আর নাই। সূর্য্যদেব পাটে বসিয়াছেন। কাশী-বাসী ঐ দুইটী ভক্ত বাবাজীর আগমনপ্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। সকলকে বলিতেছেন,—"আমি ঐ দুইটী পরম বৈষ্ণবের প্রসাদ ভিন্ন আর কিছু ভক্ষণ করিব না। উহাঁরা মানুষ নন,—দেবতা। যেন কৃষ্ণ-বলরাম ভূতলে অবতীর্ণ। উহাদের কণামাত্র প্রসাদ-সুধার গুণে, আমার এ ভব-ক্ষুধা অচিরেই দূর হইবে।

পথে আসিতে আসিতে সনাতন দাস, শিয়ালমারাকে কহি-তেছে, "দেখ ভাই! চুরী ডাকাতী করিয়া আর সুখ নাই। এ ব্যবসায়ে বিপদ্ অনেক, অথচ লাভ কম। আমি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, দেখিয়া শুনিয়া স্থির করিয়াছি, ধর্ম্মের ব্যবসার তুল্য উৎ-কৃষ্ট ব্যবসা এ সংসারে আর কিছুই নাই। ইহাতে ক্ষীরোদ-সাগরের ক্ষীর পাওয়া যায়, নন্দনকাননের পারিজাত পাওয়া যায়, কুবেরের ধন-ভাণ্ডার লাভ করা যায়,—অধিক কি, পৃথিবীর মধ্যে যাহা সারা এবং সুন্দরী, অনায়াসে তৎসমস্তই পাওয়া যায়।

শিয়ালমারা। আচ্ছা ভাই! তোমার কথাই মানিয়া লই-লাম। এ কথা বড় মন্দ নয় বলিয়া বোধ হইতেছে। নমুনা যাহা দেখিলাম, তাহা আশাপ্রদ বটে। পৃথিবীর লোক যে এত বোকা, তাহা পূর্ব্বে আমি জানিতাম না।

সনাতন। আজ যেমন হালুইকরের নিকট তোমাকে দেবতা করিয়া তোমার চেলা হইয়াছিলাম, সেইরূপ বরাবরই তোমাকে

দেবতা করিব এবং বরাবরই তোমার চেলা থাকিব। দেবতা সাজা সহজ, চেলা সাজা কঠিন। তুমি এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ বলিয়া তোমায় দেবতা সাজাইয়াছি এবং আমি অভিজ্ঞ বলিয়াই চেলা সাজিয়াছি! দেবতাকে বেশী কথা কহিতে হয় না,—যাহা কিছু ঘটকালি, সমস্তই শিষ্যকে করিতে হয়।

শিয়ালমারা। উপস্থিত কাশীবাসীর গৃহে গিয়া কি করিতে হইবে, ঠিক্ করিয়া চল। শেষে যেন অপ্রস্তুত হইতে না হয়।

সনাতন। কাশীবাসী সাক্ষাৎ জীবন্ত কলি। এমন দুষ্কর্ম্ম নাই, যাহা ঐ ব্যক্তি করে নাই। আজ কাল বয়স হইয়াছে, বোধ হয়, মরণের ভয় হইয়া থাকিবে; সেই জন্য কাশীতে সদাই ভাল ভাল সন্ন্যাসী খুঁজিয়া বেড়ায়। সন্ন্যাসীদের নিকট হইতে মন্ত্র লইবে, ঔষধ লইবে,—ইহাই উহার একান্ত চেষ্টা। চিরদিন দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে, এখন মরণ নিকট জানিয়া, সহজে মুক্তি পাইবার আশায়, কাশীমৃত্যু কামনা করিয়া সে, কাশীবাস করিতেছে। কাশীতে আসিয়া বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণার বাটীতে দুবেলা যাওয়াও আছে, হরিনামও আছে, বম্ বম্ হর হরও আছে,—আর ওদিকে জাল তমঃসুক করা আছে, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া আছে, আর পরস্ত্রী-গমন গুণ ত আছেই। প্রথম প্রথম কাশীতে আসিয়া, বড়জোর এক সপ্তাহ কাল বেশ ভাল ছিল, কিন্তু কেমন যে মজ্জাগত স্বভাব-দোষ, কিছুতেই থাকিতে পারিল না। যেখানে মোকদ্দমার কথা হয়, সেইখানেই কাশীবাসী যাইয়া এক পক্ষ অবলম্বন করে; তার পর ক্রমশঃই সাক্ষ্য দেওয়া আরম্ভ হইল; জাল-জালিয়াতি আরম্ভ হইল। ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিবার, মনে মনে একটুকু আধটুকু ইচ্ছা থাকিলেও, লোকটা হঠাৎ কেমন পাপের প্রলোভনে পড়িয়া যায়।

যে, সে সময় তাহার আর জ্ঞান থাকে না। এদিকে কিন্তু সাধু-সন্ন্যাসী দেখিলে, কাশীবাসীর ভক্তি বাড়িয়া উঠে। ভক্তি বৃদ্ধির কারণ বোধ হয় এইরূপ ;—সাধুগণ দৈবশক্তি-সম্পন্ন। তাঁহারা অঘটন ঘটাইতে সক্ষম। তাঁহারা অলৌকিকত্বের এবং অপূর্ব্বত্বের আধার। তিন মাসের পথ তাঁহারা তিন মিনিটে যাইতে পারেন। তাঁহাদের ইচ্ছায় নিদারুণ গ্রীষ্মে আকাশে নবঘন দেখা দেয়, আর বারিবর্ষণ করে। মৃতপ্রায় রোগীকে মন্ত্রপূত ছাই খাওয়াইয়া তাঁহারা জীবিত করেন। একমুঠা পথের ধূলা লইয়া তাঁহারা একমুঠা খাঁটি সোণা করিতে সক্ষম। তাঁহাদের একটী গণ্ডূষে সাগর শুকাইয়া যায়। তাঁহাদের এক ফুৎকারে দাবানল নিবিয়া যায়। তাঁহাদের নিশ্বাস-বায়ুতে পর্ব্বত উড়িয়া যায়। তাঁহারা ইচ্ছাময়। ইচ্ছায়—কখন নবযৌবন সম্পন্ন, দিব্য বেশ-ভূষায় ভূষিত, পরিজাতমালা-পরিহিত মণিরত্ন-মণ্ডিত—রাজপুত্র হন ;—ইচ্ছায়—কখন জটা-বল্কলধারী, ভস্মবিলেপনকারী নবীন সন্ন্যাসী হন। ইচ্ছায়—কখন মত্ত মধুকর হইয়া অপ্সরা-সেবিত মধুবনে গুন্ গুন্ স্বরে গান করেন। ইচ্ছায়—কখন স্বর্গলোকে গমন করিয়া, দেবনর্ত্তকীগণের সহিত হাস্য-পরিহাস করেন। অধিকন্তু, এই সকল সাধু-সন্ন্যাসীর নিকট এক এক খানি পরেশ-পাথর থাকে। বোধ হয়, উপরোক্ত ঐ সকল গুণে গুণবান্ হইবার জন্য ঐ সকল মন্ত্রতন্ত্র শিখিবার জন্য, কাশীবাসী, সন্ন্যাসী দেখিলেই প্রণাম করেন এবং ভক্তি-গদ্গদ-চিত্তে তাঁহাদের পায়ের ধূলা মাথায় দেন। ভাই শিয়ালমারা! আমার ধারণা এই,—কাশীবাসী আমাদিগকে নিশ্চয়ই পরম তত্ত্বজ্ঞ সাধু ভাবিয়াছে, অথবা ঈশ্বরের অবতারস্বরূপ স্থির করিয়াছে। নহিলে আমাদের প্রতি

উহার এত ভক্তি যত্ন হইবে কেন? কাশীবাসী ধনবান্। উহাকে আমাদের শিষ্য করিতে পারিলে, ভবিষ্যতে এবং বর্ত্তমানে অনেক কাজ হইবে। উহার গৃহে পৌঁছিয়া তুমি উহার সহিত অধিক কথাবার্ত্তা কহিও না। যা কিছু কথা কহিতে হয়, আমি কহিব।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

সনাতন এবং শিয়ালমারা, কাশীবাসীর গৃহে পৌঁছিবামাত্র কাশীবাসী অমনি যোড়হাতে গলায় কাপড় দিয়া কহিলেন,—"আসুন আসুন! আস্‌তে আজ্ঞা হউক। অপরাহ্ন অতীত হইয়াছে, সন্ধ্যা হয়-হয়, আপনারা সমস্ত দিন অনাহারে আছেন,—এখনও সেবা হয় নাই, আপনাদের কতই না কষ্ট হইতেছে আহা! আহা! মরি মরি! চাঁদবদন শুকাইয়াছে।"

শিয়ালমারা মৌনী হইল, কোন কথা কহিল না। সনাতন দাস কহিল,—"হরিবোল হরি!—একবার হরি হরি বল—একবার হরি হরি বল—হরি রক্ষা কর! (একটু হাসিয়া) আপনি আমাদিগকে আহার করিবার কথা বলিতেছেন কি? হায়! হায়! পার্থিব অন্নের আহারে আমাদের আর ক্ষুধা-নিবৃত্তি হয় না। হরিনাম-সুধা-পান ব্যতীত এ প্রাণের ক্ষুধা, এ প্রাণের পিপাসা কিছুতেই মিটে না।"

কাশীবাসী। (যোড়হাতে) প্রভু যা ব'ল্‌চেন, তাই ঠিক। তবে কিনা আপনাদের সেবা করিতে না পারিলে, আমাদের মন কাঁদে; তাই বল্‌চি, হবিষ্য-রন্ধনের সমস্তই যোগাড় করিয়া রাখি-

রাছি ; এ অধীনের গৃহে স্বপাক করিয়া, এ অধীনকে কৃতার্থ করুন। আর শেষে এ অধীন আপনাদের প্রসাদ পাইয়া যাহাতে এ দগ্ধ প্রাণে শান্তি লাভ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করুন। আমি আপনাদের প্রসাদ-সুধা পান করিব বলিয়া, এ পর্য্যন্ত জল-গ্রহণ করি নাই। আপনারা সেই যে, বেলা দুই প্রহরের পর গঙ্গাস্নান করিতে গেলেন, আমি সেই পর্য্যন্ত পথপানে চাহিয়া আছি। আপনাদের আহারের সমস্ত উদ্যোগ করিয়া রাখিয়াছি।

সনাতন। বটে বটে—আমাদের আসিতে একটু বিলম্ব হইয়াছে বটে। গঙ্গাস্নানের পর ধ্যানে বসিয়াছিলাম, সে ধ্যান কিছুতেই আর ভাঙ্গে নাই। বহুক্ষণ পরে হঠাৎ চক্ষু খুলিয়া দেখি, সন্ধ্যা হয়-হয় হইয়াছে। বৈকুণ্ঠবাসী শ্রীহরির প্রেমময় মূর্ত্তি দেখিলে, কিছুই আর মনে থাকে না। তাই ধ্যানভঙ্গে এত বিলম্ব ঘটিয়াছিল। আমার যদি ধ্যান ভাঙ্গিল, (শিখিমাহাতীকে উদ্দেশ করিয়া) এই মহাপ্রভুর ধ্যান আর কিছুতেই ভাঙ্গে না দেখিলাম, ধ্যানে ইনি প্রস্তরবৎ অচল হইয়া গিয়াছেন। নাকের নিকট হাত লইয়া গিয়া দেখিলাম, নিঃশ্বাসও পড়ে না। বুঝিলাম, ইঁহার দেহে তখন আর প্রাণ নাই, দেহ শীতল হইয়াছে। ইহার আত্মা সেই পরমব্রহ্ম হরিতে গিয়া মিশিয়াছে। তখন আর উপায়ান্তর না দেখিয়, মহাপ্রভুর চক্ষে মুখে গঙ্গাজল সেচন করিতে লাগিলাম এবং দক্ষিণ-কর্ণে হরিধ্বনি দিতে লাগিলাম ; তখন দেখিলাম, ধীরে ধীরে অঙ্গে অঙ্গে মহাপ্রভুর দেহ গরম হইয়া আসিতেছে। ক্রমশঃ আরও উচ্চরবে—"হরিবোল হরিবোল!" করিতে আরম্ভ করিলাম। গা বেশ গরম হইয়া উঠিল, দেহে প্রাণ আসিল ; মহাপ্রভু তখন যেন একটু দুলিয়া উঠিলেন। আস্তে আস্তে চক্ষু মেলিয়া ঢুলু-ঢুলু

নেত্রে বলিলেন,—'আমি কোথায়—হায়! আমি কোথায়? আমার শ্রীকৃষ্ণ কৈ? আমার শ্রীরাধিকা কৈ? আমার যুগল-মূর্ত্তি কৈ?' এইরূপ বলিতে লাগিলেন, আর মাহাপ্রভু কাঁদিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া লইয়া আসিলাম। কিন্তু সেই অবধি মহাপ্রভু কেমন কতকটা মৌনী হইয়া রহিলেন। এই সকল নানা কারণেই আপনার গৃহে ফিরিয়া আসিতে, আমাদের বিলম্ব ঘটিয়াছে।"

কাশীবাসী। আহা! নামের কি অপূর্ব্ব মহিমা! হরিনামের গুণে সমস্তই সম্ভব। আপনারা মহাযোগী, ভগবানের সাক্ষাৎ-কার লাভ করেন, আমি আপনাদের শ্রীচরণের রেণুর রেণু হইবার উপযুক্ত নই। আপনাদের প্রত্যাগমনে বিলম্ব হউক, তাহাতে ক্ষতি কি আছে! আপনাদের শুভাগমনে,—পায়ের ধূলায়—আমার গৃহ আজ পবিত্র হইল, মন পবিত্র হইল। আপনারা যে দয়া করিয়া এ দাসের গৃহে আসিয়াছেন, ইহাই যথেষ্ট; আমি আর কিছুই চাই না। এক্ষণে কৃপা করিয়া হবিষ্য-রন্ধনের উদ্‌যোগ এবং আমার জন্ম সফল করুন।

সনাতন। (হাসিয়া) আচ্ছা, তবে তাহাই হউক। আমরা ভক্তমনোবাঞ্ছা সতত পূর্ণ করিয়া থাকি।

কাশীবাসী ধনাঢ্য ব্যক্তি। হবিষ্যান্নের বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন। অতি উৎকৃষ্ট পেশোয়ারী আতপ-তণ্ডুল। অতি উৎকৃষ্ট গব্য ঘৃত। ঘৃতের সৌরভে দিক্ আমোদিত। তরী-তর-কারীফল-মূল প্রচুরপরিমাণ। দুগ্ধ, দধি, ক্ষীর, রাবড়ি, মালাই,—প্রচুর পরিমাণ। পেড়া বরফী, মেঠাই, প্রচুর পরিমাণ। উদ্‌যোগের ত্রুটিও ছিল না, অভাবও কিছু ছিল না। সেই মহা-আয়োজন

দেখিয়া, সনাতন দাস মনে মনে কহিল, "হায় রে! কেবল লুচি খাইয়াই আজ পেট ভরাইলাম! এত মিষ্টান্ন এত সন্দেশ-মিঠাই, এত ক্ষীর- দই, সমস্তই বৃথা গেল। যা হোক, আজ একটা কায়দা এবং কসরৎ দেখাইতে হইবে।"

সনাতন দাস "হরিবোল" "হরিবোল" শব্দ অনবরত করিতে করিতে রন্ধন আরম্ভ করিল। তরকারী কিছু স্বতন্ত্র রাঁধিল না। যাহা কিছু ছিল, সমস্তই ভাতে দিল। বলিল, "আমরা এক পাকে যাহা হয় তাহাই খাই,—দুই তিন বার হাঁড়ি চড়াই না।" সুতরাং শীঘ্রই রন্ধন-কার্য্য শেষ হইল। উপযুক্ত পাত্রে অন্নাদি রাখিয়া কহিল, "এইবার শ্রীহরিকে নিবেদন করিতে হইবে।" তখন কাণে কাণে কাশীবাসীকে, সনাতনদাস অতি গোপনে কহিল, "ইনিই (শিয়ালমারা) স্বয়ংশ্রীহরি বা শ্রীহরির অংশস্বরূপ। ইহাঁকে কেহ এখনও চিনিতে পারেন নাই বা এখনও ইনি নিজ মূর্ত্তিতে প্রকট হন নাই। ইহাঁকেই অন্নাদি নিবেদন করিলে শ্রীহরিকে নিবেদন করা হইবে। ইহাঁর শক্তি এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে, ইনি 'সোঽহং'। তবে ইনি আত্মশক্তি এবং নিজ মাহাত্ম্য গোপন করিয়া থাকেন। যখন আমরা মথুরায় বাস করিয়াছিলাম, তখন একদিন গভীর নিশিতে যমুনার তীরে ইনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, বদনে বংশী দিয়া রাধা রাধা বলিয়া ডাকিয়াছিলেন;— ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলাম। কিন্তু যখন তিনি টের পাইলেন যে, আমি আসিয়াছি, তখন তিনি সে মূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া অমনি মানুষ হইয়া পড়িলেন। ইনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী পুরুষ। ইচ্ছা করিলে ইনি বোলতা হইয়া ভোঁ করিয়া উড়িয়া যাইতে পারেন,— ইহাও আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। কিন্তু ইহাঁকে মনে মনে দেবতা

জানিলেও, যদি মানুষ ভাবিয়া ইহাঁর সহিত ব্যবহার না করেন, তাহা হইলে ইনি কখনই থাকিবেন না। ইনি যদি জানিতে পারেন যে, আপনি ইহাঁকে দেবতা বলিয়া ঠাওরাইয়াছেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ ইনি পলাইয়া নিরুদ্দেশ হইবেন,—অতএব সাবধান।"

কাশীবাসী এই গূঢ় গোপনীয় কথা, কাণে কাণে শ্রবণ করিয়া আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না,—সনাতন দাসের পদপ্রান্তে তিনি ধড়াস করিয়া পড়িয়া গেলেন এবং ভক্তিগদ্গদচিত্তে তাঁহার চরণ দুইটা ছাঁদিয়া ধরিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতে লাগিলেন,—"হায়! আমার আজ কি শুভাদৃষ্ট! না জানি পূর্ব্বজন্মে কত পুণ্যই করিয়া ছিলাম, তাই বুঝি আজ স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবান্, দেহ ধারণ করিয়া, আমার গৃহে অধিষ্ঠিত হইলেন! ধন্য আমি!—ধন্য আমার জীবন!"

সনাতন। চুপ চুপ! একথা কহিও না; মহাপ্রভু একথা শুনিলেই এখনই নিরুদ্দেশ হইয়া চলিয়া যাইবেন।

কাশীবাসী প্রকৃতিস্থ হইলেন। দেবতাকে যেমন ভোগ নিবেদন করে, সনাতন দাস শিয়ালমারাকে সেইরূপ ভোগ নিবেদন করিলেন। কত মন্ত্রতন্ত্র বলিলেন, শাঁক-ঘণ্টা বাজাইলেন। এইরূপ অর্দ্ধঘণ্টা অতিবাহিত হইলে, শিয়ালমারা তখন পাত্র হইতে প্রথমে একটী ভাত লইয়া মুখে দিলেন, তার পর আবার নীরব হইয়া গেলেন। সনাতন দাসের শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁসর আবার বাজিল। এই-রূপ দশমিনিট অতীত হইল,—শিয়ালমারা আবার দুইটী ভাত লইয়া মুখে দিলেন। তখন সনাতন দাস আনন্দে "হরিবোল" "হরিবোল" বলিয়া উঠিলেন। কাশীবাসীকে বলিলেন,—"ঠিক

হইয়াছে, ঠিক হইয়াছে। আসুন, এইবার আমরা প্রসাদ ভক্ষণ করি।” কাশীবাসীর সমস্ত দিন আহার হয় নাই। বিশেষতঃ প্রসাদে তাঁহার অচলা ভক্তি। এদিকে সনাতন দাসও বলিয়া দিয়াছেন, প্রসাদ ফেলিতে নাই, সাধ্যমত খাইতে হয়,—তবে অসাধ্য হইলে স্বতন্ত্র কথা। কাশীবাসী উদরপূর্ণ করিয়া প্রায় দেড়পোয়া পেশওয়ারি চাউলের অন্ন ভক্ষণ করিলেন।

ক্ষীর-মিষ্টান্নাদিও তদনুযায়ী তাঁহার উদর-গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইল। সনাতন দাস পাত্রপরিপূর্ণ অন্ন এবং যথেষ্ট মিষ্টান্নাদিও আহারার্থ লইয়াছিলেন বটে, কিন্তু খাইলেন না কিছুই। অর্দ্ধ-মুঠা অপেক্ষাও কম অন্ন তিনি হরি-ধ্যান করিতে করিতে ভক্ষণ করিলেন, এবং একটী খড়িকা চাহিয়া লইয়া, তাহার ডগাটী,—ক্ষীরে, দ'য়ে, রাবড়ি প্রভৃতিতে এক একবার ঠেকাইয়া সেই খড়িকা-গ্রভাগ মুখে দিতে লাগিলেন; এইরূপেই তাঁহার আহার কার্য্য শেষ হইল।

কাশীবাসী অবাক্ হইলেন। ভাবিলেন, “এ কি! সমস্ত দিনের পর কি এই আহার,—এত সামান্য আহার! তবে ইনি কিরূপে জীবন ধারণ করিয়া আছেন?” আর ধৈর্য্য ধরিতে না পারিয়া প্রকাশ্যেই সনাতন দাসকে জিজ্ঞাসিলেন,—“দেবতা! এত অল্প আহার করিয়া আপনারা কিরূপে প্রাণধারণ করেন, বলুন দেখি!” সনাতন দাস হো হো হাসিয়া উত্তর দিলেন,—“উহা কিছুই নহে,—উহা কিছুই নহে,—আপনার ওসব কথা শুনিয়া কাজ নাই।”

কাশীবাসীর কৌতূহল আরও বৃদ্ধি পাইল। তিনি অধীর হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, “বলুন, বলুন, আমাকে পর মনে করিবেন না। আহা

কিবা হৃষ্ট-পুষ্ট-বলিষ্ঠ-দেহ, কিবা কমনীয় কান্তি, অথচ আপনার আহার নাই! গূঢ়-রহস্য আছে—গূঢ় রহস্য আছে।"

সনাতন দাস। তবে শুনুন; কিন্তু এ গোপনীয় কথা অন্য কাহাকেও প্রকাশ করিবেন না। আমাদের নানারূপ প্রক্রিয়া আছে, যোগ-অভ্যাস আছে, তন্ত্র-মন্ত্র আছে, সেইজন্যই এত অল্প-আহারে প্রাণধারণ করিতে পারি এবং এই অল্প-আহারেই শক্তি এবং লাবণ্য বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। আমি যত যোগাভ্যাসে পরিপক্ব হইতেছি, ততই আমার আহার কমিতেছে। আমি শীঘ্রই অন্ন-ত্যাগ করিয়া কেবল ফল-মূল ধরিব। তার পর অতি-পক্ক হইলে, পত্র আহার আরম্ভ করিব। আর যে দিন চরম-পক্ক হইব, সে দিন হইতে কেবল বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিব।—হরি হে! দীনবন্ধু শ্রীরাধাবিনোদ! তব দাসানুদাসকে রক্ষা কর। হরি হরি হরি!

সনাতন দাসের এইরূপ কথাবার্ত্তা শুনিয়া, কাশীবাসীর অবাক্‌ত্ব আরও বৃদ্ধি পাইল। তিনি বিস্ময়-বিমুগ্ধ-নেত্রে চারি-দিকে চাহিতে লাগিলেন এবং শেষে সনাতন দাসের পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া, অশ্রু-জল ফেলিতে ফেলিতে, শিয়ালদারার পদপ্রান্তে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

৺কাশীধাম। দশাশ্বমেধ ঘাট। সন্ধ্যা ঈষৎ উত্তীর্ণ হইয়াছে। অল্প-অল্প শীত বেশ আছে। জনতা বিষম। ঘাটের চারিদিক্ আলোকমালায় উদ্ভাসিত। শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিতেছে। নাগরা বাজিতেছে। নৃত্য হইতেছে, গান হইতেছে।—আর, মাঝে মাঝে উচ্চরবে হরিধ্বনি হইতেছে। জনতা-নিবারণের জন্য,—পুলিশ-প্রহরিগণ 'তফাৎ যাও—তফাৎ যাও'—বলিতেছে।

এত সমারোহ কিসের? উহা আর কিছুই নহে,—স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবান্,—মানবদেহ ধারণপূর্ব্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন; এবং সন্ধ্যার পর, পূজক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক তাঁহার আরতি হইতেছে। পাঠক এবং পাঠিকা!—মানবরূপধারী দেবতা যদি দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, আমার সঙ্গে আসুন! দেহে একটু বল চাই;—কেন না, লোকারণ্য ভেদ করিয়া চলিতে হইবে। কোমর বাঁধুন। জীবন্ত দেবদর্শন করিবেন, কিছু প্রণামী লইয়া চলুন; কিছু ফলমূল সংগ্রহ করুন। উঃ! বড় ভিড়!—নিকটে যাওয়া অতীব কষ্টকর।

পূর্ব্বজন্ম-পুণ্যফলে, এবং ইহজন্মের দেহের বলে,—নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলাম, সত্য সত্যই এক মানুষরূপী দেবতা উচ্চ সিংহাসনে উপবিষ্ট। দেবতা মৌনী; মুদ্রিত-নয়ন; যেমন নিঃস্পন্দ। কেহ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া চামর ঢুলাইতেছে; কেহ যোড়হস্তে দণ্ডায়মান আছে; কেহ পদপ্রান্তে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া পড়িয়া আছে। পূজারি ব্রাহ্মণ দক্ষিণ হস্তে পঞ্চ-প্রদীপ, বাম হস্তে ঘণ্টা লইয়া, আরতি করিতেছেন। আর দেখিলাম, শ্রীল শ্রীযুক্ত কাশীবাসী,

দেবতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া যুক্তকর হইয়া, কেবল নয়নজলে ভাসিয়া যাইতেছেন। দেবতার সম্মুখে একখানি থালা আছে।—রূপার থালা, কি গিল্টি করা, কি মুরাদাবাদী কলাই করা, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। থালার উপর ঘন ঘন পয়সা পড়িতেছে; সিকি পড়িতেছে; আধুলি পড়িতেছে; টাকা পড়িতেছে; ঐ যে একটী মোহরও পড়িল দেখিতেছি। বামপার্শ্বে খুব একখানি বৃহৎ থালা রহিয়াছে! তাহার উপর চা'ল পড়িতেছে। কলা পড়িতেছে; সন্দেশ পড়িতেছে এবং বহুতর ফল মূলও পতিত হইতেছে। দেখিলাম, ফল, মূল এবং প্রণামির পয়সা বা টাকা দিবার পর, যুবতী রমণীকুল, মানবরূপী দেবতার উদ্দেশে পুষ্পবর্ষণ মালাবর্ষণ, তোড়াবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। কোন ফুল দেবতার চরণ-প্রান্তে পড়িল, কোন ফুল মাথায় পড়িল, কোন ফুল গ্রীবায়, কোন ফুল বক্ষে, কোন ফুল কক্ষে, কোন ফুল অঙ্কে পতিত হইল। মালা ফেলারও বেশ তারিফ দেখিলাম। দূর হইতে একগাছি মালা একটী রমণী এমন ভাবে নিক্ষেপ করিলেন যে, সেই মালাগাছিটী দেবতার গলায় গিয়া ঠিক পতিত হইল; মনে হইল, কে যেন এক-গাছী মালা ধীরে ধীরে তাঁহার গলায় পরাইয়া দিয়া গেল। মালা ক্ষেপণের এমনই সুশিক্ষা এবং সুকৌশল! কতকগুলি রমণী উলু উলু ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। এক সম্প্রদায়,—'জয়-রাধারাণীকী জয়' বলিয়া উঠিলেন।

৺কাশীধামে আজ প্রকৃতই এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার উপস্থিত। মানবরূপধারী দেবতা কেহ কখন দেখেন নাই; বোধ হয় এমন কথা কেহ কখন শুনেন নাই। কিন্তু ৺কাশীধামে আজ তাহাই দেখিতে হইল,—আজ তাহাই শুনিতে হইল। কাশীতে কি না

হয়? অফলা ফলে, অবোলা বলে, অন্ধে দেখে;—কাশীতে কিনা হয়? এখানে যিনি পঙ্গু, তিনি আগেই গিরি লঙ্ঘন করিয়া বসেন; এখানে যিনি মহামূর্খ, তিনি সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হন; এখানে যিনি লম্পট, তিনি আদর্শসাধু বলিয়া সম্মানিত হন। সেই কাশীতে এই মানবরূপী দেবতা যে আবির্ভূত হইবেন, তাহার আর বৈচিত্র্য কি?

ব্যাপার বিচিত্র না হইলেও, কাশীধামে আজ ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত। চারিদিক্ হইতে দলে দলে, মানবরূপী ভগবান্ দেখিবার জন্য দশাশ্বমেধঘাটে লোক ছুটিতেছে। মুনি ঋষি যতিগণ বহুসহস্র বৎসর,—বহু যুগান্তর কঠোর তপস্যা করিয়াও, যে ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন না, সেই ভগবান্ আজ কাশীধামে,—দশাশ্বমেধ ঘাটে,—অবতীর্ণ! লোকের মন চঞ্চল হইবে না কেন? লোক দৌড়িবে না কেন? আবালবৃদ্ধ-বনিতা,—ধাবিত হইতেছে। সাত আট বছরের ছেলেগুলি ন্যাংটো হইয়া,—মা কোথা যাচ্ছিস্!—মা কোথা যাচ্ছিস্, আমিও তোর সঙ্গে যাব'—বলিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতেছে। ভগবান্ দর্শনে তন্ময়-চিত্তা জননী, সন্তানের কথায় কোন প্রত্যুত্তর না দিয়াই, অক্ষুণ্ণমনে বেগে ছুটিতেছে; দিগম্বর পুত্রগুলিও, ঈষৎ কাঁদিতে কাঁদিতে ঈষৎ হেলিয়া-দুলিয়া,—মাতার অনুবর্ত্তী হইতেছে। সে এক অপূর্ব্ব বাহার!

আরতি শেষ হইল। মানব-রূপী ভগবানের দক্ষিণ পার্শ্বে,—তাঁহার ভক্ত চেলা উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি আগন্তুক দর্শকবৃন্দের কপালে একটী করিয়া টিপ্ দিতে লাগিলেন; বলিলেন,—ইহা মন্ত্রপূত সঘৃত ভস্মের টিপ্। সেই টিপ্ লইবার জন্য স্ত্রীলোকবৃন্দ

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যাকুল হইলেন এবং প্রধান ভক্ত তাঁহাদের কপালে টিপ্ দিবার জন্য আরও অধিক ব্যাকুল হইলেন। তখন ব্যাকুলা যুবতীর কপালে ব্যাকুল ভক্ত,—ধীরে ধীরে মনের সাধে টিপ্ দিতে লাগিলেন। যে যুবতী আবার একটু অধিক সুন্দরী, তাহার শুধু কপালে নয়,—অধরে, কণ্ঠে, বাহুমূলে টিপাঙ্কিত করিতে লাগিলেন। যে যুবতী রমণী আবার সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী এবং ষড়দর্শননিপুণা বলিয়া বোধ হইল, সেই রমণীটীকে ব্যাকুল ভক্ত কহিলেন,—'সর্ব্বশেষে তোমায় টীপাঙ্কিত করিব এবং আরও অকটী অধিক বস্ত্র দিব ; তুমি এখন এই খানে থাক।' সুন্দরী যুবতী মুচকি হাসি হাসিয়া কহিলেন,—'আমরা দাসী। শ্রীভগবানের সেবার নিমিত্ত দেহ-মন উৎসর্গ করিয়াছি এবং তাঁহারই চরণসুধা পান করিয়া, আমার এই মনচকোরের পিপাসা মিটিবে, ইহাই কামনা করিয়া এখানে আসিয়াছি হায়! আশা বুঝি পূর্ণ হইল! মনোভৃঙ্গ বুঝি, পদ্মের মধুপান করিতে সমর্থ হইল।' এবার ব্যাকুল ভক্ত, তখন আপন দক্ষিণ কর দ্বারা সুন্দরীর করকমল ধারণ করিয়া শ্রীভগবানের চরণোপান্তে—আপন সম্মুখে সুন্দরীকে বসাইলেন এবং কহিলেন,—'তুমি যদি জাতিস্মর হইতে, পূর্ব্বজন্মের কথা যদি স্মরণ করিতে—পারিতে, তাহা হইলে বুঝিতে, তুমি সামান্য মানবী নহ। পূর্ব্বজন্মে বৃন্দাবনে তুমি একজন রসজ্ঞা গোপিকা ছিলে; শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাসলীলা করিবার অধিকার পাইয়াছিলে। এ সং বিষয় কিছু স্মরণ হয় কি? শ্রীকৃষ্ণের সহিত হাত-ধরাধরি করিয়া, একাঙ্গ হইয়া, যখন তুমি রাস-মণ্ডপে নাচিয়াছিলে, সেই সুখময়-কাল এখন তোমার মনে পড়ে কি? যদি একান্তই স্মরণ করিতে না পারো, তবে এই শিকড়টী হস্তে ধারণ করো, তোমার

পূর্ব্বজন্মের কথা সমস্তই মনে পড়িবে। বেশ ভাবো।—সেই শ্রীকৃষ্ণকে মনে কর; সেই সুখ-বৃন্দাবন মনে কর; সেই ফুল্ল-জ্যোৎস্না,—সেই নিধু-নিকুঞ্জবন,—সেই মধুর বাঁশরী,—সেই পীতধরা—এই সমস্ত, একবার মনে মনে ভাবো দেখি? এই শিকড়ের আঘ্রাণ লও আর ভাবো; এখনই সব মনে পড়িবে।"

সুন্দরী ঈষৎ ভাবিয়া, ধীরে ধীরে কহিতে আরম্ভ করিলেন,—"প্রভু, দয়াময়! আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহাই ঠিক। অতি অপূর্ব্ব কথাসমূহ এখন আমার স্মরণ-পথে উদিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ একদিন আমাকে স্কন্ধদেশে স্থাপনপূর্ব্বক বন-ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাহাও আমার মনে হইতেছে। একদিন সোহাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ আমার উত্তমাঙ্গে হাত দিয়া বলিয়াছিলেন;—"আমি তোমার এই প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ।" রাসলীলার কথাও মনে পড়িতেছে এবং আমার লোমহর্ষণ হইতেছে। আমি শ্রীকৃষ্ণানুগতপ্রাণা; আমি তাঁহাকেই চাই; শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কিছু আমি চাহি না; তাঁহার সেবাতেই এ দেহ আমি উৎসর্গ করিব। আজ হইতে গৃহ ছাড়িলাম; পতি ত অনেক দিনই ছাড়িয়াছি; ১২৩০ সালের বানে পতিটী যে কোথা ভাসিয়া গিয়াছেন, সেই অবধি কোন সন্ধানই নাই! আমি কাশী বাসিনী হইয়াছি; অদ্য হইতে আমার সার সর্ব্বস্ব,—শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিলাম।"

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইল; তথাচ ভিড় ভাঙ্গে না। প্রধান ভক্ত কহিলেন,—"দেবতা এইবার শয়ন করিবেন; সকলে সরিয়া যাও! এ স্থানে থাকা উচিত নয়; এখনই দীপ নির্ব্বাণ হইবে। যিনি থাকিবেন, তাঁহারই এই সময়ে বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা। আবার কাল সকালে আসিও; এখন তফাৎ যাও!—তফাৎ যাও!

—দেবতার কোপে কেহ পতিত হইও না! শয়নে বাধা দিলে,—বিঘ্ন দিলে,—শয়ন কালে ঈষৎ কথা কহিলে, দেবতার নিদ্রা-ভঙ্গ হয়। এই নিদ্রাভঙ্গ রূপ পাপে যিনি লিপ্ত হইবেন, তিনি কৃমি-কীট হইয়া অবশ্যই জন্মগ্রহণ করিবেন। সকলে সাবধান! সাবধান!—সরিয়া যাও, সরিয়া যাও!"

প্রধান ভক্তের কথায় সকলেই আপন আপন গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল; রহিলেন কেবল,—সেই কৃষ্ণগতপ্রাণা সুন্দরী যুবতী।

দেখিতে দেখিতে দীপসমূহ,—মশালসমূহ—একেবারে নিবিয়া গেল। ঘোর অন্ধকারে ঘাট পূর্ণ হইল। আকাশের তারাদল, আর কুলকুল-নাদিনী গঙ্গার জল,—পরস্পর কেবল মুখ-চাওয়াচায়ি করিতে লাগিল।

যিনি স্বয়ং-কৃষ্ণ-ভগবান্ হইয়া, দশাশ্বমেধ ঘাটে বসিয়া আছেন, তিনি আমাদের সেই শিয়ালমারা; আর যিনি তাঁহার প্রধান ভক্ত,—দীপ নির্ব্বাণ করিতে যিনি সদাই ব্যস্ত, তিনি আমাদের সেই ভক্ত সনাতন দাস—বৈরাগী।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

ধরাধামে মানব-রূপী ভগবানের আবির্ভাব সম্ভব কি অসম্ভব, তাহা কেহ ভাবিতেছে না; হঠাৎ ঈশ্বরের নূতন অবতার হওয়া সম্ভব কি অসম্ভব, তাহাও কেহ ভাবিতেছে না; অমন হাড়ে-মাসে জড়িত পাকৃশিটে গড়নে অমন বিতিকিচ্ছি লম্বা আকারে,—কোঁকড়া-কোঁকড়া চুলবিশিষ্ট মানুষের ভগবান্ হওয়া কতদূর সম্ভব, তাহাও কেহ ভাবিতেছে না;—সুন্দরী যুবতী কাছে আসিয়া

বসিয়াছে বুঝিতে পারিলে, যে ধ্যানস্থ মুদ্রিতনয়ন পুরুষ, চক্ষু মেলিয়া, আড়-নয়নে সেই সুন্দরীকে দেখিতে থাকেন,—তাঁহার ভগবান্ হওয়া কত দূর সম্ভব, তাহাও কেহ ভাবিতেছে না;—যে ভগবান্,—পয়সা, সিকি, আধুলি, টাকা পতিত হইবার জন্য, সম্মুখে একখানি বৃহৎ থালা রাখিয়াছেন, তাঁহার সত্যিকারের ভগবান্ হওয়া সম্ভব কি না, তাহাও কেহ ভাবিতেছে না! কিন্তু ৺কাশীধামে যেরূপ হুলস্থূল কাণ্ড বাধিয়াছে, যেরূপ হৈ হৈ শব্দ উঠিয়াছে, তাহাতে সমগ্র কাশীবাসীর অবশ্য নিশ্চয়ই বিশ্বাস জন্মিয়া থাকিবে যে, কাশীধামে দশাশ্বমেধ-ঘাটে, সত্যসত্যই মানব-রূপী ভগবানের আবির্ভাব হইয়াছে। কাশীতে এখন কেহ আর রাত্রিতে নিদ্রা যায় না;—সারা রাত কেবলই ঐ দেবতার গল্প। যেখানে পাঁচ জনে বসিয়াছে,—অন্য কথা নাই,—কেবলই ঐ দেবতার কথা। পত্নী, পতির নিষেধ মানিতেছে না,—ভগবান্-দর্শনে দৌড়িতেছেন। পুত্রও পিতার কথা মানিতেছে না, ঐ দিকে দৌড়িতেছে। সকলেই দৌড়িতেছে দশাশ্বমেধ ঘাটের পথে, দূর হইতে দেখ,—যেন, অনন্ত [illegible] উড়িতেছে। ধন্য লোকের বিশ্বাস! মানুষ এরূপ বোক-বিশ্বাসী না হইলে, সংসার চলিত কি না সন্দেহ?

বাল্যকালে শুনিয়াছিলাম, অমুক মাসে, অমুক তিথিতে—অমুক তারিখে—অমুক সময়ে—মরা মানুষ ফিরিয়া আসিবে। ইহাতেই তখন বহুসংখ্যক লোকের ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিয়াছিল এবং সেই বিশ্বাস অনুযায়ী অন্ততঃ বঙ্গের পাঁচ কোটি লোক যথাযথ কাজ করিয়াছিল। কেহ কেহ কাপড় কিনিয়া রাখিয়াছিল; কেহ কেহ

রন্ধন করিয়া রাখিয়াছিল; বিরহবিধুরা-বালা মৃত-পতির নিমিত্ত শয্যা প্রস্তুত করিয়া, মৃত পতির আসার আশায়, সারা নিশি যাপন করিয়াছিলেন।

১২৬১ সালে,—হুগলীতে যখন প্রথম বিদ্যালাভ করিতে আসি, তখন একদিন সংবাদ পাইলাম যে, একজন বিদুষী ভৈরবী একটী মৃত-মানুষকে জীবনদান করিবেন,—এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। জীবন দানের স্থান,—রাণী রাসমণির ঘাট। আমি দৌড়িলাম; বাসার ঝি দৌড়িল! পথে এই কথা যে শুনে, সেই আমাদের সঙ্গে দৌড়ায়। রঙ্গভূমে পৌঁছিবার পূর্ব্বে আমার সঙ্গে প্রায় এক শত লোক দৌড়িয়াছিল। গিয়া দেখি, রাসমণির ঘাটে একটী খাট পাতা আছে; খাটের উপর মশারি খাটান। পুরু মার্কিন কাপড়ের মশারি তৈয়ারি হইয়াছে। কাপড় এত পুরু যে, ভিতরে কি হইতেছে, কিছুই দেখিবার যো নাই। শুনিলাম, মড়াটীকে খাটের উপর শোয়াইয়া রাখা হইয়াছে, আর সেই বিদুষী ভৈরবী মড়ার কাছে বসিয়া কত মন্ত্র তন্ত্র বলিতেছেন, কত ক্রিয়া প্রক্রিয়া করিতেছেন; এবং আরও শুনিলাম, বিদুষী ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছেন,—আর তিন ঘণ্টার মধ্যেই মৃত মানুষ সজীব হইয়া উঠিবে; ইহারই মধ্যে মড়াটীর ক'ড়ে আঙ্গুলটী নড়িতেছে। খাট-রক্ষার জন্য আটজন পুলিশ প্রহরী প্রহরী দাঁড়াইয়া আছে। জনতা এত অধিক হইয়াছে যে, পুলিশ-সাহেব মধ্যে মধ্যে দর্শক-বৃন্দকে বেত মারিতেছেন এবং "তফাৎ যাও।—তফাৎ যাও!"—বলিতেছেন। অর্দ্ধক্রোশব্যাপী পথ, লোকপূর্ণ হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে শুনিলাম, পুলিশ সাহেব টমটম্ হাঁকাইয়া আসিতেছেন। তখন দর্শকবৃন্দের উপর বেত্রাঘাত অধিকতর আরম্ভ হইল এবং "তফাৎ

যাও,—রাস্তা সাফ্ করো!—এইরূপ শব্দ উত্তরোত্তর অধিকতর উত্থিত হইল।

মশারির ভিতর কি যে কাণ্ড ঘটিতেছে, তাহা দর্শকবৃন্দ কেহ দেখে নাই,—ইহা আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি। কিন্তু প্রত্যেক দর্শকই বলিতেছেন যে, মৃত ব্যক্তির নাড়ী বেশ তর্জ্জনী-ভুক্ত হইয়াছে; মৃত ব্যক্তির নাকটী বেশ গরম হইয়াছে; কেহ বলিতেছেন, আমি স্বকর্ণে মৃত ব্যক্তিকে একটী কথা উচ্চারণ করিতে শুনিয়াছি; বলা বাহুল্য, আমি তখন এ সব কথা অবিশ্বাস করি নাই। আমিও ঘরে ফিরিয়া আসিয়া, স্বচক্ষে দেখার মতন, অনেকের নিকট ঐ সকল গল্প করিয়াছিলাম। আমার কথায় আরও অধিক লোক—সেই পাড়া হইতে রাসমণির ঘাটের দিকে ছুটিয়াছিল।

ভজহরি শর্ম্মা,—বিশেষ পরীক্ষা না করিয়া, ভৃত্য নিযুক্ত করিতেন না। একদিন একজন ভৃত্য, চাকরীর প্রার্থী হইয়া, শর্ম্মা মহোদয়ের নিকট সমাগত হইল। ভজহরি জিজ্ঞাসিলেন, "কত টাকা মাহিনায় তুমি থাকিতে পারিবে বাপু?" চাকর উত্তর দিল, 'খোরাক পোষাক পাঁচ টাকা মাহিনা আমার চাই; তা আমার কাজ দেখিয়া লইবেন। আমি ইস্তক চণ্ডীপাঠ—নাগাদ পাঁটা-কাটা পর্য্যন্ত,—সকল কাজই করিতে পারি।" ভজহরি মনে মনে ভাবিলেন,—"এটি যে বড় চালাক চাকর দেখিতেছি, মুখে যে আর কথা ধরে না!" প্রকাশ্যে ভৃত্যকে কহিলেন,—"একটু দাঁড়াও বাপু! একটু অপেক্ষা কর।" ভৃত্য অপেক্ষা করিয়া, ভজহরির সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

ভজহরি শর্ম্মা, পার্শ্বস্থ প্রিয় বয়স্যকে কহিলেন,—"ভায়া আর

শুনেছ! এমন ঘটনা কেহ কখন শুনেও নাই;—কেহ কখন দেখেও নাই! অতি আশ্চর্য্য! অতি আশ্চর্য্য!'

বয়স্য। আশ্চর্য্য ঘটনার বিষয় পাড়াময় রাষ্ট্র হইয়াছে! ব্যাপারটা কি বলুন দেখি? সত্য সত্যই কি তাই?

ভজহরি। হাঁ, ঠিক সত্য; সত্য বই মিথ্যা নয়। অতি আশ্চর্য্য! অতি আশ্চর্য্য! আজকাল কোন দিন পূরা দেড়সের দুধ দেয়,—কোন দিন দুইসের দুধ দেয়; আর দুধই বা কি মিষ্টি! —খাঁটি দুধ;—যেন বটের আটা! বলদ-গরু যে গর্ভিণী হইবে, প্রসব হইবে, চারিটা বাঁটবিশিষ্ট হইবে এবং কেঁড়ে কেঁড়ে দুধ দিবে, ইহা আমি কখনই ভাবি নাই। মোড় কি!—যেন একবারে সুগোল, নধর! দিনের-বেলা সেই বলদ,—লাঙ্গল ঘাড়ে করিয়া প্রায় এক বিঘা জমি চষিয়া আসে, আর চাষ কার্য্য শেষ হইলে, ঘরে আসিয়া বলদ, কপিলা গাভীর ন্যায় দুধ দিতে থাকে। অতি আশ্চর্য্য!—অতি আশ্চর্য্য!!

এইরূপ কথাবার্ত্তা শুনিয়া, নবাগত ভৃত্য স্তম্ভিত ও অবাক্ হইল, যোড়হাতে সাধুভাষায় কহিল,—"মহাশয়! বলিতেছেন কি? এ অধীন একবার তাহা দর্শন করিবার ইচ্ছা করিতেছে। কোথায় সেই বলদ আছে, বলিয়া দিন। বলদটী কি এখন গোশালায় বদ্ধ আছে?"

ভজহরি। হাঁ; গোয়ালেই বলদ বাঁধা আছে। বলদ দেখিবে, তাহার বকনা বাছুরটীকে দেখিবে এবং মোড়ের বাহার দেখিবে। সে ত এখন বলদ নাই;—ঠিক যেন, ভগলপুরী গাই হইয়াছে। এই পথ দিয়া যাও; গেলেই গোশালা দেখিবে।

নবাগত ভৃত্য, ইঙ্গিতমত পথ ধরিয়া চলিল। খানিকদূর যাইতে,

না যাইতেই ভজহরি, ভৃত্যকে ডাকিল,—"ওহে ফিরে এস,—ফিরে এস! তুমি যে কত বড় চালাক, তাহা বুঝিয়াছি! বলদে গর্ভিণী হয়, সন্তান প্রসব করে, দুধ দেয়, এ কথা যে বিশ্বাস করে সে ব্যক্তি আমার বাড়ী চাকরী করিবার উপযুক্ত নয়! তুমি আপন ঘরে চলিয়া যাও।"

ভৃত্য একটু থতমত খাইল; অপ্রস্তুত হইল; আপন নির্ব্বুদ্ধিতা বুঝিতে পারিয়া, কোন কথার উত্তর না দিয়াই, ম্লানমুখে আপন আবাসে প্রস্থান করিল।

ভৃত্যের কিন্তু দোষ ছিল না। এইরূপ এবং অন্যরূপ বিশ্বাস-ব্যাপারে বড় বড় পালোয়ান পড়িয়া যাইতেছে,—দুর্ব্বল ভৃত্য ত কোন ছার! এইরূপ অন্ধ-বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, ইন্দ্র-চন্দ্র-বায়ু-বরুণ-কুবের-হুতাশন ভূমে লুটাইয়া গড়াগড়ি যাইতেছেন,—দরিদ্র ভৃত্য ত কোন ছার! ফল কথা, এইরূপ বোকা-বিশ্বাসী না হইলে, সংসার অচল হইত! সেই জন্যই ভগবান্ বারো-আনা ব্যক্তিকে বোকা-বিশ্বাসী করিয়া জন্ম দিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন,—চৌদ্দ-আনা; কেহ কেহ বোকাবিশ্বাসীর সংখ্যা পনর-আনা উনিশ গণ্ডা ধরিয়া রাখিয়াছেন।

ভূতলে ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়াছেন,—এই কথা বিশ্বাস করিয়া কাশীবাসিগণ যে উৎকুণ্ঠিত হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের দোষ ছিল না। বিধাতার সৃষ্টি,—বিধাতার নির্ম্মাণ-কৌশল যেরূপ,—সেইরূপ ঘটনাই ঘটিবে। ভগবৎ-মায়ায় মানবমাত্রেই আবদ্ধ। এক আধ জন ব্যক্তিমাত্র এই মায়ারূপ মাকড়সার জাল এড়াইয়া থাকেন। সুতরাং কাশীবাসিগণের অন্ধ-বিশ্বাস হেতু, ভক্তি-হেতু দৌড়াদৌড়ি হেতু, রাত্রি-জাগরণ-হেতু—কোনই দোষ ছিল না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

শ্রীভগবান্-শিয়ালমারার পসার দিন দিন অধিকতর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এক বৎসর মধ্যে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা-ভূমে তাঁহার নাম প্রচারিত হইল। এদিকে উত্তর-পশ্চিমের ত কথাই নাই,—পঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, এমন কি, লঙ্কাদ্বীপ হইতে যাত্রিগণ তাঁহাকে দেখিতে আসিতে লাগিল। কেহ কেহ কাশীতে আসিয়া, বাবা বিশ্বনাথকে দর্শন করিবার পূর্ব্বেই, শিয়ালমারাকে দর্শন করিতে আরম্ভ করিল।

শিয়ালমারা বড়ই সৌভাগ্যবান্ পুরুষ! বড় বড় ভট্টাচার্য্য আসিয়া, তাঁহার পায়ের ধূলা লইতে লাগিল। অনেক রাজা, মহারাজ, জমিদার,—শিয়ালমারার শিষ্য হইল। অনেক উকীল, হাকিম, জজ,—শিয়ালমারাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিল। অনেক ইংরেজী-নবীস উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং অনেক শিক্ষক ও গ্রন্থকার শিয়ালমারাকে দেবতাবোধে, তাঁহার পূজা দিয়া, মন্ত্র-গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। ইতরসাধারণের ত কথাই নাই,—তাহাদের শিয়ালমারাই ধ্যান, শিয়ালমারাই জ্ঞান, শিয়ালমারাই সর্ব্বস্ব।

শিয়ালমারার নামে নানারূপ গল্প প্রচারিত হইল;—তিনি সর্ব্ব-শক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানবক্তা, বাক্‌সিদ্ধ, ষড়ৈশ্বর্য্য-শালী। লোকে বলিতে লাগিল,—তিনি মহাবিদ্যাধর;—ধন্বন্তরি তাঁহার নিকট দাসানুদাস,—মন্ত্রবলে অণুমাত্র ভস্মদানে সর্ব্বরোগ আরোগ্য করিতে তিনি সক্ষম;—মৃত মানবকেও জীবিত করিতে তাঁহার শক্তি আছে। মূর্চ্ছিত মানুষকুলের অঙ্গে হাত বুলাইলেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হয়।

কাশীধামে, দশাশ্বমেধ ঘাটের নিকট, এক্ষণে যেখানে বৈদ্যকুল-চূড়ামণি ৺গঙ্গাপ্রসাদ সেনের বাটী অবস্থিত, সেই স্থানের নিকটে তখন একদিন কি কথাবার্ত্তা হইতেছিল, একবার শুনুন,—

প্রথম ব্যক্তি। এই ছেলেটী আজ চৌদ্দ বৎসর কাল বোবা ছিল; গুরুর কৃপায়, তিন দিনে ইহার কথা ফুটিল! ধন্য—ধন্য তিনি!

দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তর দিল,—"তুমি কথা-ফুটার কথা কি বলিতেছ?—সে দিন একটী মানুষ মরিয়া গিয়াছিল; মরিয়া পচিয়া ঢোল হইয়াছিল; চক্ষুদুটী পাখীতে উপড়াইয়া লইয়া ছিল; শিয়ালে কাণ কামড়াইয়া খাইয়াছিল; নাকটী পচিয়া ধ্বসিয়া গিয়াছিল; পেটের-ভুঁড়ী সমস্তই শকুনি-কুল লইয়া গিয়া মহা-মহোৎসব করিয়াছিল;—মৃত রোগীটীকে ধরাধরি করিয়া দেবতার সম্মুখে যাই ফেলা হইল, অমনি দেবতা করুণচক্ষে তাহার প্রতি চাহিলেন এবং মধুরবচনে বলিলেন, 'উঠ বৎস! উঠ' বৎস অমনি তৎক্ষণাৎ সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন। কোথা হইতে মুহূর্ত্তমধ্যে নাক আসিল, কাণ আসিল, চক্ষু আসিল, নাড়ী-ভুঁড়ি পেটের ভিতর ঢুকিল; দুর্গন্ধ দূর হইল, পদ্মগন্ধ বাহিরিল;—তাহা আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।"

তৃতীয় ব্যক্তি কহিল,—"১২৩০ সালের বানে আমার একটী গাই গরু ভাসিয়া গিয়াছিল।—মানব-রূপী ভগবানের নিকট গিয়া আমি যোড়হাত করিয়া কহিলাম, "প্রভো! আমার গাভীটীকে আনাইয়া দাও। গাভীর শোকে আমার পত্নী একাল পর্য্যন্ত আধ-পেটা খাইয়া আছেন এবং রাত্রি সাড়ে নয়টার পরই তিনি ক্রন্দন আরম্ভ করিয়া থাকেন। হে দয়াময় প্রভো! আমার সেই সাধের

গাভীটীকে কৃপাপূর্ব্বক আনাইয়া দাও। যদি না আনাইয়া দাও, তাহা হইলে আমি এখনি তোমার সমক্ষে মাথায় ইট মারিয়া মরিব। শ্রীভগবান্ অমনি—"আয় গাভী,—আয় গাভী,—আয় গাভী" বলিয়া ডাকিলেন;—জানি না, কোথা হইতে তৎক্ষণাৎ গাভীটী আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।"

চতুর্থ ব্যক্তি কহিলেন,—"গাভী হারান ত সহজ কথা; এক বৃদ্ধ ব্যক্তির এক যুবতী স্ত্রী হারাইয়াছিল; বৃদ্ধ লাঠি হাতে করিয়া, এ গ্রাম হইতে ও গ্রাম,—এ রাজার দেশ হইতে ওরাজার দেশ, খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া স্ত্রীকে খুঁজিতে লাগিল। বৃদ্ধের পা ফাটিল, পা দিয়া, রক্ত বাহির হইতে লাগিল,—তথাপি বৃদ্ধ থামিল না;—সেই খোঁড়া ফাটা রক্তাক্ত পায়েই কত নদ-নদী পার হইল,—কত বন-জঙ্গল পার হইল,—কত পাহাড়-পর্ব্বত এড়াইল,—তথাপি যুবতী স্ত্রীটীকে বৃদ্ধ খুঁজিয়া পাইল না: এইরূপে বারো বৎসর কাল নানা স্থানে স্ত্রী অন্বেষণপূর্ব্বক বৃদ্ধ গৃহে ফিরিল। তার পর আরো বারো বৎসর কাল বৃদ্ধ স্ত্রীর শোকে জর্জ্জরিত হইয়া কাল কাটাইতেছিল; কিন্তু বৃদ্ধ যখন শ্রীভগবানের হঠাৎ এইরূপ আবির্ভাব শুনিল, তখন একদিন প্রাতে আসিয়া, ভগবানের পদপ্রান্তে কেবল মাথা কুটিতে লাগিল। কোন কথা বলা নাই, কোন কথার উত্তর নাই,—বৃদ্ধ কেবল মাথা কুটিয়া রক্ত বাহির করিতে লাগিল। তখন শ্রীভগবান্ বৃদ্ধকে সহাস্যবদনে জিজ্ঞাসিলেন,—"বাপু! তোমার কি হইয়াছে?" বৃদ্ধ অমনি যোড়হাতে কহিল,—"আমার ষোল বৎসরের সুন্দরী যুবতী স্ত্রীটী (আহা! তাঁর গুণই বা কি ছিল!) আজ চব্বিশ বৎসর নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছেন। বারো বৎসর কাল আমি এই ভারত ভ্রমণ,

করিয়া খুঁজিয়াছিলাম; কিন্তু কোথাও তাঁহাকে পাই নাই। তার পর, বারো বৎসর তাঁহার ধ্যান করিয়া এবং গুণগান করিয়া কাটাইয়াছি। আমার বয়স বিরানব্বই বৎসর হইয়াছে। আমি আর বেশী দিন বাঁচিব না। প্রথম পক্ষের পুত্র আমার গঙ্গাবাসের আয়োজন করিতেছেন। এ সময় যদি আমার সুন্দরী যুবতী স্ত্রীটী, সেই ষোল বৎসরের প্রেয়সীটীকে খুঁজিয়া আনিয়া দেন, তাহা হইলে আমার জীবনদান করা হয়। আপনার কাশীতে শিবস্থাপন করার পুণ্যলাভ হয়। হে ভগবন্! আমি মরিবার পূর্ব্বে, যদি এক মুহূর্ত্তের জন্য, তাঁহাকে দেখিয়া মরিতে পাই, তাহা হইলে অন্তিমে আমার এ জীবন সার্থক হয়। আর আমার এক লক্ষ বারো হাজার টাকা নগদ আছে। প্রথম পক্ষের ছেলেরা তাহা জানে না,—আমি সে টাকাগুলি মাটীর নীচে পুতিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছি। হে মানব-রূপী শ্রীকৃষ্ণ! তোমাকে আমি সেই এক লক্ষ বারো হাজার টাকাই নিজে গণিয়া দিতেছি,—তুমি তাহা লইয়া আমার সেই ষোড়শীটীকে আনিয়া দাও।

"শ্রীভগবান্ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া উচ্চ হাস্য করিলেন। কহিলেন,—'সংসারে অর্থ সর্ব্বাপেক্ষা হেয়। টাকাকে আমি কৃমি-কীট অপেক্ষাও অতি জঘন্য বস্তু বলিয়া মনে করি। সম্মুখে পুকুর দেখিলেই টাকাকে আমি খোলার কুঁচি ভাবিয়া, ছিনিনি খেলি। অতএব টাকাতে আমার প্রয়োজন নাই। আমি চাই ভক্তি, প্রীতি এবং প্রেম। টাকাটী যদি সঙ্গে করিয়া আনিয়া থাক তাহা হইলে আমার পশ্চাতে যে গর্ত্ত আছে, উহাতে হুড় হুড় করিয়া ঢালিয়া দাও,—একেবারে পাতালে মহীরাবণের বাড়ী চলিয়া যাইবে —আমার টাকার প্রয়োজন নাই।'

"বৃদ্ধ তখন যোড়হাতে উত্তর দিল,—'ভগবন্! ক্ষমা করুন। টাকার কথা উত্থাপন করিয়া আমি অন্যায় করিয়াছি। আমি আপনার দাসানুদাস;—দিবারাত্রি আমি কেবল আপনার নাম জপ করিব এবং ভক্তিতে গলিয়া গিয়া কেবল কাঁদিব।'

শ্রীভগবান তৎক্ষণাৎ ধুনি হইতে ভস্ম লইয়া বৃদ্ধের দিকে উড়াইলেন। অমনি একটী যুবতী স্ত্রীলোক আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। ঘোমটা দিল। 'হা নাথ!' বলিয়া বৃদ্ধের পদপ্রান্তে পতিত হইল। বৃদ্ধ তখন আহ্লাদে গদ্‌গদ হইয়া, অবগুণ্ঠনবতী সেই ষোড়শী যুবতীকে সঙ্গে লইলেন; গৃহে গেলেন। ইহাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে

পঞ্চম ব্যক্তি কহিল,—"ভগবানের হৃদয় বড় কোমল প্রভাতে বেলা আটটার পর যিনি তাঁহার নিকটে যান, তাঁহাকে তিনি হাত দেখিয়া ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান বলিয়া দেন,—কাহাকেও বিফলমনোরথ করেন না। হাত-দেখা ব্যাপার দশটা পর্য্যন্ত চলে দশটার পর ঔষধ বিতরণ আরম্ভ হয় যাহার যেমন রোগ হউক না কেন,—ধুনি হইতে একটু ভস্ম লইয়া তিনি বলিতেছেন,—'তুমি একটু খাও, এখনি রোগ আরোগ্য হইবে।' আশ্চর্য্য! অমনি রোগও সঙ্গে সঙ্গে আরাম হইতেছে। একজন অন্ধের চক্ষে ভগবান্ ভস্ম নিক্ষেপ করিলেন, আর অন্ধের চক্ষু, মল্লিকা ফুলের ন্যায় তৎক্ষণাৎ ফুটিয়া উঠিল। ভগবান্ যদি কাহারও নেড়া-মাথায় হাত বুলাইয়া বলেন, 'চুল সকল! এখনি তোমরা উঠিয়া পড়ো!' অমনি সায় চেরার্স ৭ঞ্চি-শুদ্ধ পোমেটম-মাখা মিহি-মিহি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ চুল উঠিয়া পড়িবে। ভগবান্ যদি আবার কাহারও চুলযুক্ত স্থানে হাত দিয়া বলেন, 'চুল সকল! এখনি তোমরা এস্থান হইতে চলিয়া

যাও।' অমনি সেইখানটী বেমালুম তেলপানা নেড়া হইয়া যাইবে। ঔষধ-বিতরণের সময় ভয়ানক ভিড় হয়। সেই জন্য তিনি প্রথমতঃ অবলাদিগকে ঔষধ দেন। অবলাজাতির মধ্যে যাঁহারা আবার যুবতী, তাঁহাদের সম্মান সর্ব্বাগ্রে রক্ষিত হয়। যুবতীগণের মধ্যে যাঁহারা আবার সুন্দরী, তাঁহারা তৎপূর্ব্বে আদরে ঔষধ পাইয়া থাকেন। আবার সুন্দরীগণের মধ্যে যাঁহারা বালবিধবা সুন্দরী, তাঁহাদের ঔষধ গমনমাত্রেই প্রীতিভরে প্রদত্ত হইয়া থাকে। কিবা সুনিয়ম! কিবা সুব্যবস্থা!—ভগবানের মর্ত্ত্যলোকে নর-লীলা অতি অদ্ভুত দৃশ্য!"

ভগবানের পসার-প্রতিপত্তি, শেষে এত বৃদ্ধি পাইল যে, ঘটী হারাইলে, গৃহস্থ ঘটী না খুঁজিয়া, অগ্রে ভগবানের নিকট যাইতেন,—"প্রভু! বলিয়া দাও,—ঘটীটী কোথায় আছে?" নিরু-দ্দিষ্ট পতি ও পত্নীর অনুসন্ধান-দানে ভগবান্ বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন।

ইহা ব্যতীত তখন বহু লোক দেখিয়াছিল,—মানব-রূপধারী শ্রীভগবান্, প্রত্যহ রাত্রি তিনটার সময়, মুখ দিয়া দপ্ দপ্ আগুন বাহির করিতেন। কখনও বিশ হাত উর্দ্ধে,—শূন্যে কোনরূপ সাহায্য ব্যতীত বসিয়া থাকেন। কখন বা মাছি হইয়া উড়িয়া যান। কখন বা মশা হইয়া ভোঁ ভোঁ করেন। কখন বা জিব-কাটা কালী হইয়া দৈত্য বিনাশ করেন। কখন বা সামান্য মানব হইয়া বালকরূপ ধরিয়া, ধামি করিয়া মুড়ি খান! কখন বা নাড়ু-গোপাল হইয়া, হামা দিয়া, নাড়ু খাইতে খাইতে চলিয়া যান। অনেকে আরও দেখিয়াছিল, একদা ফুল্লজ্যোৎস্নারজনীতে, দশা-শ্বমেধ-ঘাটে, রাত্রি এগারটার পর শ্রীভগবান্ বংশী হাতে করিয়া

বাঁকা হইয়া, বামে হেলিয়া, রাধা রাধা বলিয়া ডাকিয়া ছিলেন। আহ্বানের কি অপূর্ব্ব মহিমা! দেখিতে দেখিতে একটী গোলাপী রংএর কাঁচুলি-আটা রাধিকা আসিয়া, শ্রীভগবানের বামে দাঁড়াইলেন। পরস্পরের বাহু, পরস্পরের দেহে যেন নাগপাশে বদ্ধ হইল। যুগল মূর্ত্তির পূর্ণস্ফূর্ত্তি হইল। তখন, যাঁহারা প্রকৃত ভক্ত, তাঁহারা আরও দেখিয়াছিলেন, আকাশ হইতে সেই সময় ঘন ঘন পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে, ইন্দ্র উঁকি মারিয়া সেই যুগল-রূপ হেরিতেছেন; শচী তাহাতে রাগ করিতেছেন।

পুষ্পবৃষ্টির পর,—কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য!—দেখিতে দেখিতে আকাশ হইতে সন্দেশ-বৃষ্টি আরম্ভ হইল। সন্দেশের পর রসগোল্লাবৃষ্টি, তার পর জিলিপি-বৃষ্টি,—ধন্য ভগবানের ঐশী শক্তি! ধন্য ভগবানের মাহাত্ম্য!

ফল কথা শিয়ালমারা প্রকৃতই সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ বলিয়া দেশে গণ্য এবং পূজিত হইলেন। তাঁহার শিষ্য সম্প্রদায়ও বহুবিস্তৃতি লাভ করিল। মূর্খ হইতে অগাধ শিক্ষিত ব্যক্তি পর্য্যন্ত তাঁহার শিষ্যশ্রেণীভুক্ত হইল। শিয়ালমারার যশঃসৌরভ ভারতময় বিকীর্ণ হইল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

শিষ্য সনাতন দাসের সৎশিক্ষায়, শিয়ালমারা, ষোল-কলায় সম্পূর্ণ শ্রীভগবান্-রূপে লোকচক্ষে পরিগণিত হইলেন। কিন্তু উপযুক্ত শিষ্য সনাতনের তখনও মন উঠিল না। পূর্ণ

'ভগবানত্ব' লাভ করিতে এখনও একটু বাকী আছে,—ইহাই সনাতন দাসের ধারণা।

এক দিন শিয়ালমারার সহিত সনাতন দাসের রজনীযোগে নিভৃতে এই মর্ম্মে কথাবার্ত্তা হইল ;—

সনাতন। সবই ঠিক হইয়াছে, কেবল একটু বাকী আছে। আমরা এখন ক্ষুদ্র দোকানদার নহি,—সওদাগর হইয়াছি। সওদাগর হইয়াছি বটে, কিন্তু আকাঙ্ক্ষা আমার এখনও পূর্ণ হয় নাই। আরও উচ্চপদ প্রাপ্তির আশা করিতেছি।

শিয়ালমারা। আর কিছু করিতে হইবে না। যাহা হইয়াছে ইহাই ঢের। এইরূপ ব্যবসা চালাইতে পারিলেই দুই তিন বৎসরের মধ্যেই আমাদের অন্ততঃ কুড়ি-বাইশ লাখ টাকা নগদ জমিবে ; জমিদারির আয়ও,—চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা হইতে পারে।

সনাতন। কুড়ি-বাইশ লাখ টাকা,—কিরে শালা!—তো বেটার বড় ছোট-নজর দেখচি। কুড়ি-বাইশ ক্রোর টাকার কথা ক। আগে ডাকাতি ক'রে, আপনার ভাগে সাত আট টাকা পেলেই মহা সন্তুষ্ট হ'তিস্ কিনা! তাই এখন প্রত্যহ দুই এক হাজার টাকা আয় দেখে, একবারে চমকে গেছিস্! এ অবস্থায় তোমার এই কুঠীতে দৈনিক যেরূপ আয় হওয়া উচিত, তাহা ঠিকই হইয়াছে ; কিন্তু অবস্থার একটু অন্তর করিতে হইবে, আরও একটু উচ্চ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইতে হইবে।

শিয়ালমারা! সোনা শালা এইবার ম'লো রে!—অতি লোভে তাঁতি নষ্ট!—এই যা আছি, বেশই আছি! আর এর চেয়ে কি হ'ব বাপু? ডাকাতি ক'রে ত আমাদের সংসার চলত। কোন

মাস পাঁটা মেরে, মদ মেরে,—বেশ সুখ-স্বচ্ছন্দে চল্‌ত, আবার কোন মাস আধপেটাও চল্‌ত না! কিন্তু এখন একদিকে ক্ষীরের সাগর; একদিকে লুচির পর্ব্বত; একদিকে দুধের নদী! ইহা অপেক্ষা ভাই! আর কি সুখ হইবে? রাত্রে বিশ-পঁচিশ ক্রোশ পথ হাঁটিয়া, গলদ্ঘর্ম্ম হইত; ডাকাতি করিয়া গায়ের রক্ত দিয়া এক রাত্রে কুড়িটী টাকা রোজগার করা আমাদের পক্ষে কঠিন ছিল। এখন সম্মুখে সদাই ঝর্‌-ঝর্‌-ঝর্‌-ঝর্‌ টাকা পড়িতেছে! সুতরাং আর কেন ভাই! সুখের যে চরম হইয়াছে!

সনাতন। উহুঁ!—এ সুখ,—কি সুখ?

শিয়ালমারা। দূর শালার বেটা শালা! তবে তুই আর কি চাস্‌ বল্‌ দেখি? সে দিন একজন বাঙ্গালী বঙ্গেশ্বর আসিয়া আমার পায়ে ধ'রে আধ ঘন্টা প'ড়ে রইল, এবং যাবার সময় দশ হাজার টাকা নগদ দিয়ে গেল। রাজা পায়ে ধরিতেছে; ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত পায়ের ধূলা লইতেছে! নবযুবতীগণ আসিয়া রসালাপ করিতেছে;—শালা! তুই এর চেয়ে আর কি চাস্‌?

সনাতন। এ কিছুই নয়,—এ কিছুই নয়!

শিয়ালমারা। তবে মর,—যা হয় কর; কিন্তু ধরা পড়্‌লে একূল ওকূল দুকূল যাবে।—শেষে মারও খেতে হ'বে; হয় ত, জেলেও যেতে হ'বে।

সনাতন। (হাসিয়া) এখন যদি আমাদের মার খাইবার,—জেলে যাইবার অদৃষ্ট হইত, তাহা হইলে কি হঠাৎ একবারেই এত ঐশ্বর্য্য হইয়া উঠে! সে সব ভাবনা তোর কিছুই নেই! আমি যা বলি, তুই শালা সব শুনে যা!—এবং আমার মতলব নিয়ে, সেই সব কাজ ক'রে যা! ভয় কিছুই নেই;—ভাবনাও নেই!

শিয়ালমারা। তোর ত কথা শুনেই আস্‌ছি। আমি ত কেবল ঠুঁটো জগন্নাথ ব'সে আছি; আমার এই ভাবনা,—শেষে তোমার অতি-বুদ্ধিতে কোন বিপরীত ফল যেন না ফলে। অতি শব্দটাই খারাপ। আমার ঠাকুর-মা বল্‌তেন,—

"অতি ভাল নয় বলা-বক্তা!—
অতি ভাল নয় চুপ্‌!
অতি ভাল নয় কুরূপ কুচ্ছিৎ,—
অতি ভাল নয় রূপ!"

সনাতন। (হাসিয়া) শালা আবার ভাটপাড়ার কাব্যচঞ্চু হ'য়ে এল যে! ওরে!—ও-রকম নয়!—ও রকম নয়!—তবে শোন,—

"অতিদর্পে হতা লঙ্কা অতিমানে চ কৌরবাঃ।
অতিদানে বলির্ব্বদ্ধঃ সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতম্‌॥"

শিয়ালমারা। আমি না হয় একটা বাঙ্গালা বয়েৎ ব'লেছি; তুই শালা! সংস্কৃত শিখ্‌লি কোথা বলত?

সনাতন। কি বল্‌লি?—আমি সংস্কৃত জানি না?—আমার ঠাকুর-দাদা,—জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের টোলে প'ড়েছিল!

শিয়ালমারা। শালা!—কৈবোৎ কেওট! মাছ ধ'রে,—নৌকা বেয়ে,—তোদের বিশ পুরুষের আন—লবেজান হ'য়ে গেছে; সোনা শালা বলে কিনা!—আমার ঠাকুরদাদা ত্রিবেণীর টোলে সংস্কৃত প'ড়েছে।—জারে কেওট—মালা—জোলা—জুগী—কৈবোৎ—এদিকে কি কেউ টোলে ঢুকতে দেয়?

এই কথা বলিয়া,—শিয়ালমারা চোয়াড়ে হাসি—স্বজাতীয় হাসি,—হাসিতে লাগিল!—সনাতন দাসও হো-হো-শব্দে সে

হাসিতে যোগ দিল। কহিল,—'সাবাস্!—সাবাস্! শিয়ালমারা! জীতা রও!—জীতা রও।'

শিয়ালমারা! আর একটা বোতল ভাঙ্গ!—তোর্ যেমন কাণ্ড!—শ্যাম্পিনে কি নেশা হয়?—না, সুখ হয়? বেশী টাকা দাম দিয়ে, ওগুলো যে কেন কিনে আনিস তা আমি কিছুই ব'ল্‌তে পারিনে।

সনাতন। (হাসিয়া) শালা আমাকে কৈবোৎ বলে; আমি ত কৈবোৎ চিরকালই আছি এবং থাকিব;—তুই শালা যে বামুন হ'য়ে কৈবোতেরও অধম হ'য়ে গেলি। শালা দুধ ছেড়ে—ঘোল খেতেই মজবুত; সন্দেশ ছেড়ে মুড়ি খেতেই মজবুত। ষোল টাকা ক'রে এক এক বোতল শ্যাম্পিন আন্‌ছি; তুই কিনা, হ্যাক্ থু ক'রে তাই ফেলে দিচ্ছিস! নিরেট চাষায় কি কখনও পোলাও খেতে পারে? ঘিয়ের গন্ধে তার বমি আসে। শ্যাম্পিনের মর্ম্ম চাষায় কি বুঝ্‌বে?

শিয়ালমারা। আমি চাষা চাষাই! আমায় কিন্তু ভাল মদ দাও।—ব্রাণ্ডির বোতল খোল, আর ঢাল। আমি শ্যাম্পিন খাইয়া দেবতা হইতে সম্মত নই,—আমি ব্রাণ্ডি খাইয়া মুদ্দফরাস হইতেও ভাল বাসি।

সনাতন। বেটা কি মদের ভক্ত রে! তুই যা বলেছিস্, এক হিসাবে কথাটা ঠিক বটে। যদিও আমি মুখ ফুটে বলিতে পারি না, কিন্তু আমার মনে হয়, শ্যাম্পিন-ফ্যাম্পিন—ও সব কেবল বাহার মাত্র! আসরের শোভা মাত্র; ব্রাণ্ডিই মদের রাজা। তবে কি জানিস্ ভাই! এ সব মদ ত কখনও খাই নাই। উহাতে কি মজা আছে, জানিবার জন্য, উহা কেবল চাখিয়া দেখিতেছি। ব্রাণ্ডি আমিও ভালবাসি।

তখন দুই বোতল ব্রাণ্ডি আসিল, গ্লাস আসিল; জল আসিল এবং ভাজা-ভাজা পাঁটার মাংসও এক থাল আসিল। উভয় বন্ধু,—শ্রীভগবান্ এবং তাঁহার প্রধানতম চেলা,—তখন গ্লাস গ্লাস সুরাপান আরম্ভ করিলেন। উভয়েরই স্ফূর্ত্তির মাত্রা ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিল। গল্প-শক্তি দশগুণ বাড়িল। উভয়ের কথায় উভয়ের মন মজিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

সনাতন। ভ্রাতা হে! আমি যাহা বলি, তাহা শুন। মনে আছে ত,—প্রথম প্রথম তোমাকে যখন গেরুয়া বসন পরাই,—তখন একরমক সম্মান পাইয়াছিলে; তাহার পর তোমাকে বাঘ-ছাল পরাই। বাঘ-ছালে সম্মানের মাত্রা কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাহার পর, যে দিন তোমাকে কৌপীন ধরাইলাম, বহির্ব্বাস ত্যাগ করাইলাম, সেই দিন হইতে তোমার শিষ্য-সংখ্যাও আরও বাড়িতে লাগিল; সম্মান-বৃদ্ধির ত কথাই নাই। এমন কি, এখন তোমাকে অনেকে সত্য সত্যই শ্রীভগবান্ বলিয়া ভাবিতেছে। ইহা অপেক্ষা যদি আরও অধিক সম্মান বাড়াইতে চাও, তাহা হইলে তোমাকে আরও একটী কর্ম্ম করিতে হইবে।

শিয়ালমারা। সে কর্ম্মটী কি ভাই?

সনাতন। সে অতি সহজ কর্ম্ম।

শিয়ালমারা। সহজ হউক আর শক্তই হউক, তুমি যখন বলিতেছ, তখন সে কর্ম্ম করিবই। তুমি যদি আমাকে আকাশের চাঁদ ধরিতে বল, তাহাতেও আমি পেছ্‌-পাও হইব না। ওহে

ভাই! তোমার কথায় আমি বাঘের মুখে,—গোখুরা সাপের মুখে,—হাত দিতে পারি। তুমিই আমার আমিই তোমার। সেও আমার, আমি তার;—হরিও রামের, রামও হরির। অতএব ভায়া! তুমি যাহা আমাকে করিতে বলিবে,—আমার পক্ষে তাহা অকাট্য,—কিছুতেই কাট্য নহে। নাট্যশালায় গেলে অপাঠ্য হইতে পারে। তবে শাঠ্য কিনা,—সংসারে সকলি লাঠ্য হইয়া যায়!

মদে ঢুলু-ঢুলু আঁখি শিয়ালমারা, এইরূপ এবং অনুরূপ, নানা কথা বলিতে লাগিলেন। ভক্ত সনাতন দাস বৈরাগী, সুরায় সিদ্ধ ছিলেন; মহানির্ব্বাণতন্ত্রের মতে তিনি নেশা করিতেন,—শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের মতে লীলা করিতেন। শাস্ত্র-ছাড়া এক পাও চলিতেন না। শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ সনাতন,—বন্ধু শিয়ালমারার ভাব-বিহ্বলতা দেখিয়া, অন্তরে বড় হৃষ্ট হইলেন; বুঝিলেন,—এইবার আমার কার্য্য সফল হইবে, এইবার বন্ধুকে প্রতিজ্ঞা-পাশে বদ্ধ করিয়া লইব। প্রকাশ্যে কহিলেন, ভ্রাতঃ শৃগাল-হন্তা! সে কর্ম্মটী অতি সহজ এবং অতি উত্তম।

শিয়ালমারা। হে দাদঃ!—হে শ্রীসনাতন বৈরাগ্য! সে প্রিয় মধুর কর্ম্মের কথাটী কহ; আমি নিশ্চয়ই তদনুযায়ী কার্য্য করিব।

সনাতন। সে কার্য্য আর কিছুই নহে, এইবার তোমাকে কৌপীন ছাড়িয়া, উলঙ্গ হইয়া, তিন দিন কাল কাশীময় বেড়াইতে হইবে।

শিয়ালমারা। (সচকিতে) ওরে বাপুরে!—ওরে বাপুরে!—আমি পা'রবো না; দশ লক্ষ টাকা গণিয়া দিলেও, তাহা,

আমি পারিব না। ন্যাংটা হইয়া,—ঢং ঢং করিয়া—কাশীতে বেড়ান আমার কর্ম্ম নয়; শ্রীভগবান্ সাজিয়া আমার কাজ নাই। এই যে কৌপীন পরিয়া বসিয়া আছি, ইহাতেই আমার লজ্জা পায়; মধ্যে মধ্যে হাসি আসে।

সনাতন। সে কি ভাই! উলঙ্গ হইতে ভয় কি? লজ্জাই বা কি? আমাকে বল না, এখনি মাথায় কাপড় বাঁধিয়া একেবারে দিগম্বর হইয়া, চক-বাজার দিয়া বেড়াইয়া আসি। তুমি কি কাশীতে ন্যাংটা সন্ন্যাসীর দল দেখ নাই? প্রয়াগে কুম্ভমেলায় প্রায়ই দু-চারি হাজার নিরেট ন্যাংটা পাঞ্জাবী সন্ন্যাসীর দল আসিয়া থাকে। তুমি কি তাহা দেখ নাই? তাহাদের দেহের কোথাও কিছু নাই,—সব ফাঁকা; আর ন্যাংটা নয় কে? এই যে শুকদেব গোস্বামী এত বড় পণ্ডিত ছিলেন, তিনি উলঙ্গ হইয়া বেড়াইতেন। আর এই যে মহাদেব, তিনি ন্যাংটার বাবা; কাপড় পরা বা না-পরা দুই সমান; বরং পরার চেয়ে না-পরা ভাল। আর এই যে শ্রীকৃষ্ণ, তিনি মেয়ে দেখিলেই কাপড় কাড়িয়া লইয়া ন্যাংটো করিয়া দিতেন। তাই বলিতেছি, ন্যাংটা নয় কে? যাহাতে দেবতার প্রীতি, মুনি-ঋষির প্রীতি, সাধু-সন্ন্যাসীর প্রীতি, তাহাতে ভাই! তোমার অপ্রীতি হয় কেন? দ্বিপদ ছাড়িয়া চতুষ্পদে আইস, দেখিবে প্রত্যেক জন্তুই উলঙ্গ। এমন যে হনুমান্,—যাহারা কেবল মিউনিসিপ্যালট্যাক্সের ভয়ে কথা কন না,—তাঁহাদের নর-নারীর মধ্যে কাহাকেও কাপড় পরিতে দেখিয়াছ কি? কুকুরের কাপড় নাই, অথচ কুকুর কি বাড়ী বাড়ী,—পাড়ায় পাড়ায় বেড়ায় না? ছাগলের যে কাপড় নাই, অথচ ছাগল কাহার না সমক্ষে আসিতেছে? এমন যে

ঐরাবত হাতী,—সে বিরাটমূর্ত্তির বর্ণন কেমন করিয়াই বা করি,—এমন যে উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, যাহার প্রকট মূর্ত্তির দৃষ্টান্ত সহজে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সেই উলঙ্গ হাতী ও ঘোড়াকে মানুষে অর্থ দিয়া কিনিয়া সম্মুখে বাঁধিয়া রাখে ; আর মেয়ে-পুরুষে তাহার উপর চড়ে। ইহা দ্বারা কি বুঝা যাইতেছে না যে, বিধাতার ইচ্ছা, সর্ব্বথা জীবসমূহ উলঙ্গ হইয়া ধরাধামে বসবাস করুক। আচ্ছা, একটী কথা ভাব দেখি। মানুষ যখন জননী-জঠর হইতে ভূমিষ্ঠ হয়,—উলঙ্গ হইয়া, না কাপড় পরিয়া? বিবেকবান্ চসমা-নাকে ভক্ত ভ্রাতা ছাড়া আর কাহাকেও বলিতে হইবে না যে, মানুষ উলঙ্গ হইয়াই ভূমিষ্ঠ হয় ; মানুষকে উলঙ্গ রাখাই যদি বিধাতার অভিপ্রায় না হইত, তাহা হইলে তিনি একখানি দিব্য শান্তিপু'রে কন্সাদার কাপড় পরাইয়া, মানুষকে কি ভূমিষ্ঠ করাইতে পারিতেন না? তিনি নাক দিতে পারেন, কাণ দিতে পারেন, চোখ দিতে পারেন,—পারেন না কি কেবল কাপড়টুকু দিতে? তিনি বাক্-শক্তি,—চিন্তাশক্তি,—চলনশক্তি,—আস্বাদনশক্তি,—সবই দিতে পারেন,—পারেন না কি কেবল কাপড়টুকু দিতে? ভগবান্ যদি গরীব হন,—নাই বা তিনি শান্তিপু'রে বা ঢাকাই কাপড় দিতে পারিলেন,—পাঁচগণ্ডা পয়সার একখানি বিলাতি কাপড়ও ত দিতে পারিতেন। অথবা পুরোণো কাপড়ের হাট হইতে, পাঁচ পয়সা দিয়া, একখানি পুরোণো কাপড়ও ত দিতেই পারিতেন! অতএব বিধাতার একান্তই অভিপ্রায়, নর-নারীগণ উলঙ্গ হইয়া বসবাস করুক। আদম ও ইভের কি কাপড় ছিল? এই যে শক্তিরূপিণী মা—কৈবল্যদায়িনী করালবদনা কালী, ইনি যে উলঙ্গিনী। গানে কি শুন নি?

"কে শ্যামাঙ্গিনী, মত্ত মাতঙ্গিনী,
উলঙ্গিনী হ'য়ে সমরে নাচিছে!"

শিয়ালমারা। বৈরাগীর পো! তুই এত পণ্ডিত হলি কোথা থেকে? দেখ্, ও সব কথা রাখ্, আর একটা বোতল নিয়ে আয়। শেষে যে কালীনাম কর্‌লি ও নামের একটু সার্থকতা হউক।

সনাতন। বেশী মদ খাওয়া হবে না; খুব ভোর ভোর রাত্রি তিনটার পরই আমাদিগকে শয্যা হইতে উঠিতে হইবে। কারণ, খুব ভোর বেলা হইতেই শিষ্যবর্গ এবং যাত্রিসমাগম হইয়া থাকে। তখন মাতাল হইয়া পড়িয়া থাকিলে, প্রকৃত কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটিতে পারে।

শিয়ালমারা। আরে ঘটে ঘটুক্;—তুই একটু মদ দে। আর বেশী চাইনে,—দুই গেলাস হইলেই হইবে। একটু দে। আর আমি ত অধিকাংশ সময় মৌনী হইয়া থাকি, না হয় মাতাল হইয়া পড়িয়া থাকিলাম! তুই একখান বালাপোষ চাপা দিয়া আমাকে ঢাকিয়া রাখিবি; আর না হয় বলিবি, ঠাকুর এখন সমাধিস্থ।

সনাতন। ঐ রকম অবস্থায় তুই যদি বমি করিস্?

শিয়ালমারা।-তুই বলিবি, ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ হইল, তাই উদ্গার উঠিতেছে। ঠাকুর এতক্ষণ শ্রীবৈকুণ্ঠে ছিলেন কি না,—স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী স্বহস্তে চৌষট্টি প্রকার ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া, শ্রীভগবান্‌কে খাওয়াইয়াছিলেন কিনা,—তাই উদ্গারের কিঞ্চিৎ আতিশয্য হইয়াছে!

সনাতন। সাবাস, ভায়া!—সাবাস! তোর যে এত বুদ্ধি হইয়াছে, তাহা আমি জানিতাম না। তুই যদি আর কিছু দিন বেঁচে থাকিস, তা হ'লে জগতের অনেক উপকার হ'তে পারে।

শিয়ালমারা। বেঁচে থাকা-থাকির কথা ঈশ্বরের হাত;—কিন্তু উপস্থিত যে আমি তোর হাতে প্রাণে ম'লাম! দে ভাই একটু মদ দে;—আর আমি থাকৃতে পারিনে।

সনাতন। তুই যদি উলঙ্গ হ'য়ে বেড়াইতে স্বীকার করিস্, তা হ'লে এক বোতল কেন,—ছুই বোতল দিতে পারি।

শিয়ালমারা। আচ্ছা, তাই না হয় বেড়াব; দে এখন মদ দে।

সনাতন। তা হবে না বাবা! আগে প্রতিজ্ঞা কর,—শপথ কর।

শিয়ালমারা। গুরুর দিব্য করে ব'ল্চি, কালই উলঙ্গ হ'য়ে বেড়াব।

সনাতন। তোর আবার গুরু কেরে বেটা?

শিয়ালমারা। জানিস্ নে, আমার গুরু কে? সেদিন তোকে ব'লেছিলাম।

সনাতন। ও হো! বটে, বটে, রঘুদয়াল তোর গুরু; আমি তাঁকে জানি,—বেশ চিনি। তিনি ত আমারও গুরু। সে ত আমাদের লাঠি-খেলার গুরু। আমি মনে ক'রেছিলাম, মন্ত্র দেওয়া সন্ন্যাসী গুরু; অথবা তোর ঠাকুর-মহাশয়ের কথা বল্‌ছিস্।

রঘুদয়ালের নাম হইবামাত্র, উন্মত্ত শিয়ালমারা,—রঘুদয়ালের উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল। সনাতন দাসও যুক্তকরে প্রণাম করিল। আবার এক বোতল মদ আসিল, সনাতন দাস মদ ঢালে, মদের উপর জল ঢালে, নিজে একটু খায়, আর তার পরে শিয়ালমারাকে খাইতে দেয়। এরূপ ভাবে সুধাপান চলিতে লাগিল এবং কথাবার্তা হইতে লাগিল।

সনাতন দাস কহিল, "হঠাৎ ন্যাঙটা হওয়া ভাই! একটু শক্ত বটে; তুই যা ব'লছিস্, তা ঠিক্। ন্যাঙটো হ'য়ে বাজারে বেরোবার পূর্ব্বে ঘরে দিন-কতক খিল দিয়ে, ন্যাঙটো হ'য়ে এ-কোণ ও-কোণ পা-চালি কর্। এইরূপ অভ্যাস কিছুদিন হইলেই, তোর আর হাসি আসিবে না,—লজ্জাও হইবে না।

শিয়ালমারা। আমি মুখে যাহাই বলি না কেন, হাসি বা লজ্জাকে তত ভয় করি না। আমি যেরূপ গতিক দেখিয়েছি, তাহাতে স্ত্রীলোকগণের—বিশেষতঃ কাশীর স্ত্রীলোকগণের মধ্যে অনেকেরই,—অসাধ্য কর্ম্ম কিছুই নাই। আমি উলঙ্গ হইয়া পথে বাহির হইলেই, আগে স্ত্রীলোকগণ বিশেষতঃ—সুন্দরীগণ,—যুবতীগণ—রসিকাগণ, দলে দলে আমাকে দেখিতে আসিবে, ঘেরিয়া দাঁড়াইবে এবং অনিমিষ-লোচনে আমার দেহের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে। আমার ত এই বয়স,—আর এই শরীর, সংযম কাহাকে বলে তাহা ত আমি কস্মিন্ কালেও জানি না। এইরূপ উলঙ্গ হইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে যদি কোনরূপ গোল-যোগ ঘটে,—তাহা হইলে তখন উপায় কি? একবারে সমস্ত মায়াজাল যে ছিন্ন হইয়া যাইবে।

সনাতন। কুছ্ পরোয়া নেই, কুছ্ পরোয়া নেই। হাম্ সব ঠিক্ কর্ লেঙ্গে! গোলযোগের ভয় তুমি ভাবিও না। তুমি উলঙ্গ হও, গোলযোগ যদি কিছু ঘটে, সে দায় আমার রহিল। তুমি উলঙ্গ হইলে, আমি তোমার সাত খুন মাপ করাইয়া দিব। একবার উলঙ্গ হইতে পারিলে, আমাদের এখন যে ঐশ্বর্য্য হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক বৃদ্ধি হইবে।

শিয়ালমারা। তোমার কথাতেই আমি উলঙ্গ হইতে সম্মত হইলাম। দেখিও ভাই! বিপদে রক্ষা করিও, পায়ে তরোয়ালে কাটা দাগ কয়েকটা আছে; পায়ে গুলি ফোটার দাগ আছে;—এ গুলা ঢাকিতে হইবে।

সনাতন। তজ্জন্য কোন চিন্তা নাই। যে দিন তুমি প্রথম উলঙ্গ হইবে, সে দিন তোমাকে ধূলা-কাদা মাখাইব; তাহার উপর ভস্ম মাখাইব,—সে সব দাগ কেহই দেখিতে পাইবে না। কল্য হইতে দিনের বেলা ঐ কুটীরে অন্ততঃ দুই দিন উলঙ্গ হইবার আখড়াই দিও। আখড়াই দিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিব।

শিয়ালমারা। আচ্ছা, তাহাই হউক; আমাকে এখন যাহা বলিবে, তাহাই করিব। আমাকে যে মদ দেয়, তাহার জন্য আমি মরিতে পর্য্যন্ত প্রস্তুত আছি,—উলঙ্গ হওয়া ত ছার কথা।

সনাতন। তোমার মধুমাখা কথায় আমার প্রাণ জুড়াইল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

কাশীধামে আজ নগর-সঙ্কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে উলঙ্গ সন্ন্যাসী বাহির হইয়াছেন। চারি দিক্ হইতে লোক ছুটিয়াছে। অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার! অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার! পথে এত জনতা যে, লোক ঠেলিয়া যায়, সাধ্য কার? কেহ অশ্ব-পৃষ্ঠে, কেহ গজপৃষ্ঠে, কেহ এক্কার উপর, কেহ পাল্কীর ভিতর,—অবশিষ্ট পদব্রজে, সকলেই উলঙ্গ-সন্ন্যাসী দর্শন-মানসে যাত্রা করিয়াছেন। কাশীধামে কোন গৃহেই বুঝি আজ লোক নাই,—সকলেই বাহির হইয়া রাজপথে আসিয়াছে। অশ্বের হ্রেষারব, গজের বৃংহিতধ্বনি, আর সাগর-

তুল্য মানব-কণ্ঠের কল্লোল-কোলাহল একত্র মিশিয়া, এক অপূর্ব্ব ভৈরবনাদের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রায় এক ক্রোশ পথ জুড়িয়া লোক-সমাগম। কে কাহার গায়ে পড়ে, তাহার ঠিক্ নাই। কে কাহাকে ধাক্কা দেয়, কে কাহাকে ঠেলিয়া দেয়, কে কাহাকে মারে, তাহারও ঠিক্ নাই। হুড়াহুড়ি জড়াজড়ি ক্রমশঃ বিষম হইয়া উঠিল। মনুষ্য খুন হইবার উপক্রম হইল। কি ভয়ানক ব্যাপার! দেখা গেল, এক পর্ব্বত-প্রমাণ হস্তী আরোহিগণকে ফেলিয়া দিয়া, মাহুতকে ফেলিয়া দিয়া, ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া, নক্ষত্র-বেগে ছুটিয়া, সেই জনতার দিকে আসিতেছে। 'সর্ব্বনাশ হইল, সর্ব্বনাশ হইল,—গেলাম, গেলাম,—মরিলাম, মরিলাম!'—লোকমুখ হইতে এইরূপ একটা ধ্বনি উত্থিত হইল। আর রক্ষা নাই, আর রক্ষা নাই!—ঐ দেখ, উন্মত্ত ঐরাবত ভিড়ের ভিতর আসিয়া এইবার বুঝি ঢুকিল। লোক সকল পলাইবার চেষ্টায় আপনা-আপনি পরস্পর তাল পাকাইয়া, জড়াইয়া ভূতলে পড়িতে লাগিল। কাহারও হাত ভাঙ্গিল,—কাহারও পা ভাঙ্গিল,—কাহারও মাথায় আঘাত লাগিল,—কেহ চিৎপাত হইয়া পড়িয়া গিয়া, লোকের চরণাঘাতে মৃতপ্রায় হইয়া রহিল। লোক,—আত্মপ্রাণ রক্ষা করিতে গিয়া এইরূপে আপনা-আপনি আধ-মরা হইতে লাগিল। আর ঐ দিকে,—ঐ প্রচণ্ড দাবানলবৎ,—অগ্নি-মুখ ভীষণ ব্রহ্মাস্ত্রবৎ, ক্ষিপ্ত হস্তী ভীম বেগে, শুণ্ড ঘুরাইতে ঘুরাইতে, বৃংহিতধ্বনি করিতে করিতে, দেবদারুবৎ বৃহৎ দন্তদ্বয় প্রসারণ-পূর্ব্বক ঐ আসিয়া আমার উপর পড়িল;—এই বার বুঝি সত্য সত্যই মরিলাম। প্রাণরক্ষার ত আর কোন উপায় দেখি না,—গেলাম গেলাম!

একি দেখি! এক কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘাকার পুরুষ, এক বিশাল-লোচন বিশালবক্ষা মহাপুরুষ—আজানুলম্বিত বাহুদ্বয় দ্বারা এক লম্বা লাঠি ধারণ করিয়া লম্বা লম্ফে দৌড়িয়া গিয়া, সেই ক্ষিপ্ত-হস্তীর মস্তক লক্ষ্য করিয়া একটু থমকিয়া দাঁড়াইলেন। হাতী যখন সম্যক্‌রূপে তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইল, তখন তিনি হস্তি-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া, সজোরে তাহার মাথার উপর যেন নিমেষ-মধ্যে, চক্ষুর পলক পড়িতে না পড়িতে, তিন বার লাঠি বসাইয়া দিলেন। প্রথম লাঠি খাইয়া, যেমন তাঁহার দিকে হাতী ছুটিল, অমনি তিনি এক লাফে বার হাত দূরে গিয়া দাঁড়াইলেন। তথা হইতে দ্বিতীয় লাঠি তিনি আঘাত করিলেন। দ্বিতীয় লাঠি খাইয়া, হাতী যখন তাঁহাকে তাড়া করিল, তখন তিনি সেইখান হইতে হাতীকে তৃতীয় লাঠি মারিলেন। হাতীর মাথার খুলি ভাঙ্গিল কিনা জানি না; কিন্তু রুধিরে হাতীর সর্ব্বাঙ্গ রঞ্জিত হইল। হাতী পশ্চাৎপদ হইয়া, এক বিকট চীৎকার করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলাইল। অল্পদূর যাইতে না-যাইতে হাতী কম্পিত-কলেবর হইয়া মাথা ঘুরিয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

হাতী পড়িল, ওদিকে নগর-সঙ্কীর্ত্তন থামিল,—লোক সকল যে যেথানে ছিল, পলাইল। অনেক গণ্য মান্য ধনাঢ্য ব্যক্তি সেখানে ছিলেন। যে ব্যক্তির লাঠির আঘাতে হাতী মরিল, তাঁহাকে তাঁহারা বহু অন্বেষণ করিলেন; কিন্তু কোথাও আর খুঁজিয়া পাইলেন না।

কাশীর সর্ব্বত্রই ধন্য ধন্য ধ্বনি পড়িয়া গেল। লাঠির আঘাতে হাতীর মৃত্যু ঘটিল,—এ কি সামান্য কথা! কৈ, কোথায় সেই লাঠিবাজ? তিনি মানুষ না দেবতা? অনেকে অনুমান করিলেন,—

শ্রীভগবান্-রূপী সন্ন্যাসী আজ লাঠিয়াল-বেশে, জীবের প্রাণরক্ষার নিমিত্ত ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া লাঠির দ্বারা ঐরাবতের প্রাণসংহার করিয়াছেন! ভগবান ভিন্ন আর রক্ষাকর্ত্তা কে আছে?

দশাশ্বমেধের ঘাটে উলঙ্গ শ্রীভগবান্ পৌঁছিয়াই সনাতন দাসের কাণে কাণে কহিলেন, "ভাই! সর্ব্বনাশ হইয়াছে। নিশ্চয় আমাদের গুরুদেব আসিয়াছেন। গুরুদেবের লাঠিভিন্ন কাহার এমন শক্তি যে, হাতীর প্রাণ-বধ করিতে পারে? সর্ব্বনাশ হইয়াছে ভাই! সর্ব্বনাশ হইয়াছে! চল, অদ্য রাত্রেই এখান হইতে পালাই। কারণ, তিনি কাল প্রাতে অবশ্যই এখানে আসিবেন। আমি সর্ব্বদুষ্কর্ম্ম করিতে পারি, কিন্তু গুরুদেবের সমক্ষে কখন বেয়াদবি করিতে পারিব না। কেমন করিয়া তাঁহার সাক্ষাতে, তাঁহার সমক্ষে উলঙ্গ হইয়া, বসিয়া থাকিব? যে গুরুদেবের সাক্ষাতে কখন আমি তামাক পর্য্যন্ত খাই নাই,—যাঁহার নিকট সর্ব্বদা যোড়হাতে গলায় কাপড় দিয়া দাঁড়াইয়া থাকি,—আমি ব্রাহ্মণ হইলেও যে গুরুদেবকে অন্তরের সহিত ভক্তিপূর্ব্বক মনে মনে পূজা করি,—সে গুরুদেবের নিকট কাল আমি কিরূপে এরূপ বুজরুকি দেখাইব? আমি পাপী,—মহাপাপী বটে; আমি নরহন্তা বটে; অনেকের গৃহদগ্ধ করিয়াছি, অনেকের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছি; পৃথিবীতে অনেক অকাজ-কুকাজ করিয়াছি; কিন্তু গুরুদেবের অসম্মান কখন করি নাই। এক গুরুদেবভিন্ন সংসারে আমার কেহ নাই। মাতা নাই, পিতা নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই। প্রভাতে সূর্য্যদেব উঠিলে, আগে গুরুদেবকে পূজা করিয়া, তবে সূর্য্যদেবকে প্রণাম করিয়া থাকি; রাত্রে গুরুদেবের মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া তবে নিদ্রিত হই; সে গুরুদেবের সমক্ষে আজ কি রূপে আমি উলঙ্গ

হইয়া দাঁড়াইব বলো দেখি ? ভাই ! চল, আজই পলাইয়া যাই। চল প্রয়াগে যাই। ঘাটে বৃহৎ বজরা বাঁধো আছে,—বত্রিশটী দাঁড়ী লইয়া বত্রিশটী দাঁড় এককালে ফেলিয়া ধন-সম্পত্তি যাহা কিছু আছে, সমস্তই বজরায় তুলিয়া লইয়া চল ভাই ! আমরা প্রয়াগে পালাইয়া যাই।

সনাতন। তাও কি কখন হয় ? বিপদ্ বিষম সত্য বটে ; বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইবার উপায় চিন্তা করো ;—রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন-পরায়ণ হওয়া কাপুরুষের কার্য্য ! প্রয়াগে গিয়া কি করিবে ভাই ! এখানে যেমন পসারটা জমিয়াছে, শত চেষ্টা করিলেও প্রয়াগে তাহার সিকি পসারও জমিবে না। স্থান-গুণে, লোক-গুণে, কাল-গুণে, পসার জমিয়া থাকে। প্রয়াগ,—কাশীর নিকট ক্ষুদ্র-স্থান। অতএব প্রয়াগ-গমন যুক্তিসিদ্ধ নহে—এইখানে থাকিয়া যাহাতে বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, তাহার উপায় দেখ ভাই !

শিয়ালমারা। আমি ত উপায় কিছু দেখিতেছি না।

সনাতন। আচ্ছা, কল্য প্রভাতে মুখে তেল-কালী মাখিয়া থাকিলে কি হয় ? তাহা হইলে তোমার গুরুদেব ত তোমাকে কিছুতেই চিনিতে পারিবেন না। তেল-কালীর উপর একটী লম্বা দাড়ী যদি বাঁধো, তাহা হইলে কাহার সাধ্য তোমাকে চিনিয়া লয় ?

শিয়ালমারা। ভাই ! তুমি পাগল হইয়াছ, দেখিতেছি। প্রথমতঃ আমি যদি মুখে তেল-কালী মাখিয়া এক দাড়ী করিয়া বসিয়া থাকি, তাহা হইলে ভক্তবৃন্দ কি মনে করিবে, বলো দেখি ? তাহারা ভাবিবে, ঠাকুরের এ কি রকম !—বা এ কি রোগ !

সনাতন। ওহে ভায়া ! এর জন্য তুমি ভাবিও না ! এই কথায় ভক্তবৃন্দের মন একেবারে জল করিয়া দিব। আর ভক্তকে

যাহা বিশ্বাস করিতে বলিবে, তাহাই সে নিশ্চয় বিশ্বাস করিবে। যে দিকে ফিরাইবে, সেই দিকে ফিরিবে। ভক্ত আর ভেড়া, দুই সমান। ভক্তের জন্য তোমার কোন ভাবনা নাই। সে সব আমি সারিয়া লইব। বলিব, অদ্য ভগবান্ এক নূতন লীলা করিতেছেন। কালীরূপেতে অসি এবং কৃষ্ণরূপেতে বাঁশী ভগবান্ ধরিয়াছিলেন। আর আজ ভগবান্ কৃষ্ণমর্কটরূপী হইয়া দাড়ী ধারণ করিয়াছেন। অতএব মহামর্কটের মহামহোৎসবে কেবল আম ভোগ দাও। দেখিবে, সহস্র সহস্র লোক কল্যই তোমায় ষোড়শোপচারে পূজা দিবে। যাহা তোমার আয় হইত কল্য হইতে তাহার দ্বিগুণ তোমার আয় হইবে। তাই বলিতেছি ভাই! ভক্ত আর ভেড়া দুই সমান।

শিয়ালমারা। আচ্ছা, ভাই! না হয় তাই হইল; কিন্তু আমি গুরুদেবের সমক্ষে মর্কট হইয়া, দাড়ী লইয়া, উলঙ্গ হইয়া, কিরূপে বা থাকিব? গুরুদেব আমাকে না হয় না-ই চিনিতে পারিলেন; কিন্তু আমি গুরুদেবকে এরূপ অসম্মান করিব কিরূপে? এক কর্ম্ম করো! কল্য আর আমি বাহির হইব না। ঐ গুপ্তগৃহেই লেপমুড়ি দিয়া শুইয়া থাকিব। তুমি বাহিরে রাষ্ট্র করিয়া দিও, ভগবান্ সমাধিস্থ হইয়াছেন।

সনাতন। তোমার কোন চিন্তা নাই। যাহা করিতে হয়, আমিই তাহা কাল করিব। সাপও না মরে, লাঠিও না ভাঙ্গে, এমন উপায় অবশ্যই আমি করিব। তুমি সুখে নিদ্রা যাও, অনেক রাত হইয়াছে।

শিয়ালমারা। আচ্ছা ভাই! বলো দেখি, গুরুদেব হঠাৎ কেন কাশীতে আসিলেন? বোধ হয় অদ্য প্রাতেই আসিয়াছেন।

পূর্ব্বে আসিলে, অবশ্যই আমাকে আগে দেখিতে পাইতেন। উহাঁর মনিব খুব বড়লোক ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ছেলেদের অবস্থা ত বড় খারাপ,—ছেলেদের ত তীর্থ করিতে আসিবার সময় নয়।—তবে যদি মা-ঠাকুরুণ আসিয়া থাকেন, বলিতে পারি না;—বোধ হয়, মা-ঠাকুরুণের সঙ্গে গুরুদেব আসিয়া থাকিবেন। ভাগ্যে গুরুদেবের আগমন পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছি তাই রক্ষা; নচেৎ তিনি যদি হঠাৎ আমাদের নিকট আসিতেন, তাহা হইলে আমা-দিগকে হাতে-নাতে ধরিতেন। সে যা হোক, আমি যেন না-হয় লুকাইয়া রহিলাম; কিন্তু ভাই! তোমাকেও ত তিনি চিনেন! বিশেষতঃ, তিনি জাল-জুয়াচুরির উপর বড়ই চটা। গুরুদেব যদি দেখেন, আমরা শ্রীভগবান্ সাজিয়া ধর্ম্মের ব্যবসায় আরম্ভ করি-য়াছি, তাহা হইলে আমাদের উপর বড়ই বিরক্ত হইবেন এবং তখন ইচ্ছা করিলে, এই মায়াজাল এবং মুহূর্ত্তেই ছিঁড়িয়া দিতে পারেন।

সনাতন। ওরে ভাই! কোন চিন্তা নাই;—কোন চিন্তা নাই। আমি একটা মুখোস পরিয়া বসিয়া থাকিব। গণ্ডারের মুখোস পরিয়া বলিব, আমি আজ গণ্ডার-অবতার হইয়াছি। ধরাধামের পাপরাশি নাশ করিবার জন্য, আমার প্রতি তাঁহার আদেশ হইয়াছে। তুমি মজাটী দেখিও,—এই গণ্ডার-অবতারের কথা লোকে বিশ্বাস করিবে,—পূজাও দিবে। ইহা যদি না হয়, ত আমার নাক-কাণ কাটিয়া, আমাকে নরকে ফেলিয়া দিও।

শিয়ালমারা। ধন্য তোমার বিদ্যা, আর ধন্য তোমার বুদ্ধি! তোমার বিদ্যা-বুদ্ধিতেই এই সব।

সনাতন। কোথায় তোমার গুরুদেব, তাহারও ঠিক নাই;

কোথায় কে লাঠি মারিল, তাহাও কেহ দেখে নাই,—আর গুরুদেব হইলেও কাল তিনি আমাদের নিকটে আসিবেন কিনা, তাহারও স্থির নিশ্চয়তা নাই,—অথচ তোমাকে কল্য গুপ্তগৃহে লুকাইয়া থাকিতে হইবে এবং আমাকে গণ্ডার সাজিতে হইবে। বিধাতার বিচিত্র লীলা এইরূপ!

আট হাত মাটির নীচে একটী অন্ধকারময় ঘর ছিল,—সেই ঘরে টাকা, মোহর, বস্ত্রাদি ও মদের বোতলাদি থাকিত। ভক্তগণ জানিত ইহা হঠযোগ সাধনের ঘর। একখানি তক্তাপোষ পাড়া ছিল। দুইটী লোক কষ্টে সেই তক্তাপোষে শুইতে পারিত। সে গৃহে অন্যের প্রবেশ নিষেধ। সেই গর্ত্তের উপর তক্তা বিছানো ছিল—তার উপর থলী—তার উপর খড়, তার উপর শতরঞ্চ। তার উপর বেদী,—বেদীর উপর শিয়ালমারা শ্রীভগবান সাজিয়া বসিয়া থাকিতেন। গর্ত্তে ঢুকিবার পার্শ্বে এক সুড়ঙ্গ ছিল,—তাহার উপর তক্তা চাপা থাকিত।

একাবংশ পরিচ্ছেদ।

কাশীর অধিবাসিগণ দুই দলে বিভক্ত হইল। একদল বলিল, ইহা দেবতার কাজ,—দেবশক্তি ভিন্ন এরূপ মত্তমাতঙ্গ লাঠির আঘাতে কখন নিহত হইতে পারে না। ঐ উলঙ্গ সন্ন্যাসী মানুষ নয়, দেবতা; তাঁহারই এই কাজ।

আর একদল বলিল,—সচক্ষে যখন মানবমূর্ত্তি দেখিলাম, তখন তাহাকে দেবতা বলিতে যাইব কেন? কৃষ্ণবর্ণ রং, দীর্ঘ আকার,

হাতে লাঠি,—সম্মুখে ত এইরূপ মূর্ত্তিই দেখিলাম। দেবতার মূর্ত্তি কি ঐরূপ! হাতীকে বধ করাই যদি দেবতার ইচ্ছা ছিল, তাহা হইলে দেব-ইচ্ছাতেই তখন আপনা হইতে হাতীটা ত ভূতলে পড়িয়া গড়াগড়ি দিত। অথবা দেবতা ত নীরব মন্ত্রে হাতীকে ভস্ম করিয়া ফেলিতে পারিতেন। দেবতাকে দীর্ঘাকার কৃষ্ণকায় মানুষ সাজিয়া লাঠি ধরিতে হইবে কেন? তবে বলিতে পার, দেবতার বুঝি এ নর-লীলা। কলিকালে পৌষমাসে কাশীধামে ভগবান্ এইরূপ নর-লীলা করিবেন,—কোন পুরাণে কি এই কথা উক্ত হইয়াছে? ভগবান্ও নয়, নর-লীলাও নয়; একজন বলবান পুরুষ হাতীটাকে মারিয়া ফেলিয়াছে, এই কথাই ঠিক্।

উলঙ্গ-সন্ন্যাসী-দর্শন-লাভ লালসায়, অনেক ধনবান্ ব্যক্তিও ঘটনাস্থলে সেদিন উপস্থিত হন। জগন্নাথ পাঁড়ে নামক কাশীর একজন বৃদ্ধ সওদাগর অল্পবয়স্ক নাতি এবং নাতিনী লইয়া উলঙ্গ সন্ন্যাসী দেখিতে আসেন। সেই কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ,—গজকুম্ভের উপর লাঠি মারিতে যদি এক মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব করিত, তাহা হইলে নাতি-নাতিনী সহ জগন্নাথ,—হস্তিপদবিমর্দ্দিত হইয়া প্রাণ হারাইতেন। লাঠির আঘাতে সেই প্রকাণ্ড হস্তী পশ্চাৎপদ হইল দেখিয়া, জগন্নাথ চমকিত হইয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, "জয় শিব-শম্ভু!" অতি অল্পক্ষণমধ্যে, যেন চক্ষের পলক পালটিতে না-পালটিতে, সেই কৃষ্ণবর্ণপুরুষ হস্তি-হননকার্য্য শেষ করিয়া, ভিড়ের মধ্যে যে কোথায় লুকাইয়া পড়িল, জগন্নাথ পাঁড়ে তাঁহাকে আর দেখিতে পাইলেন না। কতকদূর পদব্রজে অগ্রসর হইয়া, চারিদিকে উঁকি-ঝুঁকি মারিয়া জগন্নাথ পাঁড়ে সেই কৃষ্ণবর্ণ পুরুষের কোনরূপ সন্ধান করিতে সক্ষম হইলেন না। তিনি দেখিলেন,

আরও অনেক লোক সেই কৃষ্ণবর্ণ পুরুষটীকে খুঁজিতেছে। কিন্তু কেহই তাহার আর দর্শন পাইতেছে না। কেহ বলিতেছে,—"আমার প্রাণ এখনি গিয়াছিল আর কি? ভাগ্যে সেই লোকটী লাঠি মারিয়া হাতীর মাথা ফাটাইয়া দিল, তাই আমি জীবন পাইলাম।" কেহ বলিতেছে—'লোকটীর দেখা পেলে আমি পঞ্চাশটী টাকা তাহাকে পুরস্কার দিই; আমার এই ছেলেটী হাতীর পায়ের তলায় প'ড়েছিল আর কি? কিন্তু সেই কৃষ্ণবর্ণ লম্বা লোকটী নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া আসিয়া, অদূরস্থিত হস্তীর সম্মুখ-পথ হইতে আমার ছেলেটীকে ত্রিশূন্যে তুলিয়া লইয়া তাহার প্রাণদান দিল। আমি গরীব মানুষ কোথা কি পাব? তাহার দেখা পেলে পাঁচটী টাকা দিতাম।" এইরূপ অনেকে সেই কৃষ্ণবর্ণ পুরুষের উপর মৌখিক পুরস্কার-পুষ্প-বর্ষণ করিল। বৃদ্ধ জগন্নাথ নীরবে সকল কথা শুনিলেন; কোনরূপ উত্তর-প্রত্যুত্তর করিলেন না। অন্য সকলে বলাবলি করিল, সেই কৃষ্ণবর্ণ লোকটী কুস্তিগীর পাঞ্জাবী পালোয়ান; লাঠিতে সিদ্ধ-হস্ত হইয়াছে।

কাশীর কোতয়ালির দারোগা সেই ভূপতিত অর্দ্ধমৃত হস্তীর নিকট অশ্বারোহণে উপস্থিত। তিনি কনেষ্টবলগণকে কহিলেন,—"হাতীটী ত এখনি মরিবে, তৎপক্ষে কোন সন্দেহই নাই; তোমরা এক্ষণে, যে ব্যক্তির লাঠিতে হাতীটী মরিয়াছে, তাহার অনুসন্ধান কর। বড় সাহেবের হুকুম।"

জগন্নাথ পাঁড়ে হাতীর নিকট আসিলেন। দেখিলেন, হাতীর মাথা দিয়া তখনও ভলকে ভলকে রক্ত বাহির হইতেছে। হাতীটীর সম্মুখপদ দুইটী একটু আধটু নড়িতেছে। হাতীর নিকট তখন

লোকে লোকারণ্য। কয়েকজন কনেষ্টবল, ঠেলিয়া ধাক্কা দিয়া, হৈ হৈ শব্দ করিয়া, ভিড় ভাঙ্গাইতে আরম্ভ করিল। তাহারা দেখিল, সম্মুখে জগন্নাথ পাঁড়ে দণ্ডায়মান;—আর একটু হইলেই তাঁহার গায়ে হাত লাগিয়াছিল আর কি? কনেষ্টবলগণ সসম্মানে জগন্নাথকে সেলাম করিয়া বলিল,—"হুজুর! এখানে যে?"

জগন্নাথ। যে লোকটীর লাঠির আঘাতে হাতী মরিল, সেই লোকটীকে আমি খুঁজিতেছি।

কনেষ্টবল। বড় সাহেবের হুকুমে আমরাও সেই লোকটীকে খুঁজিতেছি।

জগন্নাথ। ভালই হইয়াছে। তোমরা যদি সেই লোকটীকে খুঁজিয়া পাও, তবে আমার কাছে লইয়া আইস। আমি তাহাকে পাঁচশত টাকা পুরস্কার দিব এবং মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তি বরাদ্দ করিয়া দিব। তোমরা যদি সঙ্গে করিয়া সেই লোকটীকে আনিতে পার, তাহা হইলে তোমরাও কিছু বখ্‌সীস পাইবে।

কনেষ্টবল। সেই হাতী-মারা লোকটীকে পাইলেই, আগে আপনার কাছে লইয়া যাইব। আপনার অনেক নুণ খাইয়াছি, আপনার কথা সর্ব্বাগ্রে শিরোধার্য্য।

এই কথা বলিয়া, কনেষ্টবলগণ হস্তি-হন্তার অনুসন্ধানে চলিল। জগন্নাথ পাঁড়ে নাতী দুইটীকে লইয়া, একখানি এক্কা চাপিয়া স্বগৃহে গমন করিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

হস্তি-হন্তাকে আজ সকলে খুঁজিতেছি; কিন্তু কেহই তাহার দেখা পাইতেছে না। পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত পুরস্কারের ঘোষণা হইলেও, হস্তি-হন্তা আসিয়া কাহাকেও দেখা দিল না।

পথে-পথে পাড়ায়-পাড়ায় ক্রমশঃ ঘরে-ঘরে—হস্তি-হন্তার খোঁজ আরম্ভ হইল। তথাচ হস্তি-হন্তা মিলিল না। হস্তি-হন্তা যত দুর্ল্লভ হয় পুলিশ সাহেবের তাহাকে পাইবার জন্য ততই আগ্রহ বাড়ে। ক্রমশঃ মাজিষ্ট্রর সাহেবের কর্ণে হস্তি-হন্তার বীরত্বের কথা উঠিল। তিনিও বলিলেন, সে বীরপুরুষকে প্রাপ্তির নিমিত্ত কাশী-জেলার অন্তর্গত প্রত্যেক থানায়, প্রত্যেক ঘাটীতে, প্রত্যেক জমিদারের নিকট হুলিয়া করিয়া দেওয়া হউক।

সেই হস্তি-হন্তা কোথায় গেল। এইত ছিল, কোথায় লুকাইল। দশদিন কাল অবিরাম অন্বেষণ করিয়াও তাহাকে কেহ দেখিতে পাইল না। ব্যাপার বড়ই আশ্চর্য্যজনক।

লোকটা লুকায় কেন? লোকটা কে?

শিয়ালমারা এবং সনাতন দাস যাহা ভাবিয়াছিল, তাহাই ঠিক। সেই হস্তি-হন্তা আর কেহই নহে, আমাদের সেই রঘুদয়াল। রঘুদয়ালের আঙ্গুল বাঁধিয়া পুলীশ,—থানার গৃহে তাঁরে টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছিল মনে আছে কি? মোহর চুরী করা অপরাধে শঙ্করীপ্রসাদের দ্বিতীয়-পুত্র রমাপ্রসাদ ধৃত হইয়া, হাজত-গৃহে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন—মনে আছে কি? রঘুদয়াল এবং রমাপ্রসা-দের পলায়ন স্মরণ হয় কি? চলিতে অক্ষম হইলে রমাপ্রসাদকে রঘুদয়াল কাঁধে করিয়া লইয়া গিয়াছিল,—সে কথা মনে আছে ত?

ভূতপূর্ব্ব প্রতাপশালী জমিদার এবং এককালে রঘুদয়ালের লাঠিখেলার শিষ্য,—সেই কনেষ্টবলের সাহায্যে দুই জনে পলাইতে সক্ষম হন। পলাইবার পন্থা বলিয়া দিয়া সেই ছদ্মবেশী হিন্দু কনেষ্টবলটী দারোগা বাবুর গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক কম্বল-আসনে ঘুমাইয়া পড়িল। শেষ রাত্রি হইয়াছিল। দেখিতে দেখিতে সেই ছদ্মবেশী প্রহরী ঘোর-ঘুমে অভিভূত হইল।

এ দিকে প্রভাত হইতে না হইতে,—"আসামী দুই জন পলাইয়াছে," এই কথা লইয়া থানায় একটা মহাশব্দ উঠিল। ক্রমশঃ কোলাহল খুবই বাড়িতে লাগিল। দারোগার নিদ্রাভঙ্গ হইল। সেই ছদ্মবেশী প্রহরীর কিন্তু ঘুম ভাঙ্গিল না। দারোগা উঠিয়াই, সেই ছদ্মবেশী প্রহরীকে ঠেলিয়া তুলিলেন,—বলিলেন,—"দেখ দেখ কি হইয়াছে? গোল কিসের?"

সেই হিন্দুপ্রহরী যেন একটু থতমত খাইয়া উঠিয়া, যে দিকে গোলমাল হইতেছিল, সেই দিকে দৌড়িল। অল্পক্ষণ পরে সেই কনেষ্টবল, এইরূপ চীৎকার করিতে করিতে প্রত্যাগত হইল,—"সর্ব্বনাশ হইয়াছে! সর্ব্বনাশ হইয়াছে! আসামী দুইজন পলাইয়াছে!" দারোগা হইতে সামান্য বিনামাইনের তামাকসাজার ভৃত্যটী পর্য্যন্ত আজ থানার সকলেই ভয়-চকিত। চারিদিকে রঘুদয়াল-রমাপ্রসাদকে ধরিবার জন্য লোক ছুটিল, কিন্তু আসামী-দ্বয়ের দেখা কেহই পাইল না। রঘুদয়াল সাত দিনে খাটী বাঙ্গালা-দেশ পার হন। ৮ম দিনে পর্ব্বতকঙ্করময় সাঁওতাল পরগণার শালবনে গিয়া উপনীত হন। সুদীর্ঘ শালবৃক্ষের শ্যামল-শোভা দেখিয়া রঘুদয়ালের আনন্দ বাড়িল। এক একটী শালগাছ বীর-পুরুষের ন্যায় উচ্চ মস্তকে স্ফীত বক্ষে দাঁড়াইয়া আছে।

পথে উদরান্ন-সংস্থানের নিমিত্ত, রঘুদয়াল এবং রমাপ্রসাদ এইখানে সন্ন্যাসী সাজিলেন অর্থাৎ গায়ে কেবল ধূলা পাঁশ মাখিলেন; গেরুয়া বসন কোথায় পাইবেন? সন্ন্যাসী সাজায় আর এক লাভ হইল,—পথে পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইবার কোন আশঙ্কা রহিল না।

এইরূপে উভয়ে নানা নদ নদী পর্ব্বত প্রান্তর অতিক্রম করিয়া পথে ভিক্ষামাত্র-উপায়ে জীবন ধারণপূর্ব্বক, পুণ্যতীর্থ ৺বারাণসীধামে আসিয়া পৌঁছিলেন। কাশীবাসের পরদিনেই রঘুদয়ালকর্ত্তৃক সেই মদমত্ত হস্তী নিহত হইল।

এদিকে রঘুদয়াল এবং রমাপ্রসাদ উভয়েই ফেরারী আসামী। বঙ্গদেশে থাকিলে জেল নিশ্চয়, ইহা ভাবিয়া উভয়েই ৺কাশীধামে পলায়িত এবং কাশীধামে আসিয়া রঘুদয়াল বিপদে নিপতিত। হাতী বধের পরেই রঘুদয়াল শুনিলেন, পুলিশ তাঁহাকে ধরিতে আসিতেছে। পুরস্কারের জন্য, কি তিরস্কারের জন্য, তাহা ভাল বুঝিতে পারিলেন না। যদি পুরস্কারের জন্যই হয়, তাহা হইলেও ত অমঙ্গল ভিন্ন মঙ্গল দেখি না। পুলিশসাহেব যখন আমার পরিচয় জিজ্ঞাসিবেন, তখন আমি কি উত্তর দিব? নিশ্চয়ই আমার নামে বাঙ্গালা মুলুকের চারিদিকে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা বাহির হইয়া থাকিবে। আর যদি আমার আকার-প্রকার রং বর্ণন করিয়া,—বঙ্গদেশের পুলিশের বড়কর্ত্তা, কাশীর পুলিশের বড়-সাহেবের নিকট পত্র লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলে, আমিত গিয়াছি,—মরিয়াছি বলিলেও চলে। আমি এ ক্ষেত্রে কাশীর পুলিশের বড়সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলে, সঙ্গে সঙ্গে যে ধরা পড়িব! বাঙ্গালা মুলুকে ধর্-ধর্ করিয়াছিল বলিয়া আমি পলাইয়া কাশীতে

আসিলাম ;—কিন্তু এমনি অদৃষ্টের দোষ যে, কাশী আসিয়াও আমার নিস্তার নাই,—আমাকে ধরিবার জন্য চারিদিকে লোক ছুটিয়াছে। তবে কি আমি কাশীধাম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবন যাইব ? আমি বৃন্দাবনে গেলে, সেখানকার লোক যদি আবার এইরূপ ধর্-ধর্ করে, তখন কোথায় যাইব ? গ্রহ বিগুণ বলিয়াই এত কথা মনে আসিতেছে। জয় শিবশম্ভু ! আমি কাশীধাম পরিত্যাগ করিব না। অদৃষ্টে যাহা থাকে; তাহাই হইবে ; আমি কাশীতেই থাকিব। এরূপ লুকাইয়া প্রচ্ছন্নভাবে থাকিব, যে কেহ আমাকে চিনিতে পারিবে না, ধরিতে পারিবে না। দিবসে বাহির হইব না। নিশাকালে রাত-ভিখারী সাজিয়া ; ভিক্ষা করিয়া, উদর পূর্ণ করিব। রমাপ্রসাদ খঞ্জনী বাজাইবে,—আমি গান গাহিব। আমি সোজা হইয়া চলিব না। তাহা হইলে আমার আকার বড়ই দীর্ঘ বলিয়া মনে হইবে। আমি যেন বাতে পঙ্গু হইয়াছি,—আমার কোমর যেন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এইরূপ ভাবে কোঁজা হইয়া লাঠি ধরিয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে পথ চলিব। আর নিশাকালে গৃহস্থের গৃহে হরির নাম গাহিয়া মুষ্টি-ভিক্ষা লইব। কিন্তু কাশীতে যেরূপ দুর্ভিক্ষ দেখিতেছি, তাহাতে মুষ্টি-ভিক্ষাও মিলা ভার হইয়াছে। যে স্থলে দিবসে ভিক্ষা মিলা দুষ্কর, সেখানে রাত্রে কিরূপে ভিক্ষা মিলিবে, তাহাই ভাবিতেছি।

আমি নিজের জন্য তত ভাবি না ; তিন দিন উপবাস করিয়া থাকিলেও আমি মরিব না। কিন্তু এই বালক রমাপ্রসাদের দশা কি হইবে ? রমাপ্রসাদ যে একদিন খেতে না পেলেই ওষ্ঠাগত-প্রাণ হইবে। সে, কাশীর পথ-ঘাট চিনে না, কোথাওরএকাকী যাইতে সক্ষমও হয় না ; পাছে হারাইয়া যায়, এই ভয়ে আমিও

তাহাকে কোথাও একাকী যাইতে দিই না। আর সে বাহির হইয়াই বা কি করিবে! ভদ্রসন্তান, ব্রাহ্মণ এবং বালক রমাপ্রসাদ ঘুঁটেগিরি করিতে পারিবে না,—কাহারও খানসামাগিরি করিতে পারিবে না, সুতরাং সে বাহির হইয়াই বা কি করিবে? আর রমাপ্রসাদকে আমিই বা কেমন করিয়া বলিব,—"তুমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা দাও বলিয়া,—বড় জঠর-জ্বালা, মাগো! দুটী ভিক্ষা দাও বলিয়া,—বেড়াইয়া বেড়াও।" যে রমাপ্রসাদের পিতা সহস্র সহস্র অভুক্ত ব্যক্তিকে অন্নদানে রক্ষা করিতেন, তাঁহারই পুত্র আজ অন্নের জন্য লালায়িত হইয়া,—হা অন্ন! হা অন্ন! বলিয়া কেমন করিয়া কাশীধামে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইবে! ভিক্ষার কথা রমাপ্রসাদকে আমি মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিব না।

সম্বল ত কিছুই নাই, পথে ভিক্ষা করিয়া খাইতে খাইতে ছদ্মবেশে কাশী আসিয়াছি। কাশীতে এই একদিন-কাল ভিক্ষা করিয়া উদর পূর্ণ করিয়াছি। অদ্য প্রাতে দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করিয়া, বাবা বিশ্বনাথকে দর্শন করিব মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু পথে এই বিভ্রাট ঘটিল। হায়! আমি যদি হাতী না মারিতাম, তাহা হইলে আমার ভিক্ষায় ব্যাঘাত কিছুতেই হইত না।

সত্যসত্যই একমাত্র রাত্রিকালে ভিক্ষা ভিন্ন আমার আর অন্য উপায় দেখি না। রমাপ্রসাদকে রাত্রে একা রাখিয়া কোথায় ভিক্ষার্থে বহির্গত হইব? তাহাকে ত সঙ্গে করিয়া লইতেই হইবে। আমি গান গাহিয়া ভিক্ষা করিব, আর একটী বালক আমার সঙ্গে থাকিবে,—এ দৃশ্য বিসদৃশ। অগত্যা রমাপ্রসাদকে খঞ্জনীদার করিতেই হইবে। আর পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—সোজা হইয়া আমি পথ চলিব না, কুঁজা হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে পথ

চলিব এবং গান গাহিব। এই পরামর্শই সৎপরামর্শ। কিন্তু আজ এখন যাই কোথায়! যে স্থানে কল্য ছিলাম, সে স্থানে আজ আর থাকিব না। সে স্থল ত লোকালয়। আজ লোকালয় ছাড়িয়া দিবাভাগে বনে গিয়া বাস করিতে হইবে।

কোমরে বাতব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে সরু একগাছি লাঠি ধরিয়া কুঁজা হইয়া রঘুদয়াল চলিতে লাগিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল বালক রমাপ্রসাদ। সেই হাতী-মারা বৃহৎ লাঠিটী রঘুদয়ালের আদেশে রমপ্রসাদ এক কূপের ভিতর ফেলিয়া দিল। পথ চলিতে চলিতে রমাপ্রসাদ জিজ্ঞাসিল, —"সর্দ্দার দাদা! এমন লাঠিটী তুমি নষ্ট করিলে।"

রঘুদয়াল। না ভাই! নষ্ট করি নাই, আবশ্যক হইলে ঐ কূপ হইতে তুলিয়া লইব। আমি জলে ডুবিয়া কতক্ষণ থাকিতে পারি, বল দেখি!

এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে রঘুদয়াল এবং রমাপ্রসাদ গঙ্গার গর্ভের পথ দিয়া কাশী ছাড়াইয়া নাগেয়া গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইল। এ গ্রামের অদূরে তখন জঙ্গল ছিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

মত পরিবর্ত্তন ঘটিল। রাত্রিকালে বিরোধ উপস্থিত হইল। শিয়ালমারা বলিল,—"যখন গুরুদেব কাশীধামে আসিয়াছেন, তখন আমি দেবতা সাজিয়া দশাশ্বমেধের ঘাটে থাকিব না।" সনাতন কহিল,—"তুমি এই দিনের বেলায় বলিয়াছিলে যে,

আমি মর্কট-অবতার হইয়া দাড়ী ধারণ করিব, এখন আবার উল্টা কথা বল কেন?”

শিয়ালমারা। তোমার জিদে ঐ কথা বলিয়াছিলাম। কিন্তু আমার প্রাণের ভিতর মর্কট-সাজার ইচ্ছা ছিল না।

সনাতন। কথা ঠিক্ রাখিও ভাই! বেঠিক্ হওয়া ভাল নয়।

শিয়ালমারা। আমরা চোর ডাকাত প্রবঞ্চক; আমাদের আবার কথার ঠিক্ বেঠিক্ কি? আমরা সব ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির কিনা যে, একটী কথা আগে বলিয়া, অন্য কথাটী পরে বলিতে পারিব না!

সনাতন। চটিস্ কেন ভাই! তোর যদি মর্কট-অবতার সাজিতে একান্ত ইচ্ছা না হয়, তা নাই সাজিবি! কিন্তু কাল খুব ভোর থেকে এখানে বহুলোক আস্‌বে, তার উপায় কি ক'রে রেখেছিস্।

শিয়ালমারা। দেখ্, ভাই! এই ভগবান্-সাজা ব্যবসা আমাদের আর চ'ল্‌বে না। হাতে প্রায় লক্ষাধিক টাকা হইয়া থাকিবে। ঐ টাকাগুলি লইয়া আমরা দু'জনে এ স্থান হইতে পলাই চল। আর অধিক লোভ করিও না। অতি লোভ করিতে গেলেই, এর পর ধরা পড়িতে হইবে।

সনাতন। এত সাজ-সরঞ্জাম, এত আসবাব, এত টাকা,— এ সব লইয়া এত রাত্রে কোথায় যাবি বল্ দেখি?

শিয়ালমারা। খাট-পালঙ্ক কাপড়-চোপড়, এ সবের মায়া ছাড়িয়া দাও। এমন কি নগদ রূপার যে পঁচিশ-হাজার টাকার পঁচিশটী তোড়া আছে, তাহাও আমি ছাড়িতে বলি! কেবল মোহরগুলি ও নোটগুলি লইয়া পলায়নই সদ্‌যুক্তি।

সনাতন। তাও কি কখন হয়? রৌপ্যমুদ্রা কি কখন ছাড়িতে আছে?

শিয়ালমারা। ছাড়িতে আমি বলি নাই। নিয়ে যেতে পারিস ত নিয়ে চল্ না। কোথায় যাবি বল্ দেখি?

সনাতন। তা আমি জানি না। তুই বল্ না কেন, কোথায় যেতে হবে?

শিয়ালমারা। আমি ঠিক্ ক'রেছি, গঙ্গা পার হ'য়ে যাওয়াই, ভাল। ওপারে ব্যাসকাশীতে জঙ্গলে, কোন নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষের তল-দেশে এই টাকাগুলি পূতিয়া রাখিব।

সনাতন। দূর পাগল! টাকা কি কখন হাত-ছাড়া করিতে আছে?

শিয়ালমারা। এই যে পঁচিশ হাজার রূপার টাকা সঙ্গে ক'রে ল'য়ে যেতে ব'লছিস, এ টাকা—কোথায় রাখ্‌বি বল্ দেখি? ছয়-হাজার যে মোহর আছে, সে ত রাখা সোজা, কোমরে বান্ধিয়া রাখিলেই চ'ল্‌বে, বাকী সব নোট, তাও রাখা সোজা। শত বিপদ্ এ ভারি রূপার টাকাগুলা লইয়া। তাইতে আমি বলিয়াছি-লাম, রূপার টাকা ছাড়িয়া যাওয়াই উচিত।

সনাতন। রূপার টাকা ছাড়া ত দূরের কথা! ঐ যে পঞ্চাশ ষাট টাকার পয়সা রহিয়াছে, উহাও আমি ছাড়িয়া যাইতে রাজি নহি।

শিয়ালমারা। তুই শালা মহামূর্খ। টাকা গাছতলায় তুই পুতিতে দিবি না, অথচ বল্ দেখি, কেমন ক'রে এই পঞ্চাশ টাকার পয়সা ও পঁচিশ হাজার টাকা নগদ তোর সঙ্গে সঙ্গে ফিরবে?

সনাতন। ওরে! বড় দুঃখের টাকা রে! ছাড়িতে মায়া হয়;

তাই বলেছিলাম, সঙ্গে করে লইতে হইবে। এই দুঃখের টাকাকে গাছতলা পুতিয়া রাখিতেও ভয় হয়, পাছে চোরে চুরি করিয়া লয়; আরও একটা ভয় হয়, পাছে সেই জঙ্গলের মাঝে গাছতলা খুঁজিয়া না পাই।—বড় দুঃখ-মেহনতের টাকা রে!

শিয়ালমারা। আচ্ছা ভাই সনাতন! দাদামণি বল্ ত ভাই! এ টাকাটা এত দুঃখ-মেহনতের কেমন করিয়া হইল? বুঝাইয়া বল্ ত ভাই! আমি ত জানি, পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া বিনা মেহনতে এমন সুখের টাকা কেহ কখন রোজগার করিতে পারে না।

সনাতন। তুমি কি নিরেট মূর্খ! কত মেহনত করিয়াছি, কত মাথা ঘামাইয়াছি, দিনরাত পড়িয়া পড়িয়া, কত ভাবিয়াছি, তবে ত শুভফল ফলিয়াছে। এক এক দিনের ভাবনায় আমার গায়ের রক্ত জল হইয়া গিয়াছে। আমার এক একটা ভাবনার দাম লাখ টাকা। এত দুঃখমেহনতের কড়ি,—এতে আমার মায়া হইবে না ভাই!

শিয়ালমারা। আরে রাম রাম! এই তোমার দুঃখ-মেহনত!

সনাতন। এইত হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক রয়েছে, করুক না এ রকম একটা ফন্দি বা'র? এ ফন্দিটা যদি নীলামে উঠ্‌ত তাহা হইলে বোধ হয়, একশ ক্রোরের অধিক টাকা ইহার ডাক হইত! এ কিরে ভাই দেহের মেহনত,—এ মাথার মেহনত!

শিয়ালমারা। সোনাশালা সুপণ্ডিত বটে; তুমি সুপণ্ডিতই হও, আর মূর্খই হও, পয়সা তোমাকে সঙ্গে ক'রে ল'য়ে যেতে দিচ্চি না। তাতে একটা খুন হয় হবে।

এইরূপ কথাবার্ত্তায় রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহর অতীত হইল।

শিয়ালমারা কহিল,—"আর বিলম্ব নাই, অল্পক্ষণ মধ্যেই নর-নারীর সমাগম হইবে ; চল এই বেলা পলাই চল।"

পরস্পরের আবার যুক্তি পরামর্শ হইল। শেষে সাব্যস্ত হইল, রৌপ্যমুদ্রা এবং পয়সা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ।

নোট এবং মোহর,—গণনা করিবার অবকাশ হইল না। যত নোট ও মোহর ছিল, তাহার অর্দ্ধেক আন্দাজ শিয়ালমারা এবং বাকি অর্দ্ধেক সনাতন দাস কোমরে বাঁধিল। কোমরে বাঁধিয়া উভয়ে ছাতি ফুলাইয়া বীরবেশে দাঁড়াইল।

এখন যাই কোথা? গঙ্গার ওপারে ব্যাস-কাশীতে গেলে হয় না? সেই যুক্তিই সার যুক্তি হইল। তখন উভয়ে সন্ন্যাসি-বেশ ত্যাগ করিয়া বাবু বেশ ধরিল। দিব্য কালা পেড়ে ধুতি, দিব্য জামা,—দিব্য গাত্রবস্ত্র পরিল। সকল রকম বেশ করিবার পোশাক্ই তাহাদের নিকট ছিল। মোটা লাঠি দুইটি গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিল। যত রূপার টাকা ছিল, তৎসমস্তই চারিদিকে ভূমিতলে ধীরে ধীরে ছড়াইয়া রাখিল, পয়সাগুলিও দশাশ্বমেধ ঘাটের সিঁড়ি পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে রাখিয়া, গঙ্গার তটদেশ উত্তম-রূপে সাজাইল। দেওয়ালে খড়ি দিয়া লিখিল "সমস্তই বাবা বিশ্বনাথের।" যে দুইটী মদের বোতল ছিল, তাহা দুইজনে বগলে করিয়া লইয়া চলিল। সর্ব্বকার্য্য শেষ হইলে, পানসী ভাড়া করিয়া গঙ্গাপার হইল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

আবার কাশীনগরে হুলস্থূল বাধিল। ভগবান্ কাশীধাম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন,—আজ ঘরে ঘরে কেবল এই কথা। "হায় কি হইল! হায় কি হইল!"—এই কথা বলিয়া, ভক্তবৃন্দ কেবল পথে-পথে কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল। অনেক কাশীবাসিনী, অনেক গৃহদাসী,—দশাশ্বমেধ ঘাটে আসিয়া গালে হাত দিয়া,—কেবল অবাক্ হইয়া রহিল। কোন বর্ষীয়সী ঝি কহিল,—"হায় হায় কি হইল! ভগবান্ স্বর্গে চ'লে গেলেন, আমায় ব'লেও গেলেন না, সঙ্গে ক'রে ল'য়েও গেলেন না; কাল এইখানে ব'সে ছিলেন গো! আমি যদি কাল-থেকে পায়ে ধ'রে প'ড়ে থাক্তাম, তা হ'লে নিশ্চয়ই তাঁর সঙ্গে স্বর্গে চ'লে যেতাম, কিছুতেই তাঁর পা ছা'ড়তাম না। জীয়ন্ত দেবতা গো,—জীয়ন্ত দেবতা!"

একজন কাশীবাসিনী কহিল,—"শুদ্ধু জীয়ন্ত-দেবতা নয় গো জীবন্তদেবতা নয়, কাঁচা দেবতা! দেখছ না—ভগবানের মনে একরত্তিও লোভ নেই, পেন্নামী যে কয়টী টাকা পেয়েছিলেন, স—ব ছড়িয়ে ফেলে দিয়ে গেছেন। টাকা গুলো কুড়ুলে এক মরাই টাকা হয়!"

দেখিতে দেখিতে আমাদের সেই কাশীবাসী স্বয়ং ঘটনাক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া, ঝি এবং কাশীবাসিনী উভয়েই কাঁদিতে লাগিল; বলিল,—"দাদা-ঠাকুর! আমাদের পোড়াকপাল ভেঙ্গেছে, আমাদের আর কেউ নেই; তিনি গোলোকধামে চ'লে গেছেন।"

কাশীবাসী। আমি ঐ কথাটা শুনে হাঁপাতে হাঁপাতে আসছি আজব কাণ্ড বটে! সেই যে কাল হরিসংকীর্ত্তনের সময় ক্ষেপা হাতীকে লাঠির দ্বারায় মেরে ফেলেছিল, সে কার কাজ জানিস্? সে এই শ্রীভগবানেরই কাজ! তা নইলে কি আর মানুষের লাঠিতে হাতী মরে। পাছে লোক-জানাজানি হয়, এই জন্যই শ্রীভগবান্ অন্তর্দ্ধান হ'য়ে গেলেন।

স্ত্রী কহিল,—'ওগো! ছড়ান টাকা গুলো দেখে যে আমার বুক ফাটে গো! ঠাকুর! তুমি ত গেলে! কিন্তু আমার দশায় কি ক'রে গেলে? টাকা গুলো যেন খোলাম-কুচির মত ছড়িয়ে দিয়ে গেল। দেবতা কিনা, তাঁর টাকার দরকার কি? আহা! টাকায় যেন পদ্মফুল ফুটে উঠেছে, আমার যে কান্না পাচ্ছে গো।'

দেখিতে দেখিতে অশ্বারোহণে পুলিশ-সাহেব এবং বহুসংখ্যক কনেষ্টবল দশাশ্বমেধ ঘাটে আসিয়া পৌছিল। বহুলোকের সমাগম হইল। কাশীর প্রায় বার আনা নর-নারী অপূর্ব্ব টাকা-ছড়ান ব্যাপার দেখিবার জন্য ধাবিত হইল। সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল! পুলিশ-কর্ম্মচারিগণ টাকা এবং পয়সা কুড়াইতে আরম্ভ করিল। কাশীবাসী আপন-সম্প্রদায়কে ডাকিলেন; তিনি খোল বাজাইয়া হরিসংকীর্ত্তন জুড়িয়া দিতে বলিলেন! এবং স্বয়ং ধেই ধেই করিয়া নাচিতে লাগিলেন। সেই নাচে এবং গানে অসংখ্য লোক যোগ দিল; অনেকের দশা পাইল; কাশীধাম টল-টল করিতে লাগিল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

কর্ম্ম-সূত্রে কখন কোথায় কাহাকে যে টানে, তাহা কেমন করিয়া বলিব? ললাট-লিপিতে যাহা লেখা থাকে, তাহা অলঙ্ঘনীয়। ঘটনা-চক্রে সদাই ঘর্ঘর ঘুরিতেছে। মানুষ কখন ঊর্দ্ধদিকে,—কখন অধোভাগে নিপতিত। সেই ঘূর্ণমান চক্রের ভীমতেজ বন্ধ করিবার শক্তি সামর্থ্য কাহারও নাই।

৺কাশীধামে গুরু-শিষ্যকে যে একই সময় দেখিতে পাইব, তাহা কে ভাবিয়াছিল? শিয়ালমারা ও সনাতম দাস,—দশাশ্বমেধ ঘাটে তাহাদের অতুলকীর্ত্তি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। কিছু দিন পরে তাহাদের গুরুদেব রঘুদয়াল কাশীতে আসিয়া পৌঁছিল। স্বচ্ছন্দে নির্ব্বিবাদে সনাতন ও শিয়ালমারা সহস্র সহস্র টাকা উপার্জ্জন করিতেছিল. সুখের ক্ষীরোদ-সাগরে পড়িয়া উভয়েই হাবুডুবু খাইতেছিল। কিন্তু যাই গুরুদেব আসিলেন, তৎক্ষণাৎ অমনি তাহাদের মায়া-হাট ভাঙ্গিল। সেই ঐন্দ্রজালিক-বিদ্যা কোথায় অন্তর্হিত হইল!

মোহরচুরী না করিয়াও রমাপ্রসাদ মোহর-চোর হইল। রঘু-দয়াল ধর্ম্মপরায়ণ সাধু-প্রকৃতি নির্লোভ হইয়াও, দস্যু বলিয়া পরিগণিত হইল। সনাতন-শিয়ালমারা দুর্দ্দান্ত দানব হইয়াও নিকামধর্ম্মা হইল,—শ্রীভগবান্ হইল। নগরবাসীর নিকট দিবানিশি পূজা পাইল। এদিকে রঘুদয়াল মদমত্ত মাতঙ্গকে লগুড়াঘাতে হনন করিয়া, অন্ততঃ পঁচিশটী মানবের প্রাণরক্ষা করিয়া, নির্জ্জনে অরণ্যে লুকাইয়া থাকিতে বাধ্য হইল। দিবসে নগরে বাহির

হইয়া ভিক্ষা করিবারও তাহার শক্তি রহিল না। রঘুদয়ালের একটী মাত্র পয়সাও সম্বল নাই। জঠর-জ্বালায় রঘুদয়াল জর্জ্জরিত। রমাপ্রসাদের কষ্ট দেখিয়া রঘুদয়াল, আরও জর্জ্জরিত। সেই সম্বল-বিহীন জর্জ্জরিত রঘুদয়ালকে কাশীর অনেক সম্ভ্রান্ত নগরবাসী খুঁজিতেছে, ডাকিতেছে,—"আমাদের রক্ষাকর্ত্তা তুমি কে? শীঘ্র আইস! তোমাকে আজ সহস্রাধিক টাকা পুরস্কার দিব।" জেলার যিনি কর্ত্তা,—সেই ম্যাজিষ্টর-সাহেব রঘুদয়ালকে ডাকিতেছেন,—"আইস, আইস শীঘ্র আইস, তোমাকে ত পুরস্কার দিবই, অধিকন্তু তোমাকে চাকুরী দিয়া প্রতিপালন করিব।" রঘুদয়ালকে টাকা দিবার জন্য,—রঘুদয়ালের দুঃখ দূর করিবার জন্য লোকে যতই ডাকিতেছে,—লোকে যতই খুঁজিতেছে, রঘুদয়াল ততই বিপদাশঙ্কা করিয়া নিবিড় অরণ্যে লুকাইতেছেন। তাই বলিতেছি, বিধাতার লিখন অখণ্ডনীয়।

আর মাতা কাত্যায়নি! তুমি বা কোথায়? আর শরীরিণী বিরহ-ব্যথা-স্বরূপিণী বধূ যশোদা! তুমিই বা কোথায়? একবার রঘুদয়ালের দুঃখ দেখিয়া যাও! প্রাতে হস্তি-হননের পর রঘুদয়াল জলগ্রহণ করেন নাই! সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, রমাপ্রসাদকে সঙ্গে লইয়া, রঘুদয়াল নাগেয়া গ্রামের অদূরবর্ত্তী অরণ্যে ম্লানমুখে উপবিষ্ট। রঘুদয়াল! বসিয়া বসিয়া আর কি ভাবিতেছ! অন্ধকারের আবরণে লুক্কায়িত হইয়া এইবার ভিক্ষার্থ বহির্গত হও।

পিতা-মাতার পিতামহীর সোহাগে গঠিতা লক্ষ্মি! তুমি যে মা'র কোল ছাড়িয়াও, তোমার সর্দ্দার-জ্যেঠা রঘুদয়ালের কোলে আসিতে, ভালবাসিতে, [illegible] জগদ্ধাত্রী-রূপিণী হইয়া রঘুদয়ালের

পৃষ্ঠে বসিতে ভালবাসিতে! রঘুদয়ালের উত্তপ্ত হৃদয় জুড়াই-বার জন্য আজ কি একবার তাহার কোলে আসিবে না? পিঠে বসিবে না?

দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত

শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী।

তৃতীয় ভাগ।

ককাতা,

১৮।২ ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী-ইলেকট্রো মেসিন প্রেসে,

শ্রীনুটবিহারী রায় দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী।

তৃতীয় ভাগ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গ্রীষ্ম কাল। বৈশাখ মাস। এক হিন্দুস্থানী যুবক প্রয়াগে,—গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম-তীর্থে উপনীত হইয়া, সন্ধ্যার সময়, অতি ধীরে ধীরে, যেন অবসন্ন হইয়া অঞ্জলি পুরিয়া জল-পান করিতেছে। যুবক বড় দরিদ্র। যে কাপড়খানি সে পরিয়া আছে, তাহা মলিন; তিন হাতের অধিক লম্বা হইবে না। বস্ত্রখানি স্থানে স্থানে ছিন্ন, কষ্টে লজ্জা-রক্ষা হয়। যুবকের চুল ঝাঁকড়-মাকড়। তাহাতে তৈল কস্মিন্‌কালে পড়িয়াছে কি না সন্দেহ। অঙ্গও রুক্ষ। হাতের নখ বড় বড়। পদতল ফাটা-ফাটা। যুবকের দাড়ী আছে। তৈলাভাবে, পরিমার্জ্জনাভাবে, সে দাড়ী কেমন কটা-কটা হইয়া গিয়াছে।

হিন্দুস্থানী যুবক অঞ্জলিপূর্ণ জল পান করিয়া, যেন কিছু তৃপ্ত হইয়া, বালুকা-ভূমে আসিয়া বসিল। প্রয়াগের পাণ্ডাদিগের

যেখানে ধ্বজপতাকা উড়িতেছে, যুবক সে খানে না বসিয়া দূরে বালুকা-ভূমে বসিয়া রহিল। অধিকক্ষণ বসিতে পারিল না। হিন্দুস্থানী যুবক শুইয়া পড়িল। বুঝি মূর্চ্ছিত হইল! একি মৃগীরোগ, না—হিষ্টিরিয়া? না, সে সব কিছুই নহে। এ ব্যাধি,—ক্ষুধাব্যাধি। যুবকের আজ প্রায় দুই দিন কাল আহার হয় নাই।

আকাশে পূর্ণিমার শশধর উঠিল। ক্ষুধার্ত্ত মূর্চ্ছিত যুবকের গায়ে যেন একখানি জ্যোৎস্নারূপ চাদর ঢাকা পড়িল। গঙ্গা যমুনা দেবীদ্বয়,—জ্যোৎস্নার ওড়নায় বিভূষিত হইয়া অধিকতর হাস্যময়ী হইলেন। ধরিত্রী দেবীও সেই সঙ্গে পোষাকী জ্যোৎস্না-বসনখানি পরিধানপূর্ব্বক বিরাজ করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যা আসিয়াছে। জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে। তীর্থ-স্থান নীরব হইয়াছে। পাণ্ডাদল দিবসের কার্য্য সমাধা করিয়া, আপন আপন গৃহাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। কোন কোন বৃদ্ধপাণ্ডা গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম-জলে হাঁটু পর্য্যন্ত নিমজ্জিত করিয়া, সন্ধ্যাহ্নিক আরম্ভ করিলেন। কেহ বা গঙ্গার নিকটে গিয়া মৃদুমন্দ সমীরণ-সেবনের সঙ্গে সঙ্গে মধুর-কণ্ঠে 'ভজন' গান গাহিতে লাগিলেন।

রাত্রি যত বেশী হইতে লাগিল, জ্যোৎস্না-ফুল ততই বেশী ফুটিতে লাগিল। সন্ধ্যাহ্নিক শেষ করিয়া, একজন বৃদ্ধ-পাণ্ডা গৃহাভিমুখে যাত্রাকালে দেখিলেন, অদূরে এক ব্যক্তি মৃতের ন্যায় ভূতলে বালুকাভূমে পতিত আছে। তাঁহার মনে সন্দেহ জন্মিল। তিনি নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "তু কৌন হ্যায়? মুর্দ্দেকে মাফিক্ কেঁও পড়া হ্যায়?—উঠ্, ঘর যা।"

সেই ভূপতিত মূর্চ্ছিত যুবক কোন উত্তর দিল না। বৃদ্ধ-পাণ্ডা আবার তাহাকে ঐরূপ কথা বলিলেন, তথাচ সে কোন উত্তর

দিল না। তখন বৃদ্ধ-পাণ্ডা সেই যুবকের অতি নিকটে গমন করিলেন; আপাদ-মস্তক তীব্র দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিলেন। মনে মনে কহিলেন,—"না, এ লোক এখনও মরে নাই, মৃত্যুলক্ষণ কিছুই দেখিতেছি না; বোধ হয়, মূর্চ্ছিত হইয়া থাকিবে।" গৃহে গমনোদ্যত কয়েকজন পাণ্ডাকে তিনি ডাকিলেন,—"ভাইয়ো! ইধর তো আনা। ইহাঁকা হাল জেরা দেখলো।" দেখিতে দেখিতে দশ বার জন পাণ্ডা, সেই বৃদ্ধের আহ্বানে, সেই পতিত যুবকের নিকটবর্ত্তী হইল। তাহারা সেই যুবককে বেষ্টন করিয়া, এক মহা গোলযোগ আরম্ভ করিয়া দিল। কেহ বলিল,—"মরিয়াছে"; কেহ বলিল,—"মূর্চ্ছিত হইয়াছে"; কেহ বলিল,—"ভূতে পাইয়াছে"। সকলকে থামাইয়া একজন বলিল,—"আমি নিশ্চয় বলিতেছি, এ লোকটা বিষপানে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।" এ কথার প্রতিবাদ করিয়া অন্য একজন পাণ্ডা কহিলেন,—"এ লোকটা মরেও নাই, বিষপানও করে নাই, মূর্চ্ছিতও হয় নাই, কেবল কল্লা করিয়া পড়িয়া আছে। লোকটা,—দেখিতেছ না, ঠিক্ যেন টাট্‌কা, সজীব রহিয়াছে। মরিলে ত এতক্ষণ দুর্গন্ধ উঠিত।" অন্য এক জন এই কথার অনুমোদন করিয়া বলিল,—"হা ভাই! তুমি ঠিক্ বলিয়াছ। লোকটা চোর; আমরা চলিয়া গেলে, এখানকার আসবাব-পত্র ও আমাদের ধ্বজাগুলি চুরি করিয়া লইয়া যাইবে। শুন নাই কি, আজ দশ বৎসর পূর্ব্বে, এক রাত্রিতে আমাদের সমস্ত ধ্বজাগুলি চুরি গিয়াছিল? ও বেটা চোর খুব মারো দেখি, এখনি কথা কহিবে।"

এইরূপ যত গোলযোগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, লোকসংখ্যা ততই

বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বহুলোকের সম্মতিক্রমে পাণ্ডা-বুদ্ধিতে শেষে ইহাই স্থির হইল যে, প্রথমতঃ লোকটাকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া বসাও, অথবা দাঁড় করাও। দেখা যাক্, এ লোকটা বসি-বার কালে কি দাঁড়াইবার কালে, ঢলিয়া বা টলিয়া পড়ে কিনা! কিন্তু সহসা লোকটাকে ছুঁইতে কেহ সাহস করিল না। যদি লোকটা সত্য সত্যই মরিয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে, ছুঁইলেই স্নান করিতে হইবে,—হয়ত সৎকারও করিতে হইবে। এমন কাঁচা কাজ করিতে সহসা কেহ সম্মত হইল না। সুতরাং লোকটাকে কেহ উঠাইয়া বসাইতে প্রস্তুত হইল না। তখন সেই বৃদ্ধপাণ্ডা অন্য সকল পাণ্ডাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"তোমরা একটু সরিয়া দাঁড়াও, আমি যেরূপ লক্ষণ দেখিতেছি, তাহাতে আমার নিশ্চয় ধারণা, এ ব্যক্তি মরে নাই। ইহার উদর দেখিতেছ না, যেন ভিতরে ঢুকিয়া গিয়াছে। বোধ হয়, এ লোকটা দুই তিন দিন খাইতে পায় নাই। তাই জঠর-জ্বালা আর সহ্য করিতে না পারিয়া,—এই স্থলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে। আমার এখন স্মরণ হইতে'ছ, এই লোকটাই একঘণ্টা পূর্ব্বে সঙ্গমে গিয়া অঞ্জলি-পূর্ণ জলপান করিয়াছিল। তখন এত মনে ভাবি নাই, কে জলপান করিতেছে,—করুক; ঐ লোকটাই তার পর ঐখানে গিয়া বসে এবং বোধ হয়, ক্ষুধার জ্বালায় সর্দ্দি-গর্ম্মিতে খানিক পরে পড়িয়া মূর্চ্ছিত হয়। তোমরা একটু সরিয়া দাঁড়াও দেখি,—ভিড় কমাও দেখি,—লোকটীর গায়ে বাতাস লাগিতে দাও। আর ঠাণ্ডা জল যদি তোমাদের নিকট থাকে ত, এক ঘটী আমাকে দাও।"

বৃদ্ধের আদেশ-অনুসারে শীতল সলিল আসিল। বৃদ্ধ স্বহস্তে সেই লোকটীর নাকে, মুখে, চোখে, কাণে, কপালে, ধীরে ধীরে

জলবিন্দু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপ সেবা-শুশ্রূষায় সেই লোকটী চক্ষু মেলিল; ধীরে ধীরে নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল; হস্ত-পদের ঈষৎ গতি হইতে লাগিল। বৃদ্ধ কহিলেন,—"আহা, দেখিতেছ না, এই দীর্ঘ বাহু, এই দীর্ঘ পদদ্বয় অন্নরসাভাবে শুষ্ক হইয়া, কাষ্ঠখণ্ডবৎ নীরস হইয়াছে। তোমাদের মধ্যে যাহার বাটী নিকট, সে এখনি দৌড়িয়া গিয়া অর্দ্ধসের দুগ্ধ লইয়া আসুক;—চিনি বা মিছরি কিছু লইয়া আসুক।"

বৃদ্ধের আদেশে দুইজন পাণ্ডা লম্বা লম্বা লম্ফে দৌড়িয়া গিয়া, অর্দ্ধঘণ্টা মধ্যে দুগ্ধ, চিনি ও মিছরি আনিয়া দিল।

ধীরে ধীরে দুগ্ধপানে, ধীরে ধীরে চিনি ও মিছরির সরবৎ পানে, সেই লোকটী সচেতন হইল। বৃদ্ধ তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন,—"বেটা! তু কোন্ হ্যায়? তেরা ঘর কাঁহা হ্যায়?"

সেই লোকটী ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর দিল, "ম্যায় বাঁকানেরকা রহনে-বালা হুঁ। মেরা ভাগ ফুটা হ্যায়? এঁহা কুছ্ কারণ বনা। যো কুছ্ সাথ থা, চুক গয়া। কুলিকা কাম কর্ কিসী তরহ পেট চলতা থা! যোহী কলকত্তে যাকর দেশবালোকী মেহেরবানীসে কুছ্ কার-করণেবালা থা। দো তিন দিনসে ন কুলিকা কাম মিলা আউর ন ভীখ হী মিলী। অব ইয়ে দশা হ্যায়।"

ঐ লোকটী আরও কিছু বল পাইলে, বৃদ্ধপণ্ডা তাহাকে আপন গৃহে ডুলি করিয়া লইয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। হিন্দুস্থানী যুবক কহিল,—"ডুলির আবশ্যক নাই; আমি এখন ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতে পারি।"

যুবক,—পাণ্ডার সহিত ধীরে ধীরে গমন করিয়া, পাণ্ডার গৃহে পঁহুছিয়া, সে রাত্রি তথায় অতিবাহিত করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সেই হিন্দুস্থানী যুবক,—প্রয়াগী পাণ্ডার চাকর হইল। সেই যুবা পুরুষ,—সেই বৃদ্ধ মনিবের কার্য্য সকল, অনুরাগভরে, তৎপরতার সহিত সম্পন্ন করিতে লাগিল।

সেই যুবকের নাম—অমরসিংহ। জাতি—ক্ষত্রিয়। নিবাস ঠিক্ বিকানীরে নহে,—সেই প্রদেশের নিকটবর্ত্তী কোন পল্লীগ্রামে। বয়স ২৭ বৎসরের অধিক হইবে কি ?

যুবক,—গৌরাঙ্গ, শক্তিসম্পন্ন এবং সুপুরুষ। মুখ-কমল,—নবোদিত গোঁপদাড়ী দ্বারা ভূষিত। যেন প্রফুল্ল পঙ্কজে ভ্রমর পঙক্তির সমাবেশ।

বৃদ্ধ পাণ্ডা অতি প্রত্যূষে উঠে। যুবক কিন্তু তাহার প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্বে উঠে। যখন একটু রাত থাকে, যখন কাক-কোকিলও ঘুমায়, তখনি যুবক উঠে। উঠিয়াই "বম্ বম্ হর হর শিব-শঙ্কর" —বলিয়া ধ্বনি করে। তার পর যুবক কোমর বাঁধিয়া কাপড় পরে, আখড়ায় গিয়া কুস্তী করে, বীর-মাটি মাখে, দহন টানে, মুগুর ভাজে, ধূলায় গড়াগড়ি দেয়। বিশ মিনিট কাল মধ্যে এইরূপ ব্যায়াম-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া, যুবক গায়ের ধূলা ঝাড়ে, কাপড় একটু লম্বা করিয়া পরে, আবার ভদ্রলোক হয়। তার পর যুবক ঝাড়ু লইয়া গৃহ পরিষ্কার করে, ব্রাহ্মণ-পাণ্ডার বাসন মাজে, কাপড় কাচে এবং জঞ্জাল-পূর্ণ ঝুড়ি মাথায় করিয়া, দূরে গৃহ-জঞ্জাল ফেলিয়া আসে। প্রয়াগী-পাণ্ডা শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াই বেণী-ঘাটে যায় ; আর তাহার ভৃত্য অমরসিং মাথায় এক প্রকাণ্ড মোট লইয়া, কাঁধে এক বাঁক লইয়া, প্রভুর পিছু পিছু চলে। প্রভুর

আজ্ঞা অনুসারে অমরসিং বেণীঘাটে গিয়া যাত্রী ডাকাডাকি করে, যাত্রীকে মিষ্ট কথায় বশ করে; যাত্রীর গঙ্গা-যমুনার-পূজার আয়োজন করিয়া দেয়। যাত্রীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন করে।

অমরসিংহের গতি নক্ষত্রবৎ ছিল। বৃদ্ধ পাণ্ডা যদি বলিত "অমর! ডাক-ঘরে চিঠি দিয়া আইস,"—অমর অমনি চিঠি লইয়া দৌড়িত; দৌড়ানই তাহার চলন ছিল। বাগানের এক কাঠা জমি খুঁড়িতে বলিলে, অমরসিং দুই কাঠা জমি খুঁড়িয়া ফেলে। অমরসিং ডুবুরি হইয়া কূপ হইতে মনিবের ঘটী তুলে; নৌকার দাঁড় টানে, গুণ টানে ও গাছে উঠিয়া আম পাড়ে, পিয়ারা পাড়ে। অমরসিং বৃদ্ধ-প্রভুর নাতিগুলিকে কোলে পিঠে করে। কোলে একটী ছেলে, মাথায় এক মন চা'ল;—এইরূপে অমরসিং বাজার হইতে আইসে। প্রভু-পাণ্ডার মুখের আদেশ-কথা বাহির হইতে না হইতে, অমরসিং সেই কাজ তদ্দণ্ডেই করে বা করিতে চেষ্টা করে। অমরসিং ক্রমশঃ এরূপ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও প্রভুপ্রিয় হইয়া উঠিল যে, প্রভু আগুনে ঝাঁপ দিতে বলিলে অমরসিং আগুনে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত; বাঘের মুখে যাইতে বলিলে, অমরসিং তাহাতেও প্রস্তুত। ডাকাতের দল আগুলিতে বলিলে, অমরসিং তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হয়। যৌবন-প্রাপ্ত শার্দ্দূলের ন্যায় অমরসিংহের বিষম বিক্রম দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। প্রতিবেশী পাণ্ডাগণের চক্ষু অমরসিংহের প্রতি পতিত হইল।

এইরূপে তিন মাস অতীত হইল। অমরসিং মনিবের কাজকর্ম্ম করে আর থাকে এবং উদর পূর্ণ করিয়া দুই বেলা রুটী খায়। প্রত্যহ রুটী খাইবার সময়, কি জানি কেন অমরসিং একটু ভাবে,

একটু ইতস্ততঃ করে, তার পর ধীরে ধীরে রুটী খাইতে আরম্ভ করে।

অমরসিংহের কার্য্যকারিতা, বুদ্ধি এবং বল-বিক্রম দেখিয়া, বৃদ্ধ-পাণ্ডার আর আনন্দ ধরে না। তিনি ভাবিতেন,—"জানি না, কোন্ পুণ্যে আমার এ সাগর-ছেঁচা-ধন মাণিক মিলিল।" অমরসিংহ সর্ব্বগুণে গুণান্বিত হইলেও লেখাপড়া জানিত না। উর্দ্দু, হিন্দী বা ইংরেজী,—কিছুই জানিত না। প্রভু-পাণ্ডা একদিন তাহাকে কহিল, "অমর! তুমি একটু হিন্দী শেখ; হিন্দী শিখিলে আমি তোমাকে আমার যাত্রিগণের খাতা-পত্র রাখিতে দিয়া নিশ্চিন্ত হই। —খাতা-পত্র অন্যের হাতে দিয়া আমার বিশ্বাস হয় না। অমরসিংহ বলিল, "যে আজ্ঞা প্রভু! কল্য হইতে শিখিতে আরম্ভ করিব।"

পঞ্চম বর্ষে, শিশুর হাতে খড়ি হয়; অমরসিংহের হাতে খড়ি হইল,—২৭ বৎসরে। অমরসিংহ আরম্ভ করিল,—ক কা, কি কী, কু কূ. কে কৈ, কো কৌ, কং কঃ—ইত্যাদি।

পাণ্ডার একটী ষষ্ঠ বর্ষীয় পৌত্র অমরের শিক্ষক হইল! অমরের ভুল হইলে, পাণ্ডা-পৌত্র ছাত্রের কাণ মলিয়া দিত। অমর হাসিত; পাণ্ডাপৌত্রও হাসিয়া অমরের গলা জড়াইয়া ধরিত। শিশুর হাসির সহিত যুবকের হাসি মিশিত। এইরূপ হাসি-কৌতুকের রঙ্গভঙ্গে অমর সিংহের লেখাপড়া চলিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অমরসিংহের চাকরি যথানিয়মে এইরূপে চারিমাসকাল চলিল। অমরসিংহের মাহিনা কত ধার্য্য হইল, আদৌ তাহা ধার্য্য হইল কিনা, তাহা কেহ জানে না। অমরসিংহ মাহিনা চাহে না; মাহিনার কথা বলে না—কেবলই কাজ করে এবং থাকে। প্রভু-পাণ্ডাও খোরাকী ব্যতীত, কাপড় ব্যতীত, নগদ পয়সা একটীও এ পর্য্যন্ত অমরসিংহকে দেয় নাই। তথাপি অমরসিংহের প্রভুর কার্য্যে বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, ঔদাসীন্য নাই, কার্পণ্য নাই, তাচ্ছিল্য নাই, বিরক্তি নাই,—সদানন্দ মনে সদাই সহাস্যবদনে স্ফূর্ত্তির সহিত অমরসিংহ প্রভুর কার্য্য করিতে থাকে।

প্রয়াগী-পাণ্ডার কোনও ভৃত্যের সাধারণতঃ সে সময় মাহিনা ছিল না। ভৃত্যগণ যাত্রীদের নিকট হইতে প্রত্যহ দুই চারি আনা যাহা আদায় করিত, তাহাই মাহিনা বলিয়া গণ্য হইত। সেই হিসাবে, বৃদ্ধ পাণ্ডা অমরসিংহের মাহিনা ধার্য্য করেন নাই। কিন্তু যখন পাণ্ডা দেখিলেন, অমরসিং সর্ব্বকর্ম্ম-দক্ষ এবং অতীব প্রভুভক্ত;—যখন পাণ্ডা আরও দেখিলেন,—অমরসিং অল্পদিন মধ্যে পরিস্কার হিন্দী লিখিতে শিখিয়াছে এবং উত্তমরূপ পড়িতে শিখিয়াছে;—যখন পাণ্ডা বুঝিলেন, শীঘ্রই অমরসিং যাত্রিগণের খাতাপত্র রাখিতে সক্ষম হইবে, তখন পাণ্ডার একটু ভয় হইল; ভাবিলেন,—মাহিনা ধার্য্য না করিলে যদি অমরসিং পলায়, তাহা হইলে আমার বড়ই ক্ষতি হইবে এবং শেষে বড়ই আপ্‌শোষ থাকিবে। অতএব শীঘ্রই ইহার মাহিনা ধার্য্য করা কর্ত্তব্য।

মাহিনা-ধার্য্যের পূর্ব্বে, বৃদ্ধের আর একটী বিষয় জানিবার জন্ত সাধ জন্মিল। অমরসিং সাধু না চোর,—ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। বাহ্যদৃষ্টিতে যেরূপ বুঝা যায়, তাহাতে উহাকে মুনি-ঋষির ন্যায় সাধু বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু উহার ভিতরে কি আছে,—উহার মুখে মধু, অন্তরে বিষ কিনা,—ইহা জানা চাই। যে তাকিয়া ঠেস দিয়া বৃদ্ধ পাণ্ডা বৈঠকখানায় বসেন, একদিন সেই তাকিয়ার নীচে বৃদ্ধ একটী টাকা রাখিয়া দিলেন। বৃদ্ধ রাত্রে অন্দরে উঠিয়া গেলেন, তাকিয়া তুলিবার ভার অমরসিংহের উপর ছিল। অমরসিং সে দিন তাকিয়া তুলিয়াই টাকা দেখিতে পাইল; এবং টাকাটী লইয়া গিয়া তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধকে দিল;—বৃদ্ধ অবাক্ হইলেন। সমস্ত জিনিষ-পত্র খরিদের ভার ক্রমশঃ অমরসিংহের উপর ন্যস্ত হইয়া ছিল। বৃদ্ধের ধারণা ছিল যে, অমরসিং বাজার করিতে গিয়া, নগদ টাকা চুরি না করুক, দস্তুরি নিশ্চয়ই লয়; কারণ, দস্তুরি লওয়া এক রকম প্রথা। অমরসিং দস্তুরি লয় কি না, অথবা বাজারের টাকা-পয়সা চুরি করে কিনা, ইহা পরীক্ষা করিতে বৃদ্ধ প্রস্তুত হইলেন। প্রয়াগের পাঁচ সাত জন প্রসিদ্ধ দোকানদারের সহিত, বৃদ্ধ এসম্বন্ধে পরামর্শ করিলেন। পরামর্শ স্থির হইলে, বৃদ্ধ অমরসিংকে কহিলেন,—'অমুক অমুক দোকানদার ভালো, অমুক অমুক দোকানদারের জিনিষ ভালো, স্বভাব ভালো;—অতএব আটা হোক্, দাল হোক্, কাপড় হোক্,—অমুক অমুক দোকান হইতে লইয়া আসিবে।—অন্য দোকানে কিনিবে না।"

অমযরসিং নির্দ্দিষ্ট দোকানে আটা কিনিতে গেল। দোকান-দারের সহিত দরের কষাকষি আরম্ভ হইল। অমরসিংহের নিকট

বাজারের দর ছাপা ছিল না। আটার দর ঠিক ঠিক অমরসিংহের মুখে শুনিয়া দোকানদার আশ্চর্য্যান্বিত হইল। দোকানদার শেষে কহিল,—"তুমি এইরূপ দর কষাকষি করিলে, আমি তোমাকে দস্তুরি দিতে পারিব না।" অমরসিং ধীরভাবে উত্তর দিল,—"আমি দস্তুরি চাহি না।" দোকানদার পুনরায় কহিল,—"তুমি কি রাগ করিতেছ? রাগ করিও না, দস্তুরি তোমাকে দিব।" অমরসিং কহিল,—দস্তুরি লওয়া আমার ব্যবসা নহে। —আমি কস্মিন্‌কালে কোন দোকানদারের নিকট হইতে দস্তুরি লই নাই, সুতরাং রাগও করি নাই। আমি ষোল আনা টাকা দিব, ষোল আনা জিনিষ লইব। মনিবের এক পয়সা আমার বুকের রক্ত-স্বরূপ। অতএব দস্তুরি-লোভ আমাকে দেখাইও না। যদি ঠিক দরে আমাকে আটা দিতে পারো, তবে দাও; নচেৎ আমি মনিবকে গিয়া এ কথা জানাইব।" দোকানদার অমরসিংকে পরাস্ত করিতে গিয়া নিজে পরাস্ত হইল। নির্দ্দিষ্ট ঠিক-দরে, অমরসিং দেড়মন আটা খরিদ করিল এবং তাহা মাথায় করিয়া প্রভুর বাটীতে আসিল, কহিল,—"আপনি এই দোকানদারকে ভালো বলিয়াছিলেন; কিন্তু কছুতেই আমার ভালো বলিয়া বোধ হইল না;—এ ব্যক্তি দস্তুরিরূপ ঘুষ আমাকে দিতে চায় এবং আমাকে মহার্ঘ্যদরে আটা লইতে বলে।" প্রভু পাণ্ডা প্রকৃত কথা গোপন রাখিয়া উত্তর দিলেন,—"তবে তোমার যে দোকানে ইচ্ছা সেইখান হইতে আমার জিনিষ-পত্র লইও।—তুমি যাহাকে ভালো বুঝিবে, তাহারই নিকট হইতে জিনিষ-পত্র লইও।"

এইরূপ এবং অন্যরূপ অনেক পরীক্ষা করিয়া, পাণ্ডা বুঝিলেন, —অমরসিং চোর নহে,—সাধু; অমরসিং ঝুটা নহে,—সাচ্চা;

অমরসিং গিল্টি নহে,—খাঁটি সোনা; অমরসিংকে তখন মাহিনা দিয়া ঘরে রাখা, বৃদ্ধ যুক্তিসিদ্ধ বোধ করিলেন। এক দিন অমরসিংহকে বৃদ্ধ পাণ্ডা কহিলেন—"তুমি যাত্রিগণের নিকট হইতে মাসিক কি পাও?—প্রত্যহ গড়ে তোমার কয় আনা করিয়া রোজগার হয়?" অমরসিং কহিল,—"কৈ, যাত্রিগণের নিকট হইতে ত আমি কিছুই লই না?—আমার রোজগার ত কিছুই নাই।"

বৃদ্ধ। সে কি কথা! যাত্রিগণের নিকট হইতে পাণ্ডার ভৃত্যগণ প্রত্যহ কিছু কিছু লইয়া থাকে।

অমরসিং। আমি কিছুই লই না, অন্য ভৃত্যগণ যে লয়, তাহাও জানি না। এরূপ লওয়া যে প্রথা, তাহাও শুনি নাই। বিশেষতঃ আপনার যখন এ সম্বন্ধে কোন আদেশ ছিল না, তখন ত আমি লইতেই পারি না। আর এক কথা যাত্রীদিগের নিকট হইতে এরূপ ভাবে পয়সা লইতে আমি ইচ্ছুকও নাহ।

বৃদ্ধ। কেন?—কেন? তুমি যাত্রীদের জন্য মোট বও, ঘর পরিষ্কার করিয়া দাও, ফুল-তুলসীপত্র আনো, বাজার করো, যাত্রিগণকে পথ-চেনাইয়া লইয়া নানা স্থলে ঘুরিয়া বেড়াও,—যাত্রিগণের তুমি এত কাজ করিতেছ, অথচ যাত্রিগণের নিকট হইতে পয়সা লও না,—এ কেমন কথা? বিদায়ের সময় যাত্রিগণকে বলিলেই ত তাহারা তোমাকে কিছু কিছু দিয়া যায়;—তুমি লও না কেন?

অমর। আমি যাত্রিগণের যে কার্য্য করি, সে তো আপনার আদেশে এক হিসাবে দেখিতে গেলে, আমি ত যাত্রিগণের কোন কাজ করি না, সে কাজ ত আপনার।

বৃদ্ধ। সে যাহা হোক্, এখন হইতে তুমি যাত্রিগণের নিকট আপন অংশ আদায় করিয়া লইও।

অমর। (যোড় হাতে) প্রভু! ঐটী আমাকে ক্ষমা করিবেন। পয়সার জন্য যাত্রীকে আমি মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিব না।

বৃদ্ধ। আচ্ছা, মুখ ফুটিয়া বলিতে না পারো, যদি কোন যাত্রী আপনা হইতে তোমাকে কিছু দেয়, তাহা হইলে ত তুমি লইতে পারিবে?

অমর। হাঁ! আপনা হইতে যদি কোন যাত্রী কিছু দেয়, তাহা অবশ্যই লইব; এখন লইয়াও থাকি; কিন্তু,—সে পয়সাও আমি নিজে লই না; আপনাকে দিয়া বলি,—যাত্রিগণ দিয়া গিয়াছে।—আপনি তাহা লন।

বৃদ্ধ। ও—বটে, বটে! তুমি আমাকে মধ্যে মধ্যে চারি আনা, আট আনা দিয়া থাক বটে! কিন্তু সে পয়সা যে তোমার প্রাপ্য, তাহা আমি জানিতাম না। যা হউক এখন হইতে উহা তোমারই থাকুক।

অমর। (যোড়হাতে) প্রভু! আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যাত্রিগণের পয়সা আমি লইব না। যাত্রিগণের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত পয়সা আপনারই থাকিবে,—আমি বাহক মাত্র।

বৃদ্ধ পাণ্ডা অন্তরে বড় প্রীতি পাইলেন।

বৃদ্ধ। অমর! তোমাকে স্থায়িরূপে আমার সংসারে রাখিব, ইচ্ছা।—মাসিক কত টাকা বেতনে তুমি থাকিতে পারো?

অমর। প্রভু! দয়া করিয়া আমাকে যাহা দিবেন, তাহাতেই আমি থাকিব। আপনি দয়া করিয়া আহার দিয়া আমার প্রাণ

বাঁচাইয়াছেন, আপনি যাহা দিবেন, তাহাতেই আমি থাকিব ; যদি কিছু না দেন, তাহা হইলেও আমি থাকিব।

বৃদ্ধ ভাবিল, এইবার আমার পছন্দসই, মনের মত লোক পাইয়াছি। বৃদ্ধ কহিল,—"তুমি ধন্য পুরুষ!—তোমাকে আমি উপযুক্ত বেতনই দিব।—কি দিব, এখন আমি বলিব না। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি কিছুদিন জীবিত থাকো এবং আমার এই বিস্তৃত বিষয়-কর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ করো। তোমার মত সাধু, সচ্চরিত্র এবং ক্ষমতাবান্ লোক ইহজীবনে আমি আর কখন দেখি নাই। —তুমি জীবিত থাকো। তোমার সন্তান-সন্ততি নাই যে, তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিব, তাহারা চিরায়ু হোক্। তবে তোমাকে পুনঃপুনঃ আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি চিরায়ু হও। আর উপযুক্ত পাত্রী খুঁজিয়া এই প্রয়াগ-ধামে তোমার বিবাহ দিব। তোমাকে গৃহবাসী করিব।—আশীর্ব্বাদ করি, "তুমি কিছুদিন জীবিত থাকো।"

বৃদ্ধের কথা শুনিয়া, যুবক অমরসিং একবার আকাশ পানে চাহিল। চাহিয়া চাহিয়া, আকাশ দেখিয়া দেখিয়া, যুবক বলিল,—"আমার চোখে কি পোকা পড়িয়াছে।" অমনি অঞ্চল দিয়া চোখের জল মুছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রয়াগের এ বৃদ্ধ পাণ্ডার নাম—কেশবরাম। ইনি একজন ধনবান্ পাণ্ডা। জমিদারীর আয় বার্ষিক ত্রিশহাজার টাকার অধিক নয় বটে ; কিন্তু ইহাঁর নগদ টাকা, লক্ষ কি কোটী,—তাহা

কেহ স্থির করিতে পারিত না। তাঁহাকে কেহ বলিত লক্ষপতি; কেহ বলিত ক্রোর-পতি। তেজারতি ব্যবসায়ে ইঁহার আয় বিলক্ষণ ছিল এবং যাত্রীর আয়ও ইঁহার অনেক ছিল। কতকগুলি রাজা, জমিদার,—ইঁহার বাঁধা যজমান ছিলেন,—ইহা ব্যতীত গৃহস্থ যজমানও ইহার বহুসংখ্যক ছিল।

কেশবরাম বাল্যকাল হইতেই পাণ্ডা। পঞ্চমবর্ষ বয়সে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। সুতরাং তিনি এখন পাণ্ডাগিরিতে পাকিয়া, একেবারে ঝুনা হইয়া আছেন। মধুর বাক্যে যাত্রী বশ করিতে, তাঁহার মত কেহ আর তখন সক্ষম ছিল না। যাত্রীদের প্রতি তাঁহার মৌখিক যত্ন-ভালবাসা, খুবই ছিল। তীর্থ-কার্য্য শেষ-হইলে যাত্রীর বিদায়-কালে, তিনি টাকা পয়সা লইয়া বড়ই টানা-টানি করিতেন। যাত্রীর সম্মুখে এমনি একটী লম্বা চৌড়া ফর্দ্দ ধরিতেন যে, তাহা দেখিয়াই যাত্রীর চক্ষু স্থির হইত। এদিকে বাধ্য হইয়া পাণ্ডাকে ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে হইত; পিতার উইল অনু-সারে অতিথিগণকে নিত্য-নৈমিত্তিক দান-সেবা ছিল; ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে অন্নদান ছিল; কতকগুলি অন্ধ, খঞ্জ, পঙ্গু ব্যক্তির মাসিক-বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট ছিল; দেব-দেবীর নিত্য পূজা দেওয়া ছিল; দেবতা-সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ-প্রণিপাত করা ছিল; সবই ছিল,—ছিল না কেবল, একটী। যাত্রীর বিদায় হইবার কালে, তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞান আদৌ যেন থাকিত না। যে যেমন যাত্রী, তাহা বুঝিয়া, পাণ্ডা সেইরূপ ফর্দ্দ করিতেন। কাহারও নিকট হইতে কখন এক টাকা বাড়ী ভাড়া লইতেন; সেই বাড়ীরই ভাড়া অন্য সময়ে অন্য লোকের নিকট দশ টাকা চাহিয়া বসিতেন। শ্রাদ্ধে আট আনার থাল দিয়া দুটাকা লিখিতেন; পাঁচ সের চাল দিয়া পঁচিশ সের লিখিতেন।

যাত্রিগণ প্রথমে মহাসমাদর এবং অভ্যর্থনা পাইয়া, শেষে যখন ঐ বিরাট্ ফর্দ্দ দেখিত, তখন তাহাদের অন্তরাত্মা শুকাইয়া যাইত। যাত্রিগণ বাদ প্রতিবাদ করিলে, পাণ্ডা সে কথা কিছুতেই শুনিতেন না। যতক্ষণ না আপন কড়া-গণ্ডা বুঝিয়া পাইতেন, ততক্ষণ তিনি যাত্রিগণকে ছাড়িতেন না; তবে তাঁহার এই গুণ ছিল,—টাকার জন্য কোন যাত্রীকে তিনি রোদে বসাইয়া রাখেন নাই, অথবা কোন যাত্রীকে এজন্য কখন প্রহার করেন নাই। প্রথমতঃ যাত্রিগণকে মিষ্টকথা বলিয়া খুব আত্মীয়তা দেখাইয়া, ফর্দ্দ অনুযায়ী টাকা পাইবার তিনি চেষ্টা করিতেন; সে চেষ্টা যখন বিফল হইত, তখন তিনি মৃদু-মন্দ-মধুর ধমক দিতে আরম্ভ করিতেন। ধমকের চরম-সীমা ছিল এইরূপ;—"টাকা চুকাইয়া না দিলে আমি তোমাকে এখান হইতে উঠিতে দিব না।" তাহাতেও যে যাত্রী টাকা দিতে পারিত না, কেবল বসিয়া বসিয়া কাঁদিত, বৃদ্ধ পাণ্ডা যাত্রীর যথা-সর্ব্বস্ব মোট পুঁটুলি লইয়া,—তাহাকে ছাড়িয়া দিতেন; তবে ছাড়িয়া দিবার পূর্ব্বে, কোন কোন যাত্রীর নিকট তিনি এক আধটা হ্যাণ্ডনোটও লিখিয়া লইতেন। চল্লিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পাণ্ডা কেশবরাম এইরূপ সতেজে স্বকার্য্য চালাইয়াছিলেন। চল্লিশের পর বয়স যখন পঞ্চাশে উঠিল, তখন মেজাজ কিছু নরম হইল। যাত্রীদের উপর সেরূপ উৎপীড়ন দুই আনা কমিয়া গেল। এখন তাঁহার বয়ঃক্রম ষাট বৎসর এখন তিনি সাধুপাণ্ডা বলিয়া প্রয়াগ-ধামে সুবিখ্যাত।

ঐশ্বর্য্যে যেরূপ তিনি অতুলনীয় ছিলেন, কার্পণ্যেও সেইরূপ তিনি অতুল্য। সেই মোটা কাপড় পরিধান;—হাঁটুর নীচে সে কাপড় কখন পড়ে নাই,—সেই প্রভাতে উঠিয়া খালি-পায়ে একটী

ঘটী হাতে করিয়া প্রায় এক ক্রোশ পথ চলিয়া সঙ্গম তীর্থে তিনি আসিতেন। তাঁহার জুতা ছিল কি না, তাহা কেহ জানে না। কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন, তাঁহার এক জোড়া জুতা আছে। তবে সে জুতা,—বারো বৎসর পূর্ব্বে, কি বাইশ বৎসর পূর্ব্বে খরিদ তাহা কেহ বলিতে সক্ষম হইত না। জুতা প্রথমতঃ কাগজে মোড়া, তাহার উপর নেকড়া দিয়া বাঁধা;—এক পৃথক্ প্রকোষ্ঠে, সযত্নে তাহা রক্ষিত ছিল। বৎসরের মধ্যে দুই দিন কি তিন দিন, সে জুতা পায়ে উঠিত কি না সন্দেহ। কোন দরবারে মাজিষ্ট্রেট সাহেব যদি নিমন্ত্রণ করিতেন, কেশবরাম সেই দিন জুতা পায়ে দিতেন। বাজার করিতে গিয়া কেশবরাম এখনও দশ পনর সের মোট হাতে করিয়া লইয়া আসেন। ভক্ষণ,—লবণ এবং আটার রুটী;—তাহার উপর যৎকিঞ্চিৎ ঘি যে দিন হইত, সে দিন সমারোহের আর সীমা থাকিত না। আবার উহার উপর যে দিন একটু ডাল হইত, সে দিন ত দানসাগর ব্যাপার! এমনও বলিতেন, "এরূপভাবে ডাল এবং ঘি যদি প্রতিদিন নষ্ট হয়, তাহা হইলে সংসার অচল হইয়া পড়িবে। একখানি গামছা তাঁহার তিন বৎসর যাইত। দু'খানি কাপড়ে তাঁহার বৎসর কাটিত। দানধ্যান যাহা ছিল, তাহা সমস্তই বাঁধাবাঁধি নিয়মে,—এক-চুল এদিক ওদিক হইবার যো নাই। তাঁহার পিতার উইলে দানাদির নিমিত্ত মাসিক পঞ্চাশ টাকা ব্যয় করিবার কথা লিখিত ছিল। বরং উনপঞ্চাশ হইত, তবু কখন একান্ন হইত না। তবে বয়স যখন তাঁহার পঞ্চাশ বৎসর হইল, তখন শুনা যায়, তিনি নাকি কিছু মুক্তহস্ত হন। মুক্তহস্ত হইলেও, পায়ে জুতা ছিল না, গায়ে আঙরাখা ছিল না, পরণে লম্বা ধুতি ছিল না,—এই

সময়ে তাঁহার আঁচলের খুঁটে চারি গণ্ডার পয়সা বাঁধা থাকিত।— গরীব দুঃখী দেখিলে তাহা স্বহস্তে দান করিতেন; কিন্তু এমনি স্বভাব যে, ঐ চারি আনা হইতেও আবার তিন আনা বাঁচাইয়া তাহা ঘরে লইয়া যাইতেন। যে ক্ষেত্রে পয়সা ব্যয় না হয়, নিজ স্বার্থের কোন ক্ষতি না হয়, সেইরূপ ক্ষেত্রে, তিনি দয়া দেখাইতে, সদা পরের উপকার করিতে,—সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতেন। কিন্তু তাঁহার মেজাজ যেন ক্রমশঃ কিঞ্চিৎ মোলায়েম হইয়া আসিতে লাগিল বটে, কিন্তু হাড়ে কেমন একটু টক্ রহিয়া গেল। সে টক্‌টুকু বড় ঝাল-টক্!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ভাদ্র মাসের ভরা-নদী দেখিতে বড় সুন্দর। নদীর এই অবস্থাকে কবিগণ নদীর যৌবন কাল বলিয়া থাকেন। স্ফূর্ত্তি, তেজ ও দম্ভের সহিত নানা স্থানের নানা নদ-নদী এই কালে দুকূল ভাসাইয়া চলিয়া যায়। যখন ছোট ছোট তরঙ্গ উঠে,—মনে হয়, যেন পদ্ম-ফুল নাচে। যখন বড় বড় ঢেউ উঠে,—মনে হয়, যেন নন্দন-কানন নাচে। আর নাচে সেই পূর্ণিমা-নিশীথে,—সেই নদী-জলের নীচে,—সেই আকাশের চাঁদ।

এই ভাদ্র মাসে, প্রয়াগ-মহাতীর্থে, আকবরের সেই অপূর্ব্ব দুর্গোপরি দাঁড়াইয়া, কখন কি গঙ্গা-যমুনার সম্মিলন দেখিয়াছ? ধরাধামে এরূপ শোভা আর আছে কি না, জানি না! সিংহ-গর্জ্জনের ন্যায় জলের গভীর গর্জ্জন বড়ই শ্রুতি-ভয়ঙ্কর। শ্রুতি-

ভয়ঙ্কর না বলিয়া, শ্রুতিমধুর বলি না কেন? ভয়ঙ্কর ভাবের ভিতর মধুর ভাব কি জন্মিতে নাই? সর্পবিষও ত সুধার কাজ করে! দুর্গের উচ্চ শিখরে দাঁড়াইয়া, নদীর গভীর গর্জ্জন শুনিয়া, আমার ভয় কি? লৌহ-রেলিং-বেষ্টিত সিংহের গর্জ্জন শুনিয়াই বা আবার ভয় কি! মনে করো না কেন, মেঘরাগের আলাপ হইতেছে? স্বর্গের বিজয়-বাদ্য ধরাধামে বাদিত হইতেছে! মনের উল্লাসে গভীর বাদ্য শ্রবণ করো,—আর সঙ্গে সঙ্গে তাণ্ডবে উন্মত্ত হও না কেন ভাই!—ভয় কি? যদি ভয়ই করিতে হয় ত সর্ব্বত্রই এবং সর্ব্বক্ষণই বর্ত্তমান। প্রস্তর-নির্ম্মিত যে দুর্গপ্রাকারে দণ্ডায়মান থাকিয়া, আপনাকে নিরাপদ্ ভাবিতেছ সেই প্রাচীর যদি এখনি ভাঙ্গিয়া যায়! মনে করিও না যে, পাথরের নির্ম্মিত শক্ত প্রাচীর,—ভাঙ্গা বড় কঠিন; কিন্তু ঐ অদূরে দেখ,—যমুনার জলরাশির অজেয় ধাক্কায়,—ঐ দেখ মোগলের প্রাচীর ভগ্ন-প্রায় হইয়া রহিয়াছে। আবার ইংরেজ তাহা পুনর্নির্ম্মাণ করিয়া ভগ্নদেহে নূতন শরীর যোজনা করিয়াছেন। মৃত্যু-ভয় কখন নাই? এখনি ত ভূমিকম্প হইতে পারে। অট্টালিকা, ভূমিসাৎ হইতে পারে। পর্ব্বত, ভূগর্ভে প্রোথিত হইতে পারে। বজ্রাঘাতে মুহূর্ত্তমধ্যে যে, এখনি তোমার প্রাণত্যাগ হইতে পারে। সদা সর্ব্বত্র মরণ নিশ্চয় জানিয়া, মৃত্যুকে কখন ভয় করিও না। যাহা সঙ্গের সাথী,—যাহা ছায়ার ন্যায় সর্ব্বত্র অনুগমন করে, তাহাতে আবার ভয় কি? অর্দ্ধাঙ্গিনী সহধর্ম্মিণী অপেক্ষাও, যে তোমাকে অধিক ভালবাসে,—তোমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে যে একান্ত অনিচ্ছুক, তাহাকে আবার ভয় কি? যদি তুমি বুদ্ধিমান্ হও, ভাবুক হও, তবে সেই ভয়ের ভিতর,—সেই ভয়ানকের, কেবল মধুরতা সন্দর্শন করিতে চেষ্টা করো।

ভীষণ ভাবের যে মধু, তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট মধু বলিয়া পৃথিবীতে পরিকীর্ত্তিত। তাই ত বলিতেছিলাম, বারিরাশির বিষম গর্জ্জন শ্রুতিভয়ঙ্কর না হইয়া, তোমার শ্রুতিমধুর হউক না কেন?—এবং উহা হওয়াই ত উচিত।

এই পরিপূর্ণ সঙ্গম-জলে, এমনি দিনে, যদি একখানি বা দুই-খানি বা চারি খানি সারি সারি বৃহৎ বজরা ভাসে, আর তাহার উপর যোড়শী কুলবালাগণ,—কখন দাঁড়াইয়া, কখন বসিয়া—শঙ্খ-ঘণ্টার ধ্বনি করেন,—ফুলরাশি বেষ্টিত হইয়া মালা গাঁথেন এবং মাঝে মাঝে রাধা-কৃষ্ণ-প্রেমবিষয়িণী সঙ্গীত-গাথা মধুরকণ্ঠে গাহিতে থাকেন,—তাহা হইলে কি হয় বলো দেখি? নিরাপদ দুর্গ-প্রাকারে কতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারো? ভাদ্র মাস; বৃষ্টি যদি হয় ত উঠিয়া কি পালাও,—না, ছাতা মাথায় দিয়া থাকো?

আবার এ একটী কি নূতন দৃশ্য? কিছুই ত বুঝিতে পারি-তেছি না। এই যুবতীদল-চন্দ্র-হট্ট মধ্যে, হঠাৎ একজন যুবক আসিয়া, কোন যুবতী-বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া,—তাহার নয়ন-পদ্ম দুটি, আপন করপদ্মদ্বারা হঠাৎ আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল,—এখানে উপমা কি দিব? বলিব কি, দুরন্ত রাহু,—সুধাকর চন্দ্র গ্রাসিল,—অথবা শরীরিণী স্বর্ণপঙ্কজিনীকে কালভুজঙ্গ দংশিল;—উপমা পছন্দ হইতেছে ত? যদি পছন্দ না হয়, তবে আর অলঙ্কার-উপ-মায় কাজ নাই, মূল আদি উপকরণ লক্ষ্য করিবেন চলুন। সম্মুখে মূল শ্রীমদ্ভাগবত উপস্থিত, বঙ্গানুবাদ দেখিবার আবশ্যকতা কি আছে? আসুন পাঠক,—আমার সঙ্গে আসুন,—বজরা দেখিবেন চলুন। অভাবেই উপমা চলিতে পারে; যেখানে সদ্ভাব, সেখানে উপমার প্রয়োজন কি?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সেই বৃদ্ধ পাণ্ডা কেশবরাম আজ মহাবিব্রত। একখানি ছোট ডিঙ্গি করিয়া, কেশবরাম দল-বলসহ কখন সেই বজরায় যাইতেছেন, কখন ফিরিয়া আসিতেছেন। কেশবরাম কখন রাশীকৃত আতপ-তণ্ডুল আহরণ করিতেছেন, কখনও বিবিধ রকমের বহুসংখ্যক বস্ত্র সজ্জিত করিতেছেন, কখনও নানারূপ স্বর্ণ-রৌপ্যের দান-সামগ্রী এবং অলঙ্কারাদি আনিয়া গঙ্গা-তীরে রাখিতেছেন, কখনও বা ভৃত্যবৃন্দকে ভৎ র্সনা করিতেছেন, আর কখন বা দুগ্ধদধি-ক্ষীর-মিঠাই বিক্রেতাগনের সহিত সদালাপে নিযুক্ত আছেন ; ফল কথা কেশবরাম আজ মহাবিব্রত।

বজরা চারিখানি। তন্মধ্যে দুই খানি খুব বড় ; দুইখানি ছোট। প্রত্যেক বজরার সহিত একখানি ডিঙ্গি সংলগ্ন আছে। প্রত্যেক বজরা রঞ্জিত-বস্ত্রে এবং ফুলমালাদলে সজ্জিত। বজরার দাঁড়-মাঝিগণ সকলেই হিন্দু,—জল আচরণীয় জাতি।

কাশীধামে দীনদয়াল নামে তখন এক বিখ্যাত সওদাগর ছিলেন। লোকে তাঁহাকে ধনকুবের বলিত। কলিকাতায়, পাটনায়, মুজাপুরে, এলাহাবাদে, কাণপুরে, দিল্লীতে, লাহোরে,—রেঙ্গুনে ভারতবর্ষের নানাস্থানে তাঁহার দোকান-আড়ত কারবার ছিল দীনদয়াল দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। কেবল নিজের কৃতিত্বের গুণে এরূপ বড় সওদাগর হন। তাঁহার ব্যবসায় মূল পুঁজি ছিল, সততা। ইহার উপর পরিশ্রম ছিল, ধৈর্য্য ছিল, অধ্যবসায় ছিল, এবং একাগ্রতা ছিল। ব্যবসা আরম্ভের প্রথম কালে তিনি মোট বহন করিতেন,—ফেরি-কর হইয়া লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়া জিনিষ

ফেরি করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার দর ছিল, এক। যে জিনিষের দর এক টাকা, ক্রেতাকে সেই জিনিষের মূল্য, তিনি এক টাকাই বলিতেন,—কখন পাঁচসিকা, দেড় টাকা বা দুই টাকা বলিতেন না। এক টাকার যদি এক পয়সা কম কেহ বলিত, তাহা হইলে সে জিনিষ তিনি তাহাকে দিতেন না। যোড়হাত করিয়া, মিষ্ট কথায় অভিবাদন করিয়া ক্রেতাকে কহিতেন,—"মহাশয়! মাপ করিবেন,—আমার দর এক;—আমি ইহা, এক টাকার সিকি পয়সা কম বলিলে, বেচিব না।" এই কথা বলিয়া তিনি ধীরে ধীরে অন্যত্র যাইতেন। ব্যবসায়ে এইরূপ নীতিতে প্রথম বৎসর বড়ই অসুবিধা ঘটিল। সাধারণতঃ লোকের অভ্যাস,—দর দস্তুরি করিয়া জিনিষ লওয়া। যাহারা পরিপক্ক ক্রেতা"—দ্রব্যের মূল্য বিক্রেতা যদি দুই টাকা বলিতেন,—তাঁহারা বলিতেন,—"আট আনায় দিবে?" যাহারা কাঁচা ক্রেতা, তাঁহারা বলিতেন,—এক টাকা ছয় আনায় না দিলে ঐ জিনিষটী লইব না!" এইরূপ ক্রেতা-বিক্রেতায় আধ-ঘণ্টাকাল, কখন বা এক ঘণ্টাকাল ধ্বস্তাধ্বস্তি চলিত। তারপর জিনিষ খারদ হইত। বাক্যব্যয়, বাহ্বাস্ফোট, উচ্চচীৎকার, গঙ্গাজলি, তামাতুলসী-গ্রহণোদ্‌যোগ ইত্যাদি ব্যাপার ব্যতীত কি ক্ষুদ্র জিনিষ কি বড় জিনিষ,—কোন জিনিষেরই সওদা হইত না। এহেন কালে, দীনদয়াল যখন "আমার এক দর" এই কথা বলিতে লাগিলেন, তখন অধিকাংশ লোকে মনে করিতে লাগিল,—দীনদয়াল পাকা প্রবঞ্চক,—বুজরুক,—ধড়িবাজ। সুতরাং দীনদয়ালের জিনিষ-পত্র অতি সামান্যই বিক্রী হইতে লাগিল। এমন কি, কোন কোন দিন কোন জিনিষই বিক্রয় হইত না। দীনদয়ালের কষ্টের অবধি রহিল না। সে জিনিষ মাথায় করিয়া

প্রতিদিন কাশী সহরের অলি গলি ঘুরিয়া বেড়ায়; কষ্টের সীমা থাকে না,—অথচ দিনান্তে গড়ে প্রত্যহ আটগণ্ডা পয়সার জিনিষ বিক্রয় হয় কিনা সন্দেহ।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, এক দিন দীনদয়াল চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে, মোট মাথায় করিয়া ঘরে আসিতেছেন। সমস্ত দিন কাশীসহর ভ্রমণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার একদর বলিয়া সে দিন কেহই তাঁহার কোন জিনিষ লয় নাই। সেদিন দীনদয়ালের এমন পয়সা ছিল না যে, এক পয়সার ছাতু-লঙ্কা খাইয়া প্রাণধারণ করেন। প্রত্যেক লোককে জিনিস দেখাইতেছেন, প্রত্যেক লোককে "লউন লউন" করিয়া ধরিয়াছেন, কিন্তু কেহই কোন জিনিষ লন নাই; কারণ, দীনদয়ালের একদর। দীনদয়াল কাঁদিতেছেন আর বলিতেছেন, "হা ধর্ম্ম! সত্য কথার কি এই পরিণাম? সততার কি এই পরিণাম!" দীনদয়াল আপন কুটীরে গমন করিলেন, ভাবিলেন,—"আজ সত্যপথ ছাড়িব! আমি আমার সেই সদ্গুরুর উপদেশ উল্লঙ্ঘন করিব। যে সত্যপথে উদরান্নের সংস্থান হয় না, যে সত্য পথে সকলেই আমাকে প্রবঞ্চক এবং মিথ্যাবাদী ভাবে, সে সত্যপথে থাকিয়া আর আমার ফল কি? আজ পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিব; মৃত্যুকালে পিতার যে আদেশ বাক্য—তাহা অবহেলা করিব;—আমি সত্যপথ ছাড়িব,—কল্য হইতে একদরে বিক্রয় বন্ধ করিব,—এক টাকার স্থলে পাঁচ টাকা হাকিব",—এইরূপ ভাবেন, আর দীনদয়াল হাউ হাউ করিয়া কাঁদেন। মাতা বলিয়াছিলেন,—"বাছা! সত্যপথে থাকিলে অর্দ্ধেক রাত্রে অন্ন হয়,—তুমি সত্যপথ কখনও ছাড়িও না।—কিন্তু আজ এই সমস্ত দিন গেল, রাত্রিও প্রায় অতিবাহিত হয়,—এক

ছটাক আটাও ত আমার মিলিল না।" সে রাত্রে দীনদয়ালের আর ঘুম হইল না। অরুণোদয়ের পূর্ব্বেই দীনদয়াল আবার মোট মাথায় করিলেন,—আবার ফেরি করিতে বহির্গত হইলেন।—"এত-দিনের সত্যপথ হঠাৎ আজ ত্যাগ করা ভালো নয়,—আরও এক-দিন, দুই দিন, তিন দিন,—দশ দিনই দেখি না কেন? দেখি না, শেষে কি ফল দাঁড়ায়। আমার মা নাই, বাপ নাই, স্ত্রী নাই, সন্তান-সন্ততি কেহ নাই, পোষ্যবর্গ কেহই নাই,—আমার এই একটা পেটের জন্য,—আমার প্রিয়তম প্রাণসম এই ধর্ম্মবৃষকে বলি দিব কেন?" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে দীনদয়ালের আরও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা জন্মিল।—"দশ দিন বলি কেন, আমার জীবনান্ত পর্য্যন্ত ধর্ম্মপথে থাকিয়া, যদি এরূপ কষ্ট সহ্য করিতে হয়, তবে তাহাও করিব,—তথাপি ধর্ম্মপথ ছাড়িব না। গত কল্য খাইতে পাই নাই বটে, কিন্তু আজ কি কিছু বিক্রয় হইবে না? চার পয়সার সামগ্রী বিক্রয় হইলেও উদরপূর্ণ হইবে,—ভয় কি?"—অনাহারে শরীর ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে, তথাপি সেই মোট মাথায় করিয়া [illegible] চিত্তে, ধর্ম্ম-মদিরায় উন্মত্ত হইয়া দীনদয়াল ফেরি করিতে চলিয়াছেন।

চির দিন কখন সমান যায় না। কভু বনে বনে ভ্রমণ, কভু রাজসিংহাসনে আরোহণ। দুই বৎসর কাল দীনদয়ালের এইরূপ কষ্টে অতিবাহিত হইল বটে; কিন্তু দুই বৎসরান্তে দীনদয়াল দেখি-লেন, তাঁহার খরিদদারের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। অর্থাৎ তখন কোন কোন লোক বুঝিতে পারিয়াছেন,—দীনদয়ালের দর একই বটে, তাঁহার কথাই সত্য। তৃতীয় বৎসরে দীনদয়াল দেখি-লেন, তাঁহার খরিদদারের সংখ্যা এত বাড়িয়া উঠিয়াছে

যে, তিনি একা কার্য্য-নির্ব্বাহ করিতে অক্ষম। তিনি নিজে একটী মোট লন, আর দুইটী ভৃত্য দুইটী মোট মাথায় লইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করে। দীনদয়াল যে পাড়ায় মোট নামান, সেই পাড়ার আবাল-বৃদ্ধ বনিতা তথায় উপস্থিত হন। দর-দস্তর নাই, কথার বেচা কেনা নাই, অভিনয়-আড়ম্বর নাই,—অতি অল্প সময়ের মধ্যে, একই দরে দীনদয়ালের বহুসংখ্যক জিনিষ একই স্থানে বিক্রয় হইতে লাগিল।

চতুর্থ বৎসরে দীনদয়াল দেখিলেন, সহরের প্রায় সমস্ত নগর-বাসী তাঁহার খরিদদার। তখন আর ফেরি করা চলিল না,—দীন-দয়াল একখানি দোকান খুলিলেন। ছোট দোকান ক্রমশঃ বড় দোকান হইল; এক খানি দোকান ক্রমশঃ পাঁচ খানি বড় দোকান হইল। দুইজন ভৃত্য ছিল, ক্রমশঃ পঞ্চাশজন ভৃত্য হইল;—দীনদয়ালের দোকানে প্রত্যহ এত ভিড় হয় যে, তিনি জিনিষ বেচিয়া উঠিতে পারেন না; টাকা গণিয়া লইতে যেন সময় কুলায় না। সততার ফল,— একদরে বিক্রয়ের ফল,—আজ সার্থক হইল।

দীনদয়াল যখন খুব বড় দোকানদার হইলেন, তখন কোন কোন লোক সন্দেহ করিতে লাগিল,—এখন ইনি পসার জমাইয়া বসিয়া-ছেন,—অতএব বেশী দরে জিনিষ বেচিতেছেন। কিন্তু সে অগ্নি-পরীক্ষায় দীনদয়াল সহজে উত্তীর্ণ হইলেন। পসার আরও বাড়িল। তার পর ভারতের নানা স্থানে দোকান-আড়ত প্রতিষ্ঠিত হইল। দীনদয়াল লক্ষপতি,—ক্রমশঃ কোটীপতি বলিয়া গণ্য হইলেন।

বলা বাহুল্য, সৌভাগ্যের উদয়-আরম্ভেই দীনদয়ালের বহু আত্মীয় স্বজন কুটুম্ব দেখা দিল। সহধর্ম্মিণী কন্যা পুত্র পৌত্র পৌত্রী,—পিসি মাসী, খুড়ি জেঠাই,—ক্রমশঃ দীনদয়ালের গৃহের

শোভাবর্দ্ধন করিল। একটা গ্রামের লোক তাঁহার বাড়ী প্রত্যহ খাইত। দীনদয়াল কাহাকেও অন্ন দিতে কখন কাতর ছিলেন না। যতই লোক আসুক,—অন্নদানে সকলকেই পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন। দীনদয়ালের যখন ষাট বৎসর বয়ঃক্রম, তখন তিনি ধর্ম্ম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিলেন। কোথাও মন্দির-প্রতিষ্ঠা, কোথায়ও বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠা, কোথাও অতিথিশালা-প্রতিষ্ঠা, কোথাও কূপ-প্রতিষ্ঠা,—এইরূপ নানা সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে লাগিলেন। যখন তাঁহার বয়স পঁয়ষট্টি বৎসর, তখন তিনি তীর্থ ভ্রমণে মনোযোগ দিলেন। গঙ্গা ও যমুনা নদীদ্বয়ের উপরিভাগস্থ বহু তীর্থ সন্দর্শন করিয়া আজ তিনি প্রয়াগে,—গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমতীর্থে বজরা আরোহণে উপনীত হইয়াছেন। সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী আছেন, পুত্র আছেন, কন্যা আছেন, জামাতা আছেন, পৌত্রী আছেন, দৌহিত্রী আছেন, নাতজামাই আছেন, বহুসংখ্যক কর্ম্মচারী আছেন—যেন একটা গ্রামের সমস্ত লোক লইয়া, দীনদয়াল এক মহাতীর্থে আসিয়াছেন। বজরারক্ষার্থ একদল বন্দুকধারী প্রহরীও আছে। কারণ তখন ডাকাতের বড় ভয় ছিল। সেই বজরায় ছোট ছোট ছেলের সংখ্যা যে কত আছে, তাহা এখনও গণিয়া উঠিতে পারি নাই। ঐ দেখুন, বজরার ছাদে উঠিয়া, এক দিকের রেলিং ধরিয়া, সারি দিয়া আট দশটী ছেলে আছে না? আবার ওদিকে অন্য একখানি বজরা দেখুন,—উহাতেও পাঁচ সাতটী ছেলে ঐরূপ ভাবে দাঁড়াইয়া আছে বলিয়া বোধ হইতেছে। তৃতীয় এবং চতুর্থ বজরাখানিতেও বালক-বালিকার সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। ছয় মাসের শিশু হইতে আট দশ বৎসরের সন্তান পর্য্যন্ত চারি দিকে দৃষ্ট হইতেছে। ইহাতেই

এক রকম বুঝিয়া লওয়া যাইতে পারে, বজরায় যুবক যুবতীর সংখ্যা কত : ছেলেগুলির পোষাকের বাহারই বা কি!—সোণা রূপা হীরা মুক্তা মণি মাণিক্য যেন পোষাকের উপর সদা ঝক্ ঝক্ করিতেছে। আর সুন্দর যুবক-যুবতীগণের রংএর বাহার দেখিব, না, পোষাকের বাহার দেখিব,—বুঝিয়া ঠিক করা দায়। যদি আগে পোষাকের বাহার দেখি, তবে রং বলিবে,—'এইবার তুমি নিশ্চয় ঠকিলে! চাঁদ ছানিয়া, জ্যোৎস্না ছানিয়া, চম্পককলি ছানিয়া যে রং প্রস্তত, আর যে রংএর সহিত বসোরা-দেশজাত প্রফুল্ল গোলাপ পুষ্পের রংএর ঈষৎ সংমিশ্রণ হইয়াছে, বিধাতার সৃষ্ট সেই চরম শোভাময় রং না দেখিয়া, তুমি ও কি কৃত্রিম মানব-কারুকার্য্য দেখিতেছ? ওরূপ ওড়না, অলঙ্কার, মণি-মুক্তা যাহা সচরাচর বাজারে দেখিতে পাও, ইচ্ছা করিলে ঘরে বসিয়াও যাহা দেখিতে পাও তাহা দেখিয়া তুমি এত মুগ্ধ হও কেন? ছি! তুমি বড় অরসিক! আবার আগে যদি তুমি রং দেখ, পোষাক বলিবেন,—রং নশ্বর সামগ্রী; এই আছে এই নাই,—যৌবন ফুরাইল ত রং ফুরাইল!—যাহা নশ্বর, যাহা ক্ষণভঙ্গুর, যাহা জলবিম্ব-প্রায়, রসিকসুজন তাহা সন্দর্শন করেন না। যাহা ক্ষণিক সুখপ্রদ, পণ্ডিত ব্যক্তি তাহার কখন আদর করেন না।—কিন্তু এই যে মুক্তার মালা, এই যে হীরকের হার,—ইহা পর-পর শত শত যুবতীর যৌবনকালে কণ্ঠদেশে বিরাজিত হইলেও, মলিন হইবে না! তোমাদের রংএর পরমায়ু সাড়ে তিন বৎসর, আর আমার এ হীরা মুক্তার পরমায়ু সাড়ে তিন শত বৎসর, অথবা সাড়ে তিন হাজার বৎসর!—অতএব বলো দেখি, কে ভালো?—কাহাকে আগে দেখিবে?'

এখন কাহাকেও না দেখিয়া, সর্ব্বাগ্রে কি দীনদয়ালকে দেখা উচিত নয়? যিনি মালিক, যাঁহার সর্ব্বস্ব, তাঁহাকে কি একবার খুঁজিবে না? কৈ,—দীনদয়াল কৈ? তাঁহাকে ত কৈ, খুঁজিয়া পাইতেছি না? পঁয়ষট্টি বৎসরের বৃদ্ধ,—কৈ, এমন মানুষ ত বজরায় দেখি না? খোঁজ। একজন বুড়া তীর হইতে ডিঙ্গি করিয়া বজরায় আসিতেছে বটে সেই ডিঙ্গিতে কেশবরাম আছেন, আর তাঁহার সেই বিশ্বস্ত ভৃত্য অমরসিংহ আছে। এই বুড়া কি দীনদয়াল হইবে? না,—ইহার পায় জুতা নাই, সুতার মোটা কাপড় পরিধান,—তাহাও আবার হাঁটুর উপর উঠিয়াছে, গায়ে জামা নাই, কেবল মাথায় একটী টুপি আছে। সেই বুড়াই ডিঙ্গির হাল ধরিয়া উপবিষ্ট। এ ব্যক্তি কখন দীনদয়াল হইতে পারে না,—একজন মাঝি হইবে। যাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য, যিনি কোটীপতি বলিয়া খ্যাত, তাঁহার কি ছাতা জুটে না?—জুতা জুটে না? এ সকল না জুটুক,—একখানি বহরওয়ালা কাপড়ও কি থাকিতে নাই? যে দীনদয়ালের অগণ্য দাসদাসী, বহুসংখ্যক দাঁড়িমাঝি,—সে দীনদয়াল কি কখন হাল ধরে? নিশ্চয়ই এ দীনদয়াল নহে।

সেই কর্ণধার,—সেই পঁয়ষট্টি বৎসরের বৃদ্ধ,—ডিঙ্গির হাল ছাড়িয়া দাঁড়াইবামাত্র, বজরাস্থ সকলে যেন তটস্থ হইল। সকলে যোড়হাত করিয়া রহিল; তাড়াতাড়ি বজরার সিঁড়ি ডিঙ্গিতে সংলগ্ন করিল। বজরার গোলমাল হঠাৎ যেন যাদুমন্ত্রে থামিয়া গেল।

বৃদ্ধ পাণ্ডা কেশবরাম এবং সেই বৃদ্ধ মাঝি, আর সেই বিশ্বস্ত ভৃত্য অমরসিং,—তিন জনে সিঁড়ী দিয়া বজরায় উঠিলেন।

বজরার বৈঠকখানার উত্তম আসনের উপর কেশবরাম এবং বৃদ্ধ মাঝি উপবেশন করিলেন,—অমরসিং যোড়হাতে অদূরে দাঁড়াইয়া রহিল

প্রকাণ্ড এক স্বর্ণের গড়গড়া আসিল। গড়গড়ার নল হীরা-মুক্তা-খচিত। এ কি! ছ টাকা মাহিনার বুড়া মাঝির সোণার গড়গড়া কেন? বৃদ্ধ মাঝি কহিল,—"ছোট হুঁকা দাও, গড়গড়া রাখ।" একজন ভৃত্য একটী ছোট খেলো-হুঁকা আনিল এইবার কিন্তু সামঞ্জস্য রহিল না। হুঁকার ছিদ্রে হাতী-মুখো একটী সোণার নল আছে। হুঁকাটীর দাম তিন পয়সা হইবে, কিন্তু নলটীর দাম তিনসহস্র টাকার কম নহে। কারণ গজ-কুম্ভের উপর দু'খানি বড় বড় হীরা ঝক্ ঝক্ করিতেছে।—সামঞ্জস্য রহিল কি? সামঞ্জস্য ত গোড়া হইতেই নাই,—ঠেঁটিপরা এক বুড়ো মিন্‌সে তিন পয়সা দামের এক খেলো হুকায় তিন হাজার টাকার এক নল লাগাইয়া তামাক খাইতেছে!—ইহা দেখিলেও যে, বিশ্বাস হয় না!

এ সকলই অসম্ভব দেখিতেছি। ঐ বুড়ো ঠেঁটিপরা লোকটা যে কার্পেটের উপর বসিয়া আছে, সেই কার্পেটের মূল্য আড়াই শত টাকা। একবার সকলে মুদ্রিত নয়নে ভাবো দেখি,—তবে লোকটা কে? ইনিই সেই দীনদয়াল, নয় ত?

হঠাৎ 'ঝুপ' করিয়া একটা শব্দ হইল। সেই শব্দের সঙ্গে আর একটী শব্দ হইল "ঝুপ।"

"বাপরে, গেল রে, ম'লো রে, ধর্ রে, রাখ রে!" ইত্যাকার ধ্বনি উঠিল। দারুণ আর্ত্তনাদ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইল। কি হইয়াছে, তাহা কেহই জানেন না,—কেহই কোন কথার উত্তর দেন না। ক্রমশঃ বুঝা গেল, দীনদয়ালের জ্যেষ্ঠ পুত্রের ছোট ছেলেটী গঙ্গার

জলে হঠাৎ পড়িয়া গিয়াছে। এবং হঠাৎ ডুবিয়া গিয়াছে; সেই টেঁটিপরা বৃদ্ধ গভীর আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন;—তিনিই দীনদয়াল॥

দীনদয়াল উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন,—"আমার পৌত্রকে আজ যে প্রাণদান করিতে পারিবে, তাহাকে আমি পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দিব।"

ভাদ্র মাসের ভরা গাঙ, খরস্রোতে নদী বহিতেছে, জলও গভীর—দাঁড়ী মাঝিগণ নঙ্গর ফেলিয়া, প্রত্যেক বজরা এক এক জন সামান্য দাঁড়ার জেম্বায় রাখিয়া, কর্ত্তার অনুমত্যনুসারে তীরে উঠিয়া প্রয়াগ-সঙ্গম দেখিতে গিয়াছে।

দীনদয়াল এই ঘোষণা আরম্ভ করিয়াছেন,—পুরস্কারের কথা তখন মুখ দিয়া ব্যক্তও হয় নাই,—কেবলমাত্র বলিয়াছেন, 'আমার পৌত্রকে যদি কেহ রক্ষা করিতে পারে'—এমন সময় প্রথম ঝুপ শব্দের পরে দ্বিতীয় ঝুপ শব্দ হইয়াছিল। দেখ দেখ আবার কে পড়িল?—দেখা গেল, শুনা গেল, বুঝা গেল, অমরসিংহ অতি শীঘ্র উত্তমরূপ কোমর বাঁধিয়া, গায়ের আঙ্‌রাখা খুলিয়া ফেলিয়া, 'জয় গঙ্গামায়ীকী জয়' বলিয়া, গঙ্গা জলে ঝাঁপ দিয়াছে। ঝাঁপ দিবামাত্র, গঙ্গাজলে ডুবিয়া, গঙ্গার অতলতলে কোথায় যে ভাসিয়া গিয়াছে, তাহা কেহ স্থির করিতে পারিল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বালক ডুবিল, সঙ্গে সঙ্গে অমরসিংহও ডুবিল। বজরায় হাহারব পড়িল। কয়েকটী স্ত্রীলোক উন্মত্তবৎ হইল। দুইটী স্ত্রীলোক জ্ঞানশূন্যবৎ হইয়া বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে, বালক-অন্বেষণার্থ বজরা হইতে যেন জলে ঝাঁপ দিবার উদ্‌যোগ করিল। বজরায় কোন রূপ শৃঙ্খলা, নিয়ম বা পদ্ধতি রহিল না। স্ত্রীলোকগণ অবাধে, পুরুষের সাক্ষাতে, বজরার বাহিরে আসিতে লাগিল। পুরুষগণও স্ত্রীলোকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতে লজ্জা বোধ করিল না। যে দুইটী স্ত্রীলোক অধীরা হইয়া উন্মত্তের ন্যায় ছটফট করিতেছিলেন;—গঙ্গায় ঝাঁপ দিবার উদ্‌যোগ করিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একটী বৃদ্ধা, একটী যুবতী। বৃদ্ধা বালকের ঠাকুর-মা। যুবতী বালকের জননী। তাঁহারা উভয়েই বজরার এক প্রান্তভাগে আসিয়া, "হায় ছেলে কোথায় গেল,—হায়! ছেলে কোথায় গেল,"—বলিয়া জলের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছিলেন। তাঁহারা আলুলায়িত-কেশা আলুথালু-বেশা। বৃদ্ধা কণ্ঠ হইতে এক হীরক-খচিত স্বর্ণহার খুলিয়া, গঙ্গাজলে ফেলিয়া দিলেন। বলিলেন,—মা গঙ্গা! তোমাকে আমি সর্ব্বস্ব অর্পণ করিতেছি,—কণ্ঠহার ত সামান্য সামগ্রী,—তুমি আমার ছেলেকে ফিরাইয়া দাও।" শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীর দেখাদেখি যুবতী বধূও গলদেশ হইতে এক অপূর্ব্ব মুক্তার মালা খুলিয়া জাহ্নবীর জীবনে নিক্ষেপ করিলেন। বলিলেন,—"মা-গো! তুই এ মালা নে,—আর আমার যাহা আছে, সবই তোকে একে একে দিতেছি, মা!—তুই কেবল আমার ছেলেকে এনে দে।"

স্ত্রীর এবং পুত্রবধূর এই উন্মত্ত অবস্থা দেখিয়া, বৃদ্ধ দীনদয়াল তাঁহাদিগকে বজরার ধার হইতে সজোরে আনিয়া, এক কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করাইলেন। এমন সময় অদূরে এক শব্দ উত্থিত হইল—"জয় গঙ্গা মায়ীকী জয়!"—দেখা গেল, সেই যুবা পুরুষ অমরসিংহ গঙ্গাজলে ভাসমান হইয়াছেন, এবং তাঁহার বক্ষঃস্থলে তিন বৎসরের ছেলেটী রক্ষিত হইতেছে। বাম হস্তের সাহায্যে অমরসিংহ সাঁতার কাটিয়া চলিয়াছেন, কিন্তু বজরায় তিনি আসিতে পারিতেছেন না;—বিপরীত দিকে চলিয়াছেন। ভাদ্র মাসের ভরা গঙ্গা,—এক টানা স্রোত,—তিনি তীরগতিতে স্রোতের মুখে পড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছেন, আর মুখে সদা ধ্বনি করিতেছেন,—"গঙ্গামায়ীকী জয়! গঙ্গামায়ীকী জয়!"

যখন এক দিকে সুবিধা হয়, তখন সকল দিকেই সুবিধা হয়। বজরার দাঁড়ী-মাঝিগণ এমন সময় আসিয়া পৌঁছিল। বিশ্বস্ত বৃদ্ধ বৈজু মাঝি তীর হইতে দেখিয়া সমস্ত ব্যাপার বুঝিল; কাহারও সহিত কথা কহিল না। নিমেষ মধ্যে আট জন দাঁড়ী লইয়া, বজরা-সংলগ্ন একখানি ডিঙ্গি খুলিয়া দিল।—'জয় গঙ্গামায়ীকী জয়' বলিয়া, বৈজু ডিঙ্গি ছাড়িল।—"ভয় নাই, ভয় নাই,—মা গঙ্গা রক্ষা করিবেন"—এই কথা বলিয়া, বৈজু মাঝি হাল ধরিয়া বসিল। নক্ষত্রবেগে ডিঙ্গি ছুটিল।

"তীর-তারা উল্কা বায়ু শীঘ্রগামী যেবা,
বেগ শিখবার তরে বেগে যাবে কেবা!

অনিমেষ-লোচনে বজরার নরনারীবৃন্দ সেই ব্যাপার অবলোকন করিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে ডিঙ্গি, অমরসিংহের নিকট পৌঁছিল।

অমরসিংহের শক্তি এবং সন্তরণ-পটুতা অতুলনীয়। সন্তরণকালে, এক হাতে জল কাটিয়া যাওয়া ও এক হাতে একটী ছেলেকে রাখা যে কত দূর কঠিন কার্য্য, তাহা ভুক্তভোগীই জানেন। ডিঙ্গি নিকটে পৌঁছিল বটে, কিন্তু অমরসিংহ সহজে ডিঙ্গিতে উঠিতে পারিলেন না। অমরসিংহ ডিঙ্গির গাত্র স্পর্শ করেন করেন,—এমন ভাব হয়,—আবার ডিঙ্গি একদিকে হটিয়া যায়,—সঙ্গে সঙ্গে অমরসিংহও একদিকে ভাসিয়া যান। অমরসিংহের বলও ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছে। ছেলেটীকে দক্ষিণ হস্তদ্বারা জলের উপর আর পূর্ব্বের ন্যায় তিনি রাখিতে পারিতেছেন না। এক একবার দক্ষিণ হস্ত ঈষৎ ডুবিতেছে, আর সেই সঙ্গে ছেলেটীও ঈষৎ ডুবিতেছে; বৃদ্ধ মাঝি বৈজু একটী দাঁড় লইয়া এবং দুই জন দাঁড়ী লইয়া, তখন জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। আর একটী দাঁড় অমরসিংহের উদ্দেশে ভাসাইয়া দিল। অমরসিংহ সে দাঁড় সহজে ধরিয়া ফেলিলেন; বিশ্রাম পাইলেন। বৈজু মাঝি সন্তরণ-কৌশলে অমরসিংহের নিকট গিয়া পৌঁছিল এবং জলে চিৎ হইয়া রহিল। সেই ছেলেটী বৈজুমাঝির বুকে অমরসিংহ কর্ত্তৃক একবার স্থাপিত হইল। অমরসিংহ আরও বিশ্রাম পাইলেন। বিশ্রাম পাইয়া, অমরসিংহের বল আবার সিংহের ন্যায় হইল। ডিঙ্গিও অতি নিকটে আসিয়া পৌঁছিল! তখন অমরসিংহ সজোরে ডিঙ্গির মুখ ধরিলেন, ডিঙ্গির সহিত ভাসিয়া ভাসিয়া যাইলেন। আর দুই জন দাঁড়ী, বৈজুমাঝিকে সাহায্য করিয়া, বৈজুমাঝির দুই পার্শ্বে সাঁতার দিতে দিতে ভাসিয়া চলিয়াছে। নৌকা নিকটে আসিল বটে, কিন্তু নৌকার উপর ছেলেটীকে তোলা বড়ই কঠিন হইয়া পড়িল। তখন অমরসিংহ উলঙ্গ হইলেন, আপনার লম্বা কাপড়ের এক প্রান্ত

নিজে ধরিলেন এবং অপর প্রান্ত বৈজুমাঝিকে ধরিবার উদ্দেশে ছুড়িয়া দিলেন। শিক্ষিত মাঝি বামহস্ত দ্বারা খপ্‌ করিয়া তাহা ধরিয়া লইল। দৃশ্যটী তখন এইরূপ;—দক্ষিণ হস্তে অমরসিংহ নৌকার মুখ বজ্রমুষ্টিতে ধরিয়াছেন, বামহস্ত দ্বারা কাপড়ের এক প্রান্ত ধরিয়া টানিতেছেন। কাপড়ের অপর প্রান্ত বৈজুমাঝির বামাহস্তে ধৃত আছে। অমরসিংহের আকর্ষণে বৈজুমাঝি ক্রমশঃ নৌকার দিকে আসিতেছে; আর দাঁড়ী দুইজন বক্ষঃস্থিত সন্তানটী যাহাতে জলমধ্যে পতিত না হয়, তদুদ্দেশেই সদা কার্য্য করিতেছে। অতি অল্পক্ষণ মধ্যে বৈজুমাঝি ডিঙ্গির অতি সন্নিকটে আসিল। তখন কাপড়ের খুঁট ছাড়িয়া অমরসিংহ মুহূর্ত্তমধ্যে একবারে ছেলেটীর দক্ষিণ হস্ত ধরিলেন এবং কুস্তীগিরির ন্যায় কৌশলে, ছেলেটীকে ছুড়িয়া ডিঙ্গির উপর ফেলিলেন। ছেলেটীকে গ্রহণ করিবার জন্য, দাঁড়ীগণ হাত পাতিয়াছিল,—হস্তের উপরেই ছেলে পড়িল। ছেলে ফেলিয়াই অমরসিংহ ডিঙ্গির উপর উঠিলেন। দেখিলেন, শিশুটী অচেতন। জীবিত কি মৃত, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কাহারও সহিত কথা না কহিয়া, তিনি তৎক্ষণাৎ ছেলেটীর পদদ্বয় ধরিয়া, ঘুরাইতে আরম্ভ করিলেন। অমরসিংহ তখনও উলঙ্গ,—বাহ্যজ্ঞান রহিত; বৈজু এবং দাঁড়ীগণ সকলেই একে একে ডিঙ্গির উপর উঠিল এবং ডিঙ্গি বজরার দিকে চালাইতে লাগিল। ছেলেটীকে অমরসিংহ ঘুরাইতেছেন দেখিয়া কোন কোন অপরিপক্ক মাঝি বিরক্ত হইল এবং কহিল,—"এ কি করিতেছ? ছেলে যে মরিয়া যাইবে! এখনি এরূপ ঘুরপাক দেওয়া বন্ধ কর।" অমরসিংহ মাঝির কথা শুনিলেন না, তিনি আপন মনে ছেলেকে ঘুরাইতে লাগিলেন; একজন দাঁড়ী ক্রোধ-

কম্পিত কণ্ঠে কহিল,—"ঠাকুর! ছেলে ছাড়িয়া দাও,—নচেৎ এখনি আমরা প্রতিফল দিব,—জীয়ন্ত ছেলেকে তুমি বধ করিও না।" অমরসিংহ কহিলেন,—"যে ছেলের জন্য আমি প্রাণের মায়া না রাখিয়া জলে ঝাঁপ দিয়াছিলাম, সেই ছেলেকে আমি বধ করিতেছি,—দাঁড়ী-মাঝি হইয়া এ কথা তুমি কেমন করিয়া বলিলে! দেখিতেছ না, ছেলেটী অচেতন; জল খাইয়া ইহার পেট ফুলিয়াছে!—এরূপ ভাবে না ঘুরাইলে, উদরের জল বাহির হইবে না, এবং ছেলেটীর চেতনা হইবে না। ইহাই উত্তম চিকিৎসা।" বৃদ্ধ মাঝি বৈজু আসিয়া দাঁড়ীর কাণ মলিয়া বসাইয়া দিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পুত্র যখন জলে ডুবে, তখন পিতামাতার মন কি রকম বিষাদ-মগ্ন হয়,—বল দেখি? আবার সেই পুত্র যখন জল হইতে উঠে, চেতনা লাভ করে, পিতামাতার মন তখন কিরূপ প্রফুল্ল হয়, বল দেখি?

পুত্রটী ডুবিয়াছিল, আবার উঠিয়াছে, জীবন পাইয়াছে, শয্যায় শুইয়া এক-আধবার ঈষৎ মধুর হাসিও হাসিতেছে;—তথাচ তাহার মা কান্দে কেন? সন্তানটীর সঙ্গে একটীবার কথা কন, সন্তানটীকে একটীবার হাসাইবার চেষ্টা করেন, আর মায়ের দুই চোখ দিয়া জলবর্ষণ হয় কেন?

এদিকে গঙ্গা-তীরে দানের ধূম লাগিয়াছে। বৃদ্ধ ব্যবসায়ী দানদয়াল, পৌত্রের পুনর্জ্জীবন লাভ হইল দেখিয়া, দীন-দুঃখী

দরিদ্রগণকে অকাতরে অর্থ বিলাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। অকাতরে বলিলাম কেন? দান ত চিরদিনই স্বেচ্ছায় হইয়া থাকে;—কে কবে (স্বেচ্ছায়) কাতর হইয়া দান করে?—কাতরভাবে অর্থ বিলায়? নিজের সামগ্রী দান করা অথবা না-করা দাতার ইচ্ছার উপর নির্ভর। যে দান ইচ্ছার উপর নির্ভর, সে দান ত অকাতরে হইবারই কথা! কিন্তু এ কথা সত্য হইলেও সকল সময় এ নিয়ম খাটে না। দেখিয়াছি,—কোন কোন দাতা হাজার হাজার টাকা দান করিবেন,—স্থির করিলেন। একটী একটী করিয়া টাকা গণিয়া তোড়া পূরিলেন। তোড়া বাহিরে লইয়া গেলেন। বহির্দ্দেশে গিয়া উপযুক্ত খাজাঞ্চির সহিত যুক্তি করিয়া, আপনারই টাকা হইতে আড়াই শত টাকা কমিশন কাটিয়া রাখিলেন। স্ত্রীর নামে ঐ কমিশনের টাকা জমা হইল। কর্ত্তা মহাশয় এইরূপ করিয় সহধর্ম্মিণীর স্ত্রী-ধন বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। কাঙ্গালীগণ পাইল,—অবশিষ্ট সাড়ে সাত শত টাকা। অকাতরে দানের সহিত কাতর হইয়া দান করার এই পার্থক্য।

আরও একবার দেখিয়াছি,—স্বয়ং দাতা কাঙ্গালীগণকে সরায় করিয়া মুড়ি দিতেছেন। পূর্ব্বে যে ব্যক্তির উপর, মুড়ি দিবার ভার ছিল, সে এক সরা পূর্ণ করিয়া মুড়ি দিতেছিল। কর্ত্তা তাহারই উপর ক্রোধ করিয়া স্বয়ং মুড়ি দিতে লাগিলেন। মুড়ি উঠিতে লাগিল,—আধ-সরা করিয়া। অথচ কাঙ্গালীর সংখ্যা অধিক নহে এবং মুড়িও প্রচুর পরিমাণে আছে। মুড়ি এত অধিক ছিল যে, কাঙ্গালী-বিদায়ের পর রাশীকৃত পর্ব্বত-প্রমাণ মুড়ির স্তূপ গৃহমধ্যে দৃষ্ট হইয়াছিল। এরূপ দানকে কি অকাতরে দান বলা যায়?

এমনও কতকগুলি লোক আছেন যে, দান করিবার কালে তাঁহাদের অসুখের অবধি থাকে না! অতিথিশালা আছে, তথায় দৈনিক ঘৃত-আটারও বরাদ্দ আছে, কিন্তু অতিথি দেখিলেই কর্ত্তা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠেন। এমন লোকও দেখা গিয়াছে যে, সন্ধ্যার সময় তুমি যদি তাঁহার নিকট পাঁচ শত টাকা গচ্ছিত রাখ, এবং প্রাতঃকালে সেই টাকা যদি তুমি তাঁহার নিকট চাও, তবে সেই টাকা প্রত্যর্পণকালে তাঁহার বিশেষ মনঃপীড়া জন্মে।

আমরা একজনকে দেখিয়াছি,—যাত্রায় পেলা দিবার জন্য দশ টাকা তিনি লইয়া গিয়াছিলেন। আটটী টাকা পেলা দিয়া, শেষে দুইটী টাকা লুকাইয়া আপন ঘরে লইয়া আসেন। ইহাকেই বলে, নিজের জিনিষ নিজে চুরী করা।

দীনদয়াল কিন্তু সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি সত্য সত্যই অকাতরে, অকুণ্ঠিতচিত্তে, অদমনীয় উদ্যমে,—কাঙ্গালী-গণকে অর্থদান করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে দশ সহস্র টাকা কোথায় উড়িয়া গেল। আবার পাঁচ হাজার টাকা দীনদয়াল বজরা হইতে আনাইলেন। সে টাকাও অল্পসময়ের মধ্যে ফুরাইল! নগরে ধন্য ধন্য রব পড়িল! বৃদ্ধ পাণ্ডা কেশবরামকে দীনদয়াল কহিলেন,—"আর এস্থানে আমি থাকিব না। প্রয়াগতীর্থে যে যে কার্য্য করিতে হয়, তাহা অদ্যই শেষ করিব। আহারান্তে অপরাহ্নে, বজরা করিয়া ৺কাশীধামে যাত্রা করিব।"

কেশবরাম একটু দুঃখিত হইলেন। এরূপ বড় মানুষ এবং সদাশয় যাত্রী,—সহজে কোন পাণ্ডার ভাগ্যে ঘটে না। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, দীনদয়ালকে এখানে অন্ততঃ তিন চারি দিন রাখিয়া মিষ্ট কথায় এবং মিষ্টান্ন ভোজনে পরিতুষ্ট করিয়া

তাঁহাকে চিরবাধিত করিয়া রাখিবেন। ভাবিয়াছিলেন, এইরূপ বাধ্য-বাধকতা জন্মিলে, দীনদয়াল অন্ততঃ তাঁহাকে অন্যূন সর্ব্ব-রকমে পাঁচ সহস্র টাকার কম প্রণামী কিছুতেই দিতে পারিবেন না। কিন্তু এক্ষণে দীনদয়াল গৃহ-গমনের নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়াছেন, এবং হঠাৎ এই বিপদ্ ঘটায়, তাঁহার মনও খারাপ হইয়াছে। পৌত্রটী পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু দীনদয়ালের আতঙ্ক এখনও দূর হয় নাই। বিশেষতঃ যে দীনদয়াল এইমাত্র এক দমে, পনর হাজার টাকা দানকার্য্যে ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছেন, এবং হয় ত এরূপ অভাবনীয় দানে তাঁহার আনীত সমস্ত অর্থ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে ;—এমত অবস্থায় কেশবরাম আর কি পাইতে পারেন! বৃদ্ধ পাণ্ডা অনেক কাকুতি-মিনতি করিলেন,—দীনদয়াল আর একটী দিনও প্রয়াগে থাকিতে সম্মত হইলেন না। দীনদয়ালের পরিবারবর্গ, সঙ্গম-জলে একে একে স্নান করিয়া, শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিল,—আপন আপন অধিকার অনুসারে বহু নরনারী মাথা মুড়াইল,—প্রত্যেকে আপন আপন সঞ্চিত অর্থ দরিদ্রগণকে দান করিল।

অপরাহ্ন। বিদায়কাল উপস্থিত। এ পর্য্যন্ত দীনদয়াল, বৃদ্ধ পাণ্ডাকে একটী পয়সা দেন নাই। এক হাজার টাকাপূর্ণ এক একটী তোড়া,—এমন দশটী তোড়া আনাইয়া,—মোট দশ হাজার টাকা দীনদয়াল,—পাণ্ডাকে দিলেন। বলিলেন,—"এ ব্যাপারে আপনাকে পাঁচ হাজার টাকা দিব সঙ্কল্প ছিল ; কিন্তু পৌত্রটী প্রাণ পাইল,—এই নিমিত্ত আরও পাঁচ হাজার টাকা দিলাম। বৃদ্ধ পাণ্ডা অবাক্ হইলেন!

অমরসিংহ নিকটে দাঁড়াইয়াছিলেন, দীনদয়াল উঠিয়া দাঁড়াই-

লেন। ধীরে ধীরে অমরসিংহের নিকটে গেলেন। অমরসিংহের গলা জড়াইয়া ধরিলেন। বলিলেন,—"বাপ-ধন!"

বলিতে বলিতে বৃদ্ধের নয়নযুগল হইতে বারিধারা বিগলিত হইতে লাগিল; "বাপ-ধন! তুমিই আজ আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছ! তোমার ঋণ পরিশোধ দিবার নহে। আমার পৌত্র আজ এই খরস্রোতা বেগবতী গঙ্গায় পতিত হইয়া ডুবিয়া গিয়াছিল। আমরা এই স্থানে প্রায় তিন শত লোক একত্র ছিলাম। পৌত্রের উদ্ধারার্থে গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে কেহই সাহস করি নাই। বাপ-ধন! তুমি কিন্তু আমার পৌত্রের জন্য আপন প্রাণের মায়া রাখ নাই। যেমন আমার পৌত্র ডুবিল, সঙ্গে সঙ্গে তুমিও গঙ্গায় ঝাঁপ দিলে। বল,—তুমি বল, কি দিয়া আমি তোমার ঋণ পরিশোধ করিব। আমার সহধর্ম্মিণী প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাঁহার যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই তিনি তোমাকে দিবেন। আমার সহধর্ম্মিণীর সম্পত্তি বড় অল্প নয়। আমার পুত্রবধূ তাঁহার সমস্ত বহুমূল্য বসন-ভূষণ তোমাকে দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন, সেইবসন-ভূষণের মূল্য অন্যূন এক লক্ষ টাকা হইবে। এক্ষণে তুমি আমাকে বল— "তোমাকে আমি কি দিব? তুমি যাহা চাহিবে, আমি তাহাই দিব।"

অশ্রু-জলে বৃদ্ধের গণ্ডস্থল প্লাবিত হইল; অমরসিংহের চক্ষেও জল দেখা দিল। গলা ছাড়িয়া দিয়া বৃদ্ধ অমরসিংহকে কহিলেন, "বাপ-ধন! তুমি ব'স,— আমিও ঐ খানে বসিতেছি।"

উভয়েই সেই খানে বসিলেন। বৃদ্ধ কহিলেন,—"আমার স্ত্রী জানিতে চাহিয়াছেন, তোমার সহধর্ম্মিণী কত বড়? তোমার সন্তান-সন্ততি আছে কি না? তোমার সন্তানগণের বয়স কত?

তোমার পিতা মাতা জীবিত আছেন কিনা? তোমার ভাই-ভগিনী আছেন কিনা? তোমার পরিবারে আর কে কে আছে? —তৎসমস্তই তিনি জানিতে চাহিয়াছেন। এ সকল তত্ত্ব জানিবার সহধর্ম্মিণীর অভিপ্রায় এই যে, তিনি মনের মত করিয়া বিবিধ-ভূষণে তোমার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, জননী, ভগিনীগণকে সাজাইবেন এবং যথোপযুক্ত অর্থ দিয়া তাঁহাদিগকে পরিতুষ্ট করিবেন

অমরসিংহ মাথা হেঁট করিলেন। কোন কথার উত্তর দিতে পারিলেন না।

দীনদয়াল পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন,—"বাপ-ধন। বল, বল, লজ্জা কি? আমি বৃদ্ধ,—তোমার পিতৃতুল্য! আমার কাছে কোন কথা বলিতে তোমার লজ্জা কি!"

অবনত-মুণ্ড অমরসিংহের চোখ দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল এইবার ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। বৃদ্ধ জিজ্ঞাসিলেন, "বাপধন! তুমি কাঁদিতেছ কেন?" অমরসিংহ যেন একটু অপ্রতিভ হইলেন। তিনি বীর পুরুষের ন্যায় মুখ মুছিয়া ফেলিলেন,—সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিস্থ হইলেন। এবং বৃদ্ধের মুখের দিকে এইবার আপন মুখ রাখিয়া কহিলেন,—"আপনার দয়া, বাৎসল্য এবং স্নেহ দেখিয়া আমার চক্ষে জল আসিয়াছিল; এমন স্নেহময় মানুষ আমি পূর্ব্বে কখন দেখি নাই।"

বৃদ্ধ। সে যাহা হউক, তোমার কে কে আত্মীয়-স্বজন আছে, তাহা বল।

অমরসিংহ আবার পৃথিবী পানে চাহিলেন। পৃথিবীর নিকট সদুত্তর না পাইয়াই বুঝি তৎক্ষণাৎ আবার আকাশপানে চাহি-

লেন। অনন্ত আকাশও কোন সদুত্তর দিতে পারিলনা। তখন তিনিসেই গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমস্থলে,—সেই বিরাট্ মহাতীর্থ,—সেই ধরাধামের অপূর্ব্ব স্বর্গ,—সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।

উত্তর দিতে বিলম্ব হইতে দেখিয়া, বৃদ্ধ আবার বলিলেন,—"বাপ-ধন! বল, বল, তোমার কে আছে? তোমার মাতা, পিতা, ভাই, ভগিনী, স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়-স্বজন কে কোথায় আছে?—বাপ-ধন! বল, বল,—আর বিলম্ব সহ্য হয় না।"

রঙ্গস্থলে কুস্তিগীর পালোয়ানের ন্যায় অমরসিংহ এবার হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন। ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পড়িতে লাগিল। সেই সঙ্গে তাঁহার বিশালবক্ষঃ তালে তালে স্ফীত হইতে লাগিল। তাঁহার বিস্তৃতনয়ন আরও যেন বিস্ফারিত হইল। উজ্জ্বল নয়ন-তারাদ্বয় যে ধ্বক্ ধ্বক্ জ্বলিতে লাগিল। তাঁহার দেহে যেন দৈববলের আবির্ভাব হইল। অমরসিংহ কহিতে লাগিলেন;—ধীরে ধীরে,—তীব্র-কণ্ঠে, কহিতে লাগিলেন,—"মহাশয়! আমি দীন দরিদ্র! দরিদ্র ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন কেহ থাকে না, দরিদ্র ব্যক্তির মাতা থাকে না, স্ত্রী থাকে না, ভ্রাতা থাকে না, "কন্যাও———

"কন্যাও" এই কথা বলিবার সময় অমরসিংহের মুখ হেঁট হইল। চক্ষু-কোণে জল আসিল কিনা জানিনা; আবার তৎক্ষণাৎ তিনি সেই হেঁট মুণ্ড উচ্চে উঠাইলেন। কহিলেন, "দরিদ্র ব্যক্তির কন্যাও থাকে না"

অমরসিংহের গলার স্বর এবার কিন্তু ভাঙ্গা-ভাঙ্গা। বৃদ্ধ জিজ্ঞাসিলেন,—"তবে কি তোমার কেহই নাই?" অমরসিংহ আবার উত্তর দিলেন,—"দরিদ্র ব্যক্তির কেহই থাকিতে পারে না।"

বৃদ্ধ। তাহা হইলে তোমার কেহই নাই?

অমর। আমি দরিদ্র,—মুটে-মজুর,—কুলি। আমার আবার কে থাকিবে? আমার সব শূন্যাকার। আমার ত্রিভুবন অন্ধকার।

দীনদয়াল,—অমরকে আর কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন না। বুঝিলেন,—এ সংসারে অমরসিংহের কেহই আর নাই,—রোগে শোকে অন্নাভাবে সকলেরই মৃত্যু হইয়াছে।

নবম পরিচ্ছেদ।

এইরূপ কথাবার্ত্তা শুনিয়া, পাণ্ডা কেশবরাম চমকিলেন। বুঝিলেন, অমরসিংহের ভাগ্য প্রসন্ন হইয়াছে। অমরসিংহের ভৃত্যগিরি এইবার ঘুচিল,—এইবার বুঝি সে রাজা হইল! দীনদয়ালের সহধর্ম্মিণীর সমস্ত বিষয় যদি অমরসিংহ পায়, তাহা হইলে ত সে সত্য-সত্যই রাজা। শুনিয়াছি, বার্ষিক পঁচিশ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি, দীনদয়াল আপনার স্ত্রীর নামে লেখাপড়া করিয়া দিয়াছেন। কাণপুরে দীনদয়ালের যে তুলার আড়ত আছে, তাহা ত তাঁহার স্ত্রীরই নামে। পার্ব্বতীর আড়ত বলিয়া ঐ তুলার আড়ত বিখ্যাত। দীনদয়ালের স্ত্রীর নাম পার্ব্বতী। ইহা ভিন্ন, পার্ব্বতীর অলঙ্কার আদিরও দাম হইবে, অন্যূন দুই লক্ষ টাকা। এদিকে দীনদয়ালের পুত্রবধূ আপন যাবতীয় বসন ভূষণ অমরসিংহকে দিবেন বলিয়াছেন; তাহারও দাম এক লক্ষ টাকার কম নহে। এত অর্থ দিয়াও দীনদয়ালের মনস্তুষ্টি হয় নাই;—তিনি বলিলেন,

—"বাপ-ধন অমরসিংহ! তুমি যাহা চাহিবে, তাহাই তোমাকে দিব।" আমার বোধ হয়, ইহার একটী কথাও,—কোন কাজের কথা নহে। এত সম্পত্তি কি কেহ কাহাকেও দিয়া থাকে? আর দান ত পাত্র বুঝিয়া করিতে হয়। অমরসিংহ গরীব; খাইতে পায় না! সামান্য যৎকিঞ্চিৎ দানই উহার পক্ষে যথেষ্ট। একটী ক্ষুদ্র মাছিকে একহাঁড়ী মধু-দান কখনই সঙ্গত নহে। বৃদ্ধ দীন-দয়াল যাহা বলিতেছেন, তাহা ত একেবারেই অসম্ভব। "তুমি যাহা চাহিবে, আমি তাহাই দিব,"—ইহাই হইল দীনদয়ালের উক্তি। অমরসিংহ যদি বলে,—"স্থাবর অস্থাবর তোমার যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই আমাকে দাও।" তাহা হইলে, তখন উপায়? দীনদয়ালকে যে, একেবারে দুনিয়ার ফকির হইতে হইবে! আমার বোধ হয়, দীনদয়ালের এসব কথা কোন কাজের কথা নহে। মনের আবেগে হঠাৎ বলিয়া ফেলিয়াছেন। বেগ একটু থামিলেই আপ্‌শোষ উপস্থিত হইবে। তখন তিনি আমতা-আমতা বুলি ধরিবেন। দানের এখনও কোনরূপ পাকা কথাবার্ত্তা হয় নাই। এই সময় দীনদয়ালকে আমার সতর্ক করা উচিত। বিশেষ, অমরসিংহ যদি এককালে এত সম্পত্তি পায়, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই আমার চাকুরী ছাড়িবে। আমি কেবল,—মুহুর্মুহু এমন ভাল চাকরটী হারাইব। ছেলেরাও আজও সেরূপ মানুষ হইল না। মনে ভাবিয়াছিলাম, অমরসিংহকে আমার বাড়ীর তত্ত্বাবধায়ক করিব। যেরূপ গতিক দেখিতেছি, বুঝি আমার সে আশা একেবারে দূর হয়।

এরূপ ভাবিতে ভাবিতে, বৃদ্ধ পাণ্ডার ক্রমশঃ অমরসিংহের উপর একটু রাগ হইল। তিনি মনে মনে কহিলেন,—"ছেলেটা বজরা থেকে প'ড়ে জলে ডুবেছিল, ডুবেইছিল,—তোর এত কি,—।

তুই জলে ঝাঁপ দিলি কেন? তোর উপর কি ছেলে তোলবার ভার প'ড়েছিল? আর তুই শুদ্ধ যদি তলিয়ে যেতিস্! তোকে তখন কে রাখ্‌ত! যত আহাম্মক নিয়ে আমার ঘর-কন্না কিনা?

পাণ্ডা কেশবরাম এইরূপ যতই ভাবেন, ততই তাঁহার রাগ বৃদ্ধি হয়। ক্রমে দীনদয়ালের উপর তাঁহার রাগ হইল,—"আচ্ছা, সে লোকটাও কি পাগল হইল! তাহার স্ত্রী আছে, পুত্র আছে, পুত্রবধূ আছে, তবুও বলে সে কিনা, তুমি যাহা চাহিবে, আমি তাহাই দিব! নিশ্চয়ই তাহার মাথা খারাপ হইয়াছে। বেশ একটী বড়মানুষ যজমান পাইয়াছিলাম, সেই যজমানটীও বুঝি এইবার যায়। অমরসিংহকে যদি সমস্তই দান করিয়া ফেলে, তাহা হইলে দীনদয়ালের আর রহিল কি? তখন আর, উহার পুরোহিত হইয়া আমারই বা লাভ কি? আর ইহাও এক বড় আশ্চর্য্য দেখিতেছি,—আমাকে সে দিল কেবলমাত্র দশ হাজার টাকা,—আর আমার চাকরকে কিনা সে যথাসর্ব্বস্ব দিতে চায়। সে ত আমার চাকর! আমার যখন সে মাহিনা খায়, তখন তাহার কৃতকর্ম্মের ফল আমি কেন না পাইব! অতএব যদি যথাসর্ব্বস্ব দীনদয়াল দেয়, তাহা হইলে আমাকেই দিক; নহিলে তাহার ধর্ম্ম বজায় থাকিবে না।

"এ যে বড় বিপদে পড়িলাম দেখিতেছি! এমন প্রভুভক্ত বিশ্বাসী চাকরটীও হাতছাড়া হইল! অথচ আমি বোধ হয় ইহার পরিবর্ত্তে পাইপয়সাও পাইতেছি না! কি উপায়ে এ বিপদ্ হইতে উদ্ধার হইতে পারি,—সদ্যুক্তি কি! সমস্যা বড় বিষম! অমরসিংহ অতি দরিদ্র, একবারে এত অর্থ পাইলে, সে কখনই লোভ সামলাইতে পারিবে না। আমাকে যে তখন পাই-পয়সা দিবে, এমনও

বোধ হয় না। প্রতিশ্রুত বিষয় পাইলে অমরসিংহ ত একেবারে রাতারাতি রাজা হইবে! রাজা হইলে কি আমাকে আর তখন মনে থাকিবে? তখন সে হয়ত আমাকেই চাকর রাখিতে পারিবে!

"আমার কি দুরদৃষ্ট! এত দিন, যে ব্যক্তি আমার চাকর ছিল, আজ আমাকে তাহারই চাকর হইতে হইল! অমরসিংহের চরিত্র যেরূপ উচ্চ ভাবিয়াছিলাম, এখন বুঝিতেছি তাহা নহে; সে ব্যক্তি সাধুও নহে, তাহার প্রকৃতিও সৎ নহে। টাকা পাইলে সে নিশ্চয়ই তাহা লুকাইবে,—আমাকে বলিবে, কিছুই পাই নাই; আর আমাকে তখন ফ্যা-ফ্যা করিয়া বেড়াইতে হইবে। এখন সংযুক্তি এই,—অমরসিংহ যাহাতে টাকা-কড়ি না পায়, তাহারই চেষ্টা করা।"

এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া, বৃদ্ধ পাণ্ডা কেশবরাম সম্মুখবর্ত্তী অমরসিংহকে কহিলেন,—"তুমি আমার বাটীতে এখনই যাও, আমার পূজা করা ফুল ও তুলসীপত্র যাহা আছে, তাহা লইয়া আইস।"

অমরসিংহ যোড়হাতে "যে আজ্ঞা" বলিয়া প্রভুর আদেশ-পালনার্থ চলিল।

এই অবসর পাইয়া বৃদ্ধ কেশবরাম,—বৃদ্ধ দীনদয়ালের সহিত কথা আরম্ভ করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

কেশবরাম। আমি পুরোহিত, আপনি যজমান। আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী,—আপনার হিত আমার একান্ত প্রার্থনীয়। আপনার মঙ্গল হইলেই আমার মঙ্গল। বিশেষতঃ আমি আপনার তীর্থগুরু। গুরু চিরদিন শিষ্যের কল্যাণ কামনা করিয়া থাকেন। আপনার মত শিষ্য এ সংসারে বিরল। আপনার মত ধার্ম্মিক এবং সদনুষ্ঠানরত, সৎপাত্রে এবং সৎকার্য্যে দানশীল শিষ্য—আমি এ সংসারে কখন দেখি নাই। আমার অসংখ্য শিষ্য, কিন্তু সর্ব্বশিষ্য অপেক্ষা আপনাকে আমি অধিক ভালবাসি এবং স্নেহ করি।

ক্রোরপতি দীনদয়াল সাধারণতঃ বেশী কথার লোক ছিলেন না। বিশেষ বাজে তর্ক-বিতর্ক করিবার তাঁহার সময়ও ছিল না। তিনি দুই এক কথার লোক ছিলেন। তিনি পাণ্ডা কেশবরামকে বাগাড়ম্বরপূর্ণ ঘোরতর ভূমিকা করিয়া ঐরূপ বক্তৃতা করিতে শুনিনা, একটু রুক্ষভাবে বলিলেন,—"এত কথার আবশ্যক কি? কি ঘটিয়াছে বলুন।"

কেশবরামকে কোনরূপ মনঃকষ্ট দিবার জন্য, তিনি ইচ্ছা করিয়া রুক্ষ কথা বলেন নাই। তাঁহার কথার ধরণই ছিল ঐরূপ। কিন্তু ইতরসাধারণ ঐরূপ কথাকে রুক্ষ কথা বলিত।

দীনদয়ালের মুখে ঐরূপ কথা শ্রবণ করিয়াও, পাণ্ডা কেশবরাম আপনবক্তৃতা ছাড়িলেন না। তিনি আপন মনে কহিতে লাগিলেন,—"আপনাকে আমি বড়ই স্নেহ করি। একদিনের স্নেহ নহে, এক বৎসরের স্নেহ নহে—এ যে ত্রিশ বৎসরের স্নেহ।

আপনার কোন অমঙ্গলের সূচনা দেখিলেই, আমার চোখে জল আসিবার উপক্রম হয়!"

এই কথা বলিতে বলিতে, বৃদ্ধ পাণ্ডা কেশবরামের চোখ ছল্‌ছল্‌ করিতে লাগিল। যেন জল পড়ে-পড়ে হইল। স্বর ভাঙ্গা-ভাঙ্গা হইল। ক্রমশঃ তিনি যেন আর কথা কহিতে পারিলেন না।

ক্রোরপতি দীনদয়াল এক এক বার আকাশ পানে চাহিতেছেন; দেখিতেছেন, বেলা আর কত আছে। কারণ, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই শুভক্ষণেই বজরা ছাড়িয়া দিবার কথা আছে। আর দীনদয়াল চাহিলেন, রাজপথপানে;—কেবল অমরসিংহের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। অমরসিংহকে তাঁহার মনের কথা না বলিয়া, তিনি কখন যাত্রা করিতে পারেন না। সে জন্য তিনি ঘন ঘন পথ পানে চাহিয়া থাকিতে বাধ্য হইতেছেন। তাঁহার এখন লক্ষ্য,—দুইটী জিনিষের পানে;—একটী আকাশের আলো, অপরটী পৃথিবীর পথ। সুতরাং বৃদ্ধ পাণ্ডার বক্তৃতা তাঁহার ভাল লাগিল না। একে তিনি আবশ্যকতা-বিহীন বাগাড়ম্বরের উপর চটা, তাহার উপর ঐ পথ এবং আলো,—তাঁহার চিত্ত হরণ করিয়াছে। কাজেই ক্রমশঃ পাণ্ডার বক্তৃতা তাঁহার বিরক্তিকর হইয়া উঠিতে লাগিল।

পাণ্ডা কেশবরাম—দীনদয়ালের নিকট তাঁহার পিতার নাম উচ্চারণ করিয়া, নিজে একটু কাঁদিবার যোগাড় করিলেন,—এবং দীনদয়ালকে একটু কাঁদাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এরূপ স্থলে স্বর্গীয় পিতার নাম শ্রবণ করিয়া, দীনদয়ালের চক্ষেত জল আসিলই না, অধিকন্তু বিরক্তির সহিত তিনি কেশবরামের

পানে কটমট করিয়া একবার চাহিলেন। দীনদয়ালের ধারণা,—যাহারা বেশী বকে, তাহারা বেশী মিছা কথা কয়।

এরূপ কটমট করিয়া চাহিলেও, কেশবরামের কথার নিবৃত্তি হইল না। তিনি দীনদয়ালের স্বর্গীয় পিতার সুযশঃ-সঙ্গীত কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। পিতার সুযশো-গান আধখানা গাহিয়া, অবশিষ্ট যেন হাতে রাখিয়া, বৃদ্ধ পাণ্ডা দীনদয়ালের পিতামহের কীর্ত্তিকলাপ বর্ণন আরম্ভ করিলেন। (পাণ্ডা,—ঐ পিতামহকে কখন দেখেন নাই :)

তখন সূর্য্যপানে চাহিয়া, দীনদয়াল কেশবরামকে বলিলেন,—"দেখুন, আর বেলা নাই। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমাকে যাত্রা করিতে হইবে; আপনার যাহা বক্তব্য আছে, তাহা শীঘ্র বলুন,—সময় প্রায় হইয়া আসিল। অমরসিংহই বা এখনও ফিরিল না কেন? যাত্রার পূর্ব্বে তাহার সহিত একবার আমার দেখা হওয়া আবশ্যক।"

কেশবরাম কহিলেন,—"আপনাকে বড় ভালবাসি।"

দীনদয়াল। আপনি যে আমাকে ভালবাসেন, তাত আমি জানি। এবং এই কথা আপনি আরও দুইবার বলিয়াছিলেন। সুতরাং এসব পুরাণ কথার আবশ্যক কি আছে? কি ঘটিয়াছে, আমাকে কেবল সেই কথাটী বলুন।

কেশবরাম। সে বড় গুরুতর কথা। ফলতঃ, আপনার বড় বিপদ্ দেখিতেছি। আপনি যদি বিশেষ বিচারপূর্ব্বক কার্য্য না করেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে আপনার অমঙ্গলের, এমন কি, সর্ব্বনাশেরও সম্ভাবনা আছে।

দীনদয়াল। আমার অমঙ্গলই হউক আর সর্ব্বনাশই হউক, সে জন্য আমি অধিক ভাবি না। আমি জানি, ভগবান্ যাহা

করিবেন, তাহাই হইবে ;—কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, আপনাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি তাহার যথাযথ উত্তর না দিয়া, কেবল অন্য বাজে কথা বলিতেছেন। আপনার যদি প্রকৃতি কোন কথা বলিবার থাকে, তবে শীঘ্র বলুন,—নচেৎ আমি অন্য কার্য্যে ব্যাপৃত হইব, বজরা ছাড়িবার পূর্ব্বে আমাকে অনেক বন্দোবস্ত করিতে হইবে,—আমার তিলার্দ্ধ সময় নাই।

পাণ্ডা কেশবরাম কহিলেন,—"দেখুন এ সময় ব্যস্ত হইলে চলিবে না। বিপদের সময় ধীরভাবে কার্য্য করা উচিত। সম্মুখে আপনার সর্ব্বনাশ উপস্থিত, অথচ আপনি সে কথা উপেক্ষা করিয়া ব্যস্ত হইয়া অন্য কাজ করিতে যাইতেছেন। ঘরের মট্‌কায় যখন আগুন লাগে, গৃহস্বামী কি তখন সে আগুন অবহেলা করিয়া বাহিরে অন্য কাজ করিতে যায় ?"

দীনদয়াল। আপনি যে আমাকে বড় জ্বালাতন করিতেছেন দেখিতেছি !—কোথায় আমার সর্ব্বনাশ হইল, কোথায় আমার আগুন লাগিল !—তাহার বিষয় কিছুই বলিবেন না,—অথচ কেবল ঐ সর্ব্বনাশ হইল, ঐ অমঙ্গল হইল, ঐ দাবানল জ্বলিল,—কেবল এই কথাই বলিতেছেন ; আমার ঘরে আগুন লাগে লাগুক, সর্ব্বনাশ হয় হউক, (ভগবান্ যদি তাহাই করেন, তবে তাহার উপর আর হাত কি আছে ?), আমি কিন্তু আপনার আর ভূমিকা শুনিতে অক্ষম।

কেশবরাম। আহা ! আহা ! বড়ই শোচনীয় পরিণাম দেখিতেছি ! যাঁহার প্রকৃতি সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর ছিল, আজ তাঁহার প্রকৃতি বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল হইল। যিনি স্বয়ং বৃহস্পতির তুল্য বুদ্ধিমান্, সহস্র সহস্র লোককে যিনি উপদেশ দিয়া

থাকেন, ধৈর্য্যই যাঁহার সর্ব্বপ্রধান গুণ ছিল,—হায়! তাঁহার আজ কেন এই দুর্গতি হইল! মরণকালে মানুষ্যের বিপরীত বুদ্ধি হয়, —মরণকালে রোগী ঔষধ খাইতে চাহে না।—অহহ!

বৃদ্ধ পাণ্ডার কোমরে চাদর জড়ান ছিল। সেই চাদর তিনি কোমর হইতে খুলিলেন। খুলিয়া মুখ ঢাকিলেন। ঢাকিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন।

এমন সময় বৃদ্ধ বৈজুমাঝি আসিয়া সংবাদ দিল,—"হুজুর! বজরা ছাড়িবার সমস্তই ঠিক হইয়াছে। হুকুম দিলেই এখন ছাড়িতে পারি।"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

দীনদয়াল,—বৈজুকে কহিলেন,—"একটু অপেক্ষা কর। অমরসিংহ আসিলেই বজরা খুলিবার হুকুম দিব। অমরসিংহ ফুল-তুলসী আনিতে এত দেরী করিতেছে কেন!"

দীনদয়ালের পুত্রের নাম হরগোবিন্দ।

পুত্র হরগোবিন্দকে দীনদয়াল কহিলেন,—"তুমি একখানি দ্রুতগামী একা করিয়া শীঘ্র পাণ্ডা-মহাশয়ের বাটীতে যাও এবং অমরসিংহকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আইস।"

পাণ্ড কেশবরাম তাড়াতাড়ি কহিলেন,—"ওকেঁ যাইতে হইবে কেন! আমি যাইতেছে, আমি যাইতেছি।"

দীনদয়াল দূরদর্শী। মানুষ কথা কহিলেই, তাহার মনের ভাব বুঝিয়া লইবার তাঁহার একটা শক্তি জন্মিয়াছিল। দীনদয়াল

বুঝিয়াছিলেন, "অমরসিংহকে পুরস্কার দিবার কথা শুনিয়া, পাণ্ডা বড় বিষণ্নহৃদয় হইয়াছেন। পাছে অমরসিংহকে পাণ্ডা আসিতে না দেন, এই ভয়ে তিনি পুত্রকে বলিলেন,—"তুমি একাই যাও, পাণ্ডা মহাশয়ের আর কষ্ট করিয়া, তথায় যাইবার আবশ্যক কি আছে?"

পাণ্ডা। আমি গেলেই ভাল হয়, আমি না হয় ওঁর সঙ্গেই যাই।

পাণ্ডার আগ্রহ দেখিয়া দীনদয়ালের কেমন একটু সন্দেহ জন্মিল। পুত্রকে যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিয়া দিয়া, তিনি পাণ্ডার সহিত কৌশল-জাল বিস্তারপূর্ব্বক গল্প আরম্ভ করিলেন।

পাণ্ডাকে কহিলেন,—"দেখুন ঠাকুর-মহাশয়! কাঙ্গালী বিদায় করিতেই আমার অনেক টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে, সেই জন্য এ ক্ষেত্রে আপনাকে অর্থ দিয়া, আমি সন্তুষ্ট করিতে পারিলাম না। আচ্ছা! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, অমরসিংহকে কি পুরস্কার দেওয়া যায় বলুন দেখি!"

কেশবরাম এইবার খুব গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেন; ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন,—"দেখুন, সে কথা আমি আর কি বলিব! দাতা দান করিবেন,—আমি তাতে প্রতিবাদী হইব কেন? আপনার যা ইচ্ছা,—যথা-সর্ব্বস্ব দান করিতে পারেন। আপনি ত বলিয়াছেন,—"যথা-সর্ব্বস্ব দান করিব।"

দীনদয়াল,—পাণ্ডার মুখে এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া মনে মনে কহিলেন,—যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই ঠিক বটে! (প্রকাশ্যত কেশবরামকে কহিলেন) হঠাৎ একবার যথাসর্ব্বস্ব দিব বলিয়া ফেলিয়াছি বলিয়াই, কি যথাসর্ব্বস্ব দিতে হইবে? তবে কিছু বেশী

দিবার আমার ইচ্ছা আছে বটে, কিন্তু আপনার পরামর্শ ব্যতীত ত সে কাজ করিব না।"

কেশবরাম। আমার মত এই,—যে ব্যক্তি যেমন উপযুক্ত, তাহার সেইরূপই পুরস্কার হওয়া উচিত। অমরসিংহের মাসিক মাহিনা বড়জোর ৪৲ চারি টাকা। সে,—আধঘণ্টা-টাক্ বড়জোর জলে পড়িয়াছিল। মাসিক মাহিনা যাহার ৪৲ চারি টাকা, দিন-প্রতি তাহার দুই আনা মজুরি পড়ে। ২৪ ঘণ্টায় যাহার বেতন ৵০ দুই আনা, আধঘণ্টার জন্য তাহাকে কতই বা মেহনত-য়ানা দিতে হইবে?

পাণ্ডার কথা শুনিয়া, দীনদয়াল এবার বিস্মিত হইলেন। ভাবিলেন,—'লোকটা কি নিষ্ঠুর!' প্রকাশ্যতঃ কহিলেন,—"ঠাকুর মশায়! আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক্ বটে! তবে একটা কথা এই,—জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিল, ডুবিয়া ত অনেকটা মেহনতও করিতে হইয়াছিল, সেইজন্য পুরস্কারের মাত্রা যেন কিছু বেশী হওয়া, আমি এক এক বার মনে করিতেছি।"

কেশবরাম। সে কথা যদি ধরেন, তবে—বেতনের হারাহারি পুরস্কার না দিয়া, একটা ডুবুরীর মজুরী দিলেই চলিতে পারে। আমার কুয়ায় ঘটি পড়িলে একটী পয়সা দিলে ডুবুরী নামিয়া ঘটিটী তুলিয়া দেয়। সে হিসাবে আপনি অমরকে একটী পয়সা দিতে পারেন। জলে ঝাঁপ দেওয়া বা ডুবে-ডুবে ঘটী তোলা বা মানুষ তোলা অথবা আর কিছু তোলা—এ ত আর আশ্চর্য্য কিছু নয়,—এরূপ ত দুবেলাই ঘটিতেছে। তবে আপনি যদি এ চেয়েও কিছু বেশী দিতে চান,—দিতে পারেন। আপনি দাতা, আমি কেন আপনার দানের কাজে বাধা দিব?

দীনদয়াল। আমি মনে করিতেছি, অমরসিংহকে পাঁচ টাকা পুরস্কার দিব।

কেশবরাম (জিহ্বা কাটিয়া) বলেন কি, বলেন কি? একটী-বার মাত্র সে জলে ডুবিয়াছে। বড় জোর, তার আধ ঘণ্টা লাগিয়াছে। এই আধ ঘণ্টার জন্য তাহাকে পাঁচ টাকা দিতে হইবে? বলেন কি আপনি? আপনারাই যে, বাজার-দর মহার্ঘ করিয়া ফেলিলেন! আপনাদের জন্য গৃহস্থ ব্যক্তির সংসার চালান ভার হইল দেখিতেছি। এর পর কোন ডুবুরীই পাঁচ টাকার কমে পাড়ার আর ঘটি তুলিবে না! বড় বিপদ্ ঘটিল দেখিতেছি।

দীনদয়াল। (স্বগত) আমি যাহা মনে ভাবিয়াছিলাম, তাহাই ঠিক্ ঘটিল! ক্ষুদ্রপ্রাণ কেশবরাম অমরসিংহকে বহুতর সম্পত্তি-দানের কথা শুনিয়া, সত্য সত্যই বিষাদ-সাগরে মগ্ন হইয়াছে। হইবারই কথা। এমন অনেক মানুষ আছে, যাহারা অপরের হঠাৎ সম্পত্তি-প্রাপ্তি দৃষ্টে বড়ই কাতর হয়। দুঃখ, ক্ষোভ এবং দুশ্চিন্তার সীমা থাকে না। পাঁচটী টাকা অমরসিংহকে দিব বলিলাম, তাহাতেও কেশবরাম রাজী নহেন। ক্ষুদ্র মনের সীমা যে এতদূর ছোট হইতে পারে, তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। যাহা হউক, কেশবরামকে এখন চটান হইবে না। উঁহার কথাতেই আমাকে সায় দিয়া যাইতে হইবে। প্রকাশ্যতঃ দীনদয়াল কহিলেন,—দেখুন "ঠাকুর মহাশয়! অমরসিংহকে কি দেওয়া যায় বলুন দেখি? পাঁচ সিকা দিব কি?"

কেশবরাম। আপনি দাতা, পাঁচসিকা কেন পাঁচহাজার টাকা দিতে পারেন। কিন্তু অতি শব্দটাই খারাপ। অতি-দান করিয়া বলি-রাজা পাতালে বদ্ধ হইয়া আছেন। আমি আপনার

তীর্থ-গুরু, আপনি আমার সন্তানতুল্য শিষ্য; তাই আপনাকে সদুপদেশ দিতেছি। অন্য কেহ হইলে এ সকল কথা বলিতাম না।

দীনদয়াল। (মনে মনে হাসিয়া) পাঁচসিকা দেওয়া যদি সঙ্গত বিবেচনা না করেন, তাহা হইলে অমরসিংহকে আমি পাঁচ-আনা দিব কি?

কেশবরাম। আমি ত গোড়া হইতেই বলিতেছি, আপনার যাহা ইচ্ছা, তাহাই দিতে পারেন;—আমাকে ওসব কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না। আমি কোন কথা বলিলে পাছে আপনি মনে করেন,—এ লোকটা দানের প্রতিবাদী,—

দীনদয়াল। আমি তা মনে করিব কেন? আপনি আমার হিতাকাঙ্ক্ষী, উপদেষ্টা ও তীর্থগুরু। আচ্ছা, আপনিই আমাকে বলিয়া দিউন, কি আমাকে দিতে হইবে?

কেশবরাম। না, না, না! সে কথা আমি মুখ দিয়া বলিতে পারিব না।

দীনদয়াল। কেন কেন? কিসের জন্য?

কেশবরাম। আমার এ সম্বন্ধে কোন পক্ষেই কথা কহা উচিত নয়। প্রথমতঃ দেখুন, অমরসিংহ আমার ভৃত্য, উহাকে আমি কতকটা ভালও বাসিয়াছি। এরূপ স্থলে, আমি অমর-সিংহকে ইহা দিউন, তাহা দিউন বলিতে পারিব না। আপনি মনে করিতে পারেন, আমি অমরসিংহকে ভালবাসি বলিয়া, অমরসিংহের পক্ষ টানিয়া কথা বলিতেছি; অমরসিংহকে ভাল-বাসি বটে, কিন্তু অমরসিংহ অপেক্ষা আপনাকে অধিক ভাল বাসি। যদি ভ্রমবশতঃ হঠাৎ অমরসিংহকে কিছু বেশী দিবার

কথা বলিয়া ফেলি, তাহা হইলে আপনার ক্ষতি হইতে পারে। আমার দ্বারা আপনার ক্ষতি হইবে, ইহা আমার পক্ষে বড়ই কষ্টকর।

দীনদয়াল। তা ত বটেই! তবে কি আন্দাজ দেওয়া উচিত, তাহার একটা আঁচ পাইলে, আমার পক্ষে বড়ই ভাল হয়। আপনি যথাপক্ষে কথা বলুন, কোন মতে দ্বিধাচিত্ত হইবেন না।

কেশবরাম। যদি যথাপক্ষে কথা বলিতে হয়,—ন্যায়ের তুলাদণ্ড ধরিয়া ওজন করিয়া কথা বলিতে হয়,—তাহা হইলে হিসাব অন্যরূপ হইয়া দাঁড়ায়। অমরসিংহকে আমি ভালবাসি বটে,—পুত্রের ন্যায় কতকটা স্নেহ করি বটে,—কিন্তু ধর্ম্মতঃ সূক্ষ্ম ন্যায়বিচারের সময়, অমরসিংহের পক্ষ আমি কিছুতেই টানিব না। তা, ইহাতে আমাকে কেহ ভাল বলিতে হয় বলুন,—মন্দ বলিতে হয় বলুন; তথাচ আমি ন্যায়পথ ছাড়িব না। গুরু হৌক্ না কেন, হক্ কথা বলিবার সময় ভয় বা খাতির আমি কাহারও করি না।

দীনদয়াল। (মনে মনে হাসিয়া) আপনার উপদেশামৃত বড়ই মধুর। আমার সে অমৃত পান করিবার জন্য বড়ই পিপাসা জন্মিতেছে। বলুন, শীঘ্র বলুন।

কেশবরাম। দেখুন,—আপনি একবার প্রণিধানপূর্ব্বক ঠিক ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন, অমরসিংহ এ ক্ষেত্রে আপন কৃত-কর্ম্মের নিমিত্ত কিছুই পাইতে পারে না। যে সময় অমরসিংহ ডুব দিয়াছিল, সে সময় অমরসিংহ আমার মাহিনা ভোগ করিতেছিল। সে সময় অমরসিংহ আমার বেতনভূক্ ভৃত্য

ছিল। অমরসিংহের তখন স্বতন্ত্র স্বত্বা ছিল না। তখন অমরসিংহের স্বত্বা আমার স্বত্বার সহিত বিলীন হইয়াছিল এবং এখনও বিলীন আছে। অতএব যাহার স্বত্বা নাই,—যাহার আলাহিদা অস্তিত্ব নাই, তাহার উদ্দেশে পুরস্কার দেওয়া কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

দানদয়াল। আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা ঠিক বটে; তবে কথা এই, আমি অমরসিংহকে পুরস্কার দিব অঙ্গীকার করিয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু আপনি যখন অমরসিংহের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই বলিতেছেন, তখন সে পুরস্কার কাহার প্রাপ্য, আপনিই ঠিক করিয়া বলুন।

কেশবরাম। ধর্ম্মতঃ ধরিতে গেলে, সে পুরস্কার আমারই প্রাপ্য; কিন্তু আমি সে পুরস্কার লইতে চাহি না। পরের উপকার করিয়া পুরস্কার গ্রহণ করা উচিত নহে। তাহাতে পরোপকার-কার্য্যজনিত পরকালে পুণ্য-লাভ হয় না। বিশেষতঃ আমি আপনার গুরু। আমার দ্বারা যদি আপনার কোন উপকার হইয়া থাকে, আমি সে উপকারের প্রত্যুপকার পাইবার প্রত্যাশী নহি। আমার ধর্ম্ম নিষ্কাম। তবে আমাকে আপনার মনে থাকিলেই হইল।

দীনদয়াল। আপনাকে আমার যাবজ্জীবন মনে থাকিবে, সে পক্ষে আপনার কোন সন্দেহ নাই। তবে কথা এই,—আমার সহধর্ম্মিণী এবং পুত্রবধূ অমরসিংহকে পুরস্কার দিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহার উপায় কি হইবে? তাঁহারা স্ত্রীলোক। আমি যেমন আপনার যুক্তি-তর্ক বুঝিলাম, তাঁহারা সেরূপ বুঝিবেন না। তাঁহারা বলিবেন,—যখন দিব বলিয়া

প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তখন নিশ্চয়ই দিব। না দিলে, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে;—প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইলে মহাপাপ।

কেশবরাম। স্ত্রীলোকগণের মন-রক্ষার্থে যদি একান্তই অমরসিংহকে কিঞ্চিৎ পুরস্কার দিতে হয়, তাহা হইলে নগদ পয়সা-টয়সা দেওয়া হইবে না; কিছু জলযোগ করাইলে চলিবে।

দীনদয়াল। কি জল খাওয়ান যায় বলুন দেখি!

কেশবরাম। অমরসিংহ বজরায় আসিলে,—এই—তাহাকে পোণ-পয়সার ছাতু এবং সিকিপয়সার লঙ্কা আনাইয়া দিলেই যথেষ্ট হইবে। যদি তাহাকে মিষ্ট-মুখ করাইতে চাহেন, তাহা হইলে আধপয়সার ছাতু এবং আধপয়সার গুড় আনিয়া দিলেই চলিবে। ছাতু-গুড় বা ছাতু-লঙ্কা পাইলেই অমরসিংহ কৃত-কৃতার্থ হইবে।

দীনদয়াল। আপনার কথাই শিরোধার্য্য করিলাম। আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাই ঠিক্; দরিদ্র ব্যক্তির হস্তে নগদ পয়সা দেওয়া উচিত নহে। তাহারা গাঁজা খাইয়া পয়সা নষ্ট করিতে পারে।

কেশবরামের হৃদয়ে এইবার আনন্দের বন্যা প্রবাহিত হইল। অমরসিংহ একদমে এক মুহূর্ত্তে লক্ষাধিক টাকা পাইবে,—এই কথা শুনিয়া তাহার বুক ফাটিতেছিল। এখন একলক্ষ টাকার পরিবর্ত্তে এক পয়সার নুন-লঙ্কার ব্যবস্থা হইল দেখিয়া, কেশবরাম হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

দীনদয়াল ভাবিতে লাগিলেন,—"শুনিয়াছিলাম বাপু ঠাকুর বৃদ্ধবয়সে ধর্ম্ম-কর্ম্মে মন দিয়াছেন। তাহার গৃহে ভিখারী মুষ্টি-ভিক্ষায় বঞ্চিত হয় না,—ক্ষুধার্ত্ত অন্নে বঞ্চিত হয় না,—এমনও শুনিয়াছিলাম।

"কিন্তু আজ যাহা দেখিলাম, তাহাতে বুঝিলাম, লোকটার ধর্ম্ম-কর্ম্ম সমস্তই বাহিরে। অন্তরে সেই কালকূট বিষের বাতি সদাই জ্বলিতেছে। লোকটার হাড়ে টক্ পূর্ব্ববৎই আছে। ধর্ম্মের পোষাক পরিলে ধার্ম্মিক হয় না। কেশবরামের ধর্ম্ম, পোষাকে আবৃত। কিন্তু সেই পোষাকের ভিতর দিয়া, কেশবরামের অধর্ম্ম উঁকি মারিতেছে। সে যাহা হউক, দুঃখ এই, স্বকার্য্য-সিদ্ধির জন্য, অনেক বাজে কথা বলিয়া সময় নষ্ট করিতে হইল। এরূপ কৌশলে পাণ্ডার মন যদি আমি নরম করিতে না পারিতাম, তাহা হইলে পাণ্ডা কিছুতেই অমরসিংহকে আমার সঙ্গে কাশীধাম যাইতে দিতেন না। এখন সুবিধা করিয়া লইয়াছি। এইবার আমি ইচ্ছা প্রকাশ করিলেই,—'পাণ্ডা ঠাকুর অমরসিংহকে আমার সঙ্গে যাইতে দিবেন।" প্রকাশ্যতঃ দীনদয়াল কহিলেন,—"সূর্য্য অস্ত হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই, অমরসিংহ এখনও আসিল না, তাই ভাবিতেছি।"

কেশবরাম। অমরসিংহকে এখন কি দরকার? বরং ছাড়িয়া দিতে পারেন। তবে যদি আপনার অমরসিংহকে পুরস্কার দিবার একান্তই ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে আমাকে সেই একটী পয়সা দিয়া যান, আমি তাহাকে ছাতু-লঙ্কা কিনিয়া খাওয়াইব।

বৃদ্ধ দীনদয়াল বলিলেন,—হাঁ, প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা সঙ্গে সঙ্গে পালন করাই কর্ত্তব্য;—যত শীঘ্র সম্ভব, ঋণে মুক্ত হওয়াই উচিত। আপনি একটু বসুন, আমি পয়সাটী আমার সহধর্ম্মিণীর নিকট হইতে আনিয়া দিতেছি।"

এই বলিয়া দীনদয়াল গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কক্ষান্তরে গেলেন এবং অল্পক্ষণ পরে একটী পয়সা আনিয়া কেশবরামের হাতে দিলেন,—বলিলেন,—"আমার সহধর্ম্মিণীর একটী অনুরোধ আপনার নিকট আছে। সহধর্ম্মিণী আপনাকে আমার দ্বারায় বলিয়া পাঠাইয়াছেন,—সেই ডুবুরিটীকে তিনি বজরা করিয়া কাশীধামে লইয়া যাইবেন। অনেক ছেলেপিলে বজরায় আছে, যদি কোনরূপ বিপদ্ ঘটে, সেই জন্ম একজন ভাল ডুবুরি সঙ্গে লওয়া উচিত।"

কেশবরাম। আপনার সহধর্ম্মিণী স্বয়ং লক্ষ্মী। লক্ষ্মীতে আর তাঁতে কোন প্রভেদ নাই। তিনি যখন বলিয়াছেন, তখন ডুবুরি অমরসিংহ নিশ্চয়ই আপনাদের সঙ্গে যাইবে; তবে আমার একটী কথা এই,—অমরসিংহকে কোনরূপ পুরস্কার তিনি যেন না দেন। ডুবুরিদের ছেলেতোলা জাতীয় ব্যবসা, তাহারা ত ছেলে জলে পড়িয়া গেলে তুলিতে বাধ্য, তাহার জন্ম আবার পুরস্কার কি?

দীনদয়াল। হাঁ, হাঁ, তা বটে। আপনি যাহা বলিতেছেন, সমস্তই ঠিক।

এমন সময় এক্কা করিয়া দীনদয়ালের পুত্র হরগোবিন্দের সহিত অমরসিংহ বেণীঘাটে আসিয়া পৌঁছিল। বজরায় উঠিবামাত্র কেশবরাম,—অমরসিংহকে কহিলেন,—"দেখ, তুমি বজরায় করিয়া ইহাঁদের সঙ্গে ৺কাশীধাম পর্য্যন্ত যাইবে। ইহাঁরা যখন যে কাজ করিতে বলিবেন, তাহাই করিবে। তুমি যেমন আমার নিকট চাকর ছিলে, ইহাঁদের নিকটও সেইরূপ ভাবে থাকিবে। আমার এই শিষ্য দীনদয়াল বড়ই সদাশয় ব্যক্তি; ইহার কথা মান্য করিয়া চলিবে।"

অমরসিংহ যোড়হাতে অবনত-বদনে কহিল;—"যে আজ্ঞে প্রভু! আপনার আদেশ আমি সাধ্যমত পালন করিব।"

পাণ্ডা ঠাকুর,—সকলের প্রণাম পাইয়া এবং দীনদয়াল কর্ত্তৃক আরও কিঞ্চিৎ অর্থ পাইবার আশা পাইয়া, অমরসিংহ পুরস্কার পাইল না বুঝিয়া, হৃষ্টচিত্তে বজরা হইতে তীরে অবতরণ করিলেন। বৈজু মাঝি "জয় গঙ্গামায়ীকি জয়" বলিয়া বজরা ছাড়িয়া দিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

কাশীধামে দুর্গাবাড়ীর অদূরে এক নিভৃত উদ্যান। দুইটী ভৃত্য এবং দ্বারবান্ ছাড়া সে উদ্যানে অদ্য এখন আর কেহই নাই। উদ্যানে নানাজাতীয় পুষ্প ফুটিয়া রহিয়াছে—নানাজাতীয় ফল বৃক্ষে ঝুলিতেছে,—নানাজাতীয় লতা নানাদিকে হেলিয়া দুলিয়া বেড়াইতেছে। উদ্যানটীকে অনেকে বলিত,—ইহা অকাল ফলের এবং অকাল ফুলের বাগান। শীতকালে এ বাগানে আম পাওয়া যাইত। শরৎকালে সুপক্ক কাল জাম মিলিত। অধিকাংশ ফুল, কালে অকালে—বার মাসই সে বাগানে ফুটিয়া থাকিত। উদ্যান-রক্ষক একজন উৎকৃষ্টমালি ছিল। তাহারই গুণে—তাহারই নৈপুণ্যে—উদ্যানের এইরূপ সমৃদ্ধি-বৃদ্ধি হইয়াছিল।

সেই উদ্যানের মধ্যস্থলে একটী দ্বিতল বাটী আছে। বাটীটী ক্ষুদ্র হইলেও উত্তমরূপে সাজান। খানসামা দুইটী সেই দ্বিতল উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া—আলো জ্বালিয়া দাঁড়াইয়া—দাঁড়াইয়া, যেন কাহার প্রতীক্ষা করিতেছে। দ্বারবান্ দুইটী ফটকের

নিকট বেঞ্চের উপর একবার বসিতেছে, আবার বেঞ্চ ছাড়িয়া পথে গিয়া দাঁড়াইতেছে—বেড়াইতেছে এবং কাহাকে যেন উঁকি মারিয়া দেখিতেছে।

গড় গড় করিয়া একখানি জুড়ী-গাড়ী আসিয়া ফটকের নিকট মুহূর্ত্তমাত্র দাঁড়াইল। দ্বারবান্-দ্বয় অতীব বিনীতভাবে গাড়ীর আরোহীকে সেলাম করিয়া, গাড়ীর আগে আগে যেন পথ দেখাইয়া ছুটিল। ফটকের দ্বার খোলা ছিল; জুড়ী-গাড়ী ফটক পার হইয়া, দ্বারবানদ্বয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। এ দিকে সেই ভৃত্য দুইজন গাড়ীর শব্দ পাইয়া, সেই গৃহ হইতে গাড়ীর অভিমুখে দৌড়িল। দূরে গাড়ী আসিতেছে দেখিতে পাইয়া সেলাম করিল এবং দ্বারবানদ্বয়ের সহিত ভৃত্যদ্বয় গাড়ীর অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল।

দ্বিতল গৃহের নিকট গাড়ী আসিয়া থামিল। গাড়ী হইতে একজন বৃদ্ধ হিন্দুস্থানী নামিলেন আর কোচবাক্স হইতে এক হিন্দুস্থানী যুবা পুরুষ অবতরণ করিল। বৃদ্ধ আগে আগে এবং বৃদ্ধের আজ্ঞানুসারে সেই যুবক পশ্চাৎ পশ্চাৎ সিঁড়ি দিয়া, সেই গৃহের দ্বিতলে উঠিতে লাগিল। উঠিবার সময় বৃদ্ধ একজন ভৃত্যকে কহিলেন,—"শীঘ্র তামাক দিয়া তোমরা উভয়েই নীচে গিয়া বস।"

কলিকাতে তামাক সাজা প্রস্তুত ছিল, ভৃত্য কেবল টীকা ধরাইয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে গড়গড়ার উপর কলিকা বসাইয়া দিয়া, নীচে আসিল। বৃদ্ধ হিন্দুস্থানী দ্বিতলের বারান্দায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এতক্ষণ কি ভাবিতেছিলেন; গড়গড়ায় কলিকা দিয়া ভৃত্য নীচে নামিলে, বৃদ্ধ দ্বিতলের সুশোভিত সুরম্য গৃহে প্রবেশ করিয়া, চেয়ারের উপর বসিলেন।

সেই যুবক হিন্দুস্থানী বাহিরেই দাঁড়াইয়াছিল। বৃদ্ধের বিনা অনুমতিতে সেই যুবক ঘরে প্রবেশ করিতে পারে নাই।

বৃদ্ধ তামাক খাইতে লাগিলেন,—আর, কি ভাবিতে লাগিলেন। সেই যুবক ঈষৎ অগ্রসর হইয়া সেই গৃহের দ্বারদেশে কপাটের কতকটা অন্তরালে গিয়া, যোড়হাতে দাঁড়াইয়া রহিল।

তামাক খাইতে খাইতে কিছুক্ষণ পরে, বৃদ্ধ—যুবককে ডাকিলেন, "তুমি ভিতরে এস।"

যুবক ধীরপদক্ষেপে সসম্মানে উপর্য্যুপরি দুইটী সেলাম করিয়া গৃহে প্রবেশ করিল।

বৃদ্ধ তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত একখানি চেয়ার দেখাইয়া—দক্ষিণ হস্ত দ্বারা সেই চেয়ার স্পর্শ করিয়া,—যুবককে কহিলেন,—"তুমি এই চেয়ারে আসিয়া ব'স।" এই কথা শুনিয়া যুবক যেন স্তম্ভিত হইল,—যুবকের যেন বাক্‌রোধ হইল।

যে চেয়ারখানিতে বৃদ্ধ যুবককে বসিতে বলিলেন, সে চেয়ারখানি গৃহস্থিত অন্য সমস্ত চেয়ার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, মেহগনি কাষ্ঠে প্রস্তুত,—স্বর্ণমুক্তা-হীরকাদি-ভূষিত; বহুমূল্য কিংখাপের গদি আঁটা। তাহার উপর, বৃদ্ধের দক্ষিণ হস্ত দ্বারা স্পৃষ্ট। যে যুবক গাড়ীতে বৃদ্ধের সহিত একাসনে উপবেশন করে নাই, বসিবার জন্য কোচবাক্‌সে মাত্র স্থান গ্রহণ করিয়াছিল, যে যুবক কপাটের অন্তরালে অবনত বদনে যোড়হস্তে ভৃত্যের ন্যায় দণ্ডায়মান ছিল, সে যুবক এক্ষণে কিরূপে, সর্ব্বোৎকৃষ্ট আসনে, বৃদ্ধের দক্ষিণ-পার্শ্বে বৃদ্ধের সমতুল্য হইয়া অথবা বৃদ্ধ অপেক্ষা যেন কিছু অধিক বড় হইয়া, উপবেশন করিবে!

"চেয়ারে ব'স"—বৃদ্ধ মুখনিঃসৃত এই কথা শুনিয়া, কাজেই যুবক অবাক্ হইল। যুবককে বাক্‌শক্তিহীন দেখিয়া, বৃদ্ধ কিন্তু ক্ষান্ত হইলেন না। বৃদ্ধ আবার কহিলেন, "ব'স এই খানেই ব'স।"

এই কথা বলিয়া বৃদ্ধ চেয়ারটী একটু ঠেলিয়া দিলেন।

যুবক। (যোড়হাতে) একি! আমি আপনার ভৃত্য।—

বৃদ্ধ। তুমি ভৃত্যই যদি হও, তাহা হইলে ত আমার আদেশ পালন করিতে বাধ্য। আমি আদেশ করিতেছি, তুমি এই মুহূর্ত্তে চেয়ারে আসিয়া উপবেশন কর।

যুবক। (যোড়-হাতে) আমি বড়-গরীব, আমি কুলী, আমি মজুর, আমি আপনার ভৃত্য;—আমাকে ক্ষমা করিবেন।

যুবকের চক্ষু ছল্-ছল্ করিতে লাগিল।

বৃদ্ধ। তুমি কুলী নও, তুমি মজুর নও, তুমি আমার ভৃত্য নও;—

এই কথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধ আপন চেয়ার হইতে ঈষৎ উঠিয়া যুবকের হাত ধরিলেন। হাত ধরিয়া, ধীরে ধীরে যুবককে টানিয়া, দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত সেই অপূর্ব্ব চেয়ারে বসাইলেন। যুবক বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে সক্ষম না হইয়া, কাষ্ঠপুত্তলীবৎ ধীরে ধীরে আসিয়া চেয়ারে বসিলেন। যুবকের নয়নযুগল দিয়া কেবল বারিধারা পতিত হইতে লাগিল।

যুবক আর কেহই নহেন, সেই অমরসিংহ। বৃদ্ধ,—৺কাশীধামের সেই প্রসিদ্ধ সওদাগর দীনদয়াল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

অমরসিংহে দীনদয়ালে এইবার কথোপকথন আরম্ভ হইল ;—

দীনদয়াল। ক্ষেপাছেলে! তুমি আমাকে ভুলাইতে এত চেষ্টা করিতেছ কেন? বল তুমি কে!

অমরসিংহ (যোড়হাতে) আমি আপনার ভৃত্য।

দীনদয়াল। আরে পাগল! চাকর-কুলী-মজুরের কখন কি এরূপ আকর্ণ-বিস্তৃত উজ্জ্বল চক্ষুর্দ্বয় হইয়া থাকে? আরসী লইয়া তোমার মুখ তুমি একবার দেখ দেখি,—কেমন সুন্দর মুখ! কেমন সুন্দর নাসিকা! অধরোষ্ঠ কেমন লাল-টুকটুকে! কুলী মজুর চাকরের কখন কি এরূপ মুখ-শ্রী হয়?

অমর। আজ্ঞে, আমি আপনার চাকরই।

দীনদয়াল। প্রয়াগধামে আমার পৌত্রটী গঙ্গার প্রবল তরঙ্গে পড়িয়া ডুবিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। বল দেখি, দুই টাকা বা চারি টাকা মাহিয়ানার কোন্ কুলী—কোন চাকর,—কোন্ মজুর আমার পৌত্রের গঙ্গায় পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে,—সে নিজে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া থাকে? বজরায় ত আরও বহু লোক ছিল, চাকরের কখন কি এত বল—এত বিক্রম—এত সাহস—এত নির্ভীকতা—এত কর্ত্তব্য-পরায়ণতা হয়? আর যে দিন বজরা চুণার সহরের অদূরে আসিয়া নঙ্গর করিল, সে দিন রাত্রে বজরায় যে ডাকাত পড়ে, সেই ডাকাতের হাত হইতে কে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছিল? ডাকাতদের বিক্রমে—ভৈরব হুহুঙ্কারে আমার সিপাহিগণের বন্দুক হাত হইতে খসিয়া পড়ে। সেই বজরায় পতিত বন্দুক কুড়াইয়া লইয়া, তুমি একে একে তিন

জন ডাকাতকে গুলি করিয়া গঙ্গাশায়ী করিলে! তোমার অপূর্ব্ব স্থির লক্ষ্য দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। বল তুমি কে?

অমরসিংহ এবার কথা কহিলেন না; চেয়ারে বসিয়া অবনত-বদনে রহিলেন।

দীনদয়াল। দেখ, আমি কাশীতে আসিয়া অবধি তোমার গতিবিধি—তোমার কার্য্য-কথা—তোমার প্রকার-পদ্ধতি সমস্তই পর্য্যবেক্ষণ করিতেছি। আচ্ছা, দিবা আড়াই প্রহরের সময়,—রুটী খাইবার পূর্ব্বাহ্নে—কোন কোন দিন রুটী খাইতে বসিয়া তোমার চক্ষু অমন ছল্-ছল্ করে কেন,—কোন কোন দিন তোমার চক্ষু দিয়া এক আধ টোসা জল পড়ে কেন? সে দিন মা অন্নপূর্ণাকে প্রণাম করিতে গিয়া, তুমি অমন করিয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলে কেন? তুমি হিন্দীভাষা ব্যতীত আর কোন ভাষা জান না—বলিয়া ভাণ কর। কিন্তু তুমি ইংরেজী এবং বাঙ্গালা এই উভয় ভাষাই জান, তাহার স্পষ্টতঃ প্রমাণ আমি পাইয়াছি। মনে আছে কি? বিগত সপ্তাহে তুমি এবং আমি উভয়ে সিক্রোলে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। একজন দুষ্ট গোরা আসিয়া ঘোড়ার মুখের লাগাম ধরে;—তুমি তাহাকে ইংরেজীতে ইড়বিড় করিয়া কি বলিলে, আর সে চলিয়া গেল। লুকাইবে কত? সে দিন তুমি দশাশ্বমেধঘাটে আপন মনে গঙ্গাপানে চাহিয়া অতি ধীরে বাঙ্গালা গান গাহিতেছিলে। আর আমি আস্তে আস্তে আসিয়া তোমার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলাম। তুমি আমাকে দেখিয়াই চমকিয়া উঠিলে, মনে আছে ত? সে গানটী কি, এখন একবার বল দেখি?

অমরসিংহ তখনও নীরবে মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন।

দীনদয়াল। বল তুমি কে? আর বিলম্ব করিও না, আমার বড় উৎকণ্ঠা হইয়াছে। তুমি কাশ্মীরী মাড়োয়ারী না মহারাষ্ট্রী? সে দিন বিকানীর হইতে একজন পাইকের আসিয়াছিল; তুমি তাহার সহিত ঠিক্ ঐ বিকানীর ভাষায় কথা কহিতে আরম্ভ করিলে; আমি ত দেখিয়াই অবাক্! তুমি যখন গুজরাটের ভাষায় কথা কও, তখন তোমাকে মনে হয়, তুমি গুজরাটী। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কথা কহিলে তোমাকে মহারাষ্ট্রী বলিয়াই মনে হয়। তোমার সুন্দর স্বরূপ দেখিলে মনে হয়, তুমি একজন অতি উচ্চ বংশোদ্ভব কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ। বেটা! কথা কও!

অমরসিংহ তখনও নীরব। কেবল চোখের জলে তিনি প্লাবিত হইতে লাগিলেন।

দীনদয়াল। বেটা! আমার বোধ হইতেছে, তুমি রাজপুত্র; বোধ হয় কোন গূঢ় কারণবশতঃ মনের বিরাগে গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছ। বল বেটা! কেন তুমি এরূপ ছদ্মবেশ ধরিয়া ভারতবর্ষময় এরূপভাবে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছ? তোমাকে আমি ছাড়িব না,—বলিতেই হইবে।

এই কথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধ,—যুবকের হাত দুইটী ধরিলেন। যুবক,—বালকের ন্যায় করুণ-স্বরে মুক্তকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিলেন। বৃদ্ধেরও চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

যুবক যত ক্রন্দন দমন করিতে চেষ্টা করেন, ততই তিনি অধিকতর হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠেন।

কিছুক্ষণ এইভাবেই কাটিল। যুবক ক্রমশঃ প্রকৃতিস্থ হইলেন; বৃদ্ধের নিকট আত্ম-কাহিনী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

যুবকের সহিত বৃদ্ধের সে রাত্রে যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ ;—

বৃদ্ধ। তোমার প্রকৃত নাম কি অমরসিংহ, না আর কিছু ?

যুবক। না আমার নাম অমরসিংহ নহে ; আমার প্রকৃত নাম শ্রীভবানীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৃদ্ধ। অঁ্যা ? বল কি ? তুমি কি বাঙ্গালী ?

যুবক। আজ্ঞে হঁা ? আমি বাঙ্গালীই বটি।

বৃদ্ধ। তোমার চেহারা দেখিয়া, তোমাকে কিছুতেই ত বাঙ্গালী মনে হয় না ? তুমি তোমার মুখের ভাবটুকু পর্য্যন্ত হিন্দুস্থানীর ন্যায় করিয়া তুলিয়াছ। তোমার কথা কহিবার কায়দা,—কণ্ঠস্বর সমস্তই হিন্দুস্থানীর ন্যায় হইয়াছে। তবে এক একবার তোমাকে আমার কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে হইত। সে যাহা হউক, তোমার পিতার কি নাম ?

যুবক। আমার পিতার নাম ৺শঙ্করীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৃদ্ধ। যদি তোমার বলিবার কোন বাধা না থাকে, তাহা হইলে তোমার আত্মীয় স্বজন কে কে জীবিত আছেন, বল।

যুবক। আমার মা আছেন, ভাই আছে, সহধর্ম্মিণী আছেন,—আর আছে একটী—

যুবকের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল ; আর তিনি কথা কহিতে পারিলেন না।

বৃদ্ধ। বেটা ! এত কাতর হইতেছ কেন ? মনকে দৃঢ় কর ; তুমি বলবান হইয়া দুর্ব্বল হও কেন ?

যুবক। আর আছে আমার একটী কন্যা!

বৃদ্ধ। ইহাঁরা সব কোথায়?

যুবক। আজ প্রায় নয় বৎসর আমি স্বদেশ-স্বগ্রাম পরিত্যাগ করিয়াছি। ইহারা যে এখন কোথায়, তাহার কিছুই জানি না। জীবিত কি মৃত, তাহাও অবগত নহি।

বৃদ্ধ। তোমার বাটীতে তবে কে অভিভাবক আছে? তোমার ভাই কত বড়?

যুবক। তেমন অভিভাবক কেহই নাই। ভাইটী যখন খুব ছোট, তখন আমি গৃহ পরিত্যাগ করি। মা-ই আমার গৃহের কর্ত্রী। মা ছাড়া আমাদের গৃহের অভিভাবক আর একজন আছে। মা বলিতেন, ওটী আমার বড় ছেলে।

বৃদ্ধ। সে লোকটী আবার কে?

যুবক। সে লোকটী বাড়ীর দ্বারবান্, নাম তাহার রঘু-দয়াল-দাদা।

বৃদ্ধ। দ্বারবান্ তোমার দাদা হইল কিরূপে?

যুবক। দ্বারবান্ ব্রাহ্মণ নন, তথাপি তিনি আমার দাদা,—তথাপি তিনি আমার মার জ্যেষ্ঠ পুত্র। রঘুদয়ালের ন্যায় বীরপুরুষ বঙ্গদেশে ত নাইই, ভারতের অন্য কোথাও আছে কি না জানি না। রঘুদয়াল দাদা যেরূপ দৈহিক-বলসম্পন্ন, অন্তরের বলও তাঁহার তদ্রূপ।

বৃদ্ধ। তোমাদের এরূপ দুঃখের দশায় তোমরা কিজন্য এরূপ বীরপুরুষ দ্বারবান রাখিয়াছিলে?

যুবক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। কহিলেন,—"আমরা উহাকে রাখি নাই। উনিই আমাদের বাটীতে ছিলেন। আমাদিগকে

ত্যাগ করিয়া যান নাই। আমাদের অবস্থা যখন মলিন হইল, তখন একজন সম্ভ্রান্ত জমিদার রঘুদয়াল-দাদাকে কুড়ি টাকা মাহিনা দিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন। রঘুদয়াল যাইতে সম্মত হইলেন না। বিনা বেতনে আমাদের বাটীতে রহিলেন। সেই রঘুদয়াল-কেই বাটীর রক্ষক রাখিয়া, আমি চলিয়া আসিয়াছিলাম।"

বৃদ্ধ। কেন চলিয়া আসিলে? চলিয়া আসিয়া কাজ ভাল কর নাই। তোমার বৃদ্ধ মাতা জীবিত, তোমার স্ত্রী-কন্যা বর্ত্তমান, তোমার ছোট ভ্রাতারও বয়স অল্প। এরূপ অবস্থায় কেন তুমি বাটী হইতে বিরাগী হইয়া বাহির হইয়া আসিলে? স্ত্রীর সহিত কি ঝগড়া করিয়া আসিয়াছ?

যুবক। (গম্ভীর স্বরে) না, আপনি আমার পিতৃতুল্য,—আপনার নিকট স্পষ্ট কথা বলিতে আমার বাধা কি? স্ত্রী আমার মূর্ত্তিমতী ভক্তি; শরীরিণী ভক্তির সহিত অতিবড় পাষণ্ডেরও বিবাদ হওয়া সম্ভব নয়।

বৃদ্ধ। তবে তুমি গৃহত্যাগ করিলে কেন?

যুবক। (দক্ষিণ হস্ত আপন উদরে স্থাপন করিয়া) উদরান্নের জন্য,—আর পুলীশের গ্রেপ্তারি পরোওয়ানার জন্য।

বৃদ্ধ। তোমার মত বুদ্ধিমান্, বিবেচক, ভাষাভিজ্ঞ, সৎসাহস-সম্পন্ন ব্যক্তির উদরান্নের এরূপ অভাব হইল কেন? তুমি ধন-বানের সন্তান; নির্ধন হইলে কেন? আর উদরান্নের জন্য তোমাকে গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রায় নয় বৎসর কাল, ভারতবর্ষের নানা স্থানে ঐরূপ ভ্রমণই বা করিতে হয় কেন? আর তোমার উপর গ্রেপ্তারি পরোয়ানাই বা বাহির হয় কেন?

যুবক। সে অনেক কথা; এ দরিদ্র ব্যক্তির দুঃখকাহিনী

শুনিয়া আপনার কি লাভ হইবে? আপনার কষ্ট হইতেছে, রাত্রিও অধিক হইয়াছে, যদি একান্তই শুনিবার আপনার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আগামী কল্য বলিব; রাত্রি অধিক জাগরণ করিলে, আপনার এ বয়সে অসুখ হইতে পারে।

বৃদ্ধ। আমার অসুখ হইবে না, অদ্য রাত্রেই তুমি সমস্ত কথাই বল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

যুবক। পিতা ধনবান্ ছিলেন। পৈত্রিক বিষয় তাঁহার কিছু ছিল না। তিনি নিজে রোজগার করিয়া বড়মানুষ হন।

বৃদ্ধ। তিনি কি কাজ করিয়া কত টাকা রোজগার করিয়াছিলেন?

যুবক। চাকুরি আদি করিয়া, কতকটা সঙ্গতি-সম্পন্ন হন বটে, কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যেই তিনি অধিকতর অর্থোপার্জ্জন করেন। শুনিতে পাই, ব্যবসায় করিয়া পঞ্চাশ ষাটি লক্ষেরও অধিক টাকা তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল।

বৃদ্ধ। এই টাকা লইয়া তিনি কি করিলেন?

যুবক। পিতার মুখে শুনিয়াছিলাম, এক বাটী-নির্ম্মাণেই পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। মা শঙ্করীর সেবাতে প্রত্যহ যে কত টাকা খরচ হইত, তা আমি ঠিক করিতে পারি নাই। প্রাতঃকাল হইতে কেবল "দীয়তাং ভুজ্যতাং" রব উঠিত। ব্রাহ্মণ-ভোজন এবং কাঙ্গালী-ভোজনের নিমিত্ত বারো জন ব্রাহ্মণ প্রত্যহ

পাকশালায় পাক করিত। মা শঙ্করী-সেবার উদ্‌যোগ সম্বন্ধে প্রাতঃকাল হইতে সে-যে এক কি অদ্ভুত কাণ্ড উপস্থিত হইত, তাহা আমি এক মুখে বলিতে পারি না। পিতার পরলোক-গমনের তিন চারি বৎসর পূর্ব্বে তিনি কেবল শঙ্করীসেবা লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন; বিষয়-কর্ম্ম বড় একটা দেখিতেন না।

বৃদ্ধ। জমিদারী কিছু করিয়াছিলেন কি?

যুবক। হাঁ। জমিদারীর আয় পঞ্চাশ হাজার টাকার কম ছিল না। তাঁহার অদৃষ্ট তখন সুপ্রসন্ন ছিল; পাঁচশত টাকা আয় দেখিয়া যদি তিনি জমিদারী বা তালুক কিনিতেন, কালক্রমে তাহার আয় পাঁচ হাজার টাকা হইয়া উঠিত। তখন তাঁহার "ধুলা-মুঠা ধরিতে কড়ি-মুঠা" হইত। একবার অষ্টমের নীলামে তিনি আড়াই হাজার টাকা পণে একটী মহাল ডাকিয়া লন। চারি পাঁচ বৎসরের মধ্যে সেই মহালের সংলগ্ন গঙ্গার চর এত ভরাট হইয়া উঠিল যে, তাহার আয় কালক্রমে আট হাজার টাকায় দাঁড়াইল।

বৃদ্ধ। ব্যবসা-বাণিজ্য এবং জমিদারীর পর্য্যবেক্ষণ—রক্ষণা-বেক্ষণ কে করিত?

যুবক। আমার পিতাই সমস্ত করিতেন। তিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছিলেন। তিনি এক ঘণ্টায় যে কাজ করিতেন, অন্যে তাহা চারি ঘণ্টায় করিতে সক্ষম হইত না। তিনি যখন স্বয়ং বিষয়-কর্ম্ম দেখিতেন, তখন, এক চুল এদিক্ ওদিক্ হইত না। কিন্তু মৃত্যুর তিন চারি বৎসর পূর্ব্বে বিষয়-কর্ম্ম-পরিদর্শনের ভার অন্যের হস্তে অর্পণ করিয়া, তিনি শঙ্করী-সেবা লইয়াই তন্ময়চিত্ত হইয়াছিলেন।

বৃদ্ধ। বিষয়-কর্ম্ম কে কে দেখিত?

যুবক। সে সকল কথা খুলিয়া বলিতে হইলে, পর-নিন্দা করিতে হয়।

বৃদ্ধ হাসিতে লাগিলেন; বলিলেন, যথার্থরূপে ঘটনাবলীর কীর্ত্তন করিলেই যে, পরনিন্দা হয়, তাহা কখন মনে করিও না। পরনিন্দা,—বক্তার উদ্দেশ্য বুঝিয়া ঠিক করিতে হয়। তুমি যখন নিন্দার জন্য কোন ব্যক্তির নিন্দা কর, তাহার ক্ষতি করিবার জন্য এবং নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য অথবা আত্মানন্দ উপভোগের জন্য অপরের নিন্দা কর, তখন পরনিন্দা বলিয়া গণ্য হয়। বস্তুর স্বরূপ-বর্ণন কখন পরনিন্দা হয় না। পরনিন্দা অন্তরের জিনিষ, বাহ্য কথার জিনিষ নহে। অতএব তুমি সমস্ত কথা আমার নিকট বল, তাহাতে পরনিন্দা হইবে না।

যুবক। পিতা যখন বিষয়-কর্ম্মে কতকটা নির্লিপ্ত হইলেন, সেই সময় নানা দেশ হইতে নানা লোক আসিয়া আমাদের বাটীতে জুটিল। কোথা হইতে মাসতুতো-পিস্‌তুতো-মামাতো—এইরূপ দশ বার জন ভগ্নীপতি আসিয়া কতকটা কর্ত্তা হইয়া পড়িল। সম্বন্ধীর সংখ্যা বিশ-পঁচিশ জনের কম হইবে না। জেঠতুত, খুড়তুত কত রকমের যে সম্বন্ধী আসিল, তাহার সংখ্যা করা এখন দুরূহ। অগণিত ভিক্ষাপুত্র আসিয়া দেখা দিল। মা বলিতেন,—"উহাদিগকে আমি চিনি না," তথাচ ভিক্ষাপুত্রদলের সংখ্যা হ্রাস কখন হইত না। পাঁচ সাতটী গুরু-পুত্রেরও উদয় হইল। পাতান-গাঁদান নকল-ঝুটা—কত রকম-সম্পর্কের লোক যে আসিতে লাগিল, তাহা আমি আর কত বলিব? আসিয়া সকলেই কর্ত্তা হইতে চাহেন, সকলেই হুকুম দিতেই উদ্যত, কিন্তু হুকুম পালন করিবার লোক ক্রমশঃই কম হইতে লাগিল।

দীনদয়াল মৃদুমন্দ হাসিতে লাগিলেন ; জিজ্ঞাসিলেন,—"ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়-সম্পত্তি নষ্ট হইল কিরূপে ?"

যুবক। যে বাড়ীতে এতগুলি কর্ত্তার প্রাদুর্ভাব, সে বাড়ীর মঙ্গল কিছুতেই হয় না। পিতা একাগ্রচিত্তে শঙ্করী-পূজায় নিযুক্ত। বাণিজ্য বিভাগের কর্ত্তা হইলেন আমার মাতুল। এক-চেটিয়া করিবার মানসে তিনি প্রচুর পরিমাণে তামা ধরিয়া রাখেন। সেই বৎসরই তিন লক্ষ টাকা ব্যবসায়ে লোকসান হয়। লোক-সানের যখন দিন আসিল, তখন যে ব্যবসায়ে মাতুল হাত দেন, তাহাতেই লোকসান হয়। পরবৎসর ঘি-চিনির ব্যবসায়ে লক্ষাধিক টাকা লোকসান হইল। ইহা ব্যতীত চারিদিকে চুরীও বিলক্ষণ চলিতে লাগিল।

দীনদয়াল হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি কেন বিষয়-কর্ম্ম তখন দেখিলে না ?"

যুবক। আমাকে সকলে তখন ছেলেমানুষ বলিত। মা বলিতেন,—"ঘর ছাড়িয়া তোমার বিদেশে যাওয়া হইবে না। আমি এক আধ দিন বাড়ীর কর্ত্তা হইবার চেষ্টাও করিয়াছিলাম। কিন্তু ভাবে বুঝিলাম, এ বয়সে আমি যে কর্ত্তা হই, পিতারও তাহা ইচ্ছা নয়। আমি কর্তৃত্ব পরিত্যাগ করিয়া আপন প্রিয় কর্ম্ম করিতে লাগিলাম।

বৃদ্ধ। তোমার প্রিয় কর্ম্ম কি ছিল ?

যুবক। বনে গিয়া ব্যাঘ্র ভল্লুক মৃগ শূকর প্রভৃতি জন্তু শীকার করাই আমার প্রিয় কর্ম্ম ছিল।

বৃদ্ধ। তোমার মাতা তোমাকে বাঘ-ভাল্লুকের মুখের কাছে যাইতে দিতেন কেন ?

যুবক। রঘুদয়াল দাদা আমার সঙ্গে যাইত। রঘুদয়াল,—আমার কাছে থাকিলে, মায়ের কিছু ভাবনা-চিন্তা থাকিত না; একবার একটী প্রকাণ্ড বাঘকে রঘুদয়াল তরোয়াল দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়াছিল।

বৃদ্ধ। ওঃ কি ভয়ঙ্কর শক্তি !

যুবক। রঘুদয়ালের শক্তির সীমা আমি দেখিতে পাই না। একবার বিবাহোপলক্ষে কয়েকজন বরযাত্রী হাতীর উপর চাপিয়া আসিয়াছিল। হাতী গ্রামে আসিয়া ক্ষিপ্ত হয়; গ্রাম তোলপাড় করে। মানুষও দুই তিনটী খুন হয়। রঘুদয়াল হাতীর মাথায় লাঠির আঘাত করিয়া হাতীকে বধ করে।

বৃদ্ধ। এমন শক্তিসম্পন্ন পুরুষের কথা আমি কখন শুনি নাই; আশ্চর্য্য বটে !

যুবক। আমি যখন খুব ছেলেমানুষ, তখন একবার আমাদের বাড়ী দুই হাজার লোকে ঘেরাও করিয়াছিল। পিতার মুখে আমি গল্প শুনিয়াছি।

বৃদ্ধ। তোমাদের বাড়ী এত লোকে ঘেরাও করিল কেন ?

যুবক। পিতা একবার একজন খুনী আসামীকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। তিনি বাস্তবিক খুন করেন নাই, কিন্তু তাঁহার গ্রামের কতকগুলি লোক এবং পুলীশ ষড়যন্ত্র করিয়া, তাঁহাকে খুনী আসামী বলিয়া সাব্যস্ত করে, তাঁহার হাজত হয়। দায়রায় মোকদ্দমা হইবার পূর্ব্বেই, তিনি হাজত হইতে পলাইয়া আইসেন; পিতার আশ্রয় লন। পিতা তাঁহাকে অভয় দেন। তিনি পিতার বাল্যবন্ধু ছিলেন। এক পাঠশালায় দুই জনে পড়িয়াছিলেন।

বৃদ্ধ। বেটা! তুমি অল্পক্ষণ অপেক্ষা কর। আমি একবার বাহিরে যাইতেছি।

বহির্দ্দেশে পাঁচ মিনিটকাল থাকিয়া, বৃদ্ধ ভিতরে আসিয়া যথাস্থানে উপবেশন করিলেন। ভৃত্য নূতন কলিকা সাজিয়া আনিয়া গড়গড়ায় বসাইয়া দিয়া গেল। বৃদ্ধ গড়গড়ার নল যেমন দক্ষিণ হস্তে তুলিবেন, অমনি তাঁহার হাত কাঁপিতে লাগিল। নল খসিয়া পড়িল।

যুবক তাড়াতাড়ি উঠিয়া বৃদ্ধের নল তুলিয়া দিল। যুবক জিজ্ঞাসিল,—"কেন কেন! আপনার হাত হইতে নল পড়িয়া গেল কেন? হাতই বা কাঁপে কেন?"

বৃদ্ধ। না না!—ও-কিছু নয়,—ও-কিছু নয়!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

যুবক। বোধ হয়, আপনার কষ্ট বোধ হইতেছে। অবশিষ্ট কথা কাল বলিব।

বৃদ্ধ। তুমি বল। আমার কষ্টবোধ হয় নাই। বাটী বেরাও করিবার পর কি হইল?

যুবক। পিতাঠাকুর গল্প করিয়াছিলেন,—তখন সেই বাল্যবন্ধুকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আড়াইশত লাঠিয়াল বাটীতে একত্র হইয়াছিল। লাঠি ত ছিলই, ইহা ব্যতীত তীর, ধনুক, তরবারি, বর্শা এবং বন্দুকও ছিল। পিতাঠাকুর প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন,—তাঁহার প্রাণ যায়, সেও স্বীকার,—

তথাচ তিনি শরণাগত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিবেন না। ‘ক করা উচিত, তিনি রঘুদয়ালের সঙ্গে তাহার যুক্তি করিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধের একটু ঘাম হইতে লাগিল। গায়ে যে সকল জামা ছিল, তাহা খুলিয়া ফেলিলেন। যুবককে কহিলেন,—“বল বেটা! তোমার কথা বড় মনোহর।”

যুবক। রঘুদয়াল দাদা আসিয়া পিতাকে কহিলেন, “হুজুর! কোন পরওয়া নাই, হুকুম দিন! আমি অতি অল্পক্ষণ মধ্যেই শত্রু-দলকে তাড়াইয়া দিব, অথবা উহাদিগকে বিনাশ করিব। উহাদের দলে দুইশতমাত্র কনেষ্টবল আছে, এবং পাঁচশত চৌকীদার আছে। কনেষ্টবলগণ লাঠিখেলার কোন ধার ধারে না। চৌকীদার-দলের মধ্যে বিশ পঁচিশ জন ভাল খেলওয়াড় আছে বটে, কিন্তু আমি লাঠি ধরিয়া বাহির হইলেই, কেহই আমার বিরুদ্ধে লাঠি চালাইবে না। কয়েকজন চৌকীদার গোপনে বলিয়াও পাঠাইয়াছে,— “গুরুজী লাঠি লইয়া বাহির হইলে, আমরা লাঠি ফেলিয়া দূরে পলাইয়া যাইব। সুতরাং প্রভু! বাটী বেষ্টিত হইয়াছে বলিয়া আপনি ভীত হইবেন না। লোক দুই সহস্র বটে, কিন্তু দুইশত কনেষ্টবল ও পাঁচশত চৌকীদার ব্যতীত অবশিষ্ট সমুদয়ই দর্শক। অতএব চিন্তা কিছুই নাই।”

বৃদ্ধ। গল্পটী তোমার বেশ আনুপূর্ব্বিক মনে আছে,— দেখিতেছি, রঘুদয়ালের কথা শুনিয়া তোমার পিতা কি বলিলেন?

যুবক। পিতা বলিলেন,—“দেখ রঘুদয়াল! ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সকল কাজ করিতে হয়। আচ্ছা, বল দেখি! এই শত্রুদলকে

যদি তুমি বলপূর্ব্বক তাড়াইয়া দাও, তাহা হইলে কত লোক খুন জখম হইবে ?

রঘুদয়াল উত্তর দিলেন,—"চৌকীদারদলের মধ্যে কেহ বড় খুন জখম হইবে না। তাহারা যুদ্ধের আরম্ভেই পলাইবে। প্রাণে মরিবে,—কেবল ঐ ভোজপুরী কনেষ্টবলগুলি। অন্ততঃ পঁচিশ জন কনেষ্টবল খুন হইবে,—পঞ্চাশ জন জখম হইবে। যুদ্ধের সময় যদি তাহারা পশ্চাৎপদ না হইয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে পাঁচ সাত মিনিট দাঁড়াইয়া থাকে, তাহা হইলে ফল ঐরূপই হইবে ; কারণ, আমার দলে আড়াই শত পাকা পাকা লাঠিয়াল আছে,—তাহারা যদি একবার আমার হুকুম পাইয়া,—বাঘের মত শত্রুদল-মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়ে, তাহা হইলে ঐ ভোজপুরী কনেষ্টবলগুলাকে একবারে কলাগাছ শুয়া করিয়া দিবে। পিতাঠাকুর তদুত্তরে বলেন,—"দেখ রঘুদয়াল ! একটী নির্দ্দোষ ব্যক্তি খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত। তাঁহাকে আশ্রয় দিয়া আমি এই বিপদে পড়িয়াছি। দুই হাজার লোক আমার বাটী ঘেরিয়াছে। কিন্তু যদি আমার দ্বারায় পঁচিশটী পুলিশের কনেষ্টবল হত হয় এবং পঞ্চাশটী কনেষ্টবল আহত হয়, তাহা হইলে আমার ভবিষ্যৎ কি হইবে, একবার ভাবিয়া দেখ ! আমাদের এই গুরুতর অপরাধে আমাদিগকে সবংশে একে একে ফাঁসী-কাঠে ঝুলিতে হইবে। শরণাগত ব্যক্তিকে তখন রক্ষা করিতে পারিব না, অথচ আমরা সবংশে প্রাণে মারা যাইব। আজ তুমি যদি আপন বাহুবলে দুই শত কনেষ্টবলকে এবং পাঁচ শত চৌকীদারকে দূর করিতে সক্ষম হও, তাহা হইলে দেখিবে, সঙ্গে সঙ্গে এই বাটী, বন্দুকধারী এক সহস্র সিপাহী কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইবে। তখন উপায় ? ভারতবর্ষে ইংরেজরাজের তিন লক্ষ

ফৌজ আছে। সহস্রাধিক কামান আছে। পাগল ব্যতীত সেই ইংরেজ-রাজের সহিত সম্মুখ সমরে আর কেহই প্রবৃত্ত হয় না। লড়াই-দাঙ্গায় আর আমি যাইব না। কেন না, আমি বাতুল। আরও এক কথা,—একটী লোককে রক্ষা করিতে গিয়া ২৫টী লোককে খুন করা কিছুতেই যুক্তিযুক্ত নহে। কৌশলে কার্য্যোদ্ধার করিব মনে করিয়াছি! তুমি যদি সে কাজে সহায় হও, তাহা হইলে সে কাজ কতকটা সম্ভবপর বটে এবং শরণাগত ব্যক্তির রক্ষার আশা হয়।

রঘুদয়াল উত্তর দিলেন,—"আমাকে যে আদেশ করিবেন, সে কাজই করিতে আমি প্রস্তুত। আমার পণ প্রাণ পর্য্যন্ত।"

বৃদ্ধ। এমন নিমকের চাকর ত আমি দেখি নাই!

যুবকের নয়নদ্বয় বিস্ফারিত হইল। তিনি দীনদয়ালের মুখপানে চাহিয়া কহিলেন,—"রঘুদয়াল চাকর নন্—দাদা—পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র।"

বৃদ্ধের দেহ যেন ঈষৎ কম্পিত হইল। বৃদ্ধ কহিলেন,—"তাহাই বটে, আমার বলিবার ভুল হইয়াছিল। তার পর, তোমার পিতা কি বলিলেন?"

যুবক। পিতা কহিলেন,—"দেখ রঘুদয়াল! আমি গোপন অনুসন্ধানে জানিয়াছি, অদ্য রাত্রে আমার বাড়ী পুলিশ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবে না।" অদ্য রাত্রিকালে, যদি তুমি কোন গতিকে এই শরণাগত ব্যক্তিকে কোন সুদূর নিরাপদ স্থানে রাখিয়া আসিতে পার, তাহা হইলে সব দিকেই মঙ্গল।

বৃদ্ধ। তার পর কি হইল?

যুবক। পিতার নিকট শুনিয়াছিলাম, সেই শরণাগত ব্যক্তিকে

পিঠে বাঁধিয়া, দুই হাজার লোক ভেদ করিয়া, লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে পবন-গতিতে সেই রাত্রে কোথায় যে, রঘুদয়াল দৌড়িয়া পালাইয়াছিলেন, তাহা কেহ ঠিক করিতে পারে নাই। শুনিতে পাই, বঙ্গদেশের এলাকা ছাড়াইয়া বেহার-ভূমি পাটনার এলাকায়, রঘুদয়াল দাদা সেই শরণাগত ব্যক্তিকে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। সে এক অদ্ভুত কাহিনী,—সে এক অপূর্ব্ব ঘটনা!

বৃদ্ধ। তার পর, তোমার পিতার কি হইল?

যুবক। পিতা, পুলিশের হাতে আত্মসমর্পণ করেন। এই-রূপ প্রমাণ হয়, খুনী আসামী এবাটীতে আদৌ ছিল না এবং নাই; পুলিশ বৃথা সন্দেহ করিয়া এবাড়ী ঘেরাও করেন। প্রায় দেড় লক্ষ টাকা তাঁহার ব্যয় হয়। এইরূপ ব্যয় করিয়া, পিতা মুক্তি লাভ করেন।

বৃদ্ধ। আচ্ছা! তোমার মামার কর্ত্তৃত্বে ত ব্যবসা-বাণিজ্যে লোকসান ঘটে। জমিদারী প্রভৃতি নষ্ট হইল কিরূপে?

যুবক। পিতার ভগিনীপতি, সম্বন্ধী এবং ভিক্ষাপুত্র প্রভৃতির ষড়যন্ত্রগুণে জমিদারী নষ্ট হয়। জমিদারীগুলিও তাঁহারা ভাগাভাগি করিয়া একরূপ আত্মসাৎ করিলেন, বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অষ্ট-মের মালগুজারীর টাকা লইয়া পিতার ভগিনীপতি বর্দ্ধমানের কালেক্টরীতে দাখিল করিতে যান। যে রাত্রে টাকা দাখিল হইবে, সে রাত্রে ভগ্নীপতির বর্দ্ধমানের বাসায় ডাকাত পড়ে। মাল-গুজা-রীর সমস্ত টাকা লুণ্ঠিত হয়। ভগ্নীপতির পায়ে তরবারির চোট লাগে! ভগ্নীপতি অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকেন। এদিকে পর-দিন মহল,—যথাসময়ে খাজানা দাখিল অভাবে নীলাম হইয়া যায়। ভগিনী কাঁদিতে কাঁদিতে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া ডুলি করিয়া

সাত দিন পরে বাটীতে আসিয়া পৌঁছেন; পিতাঠাকুরের নিকট কাঁদিয়া আকুল হন,—বলেন, "আমি মরিয়া গিয়াছিলাম।" বলা বাহুল্য, ডাকাতী মিথ্যা, টাকা-লুণ্ঠন মিথ্যা, কেবল লোক দেখাইবার জন্য, নিজের পায়ে তিনি তরবারির চোট লাগাইয়াছিলেন। মহলটী তিনি বেনামী করিয়া, ডাকিয়া লন, সেইটীই পিতার প্রধান মহল ছিল। এইরূপে এবং অন্যরূপে একে একে ভগ্নীপতি প্রভৃতির গুণে অধিকাংশ মহল বিক্রয় হইয়া গেল, কোন কোন মহল বাক্কাও পাড়িল।

বৃদ্ধ। তার পর কি হইল?

যুবক। তার পর পিতার মৃত্যু হইল। পিতা স্পষ্টাক্ষরে, "মা শঙ্করি! মা শঙ্করি!"—এই নাম উচ্চারণ করিতে করিতে গঙ্গাজলে দেহ ত্যাগ করিলেন।

বৃদ্ধ। আচ্ছা! তোমার পিতার মৃত্যুর পর তোমাদের দারুণ অন্নকষ্ট হইল কেন? সোণা-রূপার জিনিষ কি কিছু ছিল না।

যুবক। সোণা রূপা মণি মুক্তা যথেষ্টই ছিল। সোণা রূপার জিনিষ যদি আমরা ধীরে ধীরে বেচিয়া খাইতাম, তাহা হইলে আমরা তিন পুরুষ বড়মানুষী করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিতাম। কিন্তু অদৃষ্ট বিগুণ হইলে কিছুই থাকে না। আমার জননীর কতকগুলি ভিক্ষাপুত্র,—জমিদারী বা ব্যবসার দিকে তত দৃষ্টি দিলেন না। সোণা রূপা নগদ টাকা এবং মণি-মুক্তার উপর তাঁহাদের নয়ন নিপতিত হইল। মাতা কয়েকজন ভিক্ষাপুত্রকে বড়ই ভাল বাসিতেন। সোণা-রূপার জিনিষ যে ঘরে থাকিত,—সে ঘরে সেই প্রিয়তম ভিক্ষাপুত্রগণের অবাধ গতি ছিল।

ভিক্ষাপুত্রগণ কতক দেখাইয়া, কতক লুকাইয়া, সোণা-রূপার জিনিষ-পত্র, টাকা-কড়ি এবং মণি-মুক্তা আত্মসাৎ করিল। বলিব কি! চারি দিকে অবাধলুণ্ঠনের ব্যাপার চলিতে লাগিল। শেষে যখন আমরা সর্ব্বস্বান্ত হইলাম, তখন একে একে সকলে সরিয়া পড়িল। সম্বন্ধিদল, ভগ্নীপতিদল, ভিক্ষাপুত্রদল,—কোন দলকেই আর দেখিতে পাইলাম না। গুরুপুরোহিতদল কোথায় যে লুকাইল, তাহার কিছুই ঠিকানা হইল না। রহিলেন কেবল পিতার সেই জ্যেষ্ঠ পুত্র রঘুদয়াল দাদা। মাতুলকে আমি অনেক চিঠিপত্র লিখিলাম, মাতুল কোন চিঠিরই উত্তর দিলেন না। যখন অন্নকষ্টে আমরা জর-জর, তখন একবার আমি মামার বাড়ী গিয়াছিলাম, মামা আমার সঙ্গে দেখা করিলেন না। পিতার ভগ্নীপতিগণের ব্যবহার আরও খারাপ। ভিক্ষাপুত্রদল প্রকাশ্য শত্রু হইয়া দাঁড়াইল।

বৃদ্ধ। আচ্ছা, তুমি ত লেখাপড়া জান। তুমি ত বুদ্ধিমান্ চতুর; তুমি কেন কোনরূপ চাকুরী বা ব্যবসা করিয়া পরিবার প্রতিপালনের চেষ্টা করিলে না? মাতা, ভ্রাতা এবং স্ত্রীর মনে কষ্ট দিয়া কেন এই নবীন বয়সে গৃহ পরিত্যাগ করিলে?

যুবক। বড় দুঃখেই গৃহ ছাড়িয়াছি। সে দুঃখ-কাহিনী অনন্ত। আজ আর থাক্, অনেক রাত্ হইয়াছে, আপনার কষ্ট হইতেছে। কা'ল বলিব।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

বৃদ্ধ। তুমি আজই আমাকে সে সব কথা বল। আমার বড় উৎকণ্ঠা জন্মিয়াছে।

যুবক। আমার দুঃখ-কাহিনী শুনিয়া, আপনার যে কি লাভ হইবে, জানি না। পাছে আপনার বিরক্তি জন্মে, ইহাই আমার ভয়।

বৃদ্ধ। না, না, সে কথা মনে করিও না। বিরক্তি জন্মিবে কেন? যখন আমার এত কৌতূহল, তখন বিরক্তি কখন মনোমধ্যে স্থান পাইবে না।

যুবক। দেখুন! প্রধানতঃ তিনটী কারণে আমি গৃহ ছাড়িয়াছি। ১ম,—আমার বিরুদ্ধে ডিক্রীজারি। তখন আমাদের অন্নাভাব হইয়া আসিয়াছে; একটী পয়সার জন্য আমি লালায়িত, সেই সময় তিন ব্যক্তি আমার নামে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার ডিক্রীজারি করিল।

বৃদ্ধ। কিসের ডিক্রী? কাহার নিকট কবে টাকা কর্জ্জ করিয়াছিলে? নালিস্ইবা কবে হইয়াছিল?

যুবক। আমি কস্মিন্ কালে কাহারও নিকট টাকা কর্জ্জ করি নাই। নালিস কবে হইয়াছিল, তাহাও জানি নাই। তবে যে দিন ঢোল-সহরৎ দিয়া নিলামী ইস্তাহার জারী হয়, সেই দিনই জানিলাম,—প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার আমি দেনাদার।

বৃদ্ধ। ব্যাপার কি বল দেখি,—ডিক্রীদার কে? কবে কি হেতু কত টাকা কাহার নিকট লইয়াছিলে! আরজীতে সেসব কথা কি ভাবে লেখা ছিল?

যুবক। প্রকৃত কথা খুলিয়া বলিতে গেলেই, পরনিন্দা-পাপে জড়িত হইতে হয়। তবে আপনার নিকট কোন কথা গোপন রাখিব না। সেই যে ভিক্ষা-পুত্রের দল,—গুরুপুত্রের দল, ভগ্নী-পতির দল,—সম্বন্ধীর দল,—ভায়রা-ভাইয়ের দল,—পিতার জীব-দ্দশায় আমাদের বাটী গুলজার করিয়া রাখিয়াছিল, তাহারাই এ সমস্তের মূলাধার। আমার নিজ নামে যে একটী মোকদ্দমা ছিল, তাহা হাণ্ডনোটে দশ হাজার টাকা লওয়ার দরুণ। বলা বাহুল্য, আমি কখন হাণ্ডনোটও কাটি নাই, দশ হাজার টাকাও লই নাই। বাকী দুইটী ডিক্রী ৺পিতা ঠাকুরের নামেই। পিতার মৃত্যুর পনর দিন পূর্ব্বে সে টাকার জন্য নালিস দায়ের হইয়াছিল।

বৃদ্ধ। তোমার পিতার সর্ব্বস্ব লইয়া তাহাদের তৃপ্তি হইল না। তাহার উপর তোমাদিগকে তাহারা এত কষ্ট দিতে উদ্যত হইল কেন? সহোদরা ভগিনীর পুত্রকে এরূপ কষ্ট দিবার জন্য তোমার মাতুলই বা এরূপ বদ্ধপরিকর হইলেন কেন? যাঁহারা তোমার পিতার খাইয়া মানুষ, তোমার পিতার অন্নে যাঁহারা সঙ্গতিপন্ন এবং সম্ভ্রান্ত হইয়াছেন, কেন বল দেখি,—তাঁহারা তোমার পিতার শত্রু হইলেন, তোমার শত্রু হইলেন?

যুবক। আপনি বিজ্ঞ বহুদর্শী—আপনি সংসার-তত্ত্বজ্ঞ, আপনাকে আমি বুঝাইয়া কি বলিব? লোক-চরিত্র আপনি আমা অপেক্ষা অবশ্যই ভাল জানেন।

বৃদ্ধ। এই ভগবানের সংসার-রহস্য আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তি কি বুঝিবে? কিসে কি হয়,—এমন অনেক বিষয় আছে, যাহার বিন্দুবিসর্গও আমি বুঝিতে পারি নাই। আমি যাহা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, সে সম্বন্ধে তুমি যাহা জান, আমাকে তাহা

বল ; তোমার মুখনিঃসৃত সে সকল কথা শুনিবার আমার বড় বাসনা জন্মিয়াছে।

যুবক। এই অল্প বয়সে বহুদর্শিতা দ্বারা, মূলতঃ আমি এই-টুকু বুঝিয়াছি,—যে যাহার ভাল করে, সে তাহারই মন্দ করে। সুধু আমাদের বাটীতে যে এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা নহে। আমি প্রায় নয় বৎসর কাল ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়াছি। প্রধান প্রধান নগরে এবং গ্রামে কখন কখন তিন চারি মাস পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিয়াছি। কিন্তু প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিয়াছি,—যে যাহার খাইয়া মানুষ,—অনেক সময় সে-ই তাহার পরম শত্রু। বিধাতার বিধি কেন যে এমন হইল, বলিতে পারি না। এ ত বিধি নয়,—এ যে অবিধি!

বৃদ্ধ। দেখিতেছি, অল্প মাত্রায় নাস্তিকতা তোমাতে প্রবেশ করিয়াছে। যে ব্যক্তি আমার খাইয়া মানুষ, সে-ই আমার শত্রু, ইহাই যদি বিধাতার বিধি হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, ইহা অবিধি নয়, সুবিধি। আমাদের মঙ্গলের জন্যই এইরূপ বিধি বদ্ধ হইয়াছে।

যুবক। এরূপ বিধি সুবিধি কিরূপে?

বৃদ্ধ। একটু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে ভাবিয়া দেখিলে, ইহার তত্ত্ব কতকটা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। প্রথম ধরিয়া লও,—মীমাংসা ঠিক করিয়া লও,—যে ব্যক্তি আমার খাইয়া মানুষ, সে-ই আমার শত্রু, ইহাই বিধাতার বিধি। তার পর ভাবো,—কেন এমন বিধি হইল? আচ্ছা,—ভাবিয়া দেখ দেখি, এ সংসার প্রকৃতই সমর-ক্ষেত্র কিনা? মহিষমর্দ্দিনী মাকে একবার স্মরণ কর দেখি। স্নেহময়ী,—সর্ব্ব-জীবে দয়াময়ী জগজ্জননী—মহিষাসুরকে সৃষ্টি করিলেন ; সেই

পুত্রই কিন্তু অসি-চর্ম্ম লইয়া উগ্র মূর্ত্তি ধরিয়া, মাকে কাটিতে উঠিল। শক্তিময়ী—মাতা,—পুত্রকে আশে-পাশে বন্ধন করিয়া, কেবল সুস্থির করিয়া রাখিলেন। তিনি জগৎকে দেখাইলেন—সংসারক্ষেত্রে অনন্ত সংগ্রাম পরস্পরে এইরূপই চলিতেছে!

যুবক। কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

বৃদ্ধ। বেটা! তুমি বুঝিতে পারিতেছ না। পুত্র হইয়া সে যখন মাতার শত্রু হইল, তখন অন্যে পরে কা কথা? যে তোমায় খাইয়া মানুষ, সে ত শত্রু হইবেই? জগৎকে উপদেশ দিবার জন্য স্বয়ং জগজ্জননী ইহার উদাহরণস্বরূপ হইয়াছেন। বুঝিতেছ কি?

যুবক। ভাল বুঝিতে পারিতেছি না। যে ব্যক্তি আমার খাইয়া মানুষ, সে ব্যক্তি আমার শত্রু—এ কথা না হয় ঠিকই হইল। কিন্তু এ বিধিকে সুবিধি বলিব কেমন করিয়া?—ইহা ত কুবিধি। যে পুত্র—জননীর স্তন্যদুগ্ধ-পানে পরিপুষ্ট, সেই পুত্র মাকে মারিতে উঠিবে, মায়াময়ীর এ কিরূপ মায়া বুঝিতে পারিলাম না।

বৃদ্ধ। কোনও জীব,—শত্রু, প্রতিপক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যতীত তিষ্ঠিতে পারে না। যাহার প্রতিদ্বন্দ্বী অনেক, শত্রু অনেক,—অথবা যাহার শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবল প্রতাপান্বিত, তাহারই অস্তিত্ব অধিকতর প্রস্ফুটিত হয়। রাবণ ছিল বলিয়াই, শ্রীরামচন্দ্রের অস্তিত্ব এরূপ পূর্ণ মাত্রায় প্রকটিত। দুর্য্যোধন ছিল বলিয়াই, আমরা ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে এরূপ পূর্ণমূর্ত্তিতে দেখিতে পাইলাম। কুকর্ম্মান্বিত দুর্ব্বৃত্ত ব্যক্তিগণ জগতে জন্মগ্রহণ করে বলিয়াই ধরাধামে অবতাররূপে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাই। বেটা! বল দেখি, অন্ততঃ এই হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বী বা শত্রু বাঞ্ছনীয় কি না?

যুবক। আমার জ্ঞান-বুদ্ধি অল্প, আপনি আরও একটু খুলিয়া বলুন।

বৃদ্ধ। আর একদিক্ দিয়া দেখ;—সম্মুখে প্রতিদ্বন্দ্বী বা শত্রু দাঁড়াইয়া না থাকিলে, তুমি কোনও কার্য্য সম্যক্‌রূপে সম্পন্ন করিতে সক্ষম হও না,—বা চেষ্টা কর না। মনে কর, তুমি একখানি গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছ। শত্রু সমালোচক তোমার সম্মুখে উপস্থিত;—তোমার তখন প্রাণপণ চেষ্টা হইবে, কিসে গ্রন্থ নির্ভুল হয়—শিক্ষাপ্রদ এবং সর্ব্বজন-প্রিয় হয়। সেই প্রাণান্ত চেষ্টার ফলে তোমার গ্রন্থ,—উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হইল। এক্ষেত্রে তোমার শত্রু,—তোমার হিতৈষী বন্ধু হইলেন।

যুবক। আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা সত্য। একটা খরাও দৃষ্টান্ত বলি। আমি কিছুদিন কলিকাতায় কোন স্কুলে পড়িয়াছিলাম;—বাঙ্গালা সাহিত্যে আমি আমাদের ক্লাসে অদ্বিতীয় ছিলাম। কোন ছেলেই বাঙ্গালা ভাষায় আমার সমকক্ষ ছিল না। আমি আমাকে দিগ্বিজয়ী মনে করিয়া, বাঙ্গালা ভাষা-চর্চ্চায় ক্রমশঃই অবহেলা করিতে লাগিলাম। বাঙ্গালা ভাষা যাহা শিখিয়াছিলাম, ক্রমশঃ কিছু কিছু ভুলিতে আরম্ভ করিলাম।—

বৃদ্ধ। তবেই দেখ, বাঙ্গালা-ভাষায় তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী বা শত্রু কেহ ছিল না বলিয়াই, বাঙ্গালা-ভাষায় ক্রমশঃ তোমার অবনতি হইতে লাগিল।

যুবক। সেই কথা ত আমিও বলিতেছি,—আমার এই অবনতিকালে, অন্য একটী স্কুল হইতে কোন একটী ছাত্র আসিয়া আমাদের ক্লাসে ভর্ত্তি হইল। সে ছাত্রটী বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন, এমন কি সে আমাকে ছাড়াইয়া উঠিতে চায়। তখন

আমার উৎসাহ দ্বিগুণ বাড়িল ; আমি বিশেষ পরিশ্রমপূর্ব্বক বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা পুনরারম্ভ করিলাম। আলস্য এবং আত্মম্ভরিতা আসিয়া আমাকে এতক্ষণ মাটি করিতেছিল ; প্রতিদ্বন্দ্বী আসিল বলিয়া, আমি আর মাটি হইলাম না, আমি যে মানুষ ছিলাম, তাহাই রহিয়া গেলাম

বৃদ্ধ। বেটা! এইবার এই সংগ্রামতত্ত্ব তুমি মোটামুটি কিছু বুঝিয়াছ,—দেখিতেছি। এ তত্ত্ব বড়ই কঠিন। স্থূলদৃষ্টিতে ইহার স্থূল উদাহরণ তুমি দেখিতে পাইয়াছ, সন্দেহ নাই। কিন্তু অতীব সূক্ষ্ম-সূক্ষ্মতম দৃষ্টি দ্বারা যদি তুমি দেখ, তাহা হইতে অতীব সূক্ষ্মতম উদাহরণসমূহ তোমার প্রত্যক্ষীভূত হইবে। এই অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডমধ্যে অনন্তকাল ধরিয়া অবিরত জীবে-জীবে, জড়ে-জীবে এবং জড়ে-জড়ে অনন্ত মহাসমর চলিয়াছে। এই মহাসমর ব্যতীত এই মহাবিশ্বের অস্তিত্ব থাকিত কিনা সন্দেহ।

যুবক। কিছু কিছু বুঝিলাম বটে, কিন্তু মনের সম্পূর্ণ সংশয় এখনও নিরাকৃত হইল না। সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝিবার আমি এখনও অধিকারী হই নাই। আমি—দুই একটী স্থূল কথা,—আমার মনের দুই একটী কথা,—আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে অভিলাষী হইয়াছি।

বৃদ্ধ। আচ্ছা বেটা! বল।

যুবক। আমার ত এতগুলি শত্রু-বিপক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী জুটিয়া আমাকে দেশছাড়া করিয়াছে! তবে কি ইহারা আমার হিতৈষী বন্ধু? যাহাদের জন্য আমি সর্ব্বস্বান্ত হইলাম, যাহাদের জন্য এই দগ্ধ উদরের নিমিত্ত দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইলাম, এই নয় বৎসর কাল ভারতবর্ষের নানা স্থানে বিচরণ করিলাম, নদ-নদী

পর্ব্বত অরণ্য উপত্যকা ভেদ করিয়া ভ্রমণ করিলাম, তাহারা আমার মিত্র হইল কিরূপে ?

বৃদ্ধ। (হাসিয়া) তাহারা তোমার পরম মিত্র! স্থূলভাবে ইহার উত্তর শুন,—বহুলোক সক্ করিয়া স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য বহু অর্থ-ব্যয়পূর্ব্বক অরণ্যময় পার্ব্বতীয় প্রদেশে মধ্যে মধ্যে বাস করিয়া থাকেন। লোকে যাহা চায় অথচ সহজে পায় না, তুমি তাহা অতি সহজে পাইলে, তাতে তোমার অলাভ কি ? তুমি ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থ দর্শন করিয়াছ, তোমা অপেক্ষা পুণ্যবান্ আর কে আছে ? তীর্থ-দর্শনের জন্য সদাই আমার বাসনা বলবতী। আমার অর্থের অভাব নাই। আজ দ্বাদশ বৎসর কাল, তীর্থ-দর্শনে বাহির হইব মনে করিয়া আসিতেছিলাম, কিন্তু এত চেষ্টা-সত্ত্বেও সম্প্রতি কয়েকটী তীর্থে মাত্র গমন করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। তারপর গৃহে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হই। আর তুমি অবলীলাক্রমে মনের আনন্দে পূর্ণ স্বাধীনভাবে, বন-বিহঙ্গের ন্যায়, ভারতবর্ষের সর্ব্বতীর্থ সন্দর্শন করিলে। তোমার কি সৌভাগ্য কম ? আরও দেখ, নয় বৎসর কাল ভারত ভ্রমণ করিয়া নানাজাতীয় লোকের সহিত মিশিয়া—তুমি কতদূর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছ, তোমার এই অভিজ্ঞতার মূল্য কত বল দেখি ? যে অভিজ্ঞতা গ্রন্থ-পাঠে হয় না, গুরু-উপদেশ শুনিয়া হয় না, তুমি সেই দুর্লভ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছ। তোমার এ অভিজ্ঞতার দাম পরার্দ্ধ মুদ্রা।

যুবক। (ঈষৎ মৃদু হাসিয়া) আমি খাইতে পাই না, পরার্দ্ধ টাকার অভিজ্ঞতাটুকু লইয়া কি করিব ?

বৃদ্ধ,—যুবকের পৃষ্ঠে আপন দক্ষিণ হস্ত স্থাপনপূর্ব্বক মৃদুমন্দ

আঘাত করিয়া কহিলেন,—"বেটা! তোমার আবার অন্নের ভাবনা কিসের? মা অন্নপূর্ণা,—তোমার জন্য স্বহস্তে বা তোমার সম্মুখে রাশি রাশি অন্ন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।"

যুবক। সে যাহা হউক, আমি ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়াছি সত্য, তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছি সত্য, কিন্তু সে ভ্রমণ কি ধনবান্ ব্যক্তির ভ্রমণের ন্যায় সুখ-সচ্ছন্দকর! দিন নাই, রাত নাই,—আমি পদব্রজে ভ্রমণ করিয়াছি,—বৃক্ষতলায় শয়ন করিয়াছি,—স্বয়ং পাক করিয়া খাইয়াছি,—ইহা আমার কষ্ট না সুখ?

বৃদ্ধ। একপক্ষে ইহা তোমার সুখ বৈ কি!

যুবক। সুখ কিরূপে হইল, বুঝাইয়া বলুন দেখি?

বৃদ্ধ। এককালে আমি মাথায় মোট করিয়াছি,—আট দশ ক্রোশ পথ প্রত্যহ ঘুরিয়া সহরময় ফিরি করিয়া জিনিষ বিক্রয় করিয়াছি। মোট মাথায় করিয়া কেবল পথ চলিয়া বেড়াইয়াছি বলিয়া, তখন আমার ত কোন কষ্ট হয় নাই। এই যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মোট মাথায় করিয়া মুটেগণ দিব্য ফূর্ত্তির সহিত হনহন করিয়া পথ চলিয়াছে! কষ্ট ইহাদের কোন খানে? কিসের উপর,—কোন্ পদার্থের উপর ইহাদের কষ্ট নিহিত?—মোট বহনের উপর, না পয়সা-অপ্রাপ্তির উপর? মুটে'র কষ্ট—মোট-বহনের জন্য নহে। মুটে'র কষ্ট হয়,—যদি সে মোট বহিয়া পয়সা না পায়।

একদা জ্যৈষ্ঠমাসে—নিদারুণ গ্রীষ্মকালে বেহারাগণ পাল্কী করিয়া আমাকে কোন এক স্থানে লইয়া গিয়াছিল। পথিমধ্যে এক বটবৃক্ষের তলায় তাহারা পাল্কী নামাইল। তাহাদের গা দিয়া অবিরল ঘাম বাহির হইতেছে। তাহারা একটু একটু হাঁপাই-

তেছে। ইহাতে কিন্তু তাহাদের ভ্রূক্ষেপও নাই। সর্দ্দার বেহারা রৌদ্রে আমার কষ্ট হইতেছে ভাবিয়া, পাল্কী হইতে পাখা বাহির করিয়া, আমায় বাতাস করিতে লাগিল। এস্থলে বেহারাগণ বহন-জনিত নিজের কষ্ট অনুভব করিয়াছিল কি? না,—তা করে নাই। তাহাদের কষ্ট হইত, যদি তাহারা আমাকে পরিতুষ্ট করিতে না পারিত। কারণ, আমার পরিতুষ্টিতেই তখন তাহাদের সুখ। এই সুখ অর্থে—পুরস্কার-প্রাপ্তি। বলিলে বিশ্বাস করিবে কিনা জানি না,—আরও একটা কথা বুঝ। আমার এখন কিন্তু গাড়ীতে চাড়্‌তেই কষ্ট বোধ হয়। আগে অনায়াসে পাঁচ ক্রোশ পথ মোট মাথায় করিয়া চলিয়া যাইতাম, এখন ত্রিতল হইতে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গাড়ীতে উঠিতে কষ্ট হয়। কেবল যে আমার বয়স হইয়াছে বলিয়া এই কষ্ট,—তাহা নহে। অভ্যাস খারাপ হইয়াছে বলিয়াই কষ্ট এত অধিক অনুভূত হয়। আমার পরিচিত একজন নবাব আছেন, তাঁহার কষ্টের অংশ ক্রমশঃ এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে, সিঁড়ি দিয়া নামিতেও তিনি অক্ষম; তাঁহার উপরে যাইবার ইচ্ছা হইলে, একখানি তঞ্জামের উপর তিনি বসেন, আটজন বেহারা সেই তঞ্জাম কাঁধে করে এবং সিঁড়ি দিয়া তঞ্জাম শুদ্ধ নবাবকে লইয়া দ্বিতলে উঠে। আমার একবার মনে হয়, হয় ত দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাকে একদিন ঐরূপ তঞ্জামে করিয়া দ্বিতলে উঠিতে হইবে। পদব্রজে গমন সৌভাগ্য, না গাড়ীতে চড়িয়া গমন সৌভাগ্য,—তাহা এখনও আমি ঠিক করিতে পারি নাই। আমার এখন এক প্রকার মনে হয়, যে ব্যক্তি পদব্রজে পথ চলিতে সক্ষম, সেই ব্যক্তি অধিক সৌভাগ্যশালী।

যুবক। আপনার অমৃতময়ী কথা শুনিয়া আমার প্রাণ পুলকিত হইতেছে।

বৃদ্ধ। আর একটা বিষয় ভাব দেখি। গাছতলায় শুইয়া শুইয়া তোমার শরীর কতদূর কষ্টসহিষ্ণু হইয়াছে! এই কষ্ট-সহিষ্ণুতার দামই কোটি টাকা। তুমি বলিতে পার, ধনী ব্যক্তির ন্যায় ভাল সামগ্রী এই নয় বৎসর কাল খাইতে পাই নাই। কিন্তু ভাল সামগ্রীর অর্থ কি? ভাল সামগ্রীর অর্থ,—ক্ষুধা। সে সময় মোটা আটার অর্দ্ধদগ্ধ রুটী তোমার অমৃতের ন্যায় তৃপ্তিকর বোধ হইয়াছিল কিনা,—বল দেখি? এই যে এখন ৬৪ রকম সুস্বাদু সামগ্রী আমার সম্মুখে আমার পত্নী প্রত্যহ দেবতাকে নৈবেদ্য দেখানর ন্যায় ধরিয়া থাকেন, তাহাত আমি খাইতে সক্ষম হই না। পাখীর ন্যায় একটু আধটু সামগ্রী যাহা মুখে দিই,—তাহাতেই আমার অসুখ হয়,—অম্বল হয়,—পেট কাঁপে,—মধুরার লাচ্ছেদা রাবড়ী এখন বিষবৎ বোধ হয়। অর্থ-উপার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে আমার আহারের ভোগ ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। আমি সুখী না দুঃখী। সত্য সত্যই এক একবার এখন আমার মনে হয়, আমি পূর্ব্বের ন্যায় মোট বহন করিতে যেন আবার সক্ষম হই। আবার যেন মোট বহন করিবার অধিকারী হই। আবার যেন মোটা আটার অর্দ্ধদগ্ধ রুটী অমৃতবৎ ভোজন করিতে সক্ষম হই। কিন্তু সে শুভদিন কি আর আসিবে? সুতরাং বেটা! উত্তমরূপ ভাবিয়া দেখ, ভারত-ভ্রমণে তোমার কোন কষ্ট হয় নাই; ভারত-ভ্রমণে তোমার কোন ক্ষতি হয় নাই। ভারত-ভ্রমণে তুমি অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছ। অতএব যাহারা তোমার

ভারত-ভ্রমণ ঘটাইয়াছেন, এক হিসাবে তাঁহারা তোমার শত্রু নহে, পরম মিত্র।

যুবক। আপনি যাহা বলিলেন, তাহা বুঝিলাম। আপনার যুক্তি তর্ক অখণ্ডনীয়। তবে এতদূর সূক্ষ্ম ভাবিয়া কেহ কাজ করে না। আর শত্রু দ্বারা যে শুভফল সংঘটিত হয়, তাহা বড় বিলম্বে। ধৈর্য্য ধরিয়া সে শুভফলের অপেক্ষা করা অনেকের পক্ষে অসম্ভব।

বৃদ্ধ। যে মানুষ ধৈর্য্য ধরিতে অক্ষম, সে মানুষ অধম মানুষ। "সবুরের বৃক্ষে মেওয়া ফলে"। ধৈর্য্যরূপ কল্পবৃক্ষে সুধা-ফল ফলে। ধৈর্য্য-ধারণ ভিন্ন মানুষের আর উপায় কি আছে? আঁটী পুঁতিলাম, আঁটীর শিকড় বাহির হইল কিনা, যদি ধৈর্য্য-হারা হইয়া প্রত্যহ মাটী খুঁড়িয়া দেখি, তাহা হইলে আঁটী সমূলে বিনষ্ট হয়। বালকই অধীর হইয়া এরূপ কর্ম্ম করিয়া থাকে। সে যাহা হউক, অবান্তর কথা বলিয়া অনেক সময় নষ্ট করিলাম। তোমার গৃহ-পরিত্যাগের কথা আনুপূর্ব্বিক আমার নিকট বর্ণন কর।

যুবক। আমি সমস্ত রাত্রি জাগিয়া সব কথা আপনাকে বলিতে সক্ষম। তিন দিন তিন রাত জাগিলে আমার কোন কষ্ট হয় না। আমার ভয়,—রাত জাগিলে, পাছে আপনার শরীর খারাপ হয়।

বৃদ্ধ। না, আমার শরীর খারাপ হইবার তত আশঙ্কা নাই। বেটা! আমিও একদিন তোমার মত সুস্থ সবল ছিলাম। কিন্তু যে দিন হইতে ধনশালী হইলাম, সেই দিন হইতেই অসুস্থতা এবং দৌর্ব্বল্য আমার দেহে আসিল। বল বেটা! তোমার পূর্ব্ব কথা শুনিতে আমার বড় বাসনা হইয়াছে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

যুবক। অধিক আর কি বলিব? পিতার নামে যে প্রায় চল্লিশ হাজার টাকার ডিক্রী ছিল, সেই ডিক্রীর মধ্যে কুড়ি হাজার টাকায় আমাদের বসতবাটী বিক্রয় হইল। বাকী কুড়ি হাজার টাকা দেনা রহিয়া গেল। অথচ, এই বসতবাটী প্রস্তুত করাইতে পিতার পাঁচ লাখ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

বৃদ্ধ। তোমাদের এই বসতবাটী কে খরিদ করিল?

যুবক। কে খরিদ করিল তাহা জানি না,—তবে শুনিয়াছিলাম, পিসে মহাশয় বেনামীতে খরিদ করিয়াছেন।

বৃদ্ধ। কাহার কাহার ষড়যন্ত্রে তোমার নামে জাল হাণ্ডনোট তৈয়ার হইয়াছিল?

যুবক। ঠিক্ জানি না, তবে শুনিতে পাই, এ ষড়যন্ত্রে,—মায়ের একজন প্রিয়তম ভিক্ষাপুত্র,—স্বয়ং মাতুল এবং আমাদের গ্রামের আরও কয়েকজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি ছিলেন। আমি ভাবিতাম, আমার উপর ইঁহাদের কেন এত আক্রোশ হইল? আমি ত কাহারও মন্দ করি নাই! অধিকন্তু পিতাঠাকুর মহাশয় জীবদ্দশায় ঐ সকল লোকের ভাল করিয়া গিয়াছেন। তাই চিন্তা করিতাম,—কেন এমন হইল? কি অপরাধে এরূপ শত্রুদলের আবির্ভাব হইল?

বৃদ্ধ। শত্রু,—বিধাতার সৃষ্টি,—শত্রুর কার্য্য বিধাতার বিধান।

যুবক। আপনার কথাই যথার্থ। এ সংসারে একটী বড় মজা দেখিলাম। পিতা যাঁহার-যাঁহার উপকার করিয়া

ছেন, তাঁহারাই পিতার অধিকতর অপকার করিয়া আসিতেছেন। পিতা যাঁহাদিগকে খাওয়াইয়া পরাইয়া মানুষ করিয়াছেন, সহস্র সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া বিবাহ দিয়াছেন,—বেতন দিয়া স্কুলে বহুদিন পড়াইয়াছেন,—নিজের জমিদারীতে বা আড়তে বা সুপারিশ করিয়া অন্তের নিকট, যাঁহাদের চাকুরী করিয়া দিয়াছেন,—তাঁহারাই আমার উপর এখন বিশেষ বিরূপ,—তাঁহারাই সর্ব্বাগ্রে এখন আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া থাকেন,—তাঁহারাই প্রকাশ্যতঃ এখন আমার এবং পিতার সুবিধা পাইলে নিন্দা করিয়া থাকেন। তাই বলিতেছিলাম,—এই একটী বড় মজা দেখিলাম।

বৃদ্ধ। মজা কিছুই নাই, এ সব ত ধরা কথা। ইহাই ত বিধাতার বিধি। এতক্ষণ ত ইহাই তোমাকে বুঝাইয়া আসিতেছিলাম।

যুবক। আমি আপনার সে কথায় প্রতিবাদ করি নাই; কেবল এই মাত্র বলিতেছিলাম, ব্যাপার বড় মজার।

বৃদ্ধ। ব্যাপার যে বিচিত্র এবং রহস্যপূর্ণ, তৎপক্ষে কোন সন্দেহ নাই! ভগবানের ত সমস্ত কার্য্যই ঐরূপ। এই যে দিবসে সূর্য্য উঠে—রাত্রে চন্দ্র উঠে,—এই যে ক্রমশঃ এক ঋতু পরিবর্ত্তন হইয়া অন্য ঋতু আসে, বিশ্বস্রষ্টার রাজ্যে এ অপেক্ষা বিচিত্র ব্যাপার কি আছে?

যুবক। (হাসিয়া) মজা দেখুন,—পিতার জীবদ্দশায় প্রতিবেশী কোন ব্যক্তির সংসার একান্ত অচল ছিল। পিতার নিকট হইতে দুই একটী টাকা ভিক্ষা করিয়া লইয়া না গেলে, তাঁহার চাল, ডাল, নুণ, তেল কেনা হইত না; অথচ সেই ব্যক্তি,—অবশ্য গোপনে—পিতার সদাই নিন্দা করিয়া বেড়াইতেন।

বৃদ্ধ। তোমার পিতা হঠাৎ বড় মানুষ হইয়াছিলেন; কাজেই প্রতিবেশিমণ্ডলীর চক্ষু টাটাইয়াছিল। তোমার পিতা দান, ধ্যান যতই অধিক করিতে লাগিলেন, অন্য লোকের হিংসা ততই অধিক বাড়িতে লাগিল। কোন কোন প্রতিবেশী হয়ত এমনও মনে করিল,—কেন এ ব্যক্তি হঠাৎ বড় মানুষ হইল? আমি পূর্ব্বের ন্যায় দরিদ্রই বা রহিলাম কেন? একটী পয়সার জন্য লালায়িত হইয়া আমাকেই বা ইহার দ্বারস্থ হইতে হয় কেন? আমিও মানুষ, উনিও মানুষ। যে স্থানে উহাঁর বাস,—সে স্থানে আমারও বাস; যে পাঠশালে উনি পড়িয়াছেন, সে পাঠশালে আমিও পড়িয়াছি;—এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে প্রতিবেশিমণ্ডলী তোমার পিতার উপর ক্রোধোন্মত্ত হইয়া যে মারিতে উঠে নাই, ইহাই বিচিত্র। পর-নিন্দার মত মুখরোচক সামগ্রী সংসারে আর কিছুই নাই। পর-নিন্দাকার্য্য যেরূপ সহজে সুসম্পন্ন হয়, সেরূপ সহজে সুসম্পন্ন অন্য কোন কার্য্য হয় কিনা,—জানি না। সে যাহা হউক, আবার বাস্তর কথা আসিয়া পড়িয়াছে। তুমি দেশছাড়া কেন হইলে বল?

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

যুবক। আমার নিজ নামে যে দশ হাজার টাকা ডিক্রী হইয়াছিল, সে ডিক্রীর টাকা অবশ্যই আমি দিতে পারি নাই এবং আমার নামে কোনও বিষয় সম্পত্তি ছিল না। শত্রুগণ আমার নামে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা বাহির করিল। এই সময় আমার নামে আরও একটী গুরুতর ফৌজদারী মোকদ্দমা রুজু হইল।

বৃদ্ধ। ফৌজদারী মোকদ্দমা কিরূপ?

যুবক। সে কথা বলিতে আমার বড় লজ্জা বোধ হয়!

বৃদ্ধ। বেটা! আমার সাক্ষাতে বলিলে কোন দোষ হইবে না;—বল।

যুবক। আমি কোন পঞ্চদশবর্ষীয়া বালিকার সতীত্ব নষ্ট করিয়াছি,—এই গুরুতর অভিযোগে আমি অভিযুক্ত হইয়াছিলাম। একজন ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট আমার উপর গ্রেপ্তারী পরওয়ানা বাহির করিলেন।

বৃদ্ধ। তার পর!

যুবক। আমার নিজ গ্রামে এবং অন্যান্য গ্রামে আমার শত্রুদল রটাইতে লাগিল,—আমার মত মন্দ-চরিত্রের লোক আর এ পৃথিবীতে নাই। আমার ধোপা নাপিত বন্ধ করিবার পরামর্শ চারিদিকে হইতে লাগিল। হাতে একটী পয়সা ছিল না! মুদী উঠ্‌না বন্ধ করিয়া দিল। গোয়ালিনী আমার কন্যা লক্ষ্মীর দুধ দিতে আর আসিল না। আতপ তণ্ডুলের নৈবেদ্য আর পাইবেন না, ভাবিয়া পুরুত-ঠাকুরও আমার বাটীর ত্রিসীমা আর মাড়াইলেন না। একদিন স্ত্রীর চক্ষে জল দেখিলাম; রঘুদয়াল দাদার ছল-ছল নয়ন দেখিলাম; শেষে একদিন সেই তেজস্বিনী, সেই গম্ভীর-প্রকৃতিময়ী জননীরও দীর্ঘনিশ্বাস দেখিলাম! আমি কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া—কোন উপায়ই স্থির করিতে না পারিয়া,—কাহাকেও কিছু না বলিয়া গৃহপরিত্যাগপূর্ব্বক একদিন গভীর নিশীথে পলাইলাম। আত্মহত্যার ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা করিলাম না। সে কাপুরুষের কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি হইল না। ভগবান্ যদি শুভদিন দেন,—যদি অর্থ উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হই,

যদি জননীর দুঃখ দূর করিতে পারি, তাহা হইলে দেশে ফিরিব, নচেৎ এই পর্য্যন্ত!

বৃদ্ধ। এরূপ ভাবে পলায়ন ত কাপুরুষের কার্য্য!

যুবক! কতকটা তাই বটে। কিন্তু পলায়ন ভিন্ন কোন উপায়ই ছিল না।

বৃদ্ধ। স্নেহময়ী বিধবা মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া, পতিপ্রাণা প্রিয়তমা ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিয়া, সেই স্নেহের সার-স্বরূপিণী কন্যাকে পরিত্যাগ করিয়া, তাহাদিগকে অন্নকষ্টরূপ দাবানলে দগ্ধ হইতে দেখিয়া, ওরূপ ভাবে পলায়ন করা কি উপযুক্ত যুবক পুত্রের কার্য্য হইয়াছে?

যুবক! অনেকরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি পলাইয়াছিলাম। শত্রুদলের আমি চক্ষুঃশূল হইয়াছিলাম। পাছে আমি নষ্ট বিষয়-সমূহ উদ্ধারের চেষ্টা করি, তাহাদের ইহাই ভয় হইয়াছিল। সেই জন্যই তাহারা আমার বধ বা বন্ধনের চেষ্টা করিতেছিল। আমি ভাবিলাম, আমি যদি এখান হইতে চলিয়া যাই, তাহা হইলে বোধ হয়, সব লেঠা মিটিতে পারে। আমি নিরুদ্দিষ্ট হইয়া চলিয়া গেলে, মাতুল বা পিসে মহাশয়ের আহ্লাদ হওয়া সম্ভব। আমার অনুপস্থিতিতে তাঁহারা হয়ত অর্থ-সাহায্যে জননীর অন্নকষ্ট দূর করিতে পারেন। আর আমি পলাইয়া গেলে, আমার উপর যে ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাও শত্রুগণ চালাইতে ক্ষান্ত হইতে পারে। আর আমাকে যে দেওয়ানী জেলে দিবার চেষ্টা হইতেছিল, সে চেষ্টাও তাহারা না করিতে পারে। পাপ বিদায় হইলে শত্রুগণের রাগ পড়িবার—সম্ভাবনা,—ইহা ভাবিয়া, আমি গৃহ হইতে পলায়ন করিয়াছিলাম।

বৃদ্ধ। কি করিয়া বুঝিলে যে, তোমার পিসে বা মাতুল তোমার মাকে খাইতে দিবেন?

যুবক। কতকটা ঐরূপই বুঝিয়াছিলাম। আরও ভাবিয়াছিলাম যে, একান্তই যদি তাঁহারা মাকে খাইতে না দেন,—তাহা হইলে আমাদের গৃহে তৈজস-পত্র বস্ত্রাদি আছে, তাহা বিক্রয় করিয়া খাইলেও, দুই তিন বৎসর স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতে পারিবে।

বৃদ্ধ। তুমি জ্যেষ্ঠ পুত্র, গৃহের অভিভাবক স্বরূপ, তোমার পলায়ন করা কি কখন সঙ্গত হইতে পারে?

যুবক বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকাইলেন; ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে কহিলেন,—"আমি জ্যেষ্ঠপুত্র নহি,—রঘুদয়াল-দাদা মায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁহারই অভিভাবকত্বে জননী, সহধর্ম্মিণী, কন্যা এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে রাখিয়া আসিয়াছিলাম।"

বৃদ্ধ। তোমার রঘুদয়াল-দাদাকে এতটা বিশ্বাস করা চলে কি?

যুবক। চলে;—যদি পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে আসিয়া উদয় হন, তথাচ রঘুদয়াল-দাদা কর্ত্তব্য পথ হইতে বিচ্যুত হইবেন না।

বৃদ্ধ। তবে পলাইয়া আসিয়া নিতান্ত মন্দ কাজ কর নাই।

যুবক। আর যদি পাঁচ সাত দিন আমি দেশে থাকিতাম, তাহা হইলে হাজতে লইয়া গিয়া আমাকে শত্রুগণ পুরিত। দেওয়ানী জেল এবং ফৌজদারী জেল এই উভয় জেলেই আমাকে পচিতে হইত। মাতা কাঁদিয়া কাঁদিয়া অন্ধ হইতেন; এখনও নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছি বলিয়া মাতা কাঁদিবেন বটে, কিন্তু অন্ধ হইবেন না। আমার জননী তেজস্বিনী—এবং বুদ্ধিমতী। কেন যে নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছি. তিনি অবশ্যই ইহার কারণ বুঝিতে পারিবেন এবং

আমার পলায়নই যে এ ক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত, ইহা ভাবিয়া মাতা কতকটা সুস্থ থাকিতে পারিবেন। কিন্তু সতী নারীর সতীত্বহরণ-অপরাধে যদি আমি জেলে যাই,—নির্ম্মল বংশে কলঙ্ক-কালিমা লেপন হইল ভাবিয়া জননীর নয়ন-জলের তখন আর বিরাম থাকিবে না।

বৃদ্ধ। তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা ঠিক।

বৃদ্ধ এইবার ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন, রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে; যুবককে কহিলেন, রাত্রি অধিক হইয়াছে, আজ এই পর্য্যন্ত থাক্। আরও অনেক কথা শুনিবার আছে, অন্য সময় তাহা শুনিব। উভয়ে গাত্রোত্থান করিলেন,—গাড়ীতে চড়িলেন, বাগানবাটী হইতে ঘরে আসিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

শয়ন করিতে যত অধিক রাত্রি হউক না কেন, দীনদয়াল বেলায় কখন উঠেন নাই; সেই অতি প্রত্যুষে উঠাই তাঁহার অভ্যাস ছিল। কিন্তু অদ্য বেলা এক প্রহর হইল,—দীনদয়াল তখনও শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন না। রাষ্ট্র হইল,—"গত কল্য অতিরিক্ত রাত্রি-জাগরণ জন্য তাঁহার অসুখ বোধ হইয়াছে—তাঁহার মাথা ধরিয়াছে। অদ্য তিনি আর বাহিরে আসিয়া গদিতে বসিবেন না।" দীনদয়ালের আধ-কপালে রোগ ছিল। তন্নিবন্ধন তাঁহার অদ্য মাথা ধরে নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার অদ্য যেরূপ যন্ত্রণা উপস্থিত, তাহা মাথা ধরা অপেক্ষা অধিকতর ব্যথাদায়ক। তাঁহার মুখ-কমল বিশুষ্ক, তিনি আজ সর্ব্বদাই যেন অন্যমনস্ক; ডাকিলে তিনি সহজে আর কাহাকেও উত্তর দেন না। স্ত্রী-পুত্র পৌত্র

প্রভৃতি সকলকে কহিলেন,—"আমার সহিত অদ্য কেহ যেন কথা না কহে। আমার মাথার বড় ব্যথা হইয়াছে। আমি একটু ঘুমাইব। সুনিদ্রা হইলে এ ব্যাধি দূর হইবে।"

ত্রিতলে নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে দীনদয়ালের শয্যা প্রস্তুত হইল। দীনদয়াল তথায় গিয়া শয়ন করিলেন। ত্রিতলে উঠা অন্যের পক্ষে একবারে নিষেধ হইল।

শয্যায় শয়ন করিবামাত্র দীনদয়াল কি ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন? না শয্যায় অল্পক্ষণ মাত্র শুইয়া থাকিয়া দীনদয়াল উঠিয়া বসিলেন। দীনদয়াল শুইবার জন্য—ঘুমাইবার জন্য এই নিভৃত-কক্ষে আসেন নাই, তিনি জাগিবার জন্য—ভাবিবার জন্য আসিয়াছিলেন। নির্ব্বিঘ্নে স্বচ্ছন্দে নির্ব্বিবাদে ভাবিতে পারিবেন বলিয়াই, তিনি নির্জ্জনে বাসোপযোগী একটী গৃহ নির্দ্দিষ্ট করিতে বলিয়াছিলেন।

দীনদয়ালের এত ভাবনা কিসের? অমরসিংহের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া, দীনদয়াল যেরূপ চমকিত হইয়াছেন—সম্মুখে শত বজ্র এককালে পতিত হইলেও, তিনি তত চমকিত হইতেন না। গত-কল্য নিশীথে বাগান-বাটীতে অমরসিংহ যখন আত্মকাহিনী কীর্ত্তন করেন, তখন দীনদয়াল মাঝে মাঝে, থাকিয়া-থাকিয়া কেমন যেন কাঁপিয়া-কাঁপিয়া উঠিয়াছিলেন। এরূপ কম্পনই বা কেন?

দীনদয়াল আজিও কি একটু-আধটু কাঁপিতেছেন না? বল দীনদয়াল! কি হইয়াছে? কেন তোমার হঠাৎ এত মনোবিকার উপস্থিত হইল?

দীনদয়াল ভাবিতে লাগিলেন,—"আমি জাগিয়া আছি, না ঘুমাইতেছি? না ঘুমাইয়া-ঘুমাইয়া স্বপন দেখিতেছি। এরূপ

অঘটনঘটনা যে সত্যসত্যই ঘটিবে, তাহা কখন মনে ছিল না। অথবা ইহা বুঝি মায়া-মরীচিকা!

"ওঃ! আমার সেই রক্ষক,—সেই আশ্রয়দাতা, পরম সুহৃদ্ ৺শঙ্করীপ্রসাদের পুত্র ভবানীপ্রসাদকে আজ দেখিতে পাইব, এ জীবনে আমার অদৃষ্টে যে সে সুখ লেখা আছে, তাহা আমার মনে ছিল না। ভাই শঙ্করীপ্রসাদ! তুমি স্বর্গে গিয়াছ; তোমার ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী পুত্রের আজ মুখচন্দ্র দেখিয়া আমার বুক জুড়াইল! আজ বিধির বিপাকে ভবানীপ্রসাদ আপন কর্ম্মফল ভোগ করিতেছে। নানারূপ কর্ম্মজালে নিপতিত হইয়াছে! কিন্তু অতি শুভদিন শীঘ্র আসিবে, ভয় নাই!"

পাঠক! কিছু কিছু বুঝিতেছেন কি? নরহত্যা-অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া, যে ব্রাহ্মণ হাজত-গৃহ হইতে পলাইয়া আসিয়া, শঙ্করীপ্রসাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন, এই হিন্দুস্থানী দীনদয়ালই সেই বাঙ্গালী-ব্রাহ্মণ। দুই সহস্র লোক ভেদ করিয়া ইঁহাকে পৃষ্ঠদেশে স্থাপনপূর্ব্বক, সেই মহাবীর রঘুদয়াল দ্রুতপদে পলাইয়া, —ইঁহারই প্রাণরক্ষা করেন, বুঝিতেছেন ত?

দীনদয়ালের ইতিহাস বিচিত্র। ইঁহার প্রকৃত নাম,—পিতাম্বর ভট্টাচার্য্য। ইঁহার পিতৃ-পিতামহ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ছিলেন। পীতাম্বর এখন বিষয়ী এবং পণ্ডিত। পীতাম্বর ছদ্মবেশে সাত বৎসর কাল ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেন। অধিকাংশ সময় তিনি সন্ন্যাসীর বেশে যাপন করিতেন। তিনি পলাতক খুনী আসামী বলিয়া, ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক নগরে তাঁহার নামে হুলিয়া হইয়াছিল। তাঁহাকে ধরিবার জন্য হুগলি জেলার পুলিশ ও ম্যাজিষ্টরের বড় জেদ ছিল। দুই বৎসর পরে ম্যাজিষ্টর সে জেলা

হইতে বদলী হইয়া গেলেন, পুলিশ সাহেবও স্থানান্তরিত হইলেন, পীতাম্বরকে ধরিবার চেষ্টা কম হইয়া আসিল। অষ্টম বর্ষে তিনি কাশীধামে আসিয়া অবস্থিতি করিলেন। এখানে পীতাম্বর নাম পরিত্যাগপূর্ব্বক দীনদয়াল নাম গ্রহণ করিলেন। তারপর অঙ্কুর হইতে কিরূপে যে বট বৃক্ষ জন্মিল,—ফেরীকর মোটবাহক দীনদয়াল কিরূপে যে কোটিপতি হইলেন, তাহা পাঠক জানেন।

ভারত-ভ্রমণকালে পীতাম্বর এক সদ্‌গুরু পাইয়াছিলেন। এই সদ্‌গুরুর আদেশেই তিনি কাশীধামে আগমন করেন এবং সন্ন্যাসি-বেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক দীন-দরিদ্রের বেশ ধারণ করেন। গুরু বলিয়া দিয়াছিলেন,—"সন্ন্যাসী হইবার তুমি অধিকারী হও নাই; তুমি সংসারী হও,—ব্যবসা-বাণিজ্যে মনোযোগ দাও, তোমার ভাল হইবে।" পীতাম্বর গুরুর নিকট বলিয়াছিলেন,—"গুরুদেব! ব্যবসা করিতে আদেশ করিতেছেন, কিন্তু আমার মূলধন কোথায়? আমি ভিক্ষা করিয়া উদরান্নের সংস্থান করি, আমার নিকট এক কপর্দ্দকও নাই" গুরুদেব আদেশ দেন,—"ব্যবসায়ে অর্থরূপ মূলধনের আবশ্যকতা নাই। সততা, সরলতা, এবং সত্য কথা,—ব্যবসায়ের একমাত্র মূলধন। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, ৺কাশীধামে গিয়া তুমি ব্যবসায় আরম্ভ কর, তোমার অর্থ-লালসা পূর্ণ পরিতৃপ্ত না হউক, কতকটা উপশমিত হইবার সম্ভাবনা।" সেই সত্য-ধর্ম্মরূপ মূলধন পাইয়া, দীনদয়াল ব্যবসায়ে যে কিরূপ লাভবান্ হন, তাহা তাঁহার ইতিহাসে পরিকীর্ত্তিত।

দীনদয়াল ভাবিতে লাগিলেন,—"আমি যে সেই খুনী আসামী

—আমি যে ছদ্মবেশী বাঙ্গালী, তাহা ভবানীপ্রসাদকে এখন বলা হইবে না। তাঁহার পিতা যে আমার রক্ষক এবং আশ্রয়-দাতা,—তাঁহার পিতা না থাকিলে, আমি যে, এতদিন ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলিতাম, এ সব কথা এখন ভবানীপ্রসাদকে বলিয়া কোন ফল নাই,—কোন লাভও নাই। বিশেষতঃ আমার প্রকৃত ইতিহাস যত গুপ্ত থাকে, ততই ভাল। ভবানীপ্রসাদও পলাতক আসামী, উহারও নামে ওয়ারেণ্ট আছে। ভবানীপ্রসাদ যেরূপ ছদ্মবেশী-হিন্দুস্থানী আছে, তাহাই এখন থাকুক। যাহাতে বাঙ্গালী বলিয়া, উহাকে চিনিতে কেহ না পারে, এখন এইরূপ ভাবেই ভবানীপ্রসাদ ৺কাশীধামে কালাতিবাহিত করুক। ভবানীপ্রসাদ, পাপ বঙ্গদেশ হইতে তাঁহার জননী, ভ্রাতা, স্ত্রী, কন্যা এবং রঘুদয়ালকে কাশীধামে লইয়া আসুক। যত টাকা লাগে আমি দিতেছি। যে ভবানীপ্রসাদ নিজের প্রাণের মায়া না করিয়া, গঙ্গাজলে ঝাঁপ দিয়া, আমার পৌত্রকে উদ্ধার করিয়াছিল, ডাকাত-দল কর্তৃক আক্রান্ত হইলে, যে ভবানীপ্রসাদ অব্যর্থ সন্ধানে গুলি নিক্ষেপ করিয়া, ডাকাতদলকে প্রমথনপূর্ব্বক, আমাদের সকলকে রক্ষা করিয়াছিল,—সে ভবানীপ্রসাদকে আমার অদেয় কিছুই নাই। আমি তাহাকে সর্ব্বস্ব দান করিতে পারি।

"প্রাণ রক্ষার পুরস্কার বলিয়া আপাততঃ ভবানীপ্রসাদের হাতে আমি একলক্ষ টাকা প্রদান করিব। যদি বেশী আবশ্যক হয়, তবে তাহাও দিব। ভবানীপ্রসাদ দেশে গিয়া আত্মীয় স্বজনকে লইয়া আসুক।"

এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া, দীনদয়াল,—ভবানীপ্রসাদকে ত্রিতলের নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে ডাকাইলেন; বলিলেন,—"বেটা! এই ঘর

বৎসর কাল তুমি ত ভারত ভ্রমণ করিয়াছিলে,—বলিয়াছ; তোমার স্ত্রী-কন্যা-মাতার সংবাদ ঐ সময় মধ্যে রাখিয়াছিলে কি ?

ভবানী। না,—গ্রামে ডাকে আমার পত্র লিখিবার যো ছিল না। আমার পত্র,—শত্রুগণ খুলিয়া পড়িত। বিশেষ, আমার ঠিকানা যদি মাতাঠাকুরাণী পাইতেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ আমার অনুসন্ধানে লোক পাঠাইতেন। আর এক কথা,—আমার প্রতিজ্ঞা ছিল, প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে সক্ষম না হইলে, আমি আর গৃহে প্রবেশ করিব না। এই সকল নানা কারণে পত্রও লিখি নাই, সংবাদও লই নাই।

দীনদয়াল। আচ্ছা, আমি তোমাকে একলক্ষ টাকা দিতেছি। তুমি এই টাকা লইয়া গৃহে যাও; তোমার নামে এবং তোমার পিতার নামে যে সকল মিথ্যা ডিক্রীজারী হইয়াছে, সেই ডিক্রীদার-গণকে ভয় মৈত্র দেখাইয়া, অথবা আবশ্যক বুঝিলে কিছু কিছু নগদ টাকা দিয়া, তাহাদের সহিত রফা করিয়া ফেলিবে। আর সতীত্বহরণ-জনিত যে মিথ্যা ফৌজদারী মোকদ্দমা তোমার নামে হইয়াছিল, নয় বৎসর পরে সে মোকদ্দমা আদালতে উঠিবার সম্ভাবনা খুব কম। হয়ত সে মোকদ্দমার ফরিয়াদী মরিয়া গিয়া থাকিবে। ফরিয়াদী যদি জীবিতই থাকে, তাহা হইলে অর্থদানে তাহাকে পরিতুষ্ট করিতে পারো। এ সংসারে অর্থই প্রায় সর্ব্ব-রোগ দূরীকরণের মহৌষধ। তুমি লক্ষ টাকা সঙ্গে করিয়া স্বগ্রামে আসিয়াছ, এ কথা যদি প্রচার হয়, তাহা হইলে তোমার কেহই আর আপাততঃ বাহ্যতঃ বিরুদ্ধাচরণ করিতে সক্ষম হইবে না। অতএব বেটা! তুমি লক্ষ টাকা লও, গৃহে গমন কর এবং তোমার জননী প্রভৃতিকে ৺কাশীধামে লইয়া আইস।

ভবানী। (যোড় হাতে) প্রভো! আমাকে ক্ষমা করিবেন। আপনার নিকট হইতে টাকা আমি লইব না। নিজে উপার্জ্জনক্ষম হইয়া, যে অর্থ সংগ্রহ করিব, সেই টাকাই আমার নিজস্ব টাকা। আপনার প্রদত্ত টাকা,—দান মাত্র,—ভিক্ষালব্ধ অর্থ মাত্র।

দীনদয়াল। আমার প্রদত্ত এই টাকা তোমার প্রাপ্য। আমি তোমাকে দানও করিতেছি না, ভিক্ষাও দিতেছি না; তোমার পাইবার অধিকার আছে বলিয়াই, তোমাকে লক্ষ টাকা দিতেছি। শুধু এই লক্ষ টাকা নয়, তোমার আরও অনেক টাকা পাওনা আছে। আমার সহধর্ম্মিণী, আমার পুত্রবধূ,—তোমাকে আরও অনেক টাকা, অলঙ্কার এবং সম্পত্তি পুরস্কার দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

ভবানী। আমার কোন্ অপরাধে,—প্রভু! আপনি আমার প্রতি এরূপ গর্হিতাচরণ করিতেছেন?

দীনদয়াল। বেটা! তোমার অপরাধ অনেক। তোমার প্রথম অপরাধ,—তুমি আমার পৌত্রের প্রাণ দান দিয়াছ। তোমার দ্বিতীয় অপরাধ,—ডাকাতগণের হস্ত হইতে তুমি আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছ। তোমার তৃতীয় অপরাধ,—বড় গুরুতর অপরাধ। আমার পুত্র হরগোবিন্দের ন্যায় আমি তোমাকে ভাল বাসিয়াছি তোমার চতুর্থ অপরাধ!—থাক্;—সে অপরাধের কথা আজ এখন আর বলিব না। এই সকল নানা অপরাধের নিমিত্ত তোমাকে আপাততঃ যৎকিঞ্চিৎ পুরস্কারস্বরূপ লক্ষ টাকা দিলাম। ইহা তোমার উপযুক্ত পুরস্কার নহে, ইহা পুরস্কারের কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র। দেখ, এই দশ হাজার টাকা করিয়া দশখানি হুণ্ডী তোমাকে

দিতেছি, গ্রহণ কর। আমার কলিকাতার গদিতে তুমি এই হুণ্ডী-গুলি দিলেই নগদ টাকা পাইবে। ইহা ব্যতীত, তোমাকে আরও আড়াই শত টাকা নোটে ও নগদে দিতেছি। ইহা তোমার পথ-খরচ স্বরূপ হইবে।

ভবানীপ্রসাদ নতজানু হইয়া, দীনদয়ালের পদপ্রান্তে উপবেশন-পূর্ব্বক, যোড়হাতে কহিলেন,—"দয়াময় প্রভু! এই দীন দুঃখীকে ক্ষমা করিবেন। মানুষ বড় লোভী জাতি; দয়া করিয়া আমার লোভ বাড়াইবার চেষ্টা করিবেন না। আমার উপর যদি আপনার স্নেহবাৎসল্য জন্মিয়া থাকে,—আমাকে যদি আপনি পুত্রের ন্যায় ভাল বাসিয়া থাকেন,—তাহা হইলে আমার এই একমাত্র কাতর-প্রার্থনা,—আমার লোভ বাড়াইবেন না,—আমাকে পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন করিবেন না।

দীনদয়াল। বেটা ক্ষান্ত হও! তোমার কথা যে বড় কঠিন কথা দেখিতেছি। আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, পুরস্কার-স্বরূপ এই টাকা লইলে, তুমি পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন হইবে কিরূপে?

ভবানী। আমার এই ভারত-ভ্রমণকালে অনেক সাধু-সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। একজন সন্ন্যাসী আমাকে উপদেশ দিয়াছিলেন,—সংসারে যদি সুখী হইতে চাও, তবে লোভ পরি-ত্যাগ করিও। যে কার্য্য করিবে, সেই কার্য্যের নিমিত্তই সেই কার্য্য করিবে; লোভপরবশ হইয়া করিবে না। আপনার পৌত্র গঙ্গাজলে যখন নিমগ্ন হয়, তখন আমিও গঙ্গায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়া, আপনার পৌত্রকে কেবল উদ্ধারের নিমিত্তই উদ্ধারার্থ চেষ্টা করি; লোভপরবশ হইয়া পুরস্কার প্রাপ্তির আশায়—গঙ্গায় ঝাঁপ দিই নাই। বজরায় যখন ডাকাত পড়ে, তখন কেবল আপনাদিগকে

রক্ষার নিমিত্তই আমি বন্দুক ধরিয়া ডাকাতদলের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাম। পুরস্কার-প্রাপ্তির আশায় করি নাই।

বৃদ্ধ। (হাসিয়া) তোমার সন্ন্যাসীর উপদেশে কোন নূতন কথা নাই। গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রে নিষ্কাম ধর্ম্মের কথা ঐরূপই কতকটা লিপিবদ্ধ আছে; কিন্তু শাস্ত্রের এত কথা পালন করিতে হইলে, সংসার অচল হয়।

ভবানী। দেব! এই কি আপনার অপত্য-স্নেহ! এই সংসারভীত-শুষ্ক ব্যক্তিকে আর উপহাস করিবেন না,—আর বঞ্চনা করিবেন না। আমি অতি দরিদ্র ব্যক্তি; আমার সম্বল কিছুই নাই। আমার যথাসর্ব্বস্ব অপহৃত, বিলুণ্ঠিত; আমার এখন একমাত্র সম্বল,—এই ধর্ম্মটুকু। আপনি পিতৃস্থানীয় হইয়া যদি আমার এই অমূল্য ধর্ম্মনিধিটুকু কাড়িয়া লইতে চাহেন, তাহা হইলে অগ্রে আমার গলায় ছুরি দিন,—প্রাণ থাকিতে আমার এই ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারিব না। ঘোর দুর্দ্দিনে ঝড়-বৃষ্টি-ঝঞ্ঝাবাতের সময়, যে ধর্ম্মটুকুকে হৃদয় মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া, রক্ষা করিয়া আসিয়াছি, আজ সে ধর্ম্মকে জীবিতাবস্থায় কেমন করিয়া দেহ-মন ছাড়া করিব? আমার ধর্ম্মময়ী মাতা যদি কখন শুনেন যে টাকা লইয়া আমি ধর্ম্মকে বিক্রয় করিয়াছি, তাহা হইলে কুপুত্র বলিয়া—কুলের কলঙ্ক বলিয়া, আর কস্মিন্ কালে তিনি আমার মুখ দেখিবেন না। প্রভু! দোহাই আপনার! এ দীনজনে আপনি রক্ষা করুন।

এই কথা শুনিয়া হৃদ্‌-বেগ সামলাইতে না পারিয়া, ভবানীপ্রসাদ বালকের ন্যায় হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

দীনদয়াল,—ভবানীপ্রসাদের হাত ধরিলেন, বলিলেন,—

"বেটা! কাঁদিও না। তোমার মাতা, স্ত্রী, কন্যা প্রভৃতি অন্নাভাবে বস্ত্রাভাবে কষ্ট পাইতেছেন দেখিয়া, সত্য সত্যই আমার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, সেই জন্যই আমি তোমাকে এই অর্থ দিতে উদ্যত হইয়াছি।"

ভবানী। আপনার এ কথা যে অসত্য, তাহা আমি বলি না; তবে নানা কারণে আমি আপনার প্রদত্ত ঐ টাকা লইতে অক্ষম। দেখুন, এ সংসারে ত অনেক দীন দুঃখী আছে;—আপনি কি দীন দুঃখী দেখিবামাত্রই যাচিয়া-যাচিয়া অর্থ দিয়া তাহাদের দুঃখ মোচন করিয়া থাকেন? দীন দুঃখীকে এককালে লাখ টাকা দান, ইহাই বা কিরকম কথা!—সুতরাং এস্থলে বুঝিতে হইবে, দরিদ্রতা ছাড়া, আমাতে এমন কোন একটী বিশেষ গুণ আছে, যাহার জন্য আপনি আমাকে দয়া করিয়া লক্ষ টাকা দিতে উদ্যত হইয়াছেন। সে গুণটী কি? সেগুণ আর কিছুই নয়,—কেবল আপনার নিমজ্জিত পৌত্রকে গঙ্গা হইতে উত্তোলন এবং বজরায় ডাকাতদলের সহিত আমার সম্মুখ রণ। এই দুইটী কার্য্য আমি যদি না করিতাম, তাহা হইলে বলুন দেখি, কেবল দারিদ্র্যদুঃখ মোচনার্থ এই লক্ষ টাকা আমায় দিতে উদ্যত হইতেন কি না! আবার ইঙ্গিতে এইরূপও জানাইয়াছেন,—ভবিষ্যতে যে পূর্ণমাত্রায় দান করিবেন, এই লক্ষ টাকা তাহার নমুনা স্বরূপ। এ দান আমার কৃত-কর্ম্মের পুরস্কারের নিমিত্ত দান-মাত্র। কিন্তু আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পুরস্কার লাভ-লালসায় আমি ডাকাতদলের সহিত যুদ্ধও করি নাই, আপনার পৌত্রকেও গঙ্গা হইতে উত্তোলন করি নাই। সুতরাং এ টাকা আমার প্রাপ্য টাকা নহে।

দীনদয়াল। বেটা! তুমি বড় কঠিন হইয়াছ। এরূপ

কঠোর সংযমী পুরুষ আমি কখন দেখি নাই। বেটা! তবে কি তুমি তোমার গৃহে যাইতে চাহ না? মাতা, স্ত্রী, কন্যাকে উদ্ধার করিতে চাহ না?

ভবানী। চাহি—একান্তই চাহি। কিন্তু যে প্রতিজ্ঞা করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছি, সে প্রতিজ্ঞাও প্রতিপালন করিতে চাহি। স্বয়ং যদি আমি উপার্জ্জনক্ষম হই, যদি উদ্ধারের উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করিতে পারি, তাহা হইলেই গৃহে ফিরিব,—নচেৎ নহে।

দীনদয়াল। বেটা! আমার নিকট চাকুরী করিতে প্রস্তুত আছ কি?

ভবানী। আমার মনিব সেই প্রয়াগের পাণ্ডা কেশবরাম যদি বলেন, তাহা হইলে আনন্দের সহিত আপনার নিকট চাকুরী করিতে পারি।

দীনদয়াল। (হাসিয়া) চাকুরী করিয়া মাসান্তে মাহিনা লইবে ত? "কার্য্যের জন্য কার্য্য করিতেছি" বলিয়া মাহিনা লইতে অসম্মত হইবে না ত?

ভবানী (হাসিয়া) চাকুরী ত চুক্তি-মাত্র। মাহিনা লইব না কেন? অবশ্য লইব। তবে যদি একটা উদ্ভট-রকম মাহিনা আমার নির্দ্দিষ্ট করেন;—মাস পোহাইলেই বলেন, এই পাঁচ সহস্র টাকা তোমার গত মাসের মাহিনা গ্রহণ কর, তাহা আমি কিছু-তেই লইব না। এরূপ স্থলে আমার মনে হইবে, কৌশলে সেই পুরস্কার প্রদত্ত হইতেছে।

দীনদয়াল। আচ্ছা বেটা! তোমার মায়ের জন্য, তোমার স্ত্রীর জন্য, কন্যার জন্য, ছোট ভাইটীর জন্য, আর তোমার সেই রঘুদয়াল-দাদার জন্য,—একবারও কি মন-কেমন করে না?

ভবানীপ্রসাদ এ কথার কোন উত্তর দিলেন না; কেবল নয়নদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া, তিনি তীব্রদৃষ্টিতে দীনদয়ালের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

দীনদয়াল। বেটা! যদি তোমার মন কেমন করিত, তাহা হইলে এই লক্ষ টাকা না লইয়া থাকিতে পারিতে না। তোমার মন-কেমন করে না,—নয়?

ভবানীপ্রসাদের লোহিতবর্ণ লোচনদ্বয় অধিকতর লোহিতবর্ণ হইল; দেহ ঈষৎ ফুলিয়া উঠিল;—নিশ্বাস ঘন ঘন পড়িতে লাগিল; তিনি কঠোর কণ্ঠে দীনদয়ালকে কহিলেন,—"না,—আমার মন-কেমন করে না। আমি সূক্ষ্ম ওজন যন্ত্রে এক দিকে মন-কেমটী রাখিয়াছি, অন্যদিকে ধর্ম্মকে রাখিয়াছি। রাখিয়া ওজন করিয়া দেখিয়াছি,—ধর্ম্মই অধিক ভারী! প্রভু! সেই জন্য মন-কেমন করে না। ধর্ম্ম লক্ষ গুণ গুরু, সেই জন্য মন-কেমন আমার আর করে না! মাতার আদেশ,—ধর্ম্মই পৃথিবীর সার সর্ব্বস্ব; সেই জন্য আমার মন-কেমন আর করে না।"

ভবানীপ্রসাদের নয়নযুগল স্থির হইয়া রহিল,—কিছুক্ষণ পলক আর পড়িল না।

ভবানীপ্রসাদের চক্ষুকোণে—ও—কি ও? জল-বিন্দু,—না রক্ত-বিন্দু!

দীনদয়াল আর কথা কহিলেন না; ভবানীপ্রসাদের দক্ষিণ হস্তটী লইয়া আপন বুকে রাখিলেন।

———

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

পাণ্ডা কেশবরাম,—প্রয়াগ হইতে যথাসময়ে দীনদয়ালের নিকট শেষ বিদায়ী টাকা লইতে আসিল। দীনদয়াল তাঁহাকে যথেষ্ট টাকা দিলেন। পাণ্ডা কেশবরাম সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি দীনদয়ালের প্রার্থনামতে অমরসিংহকে দীনদয়ালের ভৃত্যস্বরূপ কাশীধামে রাখিয়া গেলেন। যাত্রাকালে তিনি অমরসিংহকে কর্ম্ম-আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত দশটী টাকা দান করিলেন। অমরসিংহ হৃষ্টচিত্তে সেই দশটী টাকা লইয়া, গচ্ছিতের স্বরূপ দীনদয়ালের নিকট রাখিলেন।

অমরসিংহ দীনদয়ালের ভৃত্য হইলেন। বেতন হইল মাসিক ত্রিশ টাকা। কাশী, প্রয়াগ, মৃজাপুর, কাণপুর, মথুরা, ঝাঁসি, আলিগড়, আগ্রা, হাতরস, দিল্লি এই দশটী স্থানে যে ব্যবসা চলিতে-ছিল, অমর তাহার পরিদর্শক নিযুক্ত হইলেন। এই দশটী স্থান দেখিতে অমরসিংহের প্রায় ছয় মাস লাগিল। সপ্তম মাসে দীন-দয়াল অমরসিংহকে জিজ্ঞাসিলেন,—বেটা! তোমার কিরূপ অভিজ্ঞতা জন্মিল? দেখিয়া শুনিয়া কিছু কি জ্ঞানলাভ করিতে পারিলে?

অমরসিংহ। এখনও অনেক শিখিতে বাকী আছে।

দীনদয়াল। বল দেখি কোন্ কোন্ মোকামের আড়তে আমার কাজ ভাল চলিতেছে,—কোথা বা মন্দ চলিতেছে? কোথা-কার কর্ম্মচারিগণ অলস অকর্ম্মণ্য বল দেখি? কে কে চুরী করিতেছে, প্রবঞ্চনা করিতেছে,—কোথায়ই বা মালপত্র অবহেলায় নষ্ট হই-তেছে,—এ সব সন্ধান কিছু রাখিয়াছ কি?

অমরসিংহ নিজের অভিজ্ঞতার কথা যাহা বর্ণন করিলেন, তাহা শুনিয়া দীনদয়াল সন্তুষ্ট হইলেন;—কহিলেন; "আমি অপাত্রে বিশ্বাস ন্যস্ত করি নাই। তুমি যে বিষয়াভিজ্ঞ এবং বুদ্ধিমান্, তাহা পরীক্ষা করিয়া আজ নিশ্চয় বুঝিলাম। দেখ অমর! মাসিক ত্রিশ টাকা বেতনের চাকুরী তোমার উপযুক্ত নহে। মাসিক তিন শত টাকা বেতনও তোমার উপযুক্ত নহে। আর চাকুরী করিয়া কেহ কখন প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিতে পারে না। বাণিজ্যেই লক্ষ্মীর বাস। যদি তোমার গৃহে শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী চিরদিনের তরে বান্ধিয়া রাখিতে চাও, তাহা হইলে কোন ব্যবসায় অবলম্বন কর।

লক্ষ্মীর নাম—শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মীর নাম আজ নয় বৎসর পরে অমরসিংহের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবামাত্র অমরসিংহের মাথা ঘুরিতে লাগিল,—অমরসিংহ দীনদয়ালের পদপ্রান্তে পতিত হইলেন।

"এ কি হইল, এ কি হইল"—দীনদয়াল বলিয়া উঠিলেন; জল লইয়া অমরসিংহের মুখে দিলেন। অমরসিংহ চেতন প্রাপ্ত হইয়া উঠিয়া বসিলেন।

দীনদয়াল জিজ্ঞাসিলেন—"বেটা তোমার হঠাৎ এরূপ মূর্চ্ছা হইল কেন? ঠিক বলিও আমার নিকট গোপন করিও না।"

অমর। আমার কন্যার নাম রাজলক্ষ্মী,—পিতা বলিতেন,—শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী,—মাতা ডাকিতেন লক্ষ্মী। এতদিন পরে হঠাৎ সেই নাম উচ্চারিত হইবামাত্র, আমার মাথা ঘুরিল, কি পৃথিবী ঘুরিল, কিম্বা আমি ঘুরিলাম, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আমি কেমন হইয়া গেলাম। আমার সংজ্ঞা-লোপ হইল।

দীনদয়াল। তুমি ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছিলে নয়,—"আমার মন-কেমন ত করে না।"

অমর। এখনও বলিতেছি,—না, মন-কেমন করে না। তবে মধ্যে মধ্যে আমার মাথা ঘুরে, অথবা পৃথিবী ঘুরে,—এই মাত্র।

দীনদয়াল। দেখ অমর! ও সব কথা এখন রাখ। আমি যাহা বলি, তাহা শুন। আমি তোমার পিতৃতুল্য। আমার কথা তুমি লঙ্ঘন করিও না। আজ তোমায় কতকগুলি উপদেশ দিব, ইহা ভাবিয়াই তোমাকে এই নির্জ্জনগৃহে ডাকাইয়াছি। আমি কোন অসঙ্গত কথা বলিব না। আমার কথা রক্ষা করিও। বৃদ্ধের মনে কষ্ট দিও না।

অমর। প্রভু! বলুন, আমি আপনার ভৃত্য এবং পুত্রস্থানীয়।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

দীনদয়াল। তুমি একটী ব্যবসায় আরম্ভ কর।

অমর। আমি কি জানি,—কি বুঝি যে, হঠাৎ ব্যবসায় আরম্ভ করিতে সক্ষম হইব?

দীনদয়াল। তুমি আমার দশটী আড়ত পরিদর্শন করিয়া আসিয়া, যেরূপ ভাবে সেই সকল স্থানের কার্য্যের বর্ণন করিলে, তাহাতে আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে,—তুমি একজন পাকা ব্যবসাদার হইয়াছ। এবার কোন একটী কাজ তোমার সহিত ভাগে করিব, —মনে করিয়াছি।

অমর। আমি দরিদ্র, আপনি ধনবান্। আমার সহিত আপনার ভাগে কারবার হইবে কিরূপে! আমি আমার অংশের মূলধন আপনাকে দিতে কোথায় টাকা পাইব?

দীনদয়াল। শূন্য বখ্‌রাদার হইবে। আমার মূলধন, তোমার পরিশ্রম।

অমর। একটী কথা জিজ্ঞাস্য এই,—ব্যবসায়-কার্য্যে আমি নূতন। আজ চারি মাস আপনার সংশ্রবে আসিয়াছি। আমি বিশ্বাসী, কি অবিশ্বাসী ব্যক্তি, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার আপনি সম্যক্ অবসর পান নাই।

দীনদয়াল। বেটা! আমি লোকের মুখ দেখিয়া—মূর্ত্তি দেখিয়া,—তাহাকে বিশ্বাসী, কি অবিশ্বাসী,—কার্য্যে সক্ষম, কি অক্ষম,—স্থির করিয়া থাকি। লোক দেখিলে যদি লোক চিনিতে না পারিতাম, তাহা হইলে এই ভারতবর্ষব্যাপী প্রকাণ্ড কারবার চালাইতে কখনই পারিতাম না। বেটা! তোমার চাঁদপানা মুখখানি দেখিয়া, আমি সব ভুলিয়া গিয়াছি! তুমি আমার চক্ষে শ্রেষ্ঠ-বিশ্বাসী এবং শ্রেষ্ঠকার্য্যক্ষম হইয়াছ। তোমার আয়তলোচনে—উজ্জল নয়ন-তারা দুটী ঝক্ ঝক্ করিতেছে। যাহার নয়ন এরূপ বিস্তৃত এবং উজ্জ্বল, সে কখন চোর হয় না; সে কখন আবার অকর্ম্মণ্য হয় না। যাহার ললাটদেশ এরূপ প্রশস্ত, যাহার বক্ষঃ এরূপ বিশাল,—যাহার বাহুদ্বয় এরূপ আজানুলম্বিত,—তিনি সৌভাগ্যশালী পুরুষ। তোমার প্রতি দয়া করিয়া, আমি তোমাকে অংশীদার করিতে চাহিতেছি না। তোমার ভাগ্যের সহিত আমার ভাগ্য মিলাইয়া, আমাকে অধিকতর ভাগ্যবান্ করিব বলিয়াই, তোমাকে অংশীদার করিতে উদ্যত হইয়াছি।

অমর। আমার আবার সৌভাগ্য? যে ব্যক্তি উদরান্নের জন্য লালায়িত, যে ব্যক্তি মাকে, স্ত্রীকে, ভাইকে, কন্যাকে ভরণ-পোষণ করিতে সক্ষম নহে,—যে ব্যক্তি আপন পরিবারবর্গকে

অকুল সমুদ্রে একরকম ভাসাইয়া দিয়া, ছদ্মবেশে দেশে দেশে ভিখারি-বেশে ভ্রমণ করিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহার আবার সৌভাগ্য? প্রভু! এরূপ বিপরীত কথা কেন বলিতেছেন?

দীনদয়াল। (ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে) কথা ঠিকই বলিয়াছি। আমি তোমার পিতৃস্থানীয়,—তা তুমি জান? তোমাকে বিদ্রূপ করিবার বা শ্লেষ করিবার আমার অধিকার নাই। মিথ্যা কথা বলিয়া কাহাকেও বঞ্চনা করা আমার স্বভাব নহে। আমার যাহা জ্ঞান এবং বিশ্বাস তাহাই বলিয়াছি। আবার বলিতেছি,— "তুমি সৌভাগ্যবান্ পুরুষ।"

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব। দীনদয়াল কহিলেন,—"বেটা, তোমার হাত দেখি—তোমার দক্ষিণ হস্তের করতল দেখি। বেটা! বল দেখি,—তোমার করতল এরূপ লাল পদ্মাভ কেন? এ কিসের লক্ষণ? দেখ দেখ! তোমার করতলস্থিত ঐ উর্দ্ধরেখার প্রতি একবার লক্ষ্য কর। আর ঐ মৎস্যপুচ্ছ, ধ্বজপতাকা এবং যবাদি রেখার প্রতি অনিমেষ-লোচনে কিছুক্ষণ অবলোকন করিতে থাক। আমি তোমার করতল না দেখিয়াই অনুমান করিয়াছিলাম, তুমি সৌভাগ্যবান্ পুরুষ। এখন করতল দেখিয়া বুঝিলাম,—আমার অনুমান অমূলক নহে। রাজচিহ্ন তোমার করতলে বর্ত্তমান। তুমি রাজ্যেশ্বর রাজা। তুমি রাজলক্ষ্মীর পিতা,—এই নাম তোমাতেই সার্থক হইয়াছে।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া দীনদয়াল আবার বলিলেন,—"বেটা! উপযুক্ত সময় না হইলে, বৃক্ষ ফল দেয় না;—উপযুক্ত সময় না হইলে সৌভাগ্য-বৃক্ষের ফলও ফলে না। সেই শুভ ফলের সময় তোমার আসিয়াছে;—শুভদিন উপস্থিত হইয়াছে। নহিলে

উপর রহিল। এ কারবার যখন ভাগে হইতেছে, তখন আমার প্রতিনিধি-স্বরূপ আমার পৌত্র তথায় থাকিবে। তুমি তাহাকে কাজকর্ম্ম দেখাইবে এবং শিখাইবে।

অমর। তাহাই হউক।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

চিরদিন কখন সমান যায় না। অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল। সুখ-ফুল ফুটিল। সৌভাগ্য-ফল দেখাদিল। তুলার কারবারে বিপুল লাভ হইল। সর্ব্বরূপ ব্যয় বাদে, কিছু কম চারি লক্ষ টাকা লাভ রহিল।

দীনদয়াল কহিলেন,—"অমর! এইবার তুমি স্বদেশ গমন কর। একলক্ষ টাকা সঙ্গে লও। স্বদেশে যাহার যে ঋণ আছে, তাহা পরিশোধ কর। তোমার শত্রুগণ প্রকাশ্যতই হউক, আর প্রকারান্তরেই হউক, যদি কিছু টাকা চাহে, তাহাও তাহাদিগকে দিবে। আর তোমার পরিবারবর্গকে শীঘ্র কাশীধামে লইয়া আসিবে। অধিক বিলম্ব করিও না।

অমর। দেখুন! এতদিন আমি এক-রকম যেন বেশ ছিলাম। আজ কিন্তু শরীর-মন আমার কেমন যেন অবসন্ন হইতেছে। বহুদিন পরে জননীর পদারবিন্দ-দর্শনার্থ গমন-কালে, শরীর কি এইরূপই ঝিম্ ঝিম্ করে? এই হিসাব-নিকাশের পর হইতে দেড়লক্ষের অধিক টাকা প্রাপ্তি হইল জানিয়া, কয়দিন রাত্রি আমার ভাল ঘুম হয় নাই। সত্য সত্যই আমার দেহ-মন কেমন যেন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। আমি একা যাইতে পারিব না।

দীনদয়াল। পারিলেও,—তোমার একা যাওয়া উচিত নহে। তোমার নামে গ্রেপ্তারি পরোওয়ানা বাহির হইয়াছিল, তাহারই বা কি হইল, সে সম্বন্ধে এখন তুমি কিছু জান না। সুতরাং ছদ্মবেশে তোমার স্বদেশ-গমন কর্ত্তব্য। তোমাকে এমন বেশ ধারণ করিতে হইবে যে, তোমাকে দেখিয়া তোমার গ্রামবাসিগণ তোমাকে ভবানীপ্রসাদ বলিয়া কিছুতেই যেন চিনিতে না পারে।

অমর। আমার সন্ন্যাসী সাজা অভ্যাস আছে। বহুদিন সন্ন্যাসী সাজিয়া বেড়াইয়াছিলাম! আমি এই হিন্দুস্থানী চেহারায় যদি সন্ন্যাসী সাজি, তাহা হইলে কেহই আমাকে বাঙ্গালী ভবানীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়া চিনিতে পারিবে না। আপনিও আমাকে প্রথমে বাঙ্গালী বলিয়া চিনিতে পারেন নাই। ইহার উপর সন্ন্যাসী সাজিলে আর কি রক্ষা আছে? তবে একা বাটী যাইতে আমার মন সরিতেছে না। আমার দেহ-মন কেমন খাঁ খাঁ করিতেছে।

দীনদয়াল। তোমার সঙ্গে দুই জন উপযুক্ত লোক দিব। সে দুই ব্যক্তি অনেকবার বঙ্গদেশে গিয়াছে। আমার কলিকাতার গদিতে তাহারা বহুদিন কর্ম্মচারী ছিল। তাহারা আমার পরম বিশ্বাসী এবং প্রিয়পাত্র বলিয়া, তাহাদিগকে এক্ষণে আমার নিকটে রাখিয়াছি।

অমর। তাহারা সন্ন্যাসী সাজিতে পারিবে ত?

দীনদয়াল। কার্য্যোদ্ধারের নিমিত্ত তাহারা অনেকরূপ অদ্ভুত কর্ম্ম করিতে সক্ষম। নগদ আড়াইশত টাকা এবং এক লক্ষ টাকার হুণ্ডী তুমি লইয়া স্বদেশ যাত্রা কর। প্রথমতঃ কলিকাতা যাইবে, সেখানে গিয়া দশ হাজার টাকার একখানি হুণ্ডী মাত্র

ভাঙ্গাইবে। সেই টাকা লইয়া, তোমার স্বগ্রামে আসিবে। বলা বাহুল্য, কলিকাতায় তোমার সন্যাসি-বেশ ধারণ করিয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই।"

দীনদয়াল,—অমরসিংহের মুখপানে চাহিয়া দেখিলেন,—তাহার নয়নযুগল দিয়া অবিরল বারি-ধারা বহির্গত হইতেছে; বলিলেন,—"এ কি! আজ তোমার শুভদিন সমুপস্থিত,—তুমি কাঁদিতেছ কেন? তুমি মাতৃ-দর্শনে যাইতেছ,—কন্যা-লক্ষ্মীকে কোলে লইয়া আদর করিতে যাইতেছ,—সেই পতিগতপ্রাণা, পতি-তপ-নিরতা সহধর্ম্মিণীকে বিচ্ছেদ-দাবানল হইতে উদ্ধার করিতে যাইতেছ,—"

দীনদয়ালকে আর অধিক কথা বলিতে হইল না। অমরসিংহ নীরব থাকিতে পারিলেন না। তিনি উচ্চকণ্ঠে—"মা—মা—মা!" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন।

সুখের দিনে—সুখের শুভ-সূচনায়—কেন এমন ক্রন্দন আসিয়া উপস্থিত হয়, বলিতে পারি না। দীনদয়াল যত বলেন,—"অমর তুমি বালক নও, এত কাঁদ কেন?"—অমরসিংহ তত হাঁপাইয়া—হাঁপাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া,—ফুকারিয়া ফুকারিয়া—কাঁদিয়া উঠেন।

কঠোর-সংযমী পুরুষ! ভীষ্মপ্রতিজ্ঞ-অমরসিংহ! তুমি আজ এ কি দশা প্রাপ্ত হইলে! তুমি আজ হিমালয়-সদৃশ গুরু-গম্ভীর হইয়াও, অশ্রুজলের প্রবল-বন্যায় তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যাইতেছ কেন?

———

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

হুগলি জেলার অন্তর্গত যে গ্রামে ৺শঙ্করীপ্রসাদের বাস ছিল, সেই গ্রাম মনে কর। সেই গ্রামের তটবাহিনী গঙ্গা মনে কর। অতি প্রত্যুষে উঠিয়া সেই গঙ্গার যে ঘাটে কাত্যায়নী প্রত্যহ স্নান করিতে আসিতেন, কাঁখে কলসী করিয়া জল লইয়া যাইতেন, সেই ঘাটের অদূরে গঙ্গাগর্ভে তিনটী সন্ন্যাসী উপবিষ্ট। ঘোর নিশীথকাল। কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী ঘোর অন্ধকার!—মধ্যে মধ্যে মেঘ ডাকিতেছে। ঝড় অল্প উঠিয়াছে,—গঙ্গায় বড় বড় ঢেউ হইতেছে। মাঝে মাঝে শৃগাল ডাকিতেছে!—কিছু দূরে শ্মশানভূমি,—শান্তির চির-নিকেতন! শ্মশানে একবার আলো জ্বলিতেছে:—এক একবার নিবিতেছে। শ্মশান যেন অট্ট অট্ট হাসিয়া, হাসিয়া, এক একবার আঁধার-সাগরে ডুব দিতেছে।

তিন জন সন্ন্যাসীর মধ্যে দুইজন ঘুমাইল, একজন জাগিয়া রহিলেন। যাহার চক্ষে ঘুম আসিল না, তিনিই ভবানীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়—ওরফে অমরসিংহ। ভবানীপ্রসাদ আজ জননী,—সহধর্ম্মিণী, কন্যা, ভ্রাতা এবং রঘুদয়ালের অন্বেষণার্থ আসিয়াছেন।

অমরসিংহ ভাবিতে লাগিলেন,—"মা প্রত্যহ অতি ভোরে গঙ্গার এই ঘাটে স্নান করিতে আসিতেন, তাহা আমি দেখিয়া গিয়াছি। জননীর অন্নকষ্ট-কালে আমি বিবাগী হইয়াছি। অতি প্রত্যূষে এই গঙ্গার ঘাটে মাকে দেখিতে পাইলে কি বলিয়া সম্বোধন করিব? মার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া,—প্রণাম করিয়া—পায়ের ধূলা লইয়া—মাকে বলিব,—"মা! একলক্ষ টাকা আনিয়াছি; অন্নের জন্য আর কষ্ট হইবে না, মা! লক্ষীর দুধ নাই বলিয়া, তোমার চোখে আর

জল আসিবে না মা!" মা যখন আমার সন্ন্যাসি বেশ দেখিয়া,—আমাকে চিনিতে না পারিয়া, আমার মুখপানে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিতে থাকিবেন, তখন আমি বলিব,—"মা! আমি সন্ন্যাসী নহি, আমি তোমার পুত্র ভবানীপ্রসাদ। না না, হঠাৎ মায়ের নিকট পরিচয় দেওয়া হইবে না। হঠাৎ আমাকে দেখিলে মায়ের যদি মূর্চ্ছা হয়!"

"আরও এক কথা। আমার নামে ফৌজদারী মোকদ্দমার কি হইল, না জানিয়া, আমার পরিচয় এক্ষণে প্রকাশ্যতঃ কাহাকেও দেওয়া উচিত নহে। অতি প্রত্যূষকাল পর্য্যন্ত এই স্থানেই অপেক্ষা করিব। স্নানার্থ ঘাটে আসিলে মায়ের চরণারবিন্দ দেখিয়া মাকে মনে মনে প্রণাম করিব। মাতা স্নান করিয়া গৃহাভিমুখে গমন করিলে পর,—আমি তখন কি করিব? শীঘ্র উঠিব না, একটু বেলা হইলে উঠিব। যে অশ্বথবৃক্ষটী জননী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেই অশ্বত্থ বৃক্ষের তলদেশে গিয়া বসিব। সেখানে আমরা তিন জন সন্ন্যাসী যদি বসি, তাহা হইলে নিশ্চয় গ্রামের অনেক স্ত্রী-পুরুষ আমাদিগকে দেখিতে আসিবে। আগন্তুক ব্যক্তিগণের সহিত কথাপ্রসঙ্গে সকল বিষয় জানিয়া লইতে পারিব।

"আচ্ছা! গ্রামের প্রান্তরে অশ্বত্থবৃক্ষমূলে না বসিয়া আমাদের বাটীর ভিতর প্রবেশ করি না কেন? বহির্ব্বাটী ত প্রায় বার বিঘা বিস্তৃত। সন্ন্যাসি-অতিথিগণের অবস্থিতির জন্য প্রশস্ত স্থানও আছে। মাতা বা রঘুদয়াল-দাদা আমাকে দেখিয়া চিনিতে পারিবেন কি? কখনই না। একে আমি হিন্দুস্থানী; তার পর সন্ন্যাসী সাজিয়াছি। তাহার উপর, বহুরূপীর

বেশ ধরিয়াছি। আমার সঙ্গী এই ভদ্রলোকও বলিতেছেন,—আমাকে দেখিলে মনে হইবে,—আমি ৬২ বৎসরের বৃদ্ধ। বৃদ্ধের ন্যায় স্বরে কথা কহিতেও শিখিয়াছি। চিনিতে কিছুতেই পারিবে না।

"বাটীতে ঢুকিয়া প্রথমতঃ একটী মজা করিব মনে করিয়াছি; ছলে রাষ্ট্র করিব, আমি একজন গণৎকার সন্ন্যাসী। প্রথমতঃ মায়ের হাত দেখিব না; মায়ের হাত দেখা হইবে না। মায়ের সহিত এরূপ ছলনা করিয়া লাভ কি? ছলনাই বা কি এমন? হাত দেখিলেই বা ক্ষতি কি? বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর নিকট হাত দেখাইতে আমার স্ত্রীর আপত্তি বোধ হয় হইবে না। স্ত্রী আসিলে হাত দেখিয়া বলিব,—"তোমার নামটী বুঝি যশোদা।" অজ্ঞাতকুলশীল সন্ন্যাসীর মুখে আপন প্রকৃতনাম শুনিতে পাইয়া, যশোদা চমকিয়া উঠিবে। আমি সেই সময় বলিব,—"ভয় কি আছে, পাবি পাবি—ফিরে পাবি।" যশোদা আরও চমকিবে। আমি আরও বলিব,—"তোর অদৃষ্ট ভাল আছে, যশোদা! তুই ঘরে ফিরে যা।" কিন্তু একটী কথা হইতেছে, আমার মাতা বা সহধর্ম্মিণীকে দেখিয়া যদি কাঁদিয়া ফেলি, তখন উপায় কি হইবে? চিত্ত বেগ সে সময় কি রোধ করিতে পারিব না? "পাবি পাবি ফিরে পাবি" একথা শুনিয়া, যশোদাই যদি কাঁদিয়া ফেলেন, তাহা হইলে আমি ত স্থির কিছুতেই থাকিতে পারিব না। এদিকে আবার সেই মলিনবেশধারিণী লক্ষ্মীকে দেখিয়া, আমার চিত্তকে সংযত রাখা, আমার পক্ষে একবারেই অসম্ভব হইবে। মা লক্ষ্মী এখন কত বড়টী হইয়াছেন? তাঁহার হাসিটী এখন তেমনই আছে ত? লক্ষ্মী এখন বোধ হয়, এবার বার

বৎসরের হইয়াছে ;—বার বোধ হয়, উত্তীর্ণ হইয়া থাকিবে। রঘুদয়াল-দাদা লক্ষ্মীর বিবাহ ”—

এই কথা উচ্চারণ করিতে না করিতে, ভবানীপ্রসাদের চক্ষে জল আসিল। ভবানীপ্রসাদ চক্ষু বুজিয়া মনে মনে কহিলেন,—"রে অবোধ অশ্রু-জল! তোর আমি পায়ে পড়ি, তুই আমাকে রক্ষা কর্। তুই দয়া না করিলে ত, আজ আমি মায়ের সঙ্গে স্ত্রীর সঙ্গে, লক্ষ্মীর সঙ্গে, ছোট ভাইটির সঙ্গে কাহারও সঙ্গে দেখা করিতে পারিব না।"

ভবানীপ্রসাদের নয়ন দিয়া আবার হুহু করিয়া, জল বাহির হইতে লাগিল। ভবানীপ্রসাদ কহিলেন,—"রে অশ্রুজল! তুই আর শত্রুতা করিস্ না। নয় বৎসর কাল কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতেছি ; একটী দিনের জন্য তুই আমাকে ছুটি দে ;—আমি আজ মাকে, দেখিব,—আমি আজ মাকে প্রণাম করিব,—স্ত্রীর সহিত কথা কহিব।"

ভবানীপ্রসাদের চক্ষু যেন অনন্ত প্রস্রবণ! বারিধারার বিরাম নাই। ভবানীপ্রসাদ এবার রুক্ষস্বরে কহিলেন,—"পাপ নয়ন! পাপ অশ্রুজল! তোদের বড়ই স্পর্দ্ধা দেখিতেছি! আমার সম্মুখে এই অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে। রে দুষ্ট নয়নযুগল! এখনি তোদিগে উপড়াইয়া অগ্নিকুণ্ডে ফেলিয়া ভস্মীভূত করিব। আমার নাম ভবানীপ্রসাদ। নয় বৎসরের পর আমি আজ জননীর পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিব ; তোরা বাদ সাধিস্ না। যদি আমাকে কাতর দেখিয়া দয়া না করিস্, তাহা হইলে আমাকে দুরন্ত বুঝিয়া ভয় কর্।"

সহচর দুইজন জাগিয়া উঠিল। তাহারা ভবানীপ্রসাদকে

তদবস্থ দেখিয়া কহিল,—"আবার সেই ক্রন্দন! মনে আছে, কাশীধাম হইতে শুভযাত্রার সময়, কর্ত্তা তোমাকে বলিয়া দিয়াছিলেন, পথে পথে যেন কাঁদিয়া বেড়াইও না। কিন্তু আজ দুই দিন হইতে তোমার চোখে জল দেখিতেছি কেন? তোমার শুভদিন সমুপস্থিত, আর বিলম্ব নাই। শুভদিনে এত ক্রন্দন কেন?" ভবানীপ্রসাদ কোন কথার উত্তর দিলেন না, নীরবে রহিলেন।

সহচর বলিল,—"সূর্য্য উদয় হইলেই তোমার পরিবারবর্গকে তুমি দেখিতে পাইবে! আর এক প্রহরের কম সময় অবশিষ্ট আছে। এই অল্প সময়ের জন্ত আর কাঁদা কেন? তোমার মাতা স্ত্রী প্রভৃতি তোমার সম্মুখেই ত এক রকম বর্ত্তমান বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তুমি শয়ন কর, একটু ঘুমাইয়া লও।"

ভবানীপ্রসাদ নীরবে শয়ন করিলেন, ঘুমাইতে পারিলেন না। তাঁহার ভাবনা-স্রোত এবার বিপরীত দিকে বহিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—"যদি জননীকে গৃহে দেখিতে না পাই, আমার স্ত্রী, কন্যা কোথায় গেল—সন্ধান না পাই, তখন কি হইবে! না খাইতে পাইয়া তাঁহারা সকলে দেহত্যাগ করিয়াছেন, এ কথা যদি শুনি,—তখন কি হইবে! আমি কি বাঁচিয়া থাকিতে পারিব? মৃত্যু ত ভাল; মৃত্যু ছাড়া যদি অন্য কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে, তখন—তখন—তখন—"

ভবানীপ্রসাদের মাথা ঘুরিতে লাগিল।

আঁধার-তরঙ্গ ভেদ করিয়া, তিনি এতক্ষণ গঙ্গার তরঙ্গ-মালা দেখিতে পাইতেছিলেন, কিন্তু এখন আর তিনি কিছুই দেখিতে পাইলেন না। ক্রমশঃ পৃথিবী তাঁহার চক্ষে ঘোর—ঘোরতর-

নিবিড় অন্ধকারে পূর্ণ হইল। ক্রমশঃ অন্ধকারও আর দেখা গেল না। পৃথিবীর আর অস্তিত্ব রহিল না!—শূন্যময়তারও আর অস্তিত্ব রহিল না!—বুঝি ভবানীপ্রসাদেরও আর অস্তিত্ব রহিল না!—ভবানীপ্রসাদ ধীরে ধীরে আপনা-আপনি শুইয়া পড়িলেন।

ভবানীপ্রসাদ জীবিত,—মূর্চ্ছিত,—না মৃত? ভবানীপ্রসাদ জীবিত নন, মৃত নন,—জীবন্মৃতও নন! এখন আর তাঁহার মূর্চ্ছাভাবও নাই। তিনি এখন আনন্দ-রাজ্যে। তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন,—"পরিবারবর্গের সহিত তিনি মিলিত হইয়াছেন; তিনি ভাত খাইতে বসিয়াছেন; মাতা পরিবেশন করিতেছেন। পরিবেশন শেষ হইলে, মাতা কাছে বসিয়া খাওয়াইতেছেন। পিতার পার্শ্বে লক্ষ্মী খাইতে বসিয়াছে। সহধর্ম্মিণী যশোদা,—ঈষৎ অন্তরাল হইতে স্বামীর এবং কন্যার আহার-ব্যাপার অবলোকন করিতেছেন। মায়ে-পোয়ে কথা আরম্ভ হইয়াছে। মা বলিতেছেন,—'বাছা! তুই এই ছেলে-বয়সে সর্ব্বতীর্থ দেখে এলি; আমাকে কিছুই দেখালি না।' পুত্র বলিতেছেন,—'মা! তুমি এক বৎসর অপেক্ষা কর, আমি ভারতবর্ষের সব তীর্থ তোমায় দেখাইব।' মা বলিতেছেন,—'বাছা! পুষ্করতীর্থ যাইবার জন্য আমার মনটী অনেক দিন হইতে পড়িয়াই আছে। সেখানে গিয়া সাবিত্রীকে সিন্দূর দিয়া আসিবার জন্য, আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হইয়াছে।' পুত্র বলিতেছেন,—'মা পুষ্করতীর্থ—বড় দুর্গম; বালিরাশির উপরদিয়া সাবিত্রীর পাহাড়ে উঠা বড়ই কঠিন কর্ম্ম। সে পাহাড়ে উঠিতে আমি মা! হাঁপিয়া গিয়াছিলাম।' মাতা হাসিয়া বলিতেছেন,—'ওরে! তোর মায়ের বড় কঠিন হাড়; সে ভাবনা তোকে বড় ভাবিতে হইবে না।'

এই সময় কাত্যায়নী, লক্ষ্মীকে বলিলেন,—'আর একখানি মাছের ভাজা আ'নিয়া দিতেছি, তুই বসিয়া বসিয়া খা।' মাতৃ-মুখ হইতে এই কথা উচ্চারিত হইবা মাত্র, অন্তরালস্থিতা বধূ যশোদা মাছের ভাজা আনিবার জন্ম গমনোদ্যতা হইলেন। মাতা কাত্যায়নী,—বধূ যশোদাকে কহিলেন,—'বৌ মা! তোমার মাছ আনিতে যাইয়া কাজ নাই; তুমি এইখানে দাঁড়াও; আমি গিয়া মাছ আনিতেছি। জননী মাছ আনিতে গেলেন। বধূ যশোদা স্বামীর নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন,—স্বামীকে বলিলেন,—'তুমি স্বক্তানী এত ভালবাসিতে, আজ তাহা পাতে এত পড়িয়া রহিল কেন?' স্বামী বলিলেন,—'কত খাব? এই উচ্ছের তরকারী, মোচার ঘণ্ট কে রাঁধিল?' যশোদা মৃদুমধুর স্বরে বলিল,—'আমি রাঁধিয়াছি।' স্বামী কহিলেন,—'এ অতি উত্তম হইয়াছে।' যশোদা জিজ্ঞাসিলেন,—'ডাল দিয়া গলদা চেংড়া মাছ কেমন হইয়াছে?' স্বামী কহিলেন,—'নয় বৎসর পরে এরূপ ঘৃতসংযুক্ত চেংড়া মাছ এই আমি নতন খাইতেছি। এও বুঝি তুমি রসুই করিয়াছ,—নয়? তুমি বখ্‌সিসের যোগ্যা হইয়াছ।' যশোদা কহিলেন,—'একটী বখ্‌সীস আমার চাই। আমাকেও মায়ের সঙ্গে সাবিত্রীপাহাড়ে লইয়া যাইতে হইবে। আমি ছাড়িব না।' লক্ষ্মী কহিল, 'বাবা! আমাকেও সেখানে লইয়া যাইতে হইবে। আমি তোমাকে আর কোথাও একলা যাইতে দিব না।' এমন সময় জননী কাত্যায়নী মাছের ভাজা লইয়া আসিয়া পৌছিলেন।"

ভবানীপ্রসাদের স্বপ্ন ভাঙ্গিল। মায়া-মরীচিকা দূর হইল। ভবানীপ্রসাদ দেখিলেন, উষা—আগমনের আর অধিক বিলম্ব নাই। আরও দেখিলেন,—সেই গঙ্গা, সেই শ্মশান, সেই বাব-

ছাল, এবং সেই ভস্মবিলিপ্ত আপন সন্ন্যাসিবেশ! স্বপ্নরাজ্য একবারে ধ্বংস হইল। ভবানীপ্রসাদ কহিলেন,—"মাতর্গঙ্গে! তোমার গর্ভে বাস করিয়া আজ একি বিড়ম্বনা।" দেখিতে দেখিতে পূর্ব্ব দিক্ ফরসা হইল। ভবানীপ্রসাদের দুর্ভাবনা দ্বিগুণ বাড়িল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

সূর্য্য-উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী তিন জন গঙ্গাগর্ভ হইতে উঠিলেন। ভবানীপ্রসাদ! তুমি এরূপ বহুরূপী সাজিতে কেমন করিয়া শিখিলে? তুমি যুবা পুরুষ হইয়া হঠাৎ এরূপ বার্দ্ধক্যদশায় কিরূপে উপনীত হইলে? বেশ!—ভবানীপ্রসাদ বেশ! অতি উত্তম সাজ হইয়াছে।

ভবানীপ্রসাদ পথে যাইতে যাইতে দেখিলেন, গ্রামটী অধিকতর জঙ্গলময় হইয়াছে। কেমন যেন শ্রীভ্রষ্টের লক্ষণ! কৃষকপল্লীর মধ্যে কাহারও চালে খড় নাই; কাহারও বা দেওয়াল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; কাহারও বা বাঁশের খুঁটি উপড়াইয়া পড়িয়াছে। কতকগুলি লোক ঘরছাড়িয়া পলাইয়াছে। তাহাদের ঘরের মাটীর দেওয়াল বর্ষাজলে ভিজিয়া ভিজিয়া, গলিয়া গলিয়া, একটী মাটির প হইয়া রহিয়াছে।

পথে একটী বৃদ্ধলোক দেখিয়া, ভবানীপ্রসাদের ইঙ্গিতমত একজন সহচরসন্ন্যাসী, সেই বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসিল,—"এ গ্রামে কোথাও অতিথিশালা আছে কি?"

বৃদ্ধ। না। সে সব এখানে কিছুই নাই।

সন্ন্যাসী। ফকীর-সন্ন্যাসী গিয়া দুই এক প্রহর থাকিতে পারে, এমন একটু স্থানও কি এ গ্রামে কোথাও নাই?

বৃদ্ধ। এ কোথাকার পাগল সন্ন্যাসী গো? সে সব এ গ্রামে কিছুই নাই।

সন্ন্যাসী। তবে কি আছে?

বৃদ্ধ। মোকদ্দায় সাক্ষী দিতে পার? এ গ্রামে অনেক সাক্ষীর দরকার দুবেলাই হয়। দেওয়ানী-ফৌজদারী মোকদ্দমা লেগেই আছে।

সন্ন্যাসী। তুমি কি বলিতেছ,—ভাল বুঝিতে পারিতেছি না।

বৃদ্ধ। আমি বলিতেছি, যদি ভাল চাও ত, এ গ্রাম হইতে এখনি পলাও! কি জানি,—বাঘছালটা কমণ্ডলুটা আছে—তা আবার কি কেউ কেড়ে-কুড়ে নেবে?

সন্ন্যাসী। কল্য সমস্ত দিন আমাদের আহার হয় নাই, বড় ক্ষুধার্ত্ত আছি। এ গ্রামে এমন কি কোন ভদ্র লোক নাই,—যাঁর-ওখানে গেলে অদ্য ঠাকুরের সেবা হ'তে পারে?

বৃদ্ধ। বলি, ঘটকালী করা, দূতগিরি করা অভ্যাস আছে? তা যদি থাকে—যদি যোটকতা-কার্য্যে নিপুণ হও, তা হ'লে অনেক তেড়িকাটা ভদ্রলোক আজ তোমাদিগে কালিয়া-পোলাও ক্ষীর-ছানা পায়স-পিঠে রেন্ধে খাওয়াইতে পারে।

সন্ন্যাসী। আমাদের ওরূপ উৎকৃষ্ট আহারের প্রয়োজন নাই। মোটা আতপ চাউলের অন্ন পাইলেই আমরা পরিতুষ্ট হইব।

বৃদ্ধ। এ গ্রামে, বাপু! সে সব কিছু হ'বে টবে না। হয় এক কালিয়া-পোলাও পায়স-পিঠে মিলিতে পারে, না হয় কিছুই মিলিবে না। দেখতেইত পাচ্চ বাপু! এই সোজা পথ প'ড়ে

রয়েছে। ঐ পথ দিয়ে অন্য যে কোন গ্রামে যাবে, এ গ্রামের চেয়ে সে গ্রাম ঢের ভাল হবে।

সন্ন্যাসী। ঐ যে তোমাদের গ্রামে অল্প দূরে বড় বড় অট্টালিকা দেখিতেছি। বড় মানুষ এ গ্রামে আছেন,—অনুমান করিয়াই এই পথে আসিয়াছি।

বৃদ্ধ। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) যে দিন থেকে শঙ্করীপ্রসাদ দেহত্যাগ করিয়াছেন, সেই দিন থেকে এ গ্রাম শ্মশান হইয়াছে। আহা! তাঁহার আমলে প্রত্যহ শত শত অতিথি সন্ন্যাসী থাকৃতে পেত এবং খেতে পেত। ঐ যে বড় বড় বাড়ীর কথা বলিতেছ,—ঐ সমস্তই শঙ্করীপ্রসাদের কীর্ত্তি। অতিথিশালার উচ্চ চূড়াটী বাজ পড়িয়া কতকটা ভাঙ্গিয়া গেলেও, এখনও তাহা দশক্রোশ দূর হইতে দেখা যায়।

সন্ন্যাসী। আমরা শঙ্করীপ্রসাদের বাটীতে গেলে সিধা না পাই, ততটা ক্ষতি নাই, থাকিবার স্থান পাইলেও যথেষ্ট হইবে। থাকিবার স্থান একান্ত না পাই, গাছতলায় থাকিব, তাহাতেই বা ক্ষতি কি?

বৃদ্ধ। হাঁ! গাছতলায় থাকাই ভাল,—ও অতিথিশালায় আর যেয়ে কাজ নাই।

সন্ন্যাসী। কেন? কেন? কি হয়েছে!

বৃদ্ধ। এত সাত-সতর আমি ব'লতে পারবো না। ইচ্ছা হ'য়ে থাকেত, যেয়েই দেখ্ না? গেলেই টের পাবে।

সন্ন্যাসী। শঙ্করীপ্রসাদের বংশধর কি কেহ নাই?

বৃদ্ধ। বংশ ত বংশ। শুক্ক কঞ্চিও একগাছা নাই। যাহা হউক, তোমাদের সঙ্গে আমি বকাবকি করতে পারবো না, আমার

অনেক কাজ। তোমরা এইখানে থাক বা যাও,—যা যা ইচ্ছা কর, আমাকে আর বকাইও না। আমি জমিদার-বাড়ী যাচ্ছি, যেতে একটু বেলা হ'লেই আমার প্রাণটী যাবে।

এই কথা বলিয়া বৃদ্ধ দ্রুতপদে স্বস্থানে প্রস্থান করিল। ভবানী-প্রসাদের দেহ কাঁপিয়া উঠিল। তিনি অন্য একজন সহচর সন্ন্যাসীর স্কন্ধদেশ ধারণ করিলেন; মনে মনে কহিলেন,—"চিত্ত! সংযত হও। আর কেন? প্রত্যূষে গঙ্গার ঘাটে যখন অনেক স্ত্রীলোক স্নান করিতে আসিলেন দেখিলাম, কিন্তু জননীকে আসিতে দেখিলাম না, তখনই কেমন মনে হইল—"মা বুঝি এ সংসারে নাই।" বৃদ্ধ যখন বলিল, শঙ্করী প্রসাদের গৃহে কেহই নাই, কিছু নাই,—এক গাছি শুষ্ক কঞ্চিও নাই, তখনই বুঝিলাম, মা ত নাইই,—স্ত্রী—কন্যা—ভ্রাতা প্রভৃতি কেহই নাই। রে অবোধ মন! আর চঞ্চল হতেছ কেন? যখন সব ফুরায় তখন মনুষ্যের চাঞ্চল্যও ফুরায়। যখন সব শূন্য হয়, তখন মানুষ শোক-দুঃখ-শূন্য হয়। আমার সব ফুরাইয়াছে,—সব শূন্য হইয়াছে,—আমার আর শোক দুঃখ নাই। তাই বলি, রে ভ্রান্ত মন! চঞ্চল হইবার তোর আর অধিকার নাই; তুই স্থির থাক্।'

তিন জন সন্ন্যাসী আর অগ্রসর হইলেন না। অদূরস্থ এক বকুল বৃক্ষের তল-দেশে উপবেশন করিলেন।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

এ কি? ৺শঙ্করীপ্রসাদের বাটীতে আজ এরূপ হঠাৎ আনন্দোৎসব কেন? নাচে কে! গায় কে! হাসে কে! কয়েক বৎসর হইতে যে বাটীতে জনপ্রাণী প্রবেশ করে নাই,—যে বাটী এতদিন নীরব নির্জ্জন ছিল,—প্রহরী স্বরূপ দুইজন দ্বারবান্ ব্যতীত, যে বাটীতে অন্য কোন ব্যক্তিই এ পর্য্যন্ত ছিল না,—পশু পক্ষী পর্য্যন্ত যে বাটীতে প্রবেশ করিতে অধুনা ভয় করিত,—সে বাটীতে আজ এত কোলাহল কিসের?

লুচি-ভাজার—গন্ধ আসিতেছে কেন? শঙ্করীপ্রসাদের বাটীতে কি আজ ব্রাহ্মণভোজন? না—কাঙ্গালী-ভোজন? আবার সুদিন আসিল নাকি? এ অনন্ত অমাবস্যায় আবার আকাশপটে পূর্ণচন্দ্র হাসিল নাকি? কাত্যায়নী, বধূ যশোদা এবং লক্ষ্মী তীর্থ দর্শন করিয়া প্রত্যাগত হইলেন কি? চলনা, গিয়া দেখি—ব্যাপার কি?

সন্ন্যাসিত্রয় সেই বৃক্ষতলে বসিয়া সুযুক্তি স্থির করেন,—৺শঙ্করীপ্রসাদের বাটীর ভিতর, প্রথমতঃ আমাদের যাওয়াই ভাল। সে খানে গেলে অনেক বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। দ্বারবান্ দুই জনকে বশ করিয়া সন্ন্যাসিত্রয়, শঙ্করীপ্রসাদের বাড়ীতে প্রবেশ করেন। দ্বারবান্‌দ্বয়কে বলেন,—"আমরা সন্ন্যাসীমাত্র, এই অতিথিশালায় আমরা ঠাকুরকে ভোগ দিব, প্রসাদ পাইব এবং তোমাদিগকেও প্রসাদ দিব। দ্বারবান্ দুইটী হিন্দু, বিশেষতঃ ঐ বাড়ীর পার্শ্বে তাহাদের একটী মুদীখানার দোকান ছিল। ভোগের জন্য সন্ন্যাসিগণ ঘৃত-আটা কিনিবেন

শুনিয়া, সন্ন্যাসিগণকে তাহারা অধিকতর আদর করিল; বলিল,—“এখানে কাহারও থাকিবার হুকুম নাই। তবে আপনারা সন্ন্যাসী কি না, তা একবেলা না-হয় এ বাড়ীতে থেকে ঠাকুরের সেবা আদি করুন। আমাদের মনিবও হিন্দু। যদি তিনি ভবিষ্যতে এই কথা শুনেন, তাহা হইলে তিনি আমাদিগকে তত কিছু বলিবেন না।”

সন্ন্যাসিগণ,—শঙ্করীপ্রসাদের বহির্বাটীতে বসিয়া মধুর কণ্ঠে দুই একটী ভজন গাহিলেন। একে-একে দুইয়ে-দুইয়ে দলে-দলে লোক জড় হইতে লাগিল।

কথা-প্রসঙ্গে সেই সমাগত ব্যক্তিবৃন্দের নিকট হইতে সন্ন্যাসি-গণ এইরূপ মর্ম্মের অনেক কথা শুনিলেন,—“শঙ্করীপ্রসাদের এই অপূর্ব্ব অট্টালিকা,—ভিন্ন গ্রামস্থ কোন জমিদার,—দেনা, ডিক্রীতে নীলাম করিয়া লইয়াছেন। ভগিনীপতি, সম্বন্ধী এবং ভিক্ষা-পুত্রের দল,—ষড়যন্ত্র করিয়াই এ ঘটনা ঘটায়! যিনি নীলামে ডাকিয়া লইয়াছেন, এই সম্পত্তি তাঁহার বেনামীতে আছে। এমনও কথা রাষ্ট্র, যিনি বেনামদার, তিনি এখন নাকি কাহারও কাহারও নিকট বলিতেছেন যে, এই সম্পত্তি আমার নিজের—আমি নিজ নামেই ডাকিয়াছি,—এবং নিজে টাকা দিয়া কিনি-য়াছি। বেনামী হইতে গেল কেন? সে যাহা হউক, এই বাড় খরিদ করিয়া অবধি এপর্য্যন্ত দখল লইয়া কেহ বসবাস করেন নাই,—ভোগ দখল সুখ কাহারও অদৃষ্টে ঘটে নাই। কেন না, এই বাড়ীটী বড়ই অলক্ষণযুক্ত। এই বাড়ীর বার হাত মাটির নীচে (কোন্ নির্দ্দিষ্ট স্থানে,—কেহ তাহা জানে না) ঘোর কৃষ্ণ-বর্ণ একটী বিড়ালের হাড় প্রোথিত আছে। যিনি এখানে বাস

করিবেন, তাঁহারই কোন না কোনরূপ অমঙ্গল ঘটিবে; এমন কি, তিনি সবংশে নিধন হইতে পারেন। এই দেখুন না কেন, ৺শঙ্করীপ্রসাদ পূর্ণভোগের সময় হঠাৎ মরিয়া গেলেন, তার পর তাঁর বড় ছেলেটী অসৎসঙ্গে পড়িয়া উৎসন্ন গেল।”

সমাগত ব্যক্তিগণের গল্প,—এতক্ষণ একান্ত মনে সন্ন্যাসিত্রয় বেশ শুনিতেছিলেন। যখন শঙ্করীপ্রসাদের জ্যেষ্ঠপুত্রের উৎসন্ন যাইবার কথা প্রসঙ্গক্রমে উঠিল, তখন সহাস্যবদনে ভবানীপ্রসাদ দর্শককে জিজ্ঞাসিলেন,—“সেই জ্যেষ্ঠ পুত্রটী কিরূপে উৎসন্ন গেল।”

দর্শক। বড়-মানুষের ছেলে,—ভোগে বিলাসে থাক্‌তো। সে সব কথা তোমাদিগকে আর কি বলবো! তোমরা সন্ন্যাসী মানুষ!

ভবানী। তা বই কি? অধিকাংশ বড় মানুষের ছেলেই বড় কামুক হয়। কামিনী-কাঞ্চনের প্রতি তাহাদের অত্যন্ত আসক্তি হয়। শাস্ত্রে ইহা লিখিত আছে।

দর্শক। শাস্ত্র-টাস্ত্র আমরা পড়ি নাই, আমরা চোখে দেখে বলছি। এই শঙ্করীপ্রসাদের বড় ছেলেটা না ক'রেছিল কি? ওঃ গুরুপত্নী হরণ ক'রে ফেললে গা! দেশময় একবারে ঢি ঢি পড়ে গেল, তার নামে ফৌজদারী নালিস হলো, গ্রেপ্তারী পরওয়ানা বেরুলো। কোম্পানী হাতে, হাত-কড়ি দিয়ে নিয়ে যায় আর কি? ছোঁড়া ভারি দুষ্ট কিনা? সে, দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেল।

ভবানী। তার পর; সেই পাপিষ্ঠ মূঢ় ব্যক্তির কি হইল?

দর্শক। শুনিতে পাই, ছোঁড়া গিয়ে মুর্শিদাবাদে লুকিয়ে ছিল। যার স্বভাব মন্দ হয়, সে কখন স্থির থাকিতে পারে না।

মুর্শিদাবাদে কোন মুসলমানের বাড়ী ছোঁড়া ঐরূপ বদখেয়ালী করিতে গিয়াছিল। সে মুসলমান-সন্তান,—অমনি ছাড়িবে কেন? ছোঁড়াকে কেটে খণ্ড খণ্ড করে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিল। জেলের জালে শেষ কালে লাস উঠলো।

ভবানী। (কৃত্রিম কোপের সহিত) এ পাপ-স্থানে তবে আমরা থাকিব না; আমরা উঠিলাম।

দর্শক। আরে ঠাকুর! বসুন বসুন, কত মজা শুনুন।

ভবানী। বেশীক্ষণ এখানে থাকিতে পারিব না। যাহা বলিতে হয়, শীঘ্র বল।

দর্শক। সেই শঙ্করীপ্রসাদের আর একটা ছেলে ছিল। সেই ছোঁড়া আরও পাজি।

ভবানী। সে কি ক'রেছিল?

দর্শক। সেটা ছিঁচকে চোর। সে নীলকুঠীতে গিয়ে মোহর চুরি ক'রেছিল। যেমন চুরি করা, তেমনি ধরা পড়া। তার পর, দারোগা এসে তাকে থ'নায় বেঁধে নিয়ে গেল।

ভবানী। ওঃ! বংশটাই যে খারাপ দেখিতেছি।

দর্শক। সে মজার কথা আর কি ব'লব? রঘুদয়াল ব'লে তাদের একটা নগদী ছিল,—সেটা ডাকাতের সর্দার। সে,—দিনে শঙ্করীপ্রসাদের বাড়ী কাজকর্ম্ম ক'রত, আর রাত্রে ডাকাতী ক'রে বেড়াত। লোকটা ভারি জোয়ান, ভয়ে কেউ কিছু তাকে ব'লতে পা'রত না। তার পর এক দিন এক শত পাঠান এসে, তাকে গ্রেপ্তার ক'রে ঠ্যাংদোলা ক'রে ধ'রে নিয়ে গেল। কিন্তু রঘুদয়ালকে ধরে রাখা বড় শক্ত কাজ। থানায় যেয়ে রঘুদয়াল রাত্রে লুকিয়ে নিজের হাতকড়ি ভেঙ্গে ফেলে, ছোট ছোঁড়াও সেই

দিন থানায় আটক ছিল। রঘুদয়াল ক'রলে কি? শেষ রাত্রে আস্তে আস্তে থানার দরজাটীকে ভা'ঙ্গলে। ভেঙ্গে—ছোট ছোঁড়াকে কাঁধে ক'রে নিয়ে কোথায় যে নিভাও হ'য়ে দৌড়ে পালালো, কেউ আর তখন তাকে খুঁজে পেলে না। কিন্তু সে পালিয়ে বাঁচবে কোথায়? কোম্পানীর মুলুকে লুকিয়ে থাকা চলে না। জেলায় জেলায় তার নামে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা বেরিয়ে আছে ও হুলিয়া ঘুরছে।

ভবানী। বটে,—বটে, তার গায়ে ত খুব জোর দেখছি।

দর্শক। জোরের কথা কি আর ব'লবো! এই গ্রামে ঐ বকুল তলায়, আমার ঠিক্ সম্মুখে রঘুদয়াল দাঁড়িয়ে, এক লাঠিতে একবার একটা ক্ষেপা হাতীকে সে মেরে ফেলেছিল।

ভবানীপ্রসাদ ভাবিতে লাগিলেন,—"রঘুদয়াল এবং ছোট ভাইটীর সংবাদ কতকটা পাইলাম। বুঝিলাম, তাহারা এ দেশে নাই। রঘুদয়াল যখন সঙ্গে আছে,—তখন ভাইটীর ভাবনা কিছু করি না। জননার কথা, সহধর্ম্মিণীর কথা, লক্ষ্মীর কথা এখনও দর্শক কিছু বলে নাই। হৃদয়! কম্পিত হইও না, দর্শক যাহা বলে বলুক। বজ্রাঘাতে দেহ দগ্ধ হয়,—হউক। হৃদয়! কম্পিত হইও না!—স্থির থাক। বীরের ন্যায় বুক পাতিয়া মহাবজ্র গ্রহণ কর।"

দর্শক,—সন্ন্যাসীকে কহিল,—"দেবতা চুপ করিয়া রহিলেন যে?"

ভবানী। পাপ-কথা শুনিয়া আমার অন্তর বিচলিত হইতেছে। পাপের চিত্র,—নরকের চিত্র অঙ্কিত হইতে দেখিয়া,—আমার চোকে যেন জল আসিতেছে। এখন এ স্থান হইতে পলাইতে পারিলেই বাঁচি!

দর্শক। হাঁ হাঁ,—তা হবে বৈ কি? আপনারা সন্ন্যাসী-মানুষ কি না, অল্পেতেই আপনাদের হৃদয় দয়ায় ফেটে পড়ে। আর একটু বসুন, ব'সে আরও মজার কথা শুনুন; বড়ছোঁড়া জীবদ্দশায় হ্যাণ্ডনোট কেটে কত লোকের নিকট যে দেনা ক'রে গেছলো,—তা আর কি ব'লবো। শেষ দশায় তার বাপেরও অনেক দেনা হ'য়েছিল। সেই সকল দেনার দরুণ ডিক্রীজারীতে শঙ্করীপ্রসাদের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রী হয়ে গেল। শঙ্করীপ্রসাদের স্ত্রী ছিল সতী লক্ষ্মী; কিন্তু হ'লে কি হয়! ছেলেদুটো তাকে ডুবিয়ে গেল; মাগী আর শেষে খেতে পেলে না।

ভবানী। যাক্ ও-সব কথা; পাপ-কথা শুনিয়া আমার বড় কষ্ট হইতেছে।

দর্শক। আর একটু শুনুন না! শঙ্করীপ্রসাদের স্ত্রীর একটী বৌ ছিল। বৌটী বড়ছোঁড়ার স্ত্রী। সে বৌয়ের একটী মেয়ে ছিল। মেয়েটীর রং যেন কাঁচাসোণা। সেই দুধে-মেয়েটীর মুখখানি দেখলেই তাকে ভালবেসে কোলে নিতে ইচ্ছে হ'তো। সেই মেয়েটী, একদিন একখানি ছেঁড়া কাপড় প'রে বেরিয়ে এসেছিল। আঁচলে চারিটি মুড়ি বাঁধা ছিল। সেই মুড়িগুলি ছেঁড়া দিয়ে ক্রমশঃ সব প'ড়ে গেল। মেয়েটী আঁচলে হাত দিয়া দেখে যে, মুড়ি নাই। মেয়েটী তখন খুঁটে খুঁটে মুড়িগুলি তুলতে লাগ্‌ল। পাড়ার সেই আহ্লাদে মেয়েটা এসে, ঠাট্টা ক'রে ব'লতে লাগ্‌লো,—"ওলো লেকি! তোর্ কি ভাল কাপড় জুটে নাই? ছেঁড়া-কাপড়ে মুড়ি বেন্ধে এনেছিস্ কেন লো! ছেঁড়া কাপড় প'রেকি কটকের বার হ'তে আছে? এর চেয়ে যে ন্যাংটো হ'য়ে এলেই হ'তো!' লক্ষ্মী

মেয়েটী আধ-আধ কথায় উত্তর দিল,—"বাবা আমার চাকুরী ক'র্ত্তে গেছেন, তিনি এলেই ভাল কাপড় প'রবো।"

আহ্লাদী বলিল,—"তোর বাবা চাকুরী ক'রতে গেছে বৈ কি? সে যে ম'রে গেচে। সে আর ফিরবে না লো,—ফিরবে না।" এই কথা শুনিয়াই সেই লক্ষ্মী মেয়েটী কেঁদে উঠ্‌লো। আমি মেয়েটীকে কোলে ক'রে নিয়ে সেই ডাকাত মিন্‌ষেকে—সেই রঘুদয়ালেটাকে ডেকে দিলাম! বলিলাম, তোমারা মেয়েকে ভুলাও গে!

ভবানীপ্রসাদ ভূতলে মুখ গুঁজিয়া দুপ্‌ করিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া গেলেন; কেবল গোঁ গোঁ করিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিলেন। সহচর সন্ন্যাসিদ্বয় তাঁহাকে চাপিয়া ধরিল। দর্শক কহিল,—"এ কি। এ কি! এ কি! ইনি এমন করিতেছেন কেন?"

সন্ন্যাসিদ্বয়। ইহাঁর মৃগী রোগ আছে; তাই ইনি মধ্যে মধ্যে এরূপ মূর্চ্ছিত হন এবং হাত পা ছোড়েন।

একজন সহচর সন্ন্যাসী ভূতলস্থিত ভবানীপ্রসাদকে চাপিয়া ধরিয়া তাঁহার কাণের নিকট মুখ লইয়া গিয়া, অতি ধীরে কহিল,—"চুপ করুন, চুপ করুন কাঁদিবেন না।" ভবানীপ্রসাদ অতীব আস্তে আস্তে উত্তর দিলেন,—"আমি কাঁদি নাই, কুস্তী করিতেছি। ভয় নাই, শীঘ্র উঠিতেছি।" কিছুক্ষণ পরে ভবানীপ্রসাদ কুস্তী-গীর জোয়ানের মত, চক্ষুদ্বয় আরক্ত বর্ণ করিয়া, বক্ষঃ ফুলাইয়া ভূতল হইতে উঠিয়া পড়িলেন; মুখে বলিলেন,—'ব্যোম ব্যোম, হর হর শিব শঙ্কর!'

দর্শক জিজ্ঞাসিলেন,—"দেবতার কি মৃগী আছে?"

ভবানী। হাঁ, নিদারুণ মৃগীরোগ আছে।

দর্শক। আমরা জানি, আমরাই পাপী মনুষ্য। আমাদেরই রোগ-শোক আছে। আহা! সাধু-সন্ন্যাসীর দেহে আবার রোগ জন্মে কেন?

ভবানী। সমস্তই কর্ম্ম-ফল। গৃহস্থই হউক, আর সাধু-সন্ন্যাসীই হউক,—কর্ম্ম-ফল সকলকেই ভোগ করিতে হইবে। সে যাহাই হউক, আমরা এ কুস্থানে আর থাকিতেছি না।

দর্শক। একটু বসুন, শেষ মজাটা শুনুন। সেই লক্ষ্মী মেয়েটী, খেতে না পেয়ে, শুকিয়ে যেন দড়ি-গাছটা হ'য়ে গেল। তেমন যে সোণার বরণ,—ধূলায় কাদায় অযত্নে অনাহারে,—দেখ্‌তে দেখ্‌তে,—কাল হ'য়ে উঠলো। তারপর একদিন শুনি,—শঙ্করীপ্রসাদের স্ত্রী, সেই বুড়ী,—বৌটীকে নিয়ে আর দুদে-মেয়ে লক্ষ্মীটী নিয়ে একদিন রাত্রে কোথা বেরিয়ে গেছে। গ্রামে কুলোক সুলোক—সব রকম লোকই আছে;—কেউ বল্লে, তাঁরা শ্রীবৃন্দাবনে গেছেন; কেউ বল্লে, সে কথা আর কি বল্‌বো,—বৌটীর বয়স কাঁচা কিনা, পেটের দায়ে মানুষ সব কর্ত্তে পারে। গ্রামে নানা কথা কাণাকাণি হইতে লাগিল। গ্রাম তোলপাড় হ'য়ে উঠল।

ভবানী। তবে এইবার উঠি।

দর্শক। না না,—তা হবে না। এত ভয় কি? আপনারা এসেছেন,—এক রাত্রি এখানে বাস করুন; সাধু-সন্ন্যাসীর আবার অমঙ্গল কি হইবে?

ভবানী। আচ্ছা,—তবে আপনার কথাতেই আজ আমরা এখানে রহিলাম। দেব-সেবার পর আপনাদিগকে কিঞ্চিৎ

প্রসাদ বণ্টন করিব। আপনারা তখন আসিতে ভুলিবেন না।

দর্শক। দেবতার প্রসাদ গ্রহণ করিতে সকলেরই ইচ্ছা! ঠিক্ সময় হ'লেই শঙ্খ-ঘণ্টার ধ্বনি করিবেন, তাহা হইলেই আমরা সকলে আস্‌বো।

ভবানীপ্রসাদের আর শোক-তাপ রহিল না! তিনি হাসিতে হাসিতে, নাচিতে নাচিতে, ভজন গান গাহিতে গাহিতে, প্রচুর পরিমাণে ঘৃত আটা মিষ্টান্ন সংগ্রহ করিলেন। যে পাকশালায় কাত্যায়নী এবং বধূ যশোদা রন্ধন করিতেন, সেই খানে বসিয়া তিনি লুচি ভাজিতে আরম্ভ করিলেন। লুচি ভাজার সৌরভে দশ দিক্ পূর্ণ হইল। সহচর সন্ন্যাসিগণকে কখন বা তিনি লুচি ভাজিতে দিয়া যে ঘরে জননী কাত্যায়নী, দেবী শঙ্করীর সমক্ষে বসিয়া জপ করিতেন, সেই ঘরে একবার প্রবেশপূর্ব্বক বিকট হাসি হাসিয়া, ধীরে ধীরে 'মা মা!' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। যে ঘরে বধূ-যশোদা লক্ষ্মীকে কোলে লইয়া সর্ব্বদা খেলা করিতেন, সেই ঘরে উপনীত হইয়া, ভবানীপ্রসাদ খানিকক্ষণ গড়াগড়ি দিলেন, আবার ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া, বিকট হাসি হাসিয়া হাততালি দিতে দিতে, নাচিতে নাচিতে, গাহিতে গাহিতে পাকশালায় উপনীত হইলেন।

দেবতার ভোগ দিয়া, আড়াই শত লোককে প্রসাদ ভোজন করাইয়া, সন্ন্যাসিত্রয় স্বল্পমাত্র প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া, 'জয় জয় শিব শঙ্কর অনাদিশঙ্কর!' বলিতে বলিতে উঠিয়া পড়িলেন।

গ্রামবাসী লোকগণ বুঝিয়াছিল,—অদ্য রাত্রে সন্ন্যাসিগণ ৺শঙ্করীপ্রসাদের এই বাটীতে নিশাযাপন করিবেন, কিন্তু প্রভাতে আসিয়া তাহারা দেখিল, সন্ন্যাসিত্রয় সে বাটীতে আর নাই।

দ্বারবন্দ্বয়কে তাহারা জিজ্ঞাসিল,—"সন্ন্যাসিগণ কোথায় ?" তাহারা কহিল,—"আমরা কিছুই জানি না। কখন সন্ন্যাসিগণ এবাটী পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না। তবে প্রভাতে উঠিয়া দেখিলাম, আমাদের প্রত্যেকের শিয়রে একটী করিয়া মোহর পড়িয়া আছে !"

গ্রামবাসিগণ কাণাকাণি করিল;—"সন্ন্যাসিত্রয় মানুষ নহে,—দেবতা।"

যে দিকে চাই,—সেই দিকেই শূন্যাকার। সেই শূন্যাকারের সহিত অন্ধকার এবং হাহাকার বিজড়িত ! জননী কাত্যায়নী, বধূ যশোদা এবং কন্যা লক্ষ্মী,—বৃদ্ধা, যুবতী এবং শিশু—অবলা অসহায়া এবং নিরাশ্রয়া,—এই তিনটী স্ত্রী,—কোথায় যে নিরুদ্দিষ্ট হইলেন,—কোথায় রহিলেন,—জীবিত, কি মৃত,—অমরসিংহ তাহা ঠিক করিতে পারিলেন না।

তৃতীয় ভাগ সমাপ্ত।